উড়ুক্কু

নাসরীন জাহান

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বাড়িটা যখন খুঁজে পেলাম, দিনের আলো তখন ফুরিয়ে এসেছে। গলির বাহান্ন পাক, নর্দমা, নারকেলের পচা খোসা, ধুলোর ঠাসা অসহ্য পতন সব ছাপিয়ে এতক্ষণ একটা উদ্দীপনাই কাজ করছিল—যেভাবেই হোক বাড়িটা খুঁজে বের করা। রিকশা থেকে নেমে পড়েছিলাম বড়ো রাস্তার মোড়ে। তখনো রোদ ছিল—নিস্তেজ, ফ্যাকাসে। নাম্বারটা হাতে নিয়ে শুরু করতে যাব, তখুনি চারপাশ ধোঁয়া করে বৃষ্টি। ছায়া বৃষ্টির ধীর-মন্থর পতন মাথায় করে প্রায় দৌড়েই পাশের সরু বারান্দাটায় আশ্রয় নিই। নিশ্বাস টেনে দাঁড়াতে যাব—দেখি পেছনে একজন লোক, বৃষ্টিভেজা প্যান্টের পা গুটোচ্ছে। শাড়ির জল ঝেড়ে সরে দাঁড়াই। না, বারান্দায় আরও লোক আছে—দুজন ভিখিরি। শতচ্ছিন্ন কাঁথায় শরীর ঢেকে মৌজ করে ঘুমুচ্ছে। কাঁথাটার বিভিন্ন অংশ ফুঁড়ে ওদের শরীরের বিপজ্জনক সব জায়গা দেখা যাচ্ছে। এইবার প্যান্ট গুটোতে-থাকা লোকটার সামনে আমি মহা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যাই।

পড়ন্ত বিকেলেই জ্বলে উঠেছে ল্যাম্পপোস্ট। ঝিরঝির বৃষ্টি, যেন বাতি চুইয়ে আলো পড়ছে। সামনের ক্ষত-ভরা ভাঙা গলিটা কেমন অস্পষ্ট হয়ে আসছে। জায়গাটা ঝাপসা করে তার বিপরীত দিকে জেগে আছে বিশাল সাদা বাড়িটা। সেই ধবধবে শূন্যতার দিকে তাকিয়ে ঝিম ধরে, গলা শুকিয়ে আসে। আমার হাত-পা কাঁপতে থাকে। মনে পড়ে, দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি। অফিসেও যাইনি আজ। সারাদিন টো-টো চক্কর খেয়েছি। কতদিন পর এই অপার স্বাধীনতা! কতদিন পর আজ নিজেকে ছেড়ে দেওয়া!

বৃষ্টি ঝরছে পুরো পরিবেশটাকে বিধবা, সাদা করে দিয়ে। সামনের বিল্ডিং-এর একজন লোক গোলাপ টবের কান ধরে এমন ভঙ্গিতে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে, বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না, সে শুধু বাগানই করেছে, গাছের জনক হতে পারেনি।

কেমন হাঁসফাঁস লাগছে। সেই সাদা জলো প্রকৃতির ঘোর বিভ্রম থেকে নড়তে পারছি না। চুম্বকের মতো আমাকে আটকে রেখেছে। কী নাজুক অবস্থা! বৃষ্টির ধোঁয়া ভেদ করে তাকিয়ে আছি এবং চুম্বকের আকর্ষণ কাটিয়ে সামনে এগুচ্ছি। হঠাৎ কী হয়, আমার জিভ বেরিয়ে আসে। আমি শূন্যের দিকে সেটা বাড়িয়ে দিই। বৃষ্টির ছাঁটে যখন ভিজে উঠছি, পেছন থেকে কে যেন প্রায় খেঁকিয়ে ওঠে, 'আরে করছেন কী! ভিজে যাচ্ছেন তো!'

পেছনে সরতে সরতে পিঠটা যখন সত্যি সত্যিই দেয়ালে গিয়ে ঠেকেছে, নিজেকে তখন আবিষ্কার করি এক নিরাপত্তাহীন শূন্যতায়। আশ্চর্য, যে লোকটা প্যান্ট গুটোচ্ছিল বৃষ্টিতে ঝাঁপ দেবার মতলবে, সে এখন আয়েশ করে দাঁড়িয়ে আছে। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার, বারান্দায় ভিখিরি দুটো নেই। যে ঝুলঝুলে, আঠালো আর দুর্গন্ধ-ছড়ানো কাঁথা তাদের গায়ে লেপটে ছিল, তারা চলে গেলেও, তার কিছু টুকরোটাকরা আর উৎকট গন্ধটাতো থাকবার কথা! আমি সীমাহীন ধূম্রজাল ভেদ করে দেখি, তারা নেই, তাদের চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই। বৃষ্টির মধ্যে কখন বেরিয়ে গিয়েছে, খেয়ালও করিনি। এখন সরু বারান্দার পুরোটা জুড়ে আমি আর সেই লোকটা। সে গোটানো প্যান্ট সোজা করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু তার এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত পালটানো কেন? দূরারোহ সংশয় নিয়ে আমি তার নির্বিকার মুখ দেখি। এতক্ষণে আমার শরীর বেয়ে ঠান্ডা স্রোতের ধারা নামতে শুরু করে। উঁচু বিল্ডিং-এর পানির ট্যাংকের ওপর কাকের জটলা। আমাকে জলের স্রোতে নিমজ্জিত করে বৃষ্টি ক্রমশ বাড়ছে। চারপাশে ঘোর কুয়াশা। রাস্তার লাগোয়া ঘাসে-ছাওয়া চিলতে জমিতে দু-তিনটে ব্যাং উন্মত্ততায় মেতেছে। লোকটা পেছন থেকে যদি আমাকে হঠাৎ জাপটে ধরে? আমার হিম-চামড়া স্ফীত হয়। এই বৃষ্টিপতন, ভীষণ নির্জন গলি, সামনের চুম্বক সাদা, আমি নিজেকে বাঁচাতে পারব তো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

যাহ্, বাংলা ফিল্ম আর কি... নিজেকে ঝেড়ে সহজ হতে যাব, পিঠের কাছে নিশ্বাসের শব্দ।

ভেতরে ভেতরে ছটফটিয়ে উঠতেই দেখি, মাপা দূরত্বে দাঁড়ানো স্থির সেই লোকটার চোখ এখন রাস্তা ছেড়ে আমার দিকে। তার সেই চোখে গভীর বিস্ময়। পরক্ষণেই বুঝতে পারি, আসলে নিশ্বাস নয়, বৃষ্টির ঝাপটের শব্দ। হায়রে ছিঁচকে আত্মা! দুর্বলতা এড়াতে ইস্পাতের ফলার মতো টান টান হয়ে উঠি।

ঘোর অতল থেকে নিজেকে টেনে তুলি। কেঠো হাসি হেসে স্রেফ বোকার মতো লোকটার দিকেই এগিয়ে যাই। বলি, 'মানে, এই যে, এই নাম্বারের বাড়িটা খুঁজছিলাম, আপনি চেনেন?'

সাদা শার্ট, নীল প্যান্ট পরা লোকটার আপাদমস্তক এতক্ষণে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ হয়। বোধ হয় হপ্তাখানেক তার শার্টটা ধোয়া হয়নি। কলারের ভাঁজে ময়লার আস্তর। সম্ভবত সেভও করেনি দিন-তিনেক। খোঁচা খোঁচা দাড়ির নীচেকার চামড়ায় ভাঁজ। চোখদুটোও কুতকুতে। পুরো চেহারাটা কী অসম্ভব বিদঘুটে! আপাতদৃষ্টিতে লোকটার ভাবভঙ্গি নিরাপদ মনে না হলেও সংগোপন ভয়টা কাটিয়ে উঠি, বিশেষ করে সে যখন বলে, 'বৃষ্টি কমলে আপনাকে সাহায্য করতে পারব। আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'

এইরে, শুরু হল! এখন কোথায় কী করেন, ভাইবোন ক-জন, স্বামীর ঠিকানা—এইসব টেনেটুনে প্রসঙ্গ একেবারে হাঁড়ির তলায় নিয়ে ঠেকাবে।

আমি তাই চটজলদি 'রায়ের বাজার' বলে, গম্ভীর হয়ে রাস্তার দিকে তাকাই।

বৃষ্টি ততক্ষণে গলি ছেড়ে অন্যদিকে চলে গেছে। চারদিকে ফিকে মৃদু আলো। জড়তা কাটিয়ে বাইরের সেই নরম আলোয় হাত বাড়াই। এক সময় আমি আর লোকটা রাস্তায় নেমে আসি। বাঁ গলি ডান গলি করে করে সে-ই নাম্বার নিয়ে একে-ওকে জিজ্ঞেস করে। আমি নিঃশব্দে তার পেছন পেছন হাঁটি। এক সময় আমার কাঙ্ক্ষিত নাম্বারের কাছাকাছি এসে লোকটা ঘড়ি দেখে। বিচলিত দেখায় তাকে। অত্যন্ত ক্ষিপ্র স্বরে আমাকে বলে, 'আপনি ডানে গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিলেই সম্ভবত বাসাটা পেয়ে যাবেন।' তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিই। হন্তদন্ত হয়ে সে চলে গেলে আমি আবারও একা।

চক্করটা খেতে হল তারপরই বেশি। সে যত সহজে ডান-বাঁয়ের হিসেব বুঝিয়ে দিয়েছিল, ঢাকার বাড়িঘর মোটেই তেমন সুশৃঙ্খল নয়। খিদেয়-ক্লান্তিতে ক্রমেই তেতে উঠছিল মেজাজ। একটা বিশাল বিল্ডিং-এর কাজ করছে কিছু শ্রমিক। প্রথমে তাদের কাছে এগিয়ে যাই। সামনে ইট-সুরকির স্তূপ। লম্বা রডের সারির ফাঁকফোকরে আমার পায়ের বুড়ো আঙুল ঢুকে যেতে থাকলে একটা চরম অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যাই। এই সময় বিরক্তি-ভরা মুখে রড সরাতে সরাতে একটা লোক আমার সামনে এসে দাঁড়ায় এবং আমার জিজ্ঞাসার জবাবে বলে, এ নাম্বারের বাড়ি সে চেনে না। এবার সত্যি সত্যি অসহায় হয়ে পড়ি। দিনের আলো শুষে নিচ্ছে সন্ধ্যা। চারপাশ ঘিরে নেমে আসছে প্রগাঢ় ছায়া। গলিটার গর্তে গর্তে কাদা-জল জমে থাকায় আমার শাড়ির ডগায় ভেজা বালু কিচকিচ করে। শাড়িটা ঝাড়তে গেলে সমস্ত গা শিরশির করে ওঠে। এবার নিজেকে সেই ভাঙাচোরা রাস্তা থেকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে প্রায় লাফিয়ে হাঁটতে শুরু করি। এলাকাটার প্রায় সবগুলো বিল্ডিংই প্লাস্টারবিহীন। হা হা ইট লাল দাঁত বের করে আছে। অ্যাডভান্স নিয়ে বাড়িঅলা সম্ভবত আধাআধি তৈরি বাড়ির মধ্যেই ভাড়াটে উঠিয়ে নিয়েছে। ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে। বাড়িগুলোর ছায়া ছায়া জানালায় মানুষের অদ্ভুত সব মুখ।

সংসার তো করেছি আড়াই বছর। ভাড়াটে বাড়িতে থাকার এত বিচিত্র অভিজ্ঞতা এত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

আর কারও হয়েছে কী না সন্দেহ। আমি সেই বাতিহীন, নিরাপত্তাহীন রাস্তায় অতীতের মধ্যে গা ঘষটে পড়তে গিয়েও নিজেকে টেনে তুলি। আমি এখন কোথায় যাব?

এই বোধ আমাকে মর্মান্তিক করে তোলে। এরই মধ্যে ঝপাৎ—একটা পা ছোট্ট মতন গর্তে সেঁধিয়ে যায়। আহ্! বুড়োনখটা বোধ হয় ভেঙেই গেল। দাঁতে যন্ত্রণা চেপে পা-টাকে উদ্ধার করি। হলে কী হবে, কাদায় ঠেসে গেছে স্যান্ডেল। এবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। চোখের সামনেটা কেমন টলে উঠছে। ঝিমঝিম ঘোর আর একটা বমিবোধ আমাকে ছেঁকে ধরে। সেই সাথে ভয়ানক খিদে।

আমি কি বাসায় ফিরে যাব? একটা অশরীরী ভয় থেকে—আমার এই ভাবনা। ওখানে ফিরে যাওয়ার চেয়ে এই আঁধার রাস্তায় কোনো চলন্ত ট্রাকের তলায় পড়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। পলকে নিজের মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়েঝুড়ে প্রায় মরিয়া হয়েই একজন মাস্তান গোছের ছেলের দিকে এগিয়ে যাই, 'প্লিজ ভাই—।'

আমার এই সম্বোধনে সে যেন নিজেকে জাহির করার সুযোগ পায়। এরপর সে প্রায় হাত ধরেই বাড়িটার সামনে আমাকে দাঁড় করিয়ে দেয়, 'ইরফান সাহেব আপনার কে হন?' তার এই বিড়ি-ফোঁকা মুখ থেকে বেরুনো অযাচিত প্রশ্নেও আমি বিনয়ী থাকি। নিজেকে বিস্তীর্ণ হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে ভেঙে ভেঙে বলি, 'জি, উনি আমার চাচা।'

'সোজা ভেতরে চইল্যা যান'—কথা বলেই সে চলে যায়।

কিন্তু এত ঝড়ঝাপটার পর আকাঙ্ক্ষিত বাড়িটা খুঁজে পাওয়ার আনন্দ ক্রমশ থিতিয়ে আসতে থাকে। কঠিন কুয়াশার আস্তরণে আমার গোটা অস্তিত্ব নিমজ্জিত হয়। ইরফানুল কবির! শেষ পর্যন্ত আমি তাঁর গেটের সামনে! সারাটা জীবন যাঁর কাছ থেকে আমরা কোনো সহানুভূতি, কোনো করুণা, কোনো স্নেহ কিংবা ঘৃণা, কিছুই পাইনি। আমাদের ব্যাপারে যিনি এত নির্লিপ্ত, কোনোদিন আমি যাঁর চেহারাই দেখিনি, আজ কিনা তাঁর বাড়িই খোঁজার জন্য এতখানি উন্মত্ত হয়ে উঠেছি?

পাঁজরের খাঁজে কেমন একটা ধাক্কা। সন্ধ্যার নিভাঁজ ছায়ায় চরম হতাশ আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকি।

বাড়িটা পুরোনো। পুরো আদলটা জমিদার আমলের স্থাপত্যরীতির। জায়গায় জায়গায় তার চামড়া উঠে গিয়েছে। সামনে একচিলতে ঘাসের জমি, ছেঁড়াখোঁড়া। ডানামেলা একটা নিমগাছ দেয়াল ছাপিয়ে ওপরে উঠে গিয়েছে। তার মাথায় সন্ধ্যার একঝাঁক কাক, তাদের চিৎকার। অন্ধকার প্রকট হওয়ায় ল্যাম্পপোস্টের আলোরও বিস্তার ঘটেছে। দরজা-জানালার ফাঁক গলিয়ে বাড়ি থেকে যে আলো আসছে, তা-ও হলদে, চারপাশ ঘিরে রেখেছে অন্ধকার পাঁচিল। ভারী পা বাড়াই খোলা গেটের দিকে। তাহলে এসেই পড়েছি! বিক্ষিপ্ত অসংলগ্ন হাঁটি। আজ আর পেছন ফেরার উপায় নেই।

দরজায় নক করে গলায় দম আটকে দাঁড়িয়ে থাকি। ক্লান্তি, অবসাদ, টেনশনের পীড়ন আমাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। অকস্মাৎ চেপে-বসা দুঃসহ মস্তিষ্কক্রিয়ার ফলে ঘেমে যখন দস্তুরমতো স্নান করে উঠেছি, তখুনি সামনের দরজাটা খুলে যায়। যশোর স্টিচের শাড়ি-পরিহিতা, খোলা চুলের এক মধ্যবয়সী সামনে। কীভাবে শুরু করব যখন ভাবছি, তখুনি তিনি আমাকে ভেতরে ডেকে নিলেন। আড়ষ্ট পায়ে হেঁটে সোফায় থিতু হয়ে বসি। তারপর শুরু করি, 'জি, মা আমাকে ঠিকানা দিয়েছিলেন। আমি, মানে আপনি হয়তো চিনবেন, আমার বাবার নাম সোবহান তরফদার। ইরফান চাচা বাবার খালাতো ভাই।'

স্পষ্ট লক্ষ্ করি, আমার এই বিবরণে মহিলা ঈষৎ কেঁপে ওঠেন। কিন্তু খানদানি কায়দায় নিজেকে সামলে নেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পরমুহূর্তে এই বলে, 'আমি চিনেছি। তুমি ঢাকাতেই থাকো বোধ হয়, তেমনই তো শুনেছিলাম...।' কৌতূহল অপসারিত হলে অন্য পাশের সোফায় সহজ হয়ে বসেন তিনি।

'আপনিই বোধ হয় কাকিমা' এবং পরক্ষণেই চিরকাল যা হয় অস্বস্তির সময় খেই হারিয়ে ফেলা, বলি, 'আপনি জানেন আমি ঢাকায় থাকি? মানে আপনি আমাকে চেনেন? আশ্চর্য! কী করে?' প্রশ্নটা করেই বোকার মতো এতক্ষণ পর উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর পায়ে হাত ছোঁয়াতে যাই, কিন্তু তাঁর তীব্র প্রতিরোধের মুখে তা সম্পন্ন হয় না। আমাকে বাধা দেওয়ার সময় তাঁকে দাঁড়াতে হয়। তেমনি দাঁড়িয়ে থেকেই তিনি বলেন, 'তরফদার সাহেবের একজন মেয়ে ঢাকায় থাকে, কে যেন বলেছিল। যা হোক, তুমি একটু বোসো, আমি আসছি। আসলে দেখো, যোগাযোগ না থাকলে যা হয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক অথচ কেউ কাউকে চিনি না।'

আমি ফের দাঁড়াতে যাব, অমনি তিনি প্রায় হা-হা করে বলে ওঠেন, 'বোসো বোসো।' তারপর আস্তে-ধীরে পা ফেলে তিনি ভেতরে চলে যান। এবার আমি স্বভাব কায়দায় পুরো ঘরটা পর্যবেক্ষণ করে চলি।

বাইরের মতোই ঘরের ভেতরটাও জমিদারি-কায়দায় বানানো। খাঁজকাটা দেয়ালের সাদা আস্তর ফ্যাকাসে। বিশাল এই ঘরে একটি মাত্র একশো পাওয়ারের বাল্ব। ফলে জন্ডিস-আক্রান্ত আলো দৃষ্টিকে পীড়িত করে। দু-সেট ভেলভেটে মোড়ানো সোফা বিশাল আকারের। দেয়ালে অনেক টিকটিকি। ওদের একচ্ছত্র চলাফেরা দেখে মনে হয়, যেন যত্ন করে পোষা। ঘরের পুব কোণে চা গাছের গুঁড়ির ওপর পেতলের বড়ো ফুলদানি, তাতে প্লাস্টিকের একঝাঁক ফুল ধুলোর আস্তরে ঢাকা। গুচ্ছ পাখাসমেত মৃত বাজপাখি দেয়ালের স্ট্যান্ডে ঝুলছে। এই পাখিটাই ঘরের প্রাচীনতাকে আরও প্রকট করে তুলেছে। কার্পেট দেখে মনে হয়, বাঘের চামড়ার। মেঝের মাঝামাঝি বেছানো। ঘরের গুমোট পরিবেশ এমনই যে, মনে হয়, অনেকদিন দরজা-জানলা খোলা হয় না। ভেন্টিলেটার দিয়ে যেটুকু হাওয়া আসে, তাতে করে শ্বাসক্রিয়া স্বচ্ছন্দ হওয়ার সুযোগ পায় না।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এইসব দেখছি আর নিজের অযাচিত কাঙালেপনাকে বিন্দু বিন্দু করে আবিষ্কার করছি। যে লোকটিকে এত ঘৃণা করেছি, প্রতিদিন, আজ তাঁর এখানে আশ্রয়ের জন্য আমাকে আসতে হল? একটা হিমসাদা তরঙ্গ পায়ের পাতা ফুঁড়ে মাথা অবদি ছুটে যায়। ইচ্ছে হয়, দৌড়ে বেরিয়ে পড়ি। যুগপৎ অস্বস্তি আর বিষাদ আমার পায়ের পাতা নীচের দিকে টেনে রাখে। ফ্যাকাসে আলোর তরঙ্গে বুঁদ হয়ে থাকি। তাছাড়া বাইরে অন্ধকার। কী অদ্ভুত, আমি এই বাড়িতে এসেছি! যার জন্য আমার বাবা-মার কুকুর-কামড়াকামড়ি ঝগড়া দেখেছি। মনে পড়ে, আমার ক্ষীণাঙ্গী, অসুস্থ মার সারাজীবনের যাবতীয় যন্ত্রণার একমাত্র উৎস ছিল অভাব। বাবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে মায়া-মমতা-প্রেমের কোনো কিছু কোনোদিন দেখিনি। তাদের কষ্টের মধ্যেও কোনো গভীরতা ছিল না। এরকম সম্পর্কের সেতুর ওপরেই আমাদের জন্ম—পুরো বিষয়টাই আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকে। প্রথম জীবনে অবশ্য মার মূল মানসিক কষ্টের কারণ ছিল এই ইরফান চাচা। তাঁর আর মার সেই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বাবা মাকে এত কুৎসিত কটূক্তি করেছেন আর এত কিল-থাপ্পড় দিয়েছেন যে, ধীরে ধীরে সবকিছুই তাঁর গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। ইরফান চাচা আর মার সম্পর্কটা আসলেই বিচ্ছিরি খোলামেলা এক ঘৃণিত সাবজেক্টে পরিণত হয়েছিল। আর আজ আমি নির্লজ্জের মতো চাচিকে বসে বসলাম কি না মা ঠিকানা দিয়েছেন! কেন মার কথা বললাম? সে কি তাঁর কপালের ঢেউ দিয়ে এই বাড়িতে আমার আসাটাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্যে?

নাহ্! আমি কিছু ভাবতে পারছি না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অস্বস্তি আমার চারপাশ অন্ধকার করে তুলছে। গা গুলোচ্ছে। এই স্তিমিত আলোর ঘোরে আমি কি অজ্ঞান হয়ে যাব? চারপাশে এত সেভলনের গন্ধ কেন? এটা বাড়ি, না

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

হাসপাতাল? আমি কী কোনো পুরোনো ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছি? সবকিছু মিলিয়ে আমার যখন আকাশপাতালহীন টালমাটাল দশা, তখন দরজায় একজন মহিলা, সম্ভবত বুয়া, আমাকে ভেতরে যেতে বলে। এবং কাঁধে সারাদিনের ব্যাগসহ আমার দু-পা আমাকে ভূতগ্রস্তর মতো সেদিকে টেনে নিয়ে চলে।

সব রকম ভদ্রতার পর পেটে যখন আমার দানা পড়েছে, তখন আমাকে নির্দিষ্ট একটা রুম দেখিয়ে দেওয়া হল ঘুমোনোর জন্য। কাঁধের ব্যাগটা মেঝের একপাশে রেখে খদ্দরের চাদর বেছানো খাটে নিজেকে সটান মেলে দিয়ে আমার অস্তিত্বকে আমি নতুন শূন্যতায় আবিষ্কার করি। ড্রইংরুমের মতো এই ঘরটাও গুমোট, শ্বাসরুদ্ধকর। অবশ্য আমি তেমন আলো-হাওয়ায় অভ্যস্ত নই। এই যে আজকের রাত, এই যে ওপরে বিস্তৃত সাদা ছাদ এবং এই যে আমার লজ্জাকর, অস্বস্তিকর আগমন... যেখানেই থেকেছি, সারাক্ষণ এর কোনো-না-কোনোটি আমাকে সবসময়ই আগলে থেকেছে। আমি কোনোদিন আকাশের দিকে ডালপালা-মেলা উন্মুক্ত গাছ হবার সুযোগ পাইনি।

এইবার চারপাশে বাস্তবিকই ছেঁকে-ধরা আঁধার। আমার সব ছাপিয়ে এগিয়ে আসে রেজাউল। ওর সঙ্গে যখন ছাড়াছাড়ি হল, আমার চারপাশে তখন ধোঁয়া, জটপাকানো অন্ধকার। এতদিনের সংসার! অভ্যাস বড়ো মারাত্মক। সংসারে থাকতে যুদ্ধটা একরকম ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে সেই রূপটাকে পালটাতে হচ্ছিল। আমি তখন ডুবছি-ভাসছি। একাকী অন্ধকার একটা ঘরে রাত কাটে। শব্দ শোনামাত্র ধড়ফড় করে উঠি। মাথার মধ্যে কারখানার সাইরেন বেজে চলে একটানা। প্রায় বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম। ছোট্ট একটা কামরা, তার পাশ-ঘেঁষা বাথরুমটা ছিল ভয়ংকর রকমের বিক্ষত। দাঁত বের করা কালচে ইট। হলুদ কমোডের মাঝখানটায় এমন একটা গর্ত ছিল, মনে হত, কেউ খাবলা দিয়ে তার মাংস তুলে নিয়েছে।

সেই সব একাকী নিঃসঙ্গ রাতের প্রবল ভীতি ছিল ওই বাথরুমটি। এবং ছিটকিনির শব্দ। পাশের ফ্ল্যাটে কেউ ছিটকিনি খুলছে, অথবা মাঝরাতে হাওয়ার তোড়ে খুলে গেল আমারই ছিটকিনি, ধড়ফড় করে ঘুম ভেঙে যেত। তারপর সারারাত একটানা বসে থাকা। আমি কোনোকালে একা ঘুমোনোয় অভ্যস্ত নই। বাবা-মার সংসারে ভাইবোন ল্যাপটালেপটি করে বড়ো হয়েছি। ভাবতে অদ্ভুত লাগে, ওরকম একটা কঠিন বাস্তবের মধ্যেও কারও কোনো প্রভাব ছাড়াই আমার একটা আশ্চর্য শৌখিনতা ছিল—ছবি আঁকা। যেন এইসব ঘিনঘিনে অবস্থা থেকে নিজেকে পরিত্রাণ পেতেই সেই নেশাটাকে আমি আমার মধ্যে দুর্নিবার করে তুলেছিলাম।

সেই একলা-একা কয়েকটা দিন কাটানোর সময়টাতে ঝেড়ে ফেলা পুরোনো নেশাটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। খাটের তলা থেকে বের করে আনি আস্তরপড়া রং-তুলি আর ভাঙা-চোড়া ইজেল।

সমস্ত রং তখন খটখটে, জমাট বাঁধা। ঝুল আর ধুলোর জড়াজড়িতে তুলির অবস্থাও লাজুক। চোখের সামনে এই সব দেখে স্থির হয়ে বসে থাকি। ক্রমশ রাত বাড়ে। এরই মধ্যে ঘরের কিছু জিনিসপত্র বিক্রি করে ফেলেছিলাম। বাড়িঅলা মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিয়ে যায়—জানতে চায় বাড়ি ছেড়ে দেব কী না! আমার তখন সত্যি সত্যি চরম অনিকেত দশা।

রেজাউলের সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাস করার সময় এই কামরাটাকে একটা অন্ধকার গুহা মনে হত—ভয়ংকর ভ্যাপসা, এক টুকরো আকাশ নেই, জানলা খুললেই পাশে আস্তর-খসা বিল্ডিং। সবচেয়ে কষ্টকর ছিল দম রুদ্ধ-করা বাড়িটাতে কোনো বারান্দার অস্তিত্বহীনতা। ঘর থেকে বেরিয়েই সিঁড়ি। হয় নেমে যাও, নয় উঠে আসো। সেই সঙ্গে ছিল আদ্যিকালের জং-পড়া একটা ফ্যানের সীমাহীন উৎপাত। তার শব্দ ছিল ভয়াবহ। সেই শব্দে বারবার ঘুমের তন্ত্রী ছিঁড়ে যেত। ওটাকে নিয়ে আমার আরেকটা টেনশন ছিল। দু-দিন খটখট করে চলল তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

তিনদিনের মাথায় ঘটাং করে গেল থেমে। বাকি আড়াই দিন ফ্যানহীন, বাতাসহীন—দুঃসহ গরমের ভাপ। মনে হত সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। পাগলের মতো জানলার পর্দা তুলে দিতাম। পাশের রুক্ষ দেয়াল যেন প্রবল বেগে ধেয়ে আসত আমার দিকে। অথচ বাড়ির ওই যন্ত্রণাকর ফ্যানটাই ছিল রেজাউলের প্রধান আকর্ষণ। সংসারের কাজ বলতে ওই জিনিসটার পেছনে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে লেগে থাকাটাকেই মনে করত নিজের স্বস্তিকর একটা দায়িত্ব বলে।

প্রাইভেট এক ফার্মে চাকরি করত রেজাউল। অফিস থেকে ফিরে সেই ঘামগন্ধের ভেতরে প্রথমেই সে ওপর থেকে ফ্যানটাকে নামাত। মেঝের পুরোটা দখল করে স্ক্রু-ড্রাইভার আর টেস্টারের খোঁচাখুঁচি চলত। এইসব দেখেশুনে মাঝে মাঝে আমার মাথায় রক্ত উঠে যেত। কেননা তার সেই দীর্ঘ নিমগ্নতার সময় বিছানায় বসে থাকা ছাড়া আমার আর কোনো কিছু করার থাকত না। এই নিয়ে প্রায়ই তুমুল ঝগড়া হত। আমার রক্তে সবচেয়ে ক্ষতিকর যে বিষ, সে ছিল আমার জেদ। এক এক সময় ইচ্ছে হত, ওর পিত্তি জ্বলে ওঠে তেমন কোনো কাজে আমিও জড়িয়ে পড়ি। অবশ্য সেই জেদকে থিতু করে ফেলতেও আমার জুড়ি ছিল না। ফলে ও করতে পারলে আমি কেন পারব না, এরকম স্বাধীনতায় আমার মন সায় দিত না। ওর জন্য যেটা অন্যায়, আমার বেলায় তার ব্যতিক্রম হতে যাবে কেন? আমিও অন্যায় করলে তো তার সমান্তরালে নেমে যাওয়া হল। কিন্তু তারপরও জেদটা আগুন হয়ে জ্বলার সুযোগ না পাওয়ায় দিনের পর দিন তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ রাখতাম। অহংকারী পা ফেলে তার সামনে দিয়ে হাঁটতাম। ঝপাৎ শব্দে চাবির গোছা আছড়ে ফেলতাম মেঝেতে। ফল হত গভীর রাতে তার বাড়ি ফেরা এবং বিছানায় মুখ থুবড়ে নিঃসাড় পড়ে থাকা।

এইসব নিয়ে আমিও তার ব্যাপারে ততদিনে এক-পা দু-পা করে আকর্ষণ হারাতে শুরু করেছি। আপস মানেই দুটো জানোয়ারের কুস্তোকুস্তি সঙ্গম। জঘন্য তেতো চুম্বন। ফলে আপসহীন পরিস্থিতিই আমার জন্য স্বস্তিকর। একসময় রাত্তিরে রেজাউলই তরল আপসে নেমে আসত। আমি দেখতাম একজন দিন মজুরকে, যার পৃথিবীতে বিনোদন বলে কোনো সঙ্গ নেই, ফলে শরীরের কাছে সে কতটা বিপন্ন! আমারও মায়া হত। রোমাঞ্চ নয়, স্পন্দন নয়, শেষমেষ কেবল অভ্যাসের মায়ায় সমঝোতা!

বাবার মতো স্বামীর সংসারেও মূল সমস্যা ছিল টাকা। দীর্ঘদিন বাবার সংসারে প্রতিটা মুহূর্ত এটার সাথে ওটার জোড়া দিতে দিতে আমি সত্যিকার অর্থেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। স্বামীর সংসারে এসেও তার কঠিন পুনরাবৃত্তি। আমাদের ফ্ল্যাটে প্রায়ই পানি থাকত না। লোডশেডিংও ছিল এলাকাটার অপরিহার্য অঙ্গ। সূর্য যেন আমার একরত্তি ছাদটার ওপর এসে একঠায় বসে থাকত। সারাক্ষণ আমার মেজাজ থাকত তেতে। অফিস থেকে ফিরে চেঁচামেচি জুড়ে দিত রেজাউল, 'বালতিতে একটু পানি ধরে রাখতে পারলে না?'

সমান তালে আমিও চেঁচাতাম, 'বালতিতো মাত্র একটা। ওতে আর কতটুকু পানি রাখা যায়? তাছাড়া রান্নাবান্না করতে হয় না? আর আমি কি জানতাম ঠাস করে পানি চলে যাবে?'

রেজাউলের সর্বাঙ্গে তখন সাবান, বোকার মতো কেবল পানি-শূন্য শাওয়ারের ট্যাপ ঘোরাচ্ছে। এক সময় টাওয়েল দিয়ে সাবান মুছে বাথরুম থেকে বেরিয়ে ফের হামলে পড়ত, 'তা জানবে কী করে? সারাদিন নবাবের মতো তো কেবল বসেই থাকো। করতে আমার মতো চাকরি, ফিরে এসে পানি না পেলে দেখতে'... বলতে বলতে সে পুরো পাউডারের কৌটোই নিজের শরীরের ওপর ঢেলে দিত। সাবান চিটচিটে শরীরে সাদা পাউডার লেপটে জবরজং সঙে পরিণত করত তাকে। ওর এই অবস্থা দেখে ওর ওপর মায়া হবে কি আমার নিজের জীবনের ওপর ঘেন্নাটাই প্রকট হয়ে উঠত। তাছাড়া ওর উচ্চারণ, বিষ ঝরিয়ে দিত শরীরে, নবাবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

মতো বসে খাই? মেপে মেপে পানি খাওয়া, ভাত খাওয়া। তাছাড়া প্রায়ই টয়লেটের মুখ বন্ধ হয়ে যায় এবং ভয়ংকর কমোডের গর্ত উপচে ঘিনঘিনে মল সারা বাথরুমে ছড়িয়ে পড়ত। ওগড়ানো বমিতে তখন মেঝে ভাসিয়ে দেওয়া ছিল আমার রোজকার ঘটনা। কিন্তু তাতে তো আর সমস্যার সমাধান হত না। ছোটো বাড়িঅলার বাসা। মৌলিক চাপ বড়ো ভয়ংকর। তার কাছে গিয়ে এর একটা সুষ্ঠু সমাধান চাইতাম। কখনো তেতে গিয়ে, কখনো অসহায়, নরম মেজাজে। প্রত্যেকবার বাড়িঅলার জবাবও ছিল বড়ো মৌলিক, 'এই ভাড়ায় তো আপনি ইংলিশ ফিটিং-এর মডার্ন বাথরুম পাবেন না।' মরিয়া হয়ে বলতাম, 'আমি তো মডার্ন বাথরুম চাইছি না। উপচে-ওঠা এই পানি... আপনিই বলুন, আমার স্বামী না হয় অফিস থেকে সেরে আসে... আমি একটা মেয়ে হয়ে এবাড়ি ওবাড়ি দৌড়াই কী করে?

তারপরও তার নিরুত্তাপ জবাব, 'দেখি কী হয়!' এই দেখির পর কেটে যেত আরও দু-তিন দিন। সেই দু-তিন দিন মলমূত্রের গন্ধে ডুবে আমার আধ-মরা হবার অবস্থা হত। এত গেল এক যন্ত্রণা। তার থেকে মাথা তুলেছি তো ছেঁকে ধরত চাল-ডাল-তরি-তরকারির হিসেবপত্তর। পই পই করে হিসেব করে চলেও শেষকুল রক্ষা করা যেত না। সকালে রুটি ভাজি, দুপুরে মাত্র একটাই তরকারি বরাদ্দ ছিল। রাতে থাকতে ভর্তা—আলু অথবা বেগুনের। অবশ্য আমাদের দুজনের কাছেই একটা ব্যাপার বরাবর এক রকম ছিল—রাতের ভাতটা আমরা মেপে খেতাম। ব্যাপারটা কারো নজরে পড়লে মনে হতে পারত, আমরা দুজনই ডায়েট কন্ট্রোলে ভীষণ সজাগ-সতর্ক। আসলে তা তো নয়। সঙ্গোপন ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়ে নিজেদের কাছেই আমাদের সে কী অস্বস্তি! এর মধ্যেও সংসার চালিয়ে এক-দু-টাকা করে আমি আলাদা একটা মাটির পাত্রে জমিয়ে রাখতাম। কিন্তু মাসের একুশ দিনের মাথায় তার মধ্যে হাত পড়ত। মাসের শেষ দিকটা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। সংসারের হাল তখন গড়ের মাঠের মতো। দীর্ঘ ব্যবহারে ঝুরঝুরে বিছানার চাদরটা পালটালাম তো চাল শেষ। কোনোরকমে কেনা হল আধা কেজি, ওদিকে তখন ক্রমেই শূন্যের কোঠায় নেমে আসছে মশলা, চিনি, বিস্কুট, সবজি। ধার করে কোনোরকম একটা হসফস জোড়াতালি দিয়ে তার হাত থেকেও উদ্ধার পেয়ে যেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে যাব, ব্যাস, সন্ধ্যায় হঠাৎ করে ঘরের সবেধন নীলমণি বাল্বটা ফিউজ হয়ে গেল। তারপর আর কি, ভেতর থেকে ঠেলে ওঠা হাসির বুদবুদ! ভিখিরির আর ভয় কী, আকাশ তার বাবা, চাঁদ তার মামা, চেয়ে থাকতাম মোমের শিখাটার দিকে। আমার মতনই পিরিচের ওপর গলে গলে পড়ছে মোমটা। হে ক্রমে-নিঃশেষ-হতে-থাকা মোম। দাউ দাউ জ্বলে ওঠো, দৈত্য হও।

তারপর?

তারপর আর কী, দরজা খুলে রেখে বাইরে থেকে আসা এক চিলতে আলো দিয়ে চালিয়ে দিতাম আরও দু-দিন। আয়, আয় চাঁদ মামা, উপচে-পড়া আলো আয়, উড়কি ধানের মুড়কি আয়, ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে আয়... ঝিম ধরে বসে থাকি, লাফঝাঁপ দিই অন্ধকারে। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকো, নয়তো ঘুমিয়ে পড়ো। বাল্ব কিনব কি, মোম কেনারই আর পয়সা নেই! আধ কেজি চালে তো আর একদিনের বেশি যায় না। ওটাই তো জীবনের পয়লা নম্বরের চাহিদা। আগে তো খেয়ে বাঁচতে হবে! এইসব ভাবতে ভাবতে অন্ধকার ঘরের বিছানায় শুয়ে একদিন হতাশায় নুয়ে এসেছিল রেজাউল, এরকম করে বাঁচা যায়? এরকম জঘন্য পরিবেশে? কুত্তার জীবনও এর চাইতে ঢের ভালো। ঘেন্না ধরে গেছে।

ফলে, সেরকম একটা সংসারে বসবাসের ব্যাপারটাকে রেজাউল কখনো নবাবি হালে থাকে বললে, স্বভাবতই, সহ্য করা কষ্টকর হয়ে পড়ত আমার পক্ষে। ফলাফল, আর কিছুই না, দুজনের মধ্যে বেধে যেত হুলুস্থূল। ঘটনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

হাতাহাতিতে গড়াবার আগেই আমি রান্নাঘরের ছিটকিনি লাগিয়ে, তার বদ্ধ আবহাওয়ায় অঝোরে কেঁদেকেটে কাটিয়ে দিতাম অনেকক্ষণ। এক সময় দুজনই সহজ হয়ে আসতাম। এবং আবারও শুরু হত জৈবিকতার সাথে একই রকম যুদ্ধ। প্রতিদিনই মনে হত, এই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। পালিয়ে যাই দূরে কোথাও। এই দূরের স্বপ্ন হয়তো সবাই দেখে, কিন্তু তার নাগাল আর পায় না। কঠোর এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই নিজেকে এক সময় বিন্যস্ত করতাম। রেজাউলের সামনে মেলে ধরতাম খোলাচুল, 'বলোতো চুলে কীসের গন্ধ?'

'সাবানের।'

'আর আমার গায়ে?' বলে ঝুঁকে পড়তাম ওর দিকে।

হেসে বলত, 'ঘাম আর পাউডারের।'

তবে যে একজন বলত, আমার গায়ে জংলি ফুলের গন্ধ? নিজেকে কোনোদিন এক চুল যত্ন করা ছাড়াই আমি প্রকৃতির অনাবিল অন্তরঙ্গতায় বেড়ে উঠেছি? রূঢ় সেই বাস্তবতায় স্মৃতির অমল সেই হাওয়া বদ্ধ ঘরে আমার চোখ দুটো ভিজিয়ে দিয়ে যেত কখন। তাই একা হয়ে যাওয়ার পরও সেই ঘরটা আমার অস্তিত্বের অপরিহার্য একটা অংশ হয়ে দাঁড়ায়। এই ছায়ার নীচ থেকে বেরুনো মানে খণ্ড খণ্ড মাংসে পরিণত হওয়া, কাক-কুকুরে টানাটানি করে খাওয়া। রাতের প্রবল ভয়ের পাশাপাশি ছিল এই বাড়িটা খোয়ানোর ভীতি। সোনার চেন, চেয়ার, টেবিল এক এক করে বিক্রি করতে করতে তলানিতে ঠেকতে কদ্দিন? তারপর আমি কোথায় যাব?

উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তায় আমার অবস্থা তখন পাগলের মতো। একটা শূন্য বৃত্তের মধ্যে আমার নির্ভার দেহ পাক খায়, আছড়ায়। এইভাবে দিন কাটে। একরাতের কথা মনে পড়ে, বিকারগ্রস্তের মতো ছুঁড়ে ফেলছি রঙের কৌটো, জমাট বেঁধে-যাওয়া তুলি। ঠিক তখুনি হঠাৎ করে মাঝরাতে বাইরে থেকে শুনি একটা গোঙানি, সেই সঙ্গে রাতের বুকচেরা আর্তনাদের ধ্বনি। বিছানা থেকে সটান নিজেকে টেনে তুলি। তার পরেই কাউকে লাঠি-পেটা করার উপর্যুপরি উৎকট শব্দ।

আমার পেছন-দরজার পাশেই খোলামেলা একটা মাঠ। কিন্তু দরজা খুললেই বারান্দাহীন অপার শূন্যতা। মনে হয় পা ফসকালে এই শরীর সমেত গভীর গহ্বরে তলিয়ে যাব। ভয়ে ভয়ে কোনোদিন ও দরজাটা খোলা হয় না। সেই আর্তনাদের তীব্রতা মৃত্যুর মতন আমাকে টানছে। আমি যেন কোনো ভুতুড়ে ছবির নায়িকা, এবং তার মতো করেই সেই চিরবদ্ধ ছিটকিনিতে হাত দিই। জং ধরে গেছে। রাজ্যির ধুলো, কিছুতেই খুলছে না। জোরে টান দিয়ে টাল সামলে পড়ি। দাঁড়াতেই কম্পিত চোখ যেন অতল গহ্বর দেখে, দমকা বাতাসের ঝাপটা এই প্রথম এ-পথে আসছে। আমার বুক ঠান্ডা হয়ে আসে। ফের আর্তনাদের শব্দ। ভয়ে ভয়ে সেই বিশাল শূন্যতার দিকে তাকাই, ল্যাম্পপোস্টের আলোর বিচ্ছুরণে অনেকটা স্পষ্ট হয়, আধা ন্যাংটো দুজন লোককে পেটানো হচ্ছে। অসংলগ্ন কথাবার্তা থেকে আরও স্পষ্ট হয়, লোক দুটো চোর। লাঠির আঘাতে তাদের শরীর বেঁকে-বেঁকে উঠছে। পুরো মাঠে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে আরও কিছু লোক।

সেই গোঙানির সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ, 'বাবাগো, আমি করি নাই... বাবাগো।' আর্তনাদ-করে-ওঠা দুজনের একজনকে চ্যাংদোলা করে ক-জন লোক মাঠের আরেক প্রান্তে নিয়ে ঝপাৎ করে ফেলে দিল।

দরজা বন্ধ করে দিই। বালিশে মুখ-কান গুঁজে বিছানায় পড়ে থাকি। জ্বর-জ্বর লাগতে থাকে। সেই সাথে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা। এই ফাঁকে এক সময় ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। সেই ভয়াবহ নিঃসঙ্গ রাতের কথা মনে হলে এখনো কেঁপে উঠি। ভয়ানক তৃষ্ণা পেয়েছিল। রান্নাঘরে যেতে হলে কুৎসিত বাথরুম অতিক্রম করে যেতে হয়। পানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

রান্নাঘরের কলসিতে। হাতড়ে হাতড়ে এগুচ্ছি। মাঠ থেকে গোঙানির শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। মরে গেল নাকি? হঠাৎ পায়ের কাছে ঠান্ডা একটা কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করি। বুকের মধ্যে ঘাই দিয়ে ওঠে বরফ টুকরো—সাপটাপ নাকি? আবার ভাবি, এই দোতলায় পাইপ বেয়ে সাপ উঠবে কী করে? কাঁপা কাঁপা হাতে জিনিসটা ওঠাই। একটা বোতল। নিশ্বাস টেনে টেনে অবশেষে কলসির কাছে যাই। মিটসেফের ওপর থেকে একটা গ্লাস নিই। গলায় পানি ঢেলে মাঝখানের সরু প্যাসেজে দাঁড়িয়েছি, কানের কাছে ফিসফিস... চিৎকার করে ঘরের দিকে ছুটে আসি। আবার একটা শোঁ শোঁ শব্দ, গলায় দম আটকে আসে। মাথা ঝাঁকাই। কিছুক্ষণ পর টের পাই কানে পিঁপড়ে-জাতীয় কোনো পোকা ঢুকেছে। ব্যাপারটা টের পাওয়ার পর শুরু হয় মরণ-যন্ত্রণা। মনে হয়, পোকা নয়, আস্ত একটা গোখরো ঢুকে পড়েছে কানের ফোঁকরে।

মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছি, চিৎ হচ্ছি, কাত হচ্ছি। যতই এসব করছি, ততই যেন আরও শক্ত করে কামড়ে ধরছে। প্রবল থেকে থেকে প্রবলতর হচ্ছে ব্যথা। না, পোকা নয়, সাপ নয়, আমার ভেতর মৃত্যু প্রবেশ করেছে। আজরাইল লম্বা একটা শলা ঢুকিয়ে দিয়েছে আমার অন্ধকার কানে। এই বোধ আমাকে এমনই অসহায় করে তোলে, আমি গলা ছেড়ে কেঁদে উঠি, উন্মাদের মতো ঘরময় ছুটতে থাকি। কী করব বুঝে উঠতে পারি না। আরেফিন... কুত্তার বাচ্চা... গালি দিতে থাকি। আমাকে বলে গেছে ক-টা দিন একটু কষ্ট করতে। তার জানাশোনা কে যেন একজন আছে কোন অফিসে। কথা দিয়ে গেছে ও আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করবে। কিন্তু ওর আশ্বাসের ওপর আমার কোনো ভরসা নেই। নিজে রাজনীতি করে। দু-দিন পর পরই পুলিশের প্যাঁদানি খেয়ে আমার বাড়িতে এসে আশ্রয় নিত। ওকে নিয়ে আমার আর রেজাউলের মধ্যে কম তিক্ততা হয়েছে? আর আজ বোনটাকে একা একটা বাড়িতে রেখে লাপাত্তা। সব শালা স্বার্থপর! হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই জ্বালাই। মোমের একটা টুকরোও যদি পাওয়া যেত! আবারও রান্নাঘরে। মিটসেফের ভাঙা ড্রয়ার ধরে টান দিতেই সার সার তেলাপোকা আমাকে ঘিরে ফেলে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিরশির করে ওঠে। লাইট অফ করলেই পুরো বাড়ি জুড়ে শুরু হয় তেলাপোকার রাজত্ব। মেঝে, মিটসেফ, বিছানা—সব জায়গায় তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। ও-রকম মৃত্যুময় অবস্থায় আমি মোমবাতির একটা টুকরোও খুঁজে পাই না।

হঠাৎ মনে হল কানের ভেতর দাপাদাপিটা যেন থেমে গেল। আর মনে হতেই রান্নাঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে হঠাৎ পাথর হয়ে যাই। নড়লে-চড়লে যদি আবার শুরু হয়? দম আটকে দাঁড়িয়ে আছি, পরক্ষণেই পিলে কাঁপিয়ে ফের সেটা দাপাতে শুরু করে। গোঙাতে গোঙাতে মেঝেতে বসে পড়ি। ঠিক এই সময় আচমকা ইলেকট্রিসিটি চলে আসে। ততক্ষণে আমি নেতিয়ে পড়েছি। কাঁপা কাঁপা হাতে কানের মধ্যে একগাদা পানি ঢেলে দিই। এবং ঘাড় কাত করে মাথার তালুতে থাপ্পর দিতে থাকি। আশ্চর্য কাজ দেয়। একটু পরেই দেখি সাধারণের চাইতে সামান্য বড়ো আকৃতির একটা লাল পিঁপড়ের মৃতদেহ বেরিয়ে এসেছে। কানের যন্ত্রণা না কমলেও মানসিক শান্তিতে বিছানায় এলিয়ে পড়ি। খিদে আর ক্লান্তিতে অবসন্ন শরীরে আধো তন্দ্রায় বাকি রাত কাটিয়ে দিই।

পরদিন ভোরে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি, আর একদিনও এখানে থাকব না। সোজা বাবার ওখানে চলে যাব। পরক্ষণেই বাবার ওখানে যাবার ভাবনাটা আমাকে আরও অসহায় করে তোলে। এবং সেটা সম্ভবত এই ভাবনা থেকে যে, বিয়েটা আমি নিজের পছন্দে করেছিলাম। আমার এই সিদ্ধান্তে তারা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেও, জানি, আজ আমার এই পরিণতির দায়ভাগ তারা কিছুতেই নেবে না। ডিভোর্সের পর তাদের সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি হওয়ার পর যে তিক্ততার সম্মুখীন আমাকে হতে হবে, ভাবতেই মনের গতি শ্লথ হয়ে আসে। চারপাশের এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ছায়া, ঘোর বিভ্রম কখনও আমাকে মৃত্যু, কখনো জীবনের জল গেলাতে থাকে। স্রোত... স্রোত... নাকের জল কপাল অবদি উঠছে, আর কুয়াশা—সেই ছায়া ভেদ করে একদিন হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে আরেফিন। রাজনীতির সুবাদে উঁচু মহলের একজনের সঙ্গে নাকি জানাশোনা আছে ওর। মোটামুটি চূড়ান্ত কথা হয়েছে। এখন শুধু ইন্টারভিউটা ফেস করতে হবে আমাকে।

হা! আমার ছেলেবেলায় বিস্কুট দৌড় খেলা! সুতোয় বাঁধা বিস্কুট মাথার ওপর ঝুলছে। হাঁ করো, লাফ দাও জোরে... আরও জোরে...।

কিন্তু চূড়ান্ত কথার পরও চাকরিটা শেষ পর্যন্ত হয় না। মনে আছে, প্রচণ্ড টেনশন চেপে শরীরে-মনে ভয়ানক জড়তা নিয়ে হাজির হয়েছিলাম। ছোটো একটা প্রাইভেট ফার্মে অফিস সহকারীর চাকরি। ভারী অদ্ভুত লেগেছিল অফিসের পরিবেশ দেখে। স্কার্ট, স্লিভলেস ব্লাউজ পরে চুটিয়ে আড্ডা দিয়ে চাকরি করছে মেয়েরা। পুরুষের সংখ্যা খুবই কম। টানা প্যাসেজ ধরে প্রায় নিশ্বাস আটকেই সোজা বসের রুমে হাজির হয়েছিলাম। মেয়েরা এমন ভঙ্গিতে তাকাচ্ছিল, আমি যেন একটা চিড়িয়া। রুমে ঢুকে দ্রুত শাড়ির ভাঁজ ঠিকঠাক করি। কফির মরচে-ধরা গন্ধ এবং বসের ঝাপসা মুখ। আমি অমুকের বোন অমুক, তমুক রাঘববোয়াল আমাকে পাঠিয়েছেন, এইসব ফিরিস্তি দেওয়ার পর বস আমাকে চেয়ারে বসার অনুমতি দেন। এবং অকস্মাৎ কোনো ভানভনিতা ছাড়াই আমার সম্পর্কে মন্তব্য করে বসেন, 'আপনাকে তো তেমন স্মার্ট মনে হচ্ছে না।'

বাইরে টাইপরাইটারের অস্পষ্ট শব্দ। দরজা ভেজানো, বসের ভুরু কোঁচকানো মুখ। ঠান্ডা চোখে চেয়ে আছেন আমার দিকে। মাথা জুড়ে বিশাল টাক। তাঁর কথা শুনে ভেতরের কাঁপন থেমে যায়। বোকার মতো প্রশ্ন করি, আপনি কী মিন করছেন?'

'আপনার ব্লাউজটা ভালো মতন ইস্ত্রি হয়নি, তাছাড়া কাঁধের আঁচলে সেফটিপিন আটকাননি। ফার্স্ট লুক বলে তো একটা জিনিস আছে। মন্তব্য শুনে আমি দ্রুত আঁচল ঠিকঠাক করে বুকে সাহস জমিয়ে বলি, 'আপনি আমার ইন্টারভিউ নিন।'

ইন্টারভিউই তো নিচ্ছি, তাঁর চোখে কেমন ক্রূর হাসি। 'আপনি কি ভাবছেন আমি আপনার সাথে খোশ-গল্প করছি?' আমিও ক্রমেই সহজ হয়ে আসতে থাকি। বলি, 'কিছুদিন চাকরি করলেই আমি নিজেকে তৈরি করে নিতে পারব।'

তিনি লম্বা করে সিগ্রেট টানেন, তাহলে প্রাথমিক পরীক্ষাটা হয়ে যাক, 'ধরুন, আপনি যখন কাজ করছেন, আই মিন চাকরি করছেন, তখন একজন পুরুষ আপনার গায়ে ধাক্কা দিল, আপনি কী করবেন?'

তার প্রশ্ন শুনে আমি পালটা প্রশ্ন করি, 'ধাক্কা কি তিনি ইচ্ছে করেই দেবেন?'

'হতে পারে।' তিনি কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলেন, 'ধরুন, ইচ্ছে করেই দিলেন।'

'ইচ্ছে করে হলে আমিও উলটো তার গায়ে জোরে ধাক্কা লাগাব,' আমি বলি, 'যাতে সে হুমড়ি খেয়ে নীচে পড়ে যায়।'

অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসেন তিনি, 'যদি গায়ে হাত দেয়?'

'কষে চড় লাগাব।'

'ঠিক আছে, আপনি এক হপ্তা পরে এসে খোঁজ নিয়ে যাবেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

তখন আমার একটা চাকরির ভীষণ প্রয়োজন। আমি কী আর এক হপ্তা পরে যাই? তিন দিনের মাথায় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। কিন্তু ভদ্রলোক আমাকে চেনেনই না। কেবল হাজার কথার প্যাঁচ কষেন, 'আপনি! ও হ্যাঁ আপনিই তো, কী যেন! ও হ্যাঁ চাকরি! চাকরি হলে তো ডাকবোই। আসুন, এক হপ্তা পরে আসুন।'

আরও এক হপ্তা! আমার মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। আরেফিন তার চ্যানেল ধরে আবারও দৌড়োয়। এক হপ্তা পর যথারীতি আবার যাই। তার দেখা করার সময় নেই। অশ্লীল ভঙ্গিসর্বস্ব সব মেয়েদের মাঝখানে থ-মেরে বসে থাকি। এক সময় ঠেলেই ঢুকি। আমাকে দেখা মাত্র কুৎসিত ভঙ্গিতে চিৎকার করে ওঠেন তিনি, 'আপনাকে কে আসতে বলেছে?'

'জি—আমি,' আমার কথা জড়িয়ে যেতে থাকে, 'আপনিই তো বলেছিলেন।'

'পরে আসুন'—বলে তিনি ফাইলে নিমগ্ন হন। কী আর করা, বেরিয়ে আসি। পরে শুনি, আরেফিনের যে রাঘববোয়াল নেতা ছিল, তার সঙ্গে তার বসের কনট্রাক্ট ছুটে গেছে—চাকরিবাকরি এখানে হবে না। তাছাড়া এখানকার পরিবেশও ভালো না। কথাটা শুনে ঝিম মেরে বসে থাকি। কিন্তু আরেফিন হাল ছাড়ে না। দিনরাত সেই নেতার পেছনে লেগে থাকে। তার কাজ করে দেয়। এদিকে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চড়া রোদ মাথায় নিয়ে আমি একের পর এক অফিসে ক্রমাগত মরিয়া হয়ে ধন্না দিয়ে চলি। আসলে এভাবেই আমি জীবনকে তন্নতন্ন করে ছিঁড়েখুঁড়ে দেখেছি। ভেবেছি যুদ্ধ আর যন্ত্রণাই জীবনের আসল রূপ। মনের এইরকম অবস্থায় একদিন আরেফিন আলোর মতো, বাতাসের মতো খবর নিয়ে আসে, আমার একটা চাকরি হয়ে গেছে!

এসব ভাবতে ভাবতে যখন পাশ ফিরতে যাব, পিঠের ওপর কীসের তীক্ষ্ণ খোঁচা! লাফ দিয়ে উঠি। বাতি নেভানো হয়নি। বিছানা হাতড়ে একটা সুচ আবিষ্কার করি। কী ভয়ংকর! বিছানায় সুই পড়ে ছিল? এই তীক্ষ্ণ শলা আমার বুকে ঘা দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়, নারী, তুমি কোথায় রাত কাটাচ্ছ! আসলেও আজকের এই রাত আমি এমন বাড়িতে কাটাচ্ছি, যার এলাকা দিয়ে হাঁটাও গতকাল আমার জন্য কল্পনার অতীত ছিল। ভেবে নতুন করে কাতর হই, শূন্য হই, ঘুমিয়ে পড়ি একসময়।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে বুঝতে পারি না, আমার অবস্থান আসলে কোথায়? বিভ্রান্তির ভেতর থেকে এক সময় বেরিয়ে আসি। প্রথমেই চোখ যায় দেয়ালে ঝোলানো হরিণের খটখটে মাথা ও শিং-এর দিকে। তার খাড়া শিং দুটো আমার বুক ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে যায়।

আমাকে এখন সেই মহান ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হতে হবে। আমি যখন ঘুমোতে আসি, তখনও তিনি বাইরে থেকে ফেরেননি। রাতে তাঁর স্ত্রী আমার মা-বাবা, আমার সংসার ভেঙে যাওয়া আর আমি ঠিক আজকেই কোত্থেকে এলাম—খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এসব ফিরিস্তি শুনে ফেলেছিলেন। আমি কোনো ব্যাপারেই খুব বেশি ভান-ভনিতার আশ্রয় নিতে পারি না। সরলভাবেই তাঁকে সব বলে দিয়েছি। সবকিছু শুনে তাঁকে বেশ দুঃখিত মন হচ্ছিল। তিনি কি ভাবছিলেন তার ঘাড়ে উটকো একটা ঝামেলা এসে জুটল? জাহান্নামে যাক। আপাতত ভদ্রলোকের মুখোমুখি হওয়াটাই আসল। বিছানায় টানটান শুয়ে এদিক-ওদিক তাকাই। বুয়াও ঘুমিয়ে ছিল আমার ঘরে। কিন্তু এখন নেই। দরজা ভেজিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। আশ্চর্য, এই ঘরেও সেভলনের গন্ধ! আরও একটা গন্ধের মিশেল আছে। ড্যাম্প মেঝের সোঁদা গন্ধ। এ ঘরে আসবাব নেই বললেই চলে। মাঝখানে একটা খাট বেছানো, সাইডে একটা আলনা। এক বছর আগের ক্যালেন্ডার ঝুলছে দেয়ালে। সম্ভবত এদের কোনো ছেলেপিলে নেই! সম্ভবত কেন, নেই-ই, থাকলে তো দেখতেই পেতাম। কী জানি বাবা, থাকতেও পারে। থাকলেই কী, না থাকলেই-বা কী! গতকাল অফিস কামাই দিয়েছি। ভেতরটা খচখচ করছে। অফিসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পরিস্থিতি তেমন সুবিধের নয়। হাজার রকম পলিটিক্স। এর মধ্যে আমার অনুপস্থিতি, কী যে হবে! ল্যাঠায় যাক, আজ তো শুক্রবার। হলিডে-র মুডটা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। কিন্তু এই যে উদ্ভ্রান্তের মতো এখানে ছুটে এলাম, আমার সিদ্ধান্ত কী? অনন্তকাল থেকে যাওয়া? মামার হাতের লাড্ডু আর কী! তাহলে আর কী করব? বাসায় ফিরে যাব? ভাবনার তোলপাড় আমাকে ফের অবশ করে দিতে থাকে।

চাকরি হওয়ার পর পরই আরেফিন আমাকে একটা দম্পতির সঙ্গে সাবলেটের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। তাদের সঙ্গে প্রায় সাতমাস থেকেছি। ওরা স্বামী-স্ত্রী যে ঘরটায় থাকত, তার মাঝখানে সরু একটা প্যাসেজে ছোট্ট একটা চৌকি বেছানো। তারপরের ঘরখানাই আমার। তাদের সাথে সাত মাস থাকার অভিজ্ঞতা কষ্টকর, মায়াময়, কুৎসিত, বিচিত্র। আমার যেন জন্মই হয়েছে দাম্পত্য জীবনকে বাস্তব আর বিচ্ছিরি সব বোধের ভেতর দিয়ে বারবার চেনার জন্য। আমার সঙ্গে চমৎকার সমঝোতা ছিল তাদের। কিন্তু তারপরও প্রায়ই খুটখাট লেগে যেত। বেশি রাত অবদি লাইট জ্বালাই, পানি বেশি খরচ করি! যদিও মাসকাবারি বিল আমরা ভাগাভাগি করে দিতাম। ফলে এসব নিয়ে গজগজ করা শুধু মহিলা আর আমার ভেতরেই সীমাবদ্ধ থাকলে কোনো কথা ছিল না। বাজারদরের চড়াগতি, বেতন বাড়ছে না, ভদ্রভাবে বেঁচে থাকাটাই এখন স্বপ্ন, যে দিন আসছে, দু-বেলা উপোস দিয়েও কুল রক্ষা করা যাবে না—এরকম উদাহরণের পর উদাহরণ টেনে এনে এক সময় তার স্বামীও এসব ব্যাপারে নাক গলাতে শুরু করে। বলতো, 'দেখুন, বিল তো আমরা একা দিই না, আপনাকেও দিতে হয়। অবশ্য আপনার কথা আলাদা। আপনি চাকরি করেন, একলা মানুষ তবুও যদি একটু বুঝেসুঝে চলেন...।'

অনেক রাত অবদি ঘুম না আসা তখন আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ফলে চোখের সামনে বই মেলে পড়ে থাকতাম। এই ব্যাপারটাতেই ওদের ছিল ঘোর আপত্তি। আমার বিয়ের পর রেজাউলের মাধ্যমে ভারী অদ্ভুত একটা ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল আমার। ছেলেটার নাম সত্যজিৎ। তার এক নম্বর নেশা আড্ডা দেওয়া আর বইয়ের পাতায় আমগ্ন ডুবে থাকা। সত্যজিৎ ছিল রেজাউলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ফলে, আমার বাসায় তার আসা-যাওয়া ছিল অবারিত। জঘন্য সেই বদ্ধ ঘরে সত্যজিৎ ছিল যেন এক ঝাঁক উদ্দাম হাওয়া। ঘরে ঢুকেই তার প্রথম কথা ছিল, 'এই ঘরে মানুষ থাকে? তুইতো শালা বউটাকে কাবাব বানিয়ে ফেলবি। চল, চল একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।' ভীষণ বিব্রত রেজাউলের তখন পুতুপুতু শুরু হত। আমি জানতাম, তার ভেতরে নয়ছয় হিসেব শুরু হয়ে গেছে। বাইরে যাওয়া মানেই রিকশা ভাড়া, চটপটি, ফুচকা...।

সেই সত্যজিতের সুবাদেই আমার কিছু ভালো বই পড়ার একটা অভ্যাস তৈরি হয়েছিল। অবশ্য খুব ছোট্টবেলা থেকেই নানা জাতের সভা-সমিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে আমার ব্যক্তিগত পাঠ-রুচি তেমন একটা খারাপ ছিল না। পরে সেই রুচির সঙ্গে কতকিছু যে এসে মিশল! বিশাল এক বিশ্বের দরোজা খুলে গেল আমার চোখের সামনে। সারাদিন ঘিঞ্জি কাজের পর ওই একরত্তি রাতেই তো একটু পড়ার সুযোগ! আমি কি আর ওই দম্পতির ক্যাঁচাল গায়ে মাখি? বেতন পাই আর ক-পয়সা! আরেফিনকে সাহায্য করতে হয়। তার ওপর মফস্সলে থাকা বাবা-মা-ভাই-বোনদের হাঁ-করে তাকিয়ে থাকা তো আছেই।

এইসব খরচের পর বাড়তি বিলের একাংশও আমাকেই তো বহন করতে হত। কিন্তু রাত জেগে বই পড়া, ওইটুকু শৌখিনতাও যদি আমাকে বলি দিতে হয়, তাহলে আমার আর থাকে কী?

বাদ দিয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত। আসলে কোনো ব্যাপারেই অতিরিক্ত ক্যাঁচাল আমার ধাতে সয় না। এই নিয়ে তাদের সঙ্গে একটা রফা হলেও কিছুদিন পর খিটমিটি লেগে গেল অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে। আমরা যে বাসায় থাকতাম, তার গা ঘেঁষেই ছিল একটা বস্তি। সেই বস্তিরই একজন মহিলার সঙ্গে আমার কেমন অন্যরকম একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। ওর স্বামীটি রিকশা চালাত। ওদের ছিল একটা ফুটফুটে বাচ্চা। সেই মহিলা নয়, আমার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল তার শিশুটি। ওর চেহারায় এমন একটা কিছু ছিল, আমি সহজেই ওর অনুরক্ত হয়ে পড়ি। টলমল পা ফেলে হাঁটত। ওর কোমরে বাঁধা ঘুঙুরের শব্দ, খিলখিল হাসি, ধুলোমাখা নাদুসনুদুস শরীর আমাকে আশ্চর্য এক আবেশে ভরিয়ে রাখত। বাচ্চাটাও ছিল আমার জন্য পাগল। টানা বস্তির কাদাপাঁকে থই থই দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে সে একাই আমার দরজার কাছে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াত, অদ্ভুত ভঙ্গিতে আমার ঘরের দরজাটা একটুখানি ফাঁক করে উঁকি দিত। আমি তাকাতেই ও এমন অভিনব কায়দায় জিব বের করত, আমি ছুটে যেতাম ওর কাছে। ওরই সূত্র ধরে ওর মা-ও আমার ঘরে আসত। আমার ঘর গুছিয়ে দিত। মাঝে মাঝে কাপড়চোপড় কেচে দিত। এরই মধ্যে একদিন আমার প্রচণ্ড জ্বর। পাশের ঘরের দম্পতি কুমিল্লায় বেড়াতে গেছে। ঘরের ভেতরে আমি একা একা ছটফট করছি। কাতরাচ্ছি। জ্বরের তাপে কপালের শিরাগুলো ক্রমে নীলচে হয়ে উঠছে। বিছানা থেকে নেমে একটু পানি খাব, সে শক্তিও আমার ছিল না। ক্লান্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। শরীর খারাপ বলে অফিস থেকে সেদিন তাড়াতাড়িই চলে এসেছিলাম। এসেই নেতিয়ে পড়েছিলাম বিছানায়। তারপর ঘুম। ঘুম থেকে জাগতেই আমার শরীর যে বিছানার সঙ্গে এমনভাবে সেঁটে যেতে থাকবে, ভাবিনি। ঠকঠক কাঁপছিলাম। গিঁটে গিঁটে যন্ত্রণা। সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে আসছে। হাঁ-করে দম ছাড়ছি। ঠিক এরকম একটা নাজুক মুহূর্তে মহিলাটি আমার ঘরে আসে। ওপরঅলা আমাকে যেন গভীর গহ্বর থেকে টেনে তোলার জন্যই তাকে পাঠিয়েছিলেন।

এসেই মহিলাটি হাঁ-হাঁ করে ওঠে, 'করছেন কী! অ্যাতো জ্বর, আমারে জানাইবেন না! মইরা যাইবেনতো।' আমার চোখের দৃশ্যপট থেকে তখন সবকিছু দূরে দূরে সরে যাচ্ছিল, ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসছিল সবকিছু। সেদিন সারারাত মহিলাটি আমার মাথায় জলপট্টি দিয়েছিল। পাশের দোকান থেকে প্যারাসিটামল কিনে এনে ভেজা পাউরুটির সাথে আমাকে গিলিয়ে খেতে সাহায্য করেছিল। আমার সঙ্গে মহিলার সেই রাতযাপনের খেসারত তাকে দিতে হয়েছিল। সারারাত কোথাও বসে মদ পান করেছিল তার স্বামীটি। সকালে সে ঘরে ফিরে এসে সব শুনে তাকে পিটিয়েছিল বেদম। এই ঘটনার পর থেকে বস্তির সেই মহিলার ঘরের দরজা এবং আমার দরজা এক হয়ে যায়।

কিন্তু ব্যাপারটা আমার পাশের দম্পতি কিছুতেই সহজভাবে মেনে নিল না। বাচ্চাটাকে ঘিরে আমার আদিখ্যেতা বউটির কাছে কেন জানি অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। একদিন খেপে উঠে বলেই ফেলল, 'তোমার সমাজ বলতে কিছু নেই? আমি এইসব ছোটোলোকদের এই বাসায় কিছুতেই অ্যালাও করব না।'

আমি নিরুত্তাপ উত্তর দিয়েছিলাম, 'ওরা তো আমার ঘরে আসে। তোমার অসুবিধের তো কোনো কারণ দেখছি না।'

'তুমি বুঝছ না,' স্বর পালটে সে এবার বলতে থাকে, 'এরা চোর-ছ্যাঁচোড়ের জাত, খাতির করে করে একদিন ঠিক দাঁও মেরে দেবে।'

এইবার আমার সত্যি সত্যি হেসে মরার পালা, 'আমাদের এমন কী আছে যে সে নেবে!' আমার জবাবের ভঙ্গিতে সে আর কোনো কথা খুঁজে পায় না। হাল ছেড়ে দিয়ে কেমন চুপসে যায়।

অবশ্য ওদের দুজনের সঙ্গে আমার যে শুধু খিটিমিটি লেগে থাকত, তাই নয়। একসঙ্গে খাবার ব্যবস্থায় হওয়ায় যদিও পেঁয়াজ-রসুন-তেল নিয়ে কোনো-কোনোদিন সিরিয়াসলি লেগে যেত, কিন্তু বউটি, মানে শানু, তার আশ্চর্য একটা গুণ ছিল, বেশিক্ষণ ভেতরে রাগ পুষে রাখতে পারত না। আমি তো কিছু ব্যাপারে একরোখা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

জেদি। খিটিমিটি লাগার পর দরজা আটকে বসে থাকতাম। ফলে আপস প্রস্তাব তার কাছ থেকেই আসত। চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলতো, 'রাগটা একটু কমাও। এই রাগের জন্যই তো সব হারিয়েছ, তাও যদি না বোঝো।'

এত করেও শেষ রক্ষা হল না। একদিন ঘটল এমন বিচ্ছিরি একটা ঘটনা, যার জন্য উদ্ভ্রান্তের মতো আমাকে ঘর ছাড়তে হল। এইবার আমার হাত-পা শিথিল হয়ে আসে। ভাবনার এই জায়গাটায় এসে আমি বিপন্ন হয়ে পড়ি। সৃষ্টিকর্তা! এই শানুকে আমি চিনি! কী ঘৃণা! যেন বল্লম সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার পিঠ দেয়ালে ঠেসে যাচ্ছে!

ঝনাৎ... মেঝেয় কিছু একটা পতনের শব্দে ধড়ফড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে বসি। ভাবনার সুতো ছিন্ন হতেই দেখি হতবিহ্বল বুয়া দাঁড়িয়ে। আমার জন্য বেড-টি আনতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা খেয়ে ট্রেসহ চায়ের কাপ চিৎপাত। মেঝের ওপরে ভাঙা চায়ের কাপটার টুকরোর ছড়াছড়ি। ওদের সম্ভবত বেড-টির রেওয়াজ আছে। ছি ছি, লজ্জাটা বুয়াকে নয়, আমাকেই স্পর্শ করে বেশি। ভীষণ অস্বস্তি নিয়ে তার দিকে তাকাই, 'আমাকে চা দিতে কে বলল?'

'খালাম্মা,' থতমত খেয়ে ঢোক গিলতে গিলতে সে বলে, 'চা খায়া আপনারে যাইতে কইছিল।' কথাটা বলে বুয়া নিজেকে সহজ করে নিয়ে কাচের টুকরোগুলো তুলতে থাকে। ইরফান সাহেব নিশ্চয়ই অনেক রাতে ফিরেছেন। কাল বিকেল থেকে সকাল পর্যন্ত ঘোরের মধ্যে যা কিছু করেছি, এইবার যেন তার মধ্যে সচেতনতা ঢোকে। এ আমি কোথায় এসেছি? লজ্জায়, অস্বস্তিতে আমি একেবারে থুবড়ে পড়ি। এখন এ-ঘর থেকে বেরুনো মানেই সেই মহা-মানবের মুখোমুখি হওয়া। তাঁর ছুড়ে ফেলা প্রেমিকা আমার মা, আর সেই মার মেয়ে আজ অযাচিত ছ্যাঁচড়ের মতো তাঁর দরজায়। ঘেন্নায় রি রি করে ওঠে শরীর। জীবনে প্রথম আমি আহম্মকের মতো নিজেকে ছোটো করলাম।

পুরো রাগটাই গিয়ে পরে সত্যজিতের ওপর। ঝোঁকের মাথায় ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলাম তার কনফেকশনারিতে। সে তখন বেচাবিক্রি নিয়ে ব্যস্ত। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে ওঠে, 'কীরে, অফিস বাদ দিয়ে এখানে! গিলে এসেছিস নাকি!'

'ওসব গু-মুত আমি খাই না,' আমার মেজাজ তখনো তেতে ছিল। 'তুই তোর কর্মচারীকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আয় তো।' কথামতো সত্যজিৎ বেরিয়ে আসে। বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে আমার পাশাপাশি হাঁটে।

'কীরে, তোকে আজ সিরিয়াস লাগছে, ব্যাপার কী! কোনো গণ্ডগোল হয়নি তো?' আমি এবার ভেঙে পড়ি, 'বিশ্বাস কর সত্যজিৎ, আমি আর পারছি না। এভাবে বাঁচা যায় না।'

সে রিকশা ডাকে। ঊর্ধ্বশ্বাসে সেটা এখন ছুটছে। মাথার ওপর তির্যক রোদ। হাত ব্যাগ মাথার ওপরে দিয়ে নিজেকে ছায়াবৃত করার চেষ্টা করি। সত্যজিৎ রিকশায় বসে মজা করে বলে, 'এবার আমাকে বিয়ে করে ফেল।'

আমি খেপে যাই, 'প্যাঁচাল রাখতো। তোর মতো মালাউনকে বিয়ে করে দোজখে যাই আর কী!'

'দোজখে তোর এক পা-তো চলেই গেছে,' আকাশমুখো এক রাশ ধোঁয়া ছুঁড়ে দেয় সত্যজিৎ। 'স্বামীকে তালাক দিয়েছিস, তোদের ধর্মমতে ভীষণ গর্হিত কাজ। এখন আমাকে দিয়ে পাপটাকে সম্পূর্ণ কর... আরে আরে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

এত রেগে উঠছিস কেন, যা বলবি ঝটপট বলে ফেল, নতুন কোনো ফ্যাঁকড়ায় পড়েছিস নাকি?'

'না, না, তা নয়।' আমি কেমন অবসন্ন হয়ে পড়তে থাকি। আমার মগজের পথ ধরে সার সার পিঁপড়ে হাঁটতে শুরু করে, একটা বাসের মুখোমুখি পড়েও অল্পের জন্য বেঁচে যায় আমাদের রিকশাটি। রিকশাঅলার ক্ষিপ্র গতিতে রিকশা সরানোয় দুজন প্রচণ্ড ঝাঁকি খাই। ব্যাপ্যারটায় খেপে যায় সত্যজিৎ। রিকশাঅলাকে মারার জন্য হাত ওঠাতে গেলে আমি ওকে প্রায় চেপে ধরি, 'প্লিজ কোনো সিন ক্রিয়েট করিস না। আজ অনেকদিন পর আমি অফিসে যাচ্ছি না।'

আবার বিশাল রাজপথের মাঝখান দিয়ে চলা। সত্যজিৎ প্রস্তাব দেয়, 'চল সালাহিদনের ওখানে যাই, শালা দু-দিন যাবৎ দরজা-জানালা বন্ধ করে উপন্যাস লিখছে। কেউ ধাক্কালেও খুলছে না। আজ ওর দরজা ভেঙে হলেও ঢুকব। না হলে তুইতো আছিসই। মেয়েমানুষের মিনতি-ভরা গলা শুনলে শালার দেবতাও মরা ঘুম থেকে জেগে ওঠে।'

ব্যাস, বারোটা বেজে যায় ওখানে গিয়েই। যেমনটা ভেবেছিলাম, পরিস্থিতি তার পুরো উলটো। সালাহিদন খাড়া টেবিলে ঠ্যাং উঠিয়ে মজাসে আড্ডা দিচ্ছে শাহতাব আর রঞ্জনের সঙ্গে।

আমাদের দেখে ওদের তিনজনের আরে... হল... চেঁচামেচি হল... কেমন আছ হে... হল...। এক সময় তিনজনই ঝিম মেরে যায়। আজ কেমন গাঢ় আর কোমল মনে হয় ওদেরকে। বিশেষ করে রঞ্জনকে। কেমন দপ করে জ্বলেই যেন আবারও নিভে গেল। ওর চাপ দাড়ি, ধূসর চোখ, ছিপছিপে শরীরের চারপাশ ঘিরে উড়ন্ত ধোঁয়া, কুণ্ডুলি পাকানো, ছেঁড়া ছেঁড়া।

এক সময় ভনিতা না করে সালাহিদনই বলে, 'আজকে শালা আমার উপন্যাস তাহলে চাঙ্গে উঠল! গাউছিয়া মার্কেটে হেভি পুলিস সার্চ হয়েছে। রঞ্জু শালাকে ন্যাংটা করে ছেড়ে দিয়েছে।'

'মানে', আঁতকে ওঠে সত্যজিৎ, 'কত টাকার মাল?'

'দেড় লাখ টাকার', টগবগে রঞ্জুর নিস্তেজ গলা থেকে যেন তেতো রস বেরিয়ে আসে। শাহতাব চেঁচিয়ে বলে, 'এতক্ষণ এই নিয়েই হচ্ছিল... শালারা ইন্ডিয়ান মাল মনে করে অনেক বাংলাদেশি শাড়িও নিয়ে গেছে। সিগন্যাল পেয়ে দোকানের পেছনে বস্তার নীচে দামি কয়েকটা লুকিয়েছিল, নইলে ষোলো আনাই চলে যেত।'

'ও আর ক-টা শাড়ি', সালাহিদনের গলায় ক্রোধ, 'শালারা বর্ডারে আটকাতে পারো না, বউ-শালিরা শাড়ির জন্য ইয়ে দিলেই... মাইরি মুখ খারাপ করতে চাই না... এসো সার্চ মারাতে। রঞ্জু শালা কত হাতে-পায়ে ধরে বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে শুরু করল... বাপটাতো ওকে বিশ্বাসই করতে চায় না। তারপরও যা একটু দাঁড়াচ্ছিল! যাও, শালা যাও, পুরানা লাইফে ফিইরা যাও', খিস্তির পর খিস্তি বেরোতে থাকে সালাহিদনের মুখ থেকে।

আমি মহাফাঁপরে পড়ে যাই। আচমকা এমন দুঃসংবাদের মাঝখানে পড়ার কোনো প্রস্তুতি আমার ছিল না। আমি এলে এদের সঙ্গে বেশির ভাগ আড্ডা হয় সাহিত্য, সামাজিক-বিপর্যয়, প্রেম-ভালোবাসা—এইসব নিয়ে। অথচ আজ তাদের আলোচনা ক্রমেই বাংলাদেশের রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতার দিকে যেতে থাকে। রাজনীতি আমার মগজের আশপাশ জুড়ে কখনো-সখনো ঘোরাফেরা করলেও, সেটা কখনোই ফাঁপা মাথা ভেদ করে ভেতরে ঢোকে না...। আমার এখন আরেফিনকে মনে পড়ছে, কেন, কীসের পেছনে সে এমন উদ্ভ্রান্তের মতো দৌড়ুচ্ছে, আমি বুঝি না। অনার্সের মতো পরীক্ষায় কেউ সাদামাটা একটা পাস দেয়, যার বাবা-মার প্রাণ শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

তেলের অভাবে দপদপ করছে, যার বোন সকাল থেকে স্রেফ ক-টা টাকার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে, তার ভাই কিনা হলে থেকে রক্তক্ষয়ী বিচ্ছিরি স্বার্থের রাজনীতির শৌখিনতায় নিজেকে সেঁধিয়ে দেয়? ধুৎ, মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এদের সামনে এত ধোঁয়া! এরা তো আবর্তিত নিজেদের মধ্যে! অস্বস্তি লাগে। তামাকের পাতায় কী সব শুকা ভরছে সালাহিদন। সিমেন্ট উঠে যাওয়া মেঝের অংশটায় পা ছড়িয়ে বসেছে শাহতাব। ছোটো চৌকির ওপর ঠাসাঠাসি রঞ্জু, সত্যজিৎ। 'বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে'... সালাহিদন শুরু করে—বাড়ি থেকে চিঠি আসার কাসুন্দি সবখানেই এক। কী ভয়াবহ একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছি, অথচ ঢাকায় একরাত থাকার মতো একটা জায়গা নেই। সিদ্ধান্ত নিয়েছি, একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত, ও বাড়িতে আর ফিরব না। তার পরপরই মাথার জট খোলার জন্য আজ এখানে আসা। আমার কি নিয়তিই এই, জট খুলতে এসে আরও দ্বিগুণ শক্ত জটে নিজেকে পেঁচিয়ে ফেলা?

ছোট্ট দেয়াল ঘড়িটার পেন্ডুলাম স্থির নিশ্চল। স্নো-র বিজ্ঞাপনে স্থূলাঙ্গী মহিলার হাসি। ব্লাউজ উপচে পড়ছে জীবন্ত মাংসখণ্ড। এদের চিৎকার, হতাশা, গ্লানির মাঝখানে আমার চারপাশ ঘিরে নেমে আসে অবর্ণনীয় নির্জনতা। সেই নির্জনতা হলুদাভ অথচ নিরাকার, অথচ তার একটা রূপ আছে, অথচ তা যেন ফাঁপা সব তুলোর মতো, ধোঁয়া...। আসলেই আমি কি জেগে আছি? অনেকক্ষণ পর ঝিমুতে-ঝিমুতে হাত বাড়ায় সত্যজিৎ, 'টান দিবি?'

আমার ঠোঁট জোড়া ফুলে ওঠে। আমি তার বাড়ানো হাত দেখি। কোনো শব্দ শুনতে পাই না। আচ্ছা, আমার করোটির মধ্যে এমন ঝনঝন শব্দ হচ্ছে কেন? এদের ওগড়ানো ধোঁয়ায় আমিও আচ্ছন্ন? কী দারুণ ছবি ক্যালেন্ডারে! দেয়ালে প্রকট চুন, পানের পিকের মাঝখানে সাঁই সাঁই করে ধাঁধিয়ে আছে। আর অনাহূতের মতো একটা চেয়ারে আমি বসে আছি। আচমকা উঠে দাঁড়াই এবং এদের আরে আরে... উপেক্ষা করে জরুরি কাজের কথা বলে বেরিয়ে পড়ি। এবং মগজ থেকে ধোঁয়া অদৃশ্য হয়ে যাবার পর অকস্মাৎ সিদ্ধান্ত নিই ইরফান চাচার বাসায় যাব। আমাদেরই এক আত্মীয় একদিন নিউমার্কেটে যখন ভদ্রলোকের ঠিকানাটা দিয়েছিলেন, তখন ব্যাগের মধ্যে কাগজটা দুমড়ে রাখার সময় কল্পনাও করিনি, ওই বাড়িতে আমি স্বপ্নেও কখনও যাওয়ার কথা ভাবব। অথচ সেই বিপন্নতায় ভূতগ্রস্তের মতো এই বাড়ির কথাই প্রথমে মনে হয়েছিল। তারপর বাহান্ন গলির তেপান্ন পাক খেতে খেতে...। কিন্তু এ ঘর থেকে এখন বেরুতে পারাই একটা সমস্যা। তারপর আবার চাচির স্থির দৃষ্টির মুখোমুখি হওয়া। ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে আমি বলব কী? আমার এর পরের সিদ্ধান্তটাই-বা কী? সবচেয়ে প্রথম কাজ আরেফিনকে খুঁজে বের করা। এ বাসার অস্বস্তিকর বদ্ধতা থেকে যত জলদি বেরুনো যায়, আমার জন্য ততই ভালো। ঘর-ঘেঁষা বাথরুমে ঢুকে চোখের জলের ঝাপটা দিতে দিতে ভাবছিলাম শানুর কথা। তার সেই চেহারা, আমাকে তার অকারণ ঘেন্নার গনগনে মুখ। শরীর দিয়ে বিষ নামানো কটূক্তি। আমি ছটফট করে উঠি। বাথরুমের আয়নায় নিজের জলমগ্ন মুখ দেখি। কী বিবর্ণ, ক্লিষ্ট! নিজেকে প্রশ্ন করি, কীহে! কেমন আছ?

বুকের মধ্যে হাওয়ার ফরফর ঘূর্ণি। ধুলো উড়ছে। শুকনো পাতা উড়ছে। কেমন শূন্য করে দিচ্ছে আমাকে। ভুলে টুথব্রাশ আনা হয়নি। বাথরুমেই পড়ে আছে। ফলে আঙুলেই পেস্ট লাগিয়ে দাঁতে চেপে ধরি। কী এক ভাবনার ঘোরে জোরে চাপ দিই। চারপাশে সমাচ্ছন্ন আঁধার—কী গাঢ়, কী প্রকট সেই ছায়া!

আমি যেখানে ছিলাম সেই শ্যাওলাধরা বিল্ডিংটার পাশ ঘেঁষে একটা দেবদারু গাছ উঠে গেছে। তার সামনে এক টুকরো বারান্দা। মাঝখানে ঘাসের জমিন। তার কিছুটা দূরেই সেই বস্তি। বারান্দায় বসেই আমি তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ভুতুড়ে জীবন—দুর্বহ গন্ধ, চিৎকার, চ্যাঁচামেচি, হাতুড়ির ঠুনঠুন শুনতে পেতাম।

গতকালকের রাতের পুরো ঘটনাকে উলটেপালটে দেখি। বিশ্লেষণ করি। ঘটনাটার ঠিক কোনখানে আমার অবস্থান, কোন জায়গাটায় আমাকে দায়ী করা যায়! সে রাতে আমার চোখে ঘুমটা সবে লেগে এসেছে, আচমকা ঝনঝন শব্দ শুনে উঠে বসি। পাশের ঘরে তাহলে শুরু হয়ে গেছে। ক্রোধের সময় জিনিস আছড়ে ফেলা শানুর অভ্যাস। এ তারই আলামত। তারপর সবকিছু কিছুক্ষণ ঠান্ডা, শুনশান, যেন কিছু হয়নি। আচমকা শানুর হিসহিসানি শুনতে পাই, 'কুত্তা... শুয়োর...' তারপর একটা গোঁ-গোঁ শব্দ।

এসবই ওদের প্রতিদিনের ঘটনা। কিন্তু আজ বোধ হয় কামাল ভাই শানুর গলা চেপে ধরেছে। দ্রুত বিছানা ছেড়ে উঠে যাই। উদ্ভ্রান্তের মতো শানুদের ঘরের দরজায় গিয়ে আঘাত করি। কিন্তু ধস্তাধস্তির শব্দের মধ্যে আমার কড়ানাড়া ডুবে যায়। ভয়ে-আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে। ক্রোধের সময় ওর স্বামীর যা চেহারা হয়, খুনির চেয়েও ভয়াবহ!

এবার শানুর কান্নার শব্দ শুনতে পাই। যাহোক, তেমন ভয়াবহ কিছু ঘটেনি। শিথিল শরীরে আমি সোজা ফিরে আসি বিছানায়। বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই কোথা থেকে ছুটে আসে রেজাউলের প্রেতাত্মা। সে নিঃশব্দে আমার পাশে শোয়। গলায় হাত রাখে। একসময় কণ্ঠনালি চেপে ধরে। হুবহু শানুর স্বামীর মতো ওর চেহারা!

আমার কান্না পেতে থাকে। এক সময় এই সবের মধ্যেই প্রতিদিনের ঘুম নামতে থাকে চোখে। রেজাউল কি এমন ছিল? প্রত্যেকটি মানুষই তো আলাদা। তুলনা চলে?

তখন হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। কী কী সব বাজে স্বপ্ন দেখছিলাম! ছাদের ওপর থেকে পড়ে যাচ্ছি! দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে থাকলে দেখি সে আমি নই! আমার ছোটোবোন রানু। হঠাৎ ঘুম ভাঙার পর আমার আকুলভাবে রানুকে মনে পড়তে থাকে। কতদিন বাড়ি যাই না! কদ্দিন ওদের দেখি না! এমন হয়েছে মাসেও এখন একবার ওদের কথা মনে পড়ে না।

এসব ভাবতে গিয়ে কিছুতেই আর ঘুম আসে না। মাথার লাগোয়া জানালার খটখটে পাল্লাটা সামান্য বাতাসেই খুলে গেল। এবং তারপরেই বাইরে থেকে কার যেন ঘন নিশ্বাস আছড়ে পড়ার শব্দ পাই। প্রথমে মনে হয় এ আমার মনের ভুল। কিন্তু শব্দটা ক্রমেই বাড়তে থাকে। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকার ফলে চোখের সামনে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসতে থাকে। লাফ দিয়ে উঠে বসি। জানলার কাছে চোর এসেছে? মুহূর্তে আমার শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। সরাসরি পর্দা তোলার সাহস পাই না। নিঃশব্দে দরজার কাছে ছুটে যাই। এবং সন্তর্পণে ছিটকিনি খুলে ঘরের মাঝ-বরাবর সরু প্যাসেজ ধরে হাঁটি। শানুর দরজায় দ্রুত নক করি—একবার, দু-বার। আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। ভেতরে বাতি জ্বলে ওঠে। আড়মোড়া ভেঙে শানু দরজা খুলে চোখ গোল করে, তার স্বামী বিছানায় নেই। পেছনের দরজা ভেজানো। একসঙ্গে ঘুমুলো, অথচ বিছানা খালি কেন? শানুর গলার স্বর ভেজা অথচ অস্পষ্ট... 'তুমি উঠে এসেছ কেন?' ওর কথায় কেন জানি আমার সাহস বেড়ে যায়। যদিও কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তারপরও ওকে টেনে আমার ঘরের দিকে নিয়ে আসি। পুরো ঘটনাটা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটে যায়। আমার জানলার কাছে তাকে নিয়ে এসে চাপা উত্তেজনায় ফিসফিস করি, 'তুমি কোনো শব্দ শুনেছ?' শানু কান পাতে—শব্দটা এখন অন্য রকম। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর কেউ যেন হাঁপাচ্ছে—এরকম বোধ হয়। একসময় শানুর ক্ষিপ্র হাত আমার দরজাটা খুলে ফেলে এবং প্রায় দৌড়ের ভঙ্গিতেই সে বারান্দা অতিক্রম করে একটু ঘুরে আমার জানলার কাছে ছুটে যায়। হতভম্ব আমিও তার পেছন পেছন ছুটি। তারপরই আমার শরীরে রীতিমতো থর কাঁপুনি। বিবর্ণ আলোয় দুটি ছায়ামূর্তির ছিটকে দু-দিকে সরে যাওয়ার দৃশ্য স্পষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

হয়। এবং একটি পুরুষ ছায়া পায়ের সমস্ত শক্তি নিয়ে ছোট্ট ঘাসের জমিন অতিক্রম করে রাস্তার দিকে দৌড়ে অদৃশ্য হলেও অবিন্যস্ত, বিপর্যস্ত মহিলাটি পালিয়ে যাওয়ার কোনো চেষ্টাই করে না। শানু ততক্ষণে তার চুলের গোছায় হাত দিয়েছে। এবং আমি বরফ-শীতল চোখে বস্তির সেই রিকশাঅলার বউটিকে দেখি। অবিকল স্ট্যাচুর মতো সে দাঁড়িয়ে। চুল ধরে হিড়হিড় করে তাকে টেনে আনে শানু। আমার বিপন্ন কণ্ঠস্বর তার ম্রিয়মান দেহকে কাঁপিয়ে দিয়ে প্রায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'কাল্লুর মা, তুমি!' কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে কাল্লুর মাকে খুব বেশি ঝাড়তে না পেরে তাকে ঘাড় ধরে ঠেলে বের করে দিয়ে শানু এবার ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর।

আমি মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় কাঁপছিলাম। কাল্লুর মা তার কান্না-ভেজা জবানবন্দিতে যেটুকু বলে, তার সারকথা শুনে কান্নার দমকে আমার বুকের প্রান্তর জুড়ে শুরু হয়ে যায় প্রবল দাপাদাপি। এতসব কথা কাল্লুর মা এতদিন কেন বলেনি? বস্তির মহিলারা তো সচরাচর এমনটা করে না! তার কথা থেকেই জানতে পারি, তার স্বামীটি যেখানে-সেখানে পড়ে থেকে রাত কাটায়। সংসারে ফুটো পয়সা দিয়ে সাহায্য করে না। ধারকর্জের পর ধারকর্জ করে এখানে-সেখানে টুকটাক কাজ করে তাকেই পুরো সংসারের ঘানি টানতে হয়। তারপরও চলে না। ধারের পানি এখন গলা অবদি এসে পৌঁছেছে। ধার দেনেঅলারা এখন দিনরাত তার ওপরেই চড়াও হচ্ছে। আর এদিকে শানুর স্বামী অনেকদিন ধরেই নানাভাবে, আকারে-ইঙ্গিতে তাকে লোভ দেখিয়ে আসছিল। আজই প্রথম... হেনতেন এইসব...। আর শুনতে ইচ্ছা করে না। আমার শরীর ক্রমেই হিম হয়ে আসতে থাকে। বহুদিন পর আমাকে অসহায় বিপর্যস্ত করে দিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে অন্য একটা দৃশ্য। দৃশ্যটা অলীক কিছু নয়। আমার হাড়-মাংস এক করে দেওয়ার মতো বাস্তব। আর এই ঘটনাই প্রথম আমাদের দাম্পত্য বন্ধনকে ক্রমশ শিথিল করে দেবার মোক্ষম সূত্র হিসেবে কাজ করেছিল। আমার চোখের পটে এসে দাঁড়ায় মাথায় লাল ফিতে বাঁধা চঞ্চল এক কিশোরী।

আমার সেই বদ্ধ ফ্ল্যাটের পাশেই ও থাকত। ফ্রক পরে ধেই ধেই নাচতে নাচতে প্রায়ই সে আমার বাসায় আসত। ভীষণ অস্থির প্রকৃতির ছিল ও। আমাকে 'মামি মামি' ডেকে মুখে ফেনা তুলে ফেলত। ওর উছলে পড়া হাসি, নিষ্পাপ কোমল চেহারা, ওর উদ্দামতা, আমার ঘরের সেই বদ্ধতায় ছড়িয়ে দিত একটা নির্মল হাওয়া। এভাবেই রেজাউলের সঙ্গে ওর গড়ে ওঠে চমৎকার একটা সম্পর্ক। ভীষণ স্নেহ করত সে মেয়েটিকে। মাঝখানে বিছানা। তারই চারপাশ ঘিরে দৌড়ে দৌড়ে দুজন খেলত। বিছানায় বসে তাদের সেই ছেলেমানুষী আনন্দ উপভোগ করতাম আমি। ঘরে ফেরার পথে রেজাউল প্রায়ই মেয়েটার জন্য কিছু-না-কিছু খাবার কিনে আনত। আর সে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে সেসব খেত। রেজাউল তার বেণি ধরে কখনো টানত, কখনো কাতুকুতু দিত। হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ত ও।

ওদের দুজনার সম্পর্ক যখন এমনই নিবিড়, সেই তখনকার একদিনের ঘটনা। ওরা ওদের চিরাচরিত নিয়মে খাট ঘিরে ঘুরপাকের খেলা খেলছিল। আমি তখন রান্নাঘরে। আমার গরম তেলে মাছ ভাজার শব্দে একাকার হয়ে যাচ্ছিল ওদের খুনসুটি, ছুটোছুটি, হাসাহাসি আর চিৎকারের গমক! মেয়েটার সঙ্গে খেলতে গিয়ে রেজাউলও ওর মতোই স্রেফ শিশু হয়ে যায়। আমার ভালো লাগে, আগের মতো অফিস থেকে ফিরে ও আর অকাজ নিয়ে একঘেয়ে সময় কাটায় না বলে। সেদিন হঠাৎ করে গ্যাসের চুলোটি নিভে যাওয়ায় আমি রেজাউলের পকেটে দেশলাই খোঁজার জন্য দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি, হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করছে মেয়েটা এবং রেজাউল তাকে 'পেয়েছি পেয়েছি' বলে বিছানার ওপর চেপে ধরেছে। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে আছি, মোটেও টের পায় না ও। সেই অবস্থায় 'বল কোথায় আছে' বলতে বলতে ও মেয়েটার কাছে কিছু খোঁজার চেষ্টায় তার বুক, উরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

আর শরীরের সব জায়গায় অবাধে হাত চালাতে থাকে। আমি নিষ্পলক চেয়ে ছিলাম, মুহূর্তে আমার দেহ নিঃসাড় করে দিয়ে রক্ত শুষে নিল যেন কেউ, না, এ কোনো নিষ্পাপ খেলা নয়, টাল খেয়ে ওঠে অন্ধকার, তাহলে কী?

ব্যাপারটা আসলেই কী, আমি তখনো ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছিলাম না। হঠাৎ আমাকে দেখে চমকে ওঠে রেজাউল। পলকে নিজেকে সামলে নিয়ে ভীষণ ক্ষিপ্রতায় মেয়েটিকে বিছানা থেকে টেনে তুলে ধরে বলে, 'আমার সিগ্রেট কোথায় লুকিয়েছিস, বল, বল।' তার ঘেমো মুখ, বিপন্ন কণ্ঠস্বর এবং অতিরিক্ত ঝাঁকুনিতে মেয়েটা কেমন হতভম্ব হয়ে যায়। ক্রোধে, ঘেন্নায় ক্ষিপ্ত আমি হামলে পড়ে মেয়েটাকে উদ্ধার করি। কী বুঝে কুচকানো জামা টেনে মেয়েটা সিঁড়ি ভেঙে দৌড়ে পালায়। তারপর আমি রেজাউলের মুখোমুখি। তার নিশ্বাসের দ্রুত উত্থান-পতন, লাল হয়ে আসা মুখ... আমার বিশ্বাস করতে ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। আমার সমস্ত শরীরে অসহ্য কাঁপন... কেমন বিভ্রান্ত চোখে তার দিকে তাকাই। তারপর বলি, 'ছিঃ রেজাউল, ছিঃ!' রেজাউল যেন আকাশ থেকে পড়ে। আমার চাইতেও দ্বিগুণ বিস্ময় তার স্বরে, 'তার মানে? তুমি কী বলতে চাইছ?' আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। কঠিন চোখদুটো ওর মুখের ওপর বিদ্ধ করে শুধু এটুকুই বলেছিলাম, 'ভাগ্যিস, আমাদের মেয়ে হয়নি।' পরে এই নিয়ে আমাদের দুজনার দীর্ঘ বৈঠক হয়েছে। আমি বিকারগ্রস্তের মতো বলেছি, 'মেয়েটার শৈশবকে তুমি নষ্ট করে দিলে? তুমি কী করে এটা পারলে? আমি ঘরে না থাকলে কী হত, ভাবতে পারছ?' রেজাউল তার সমস্ত বিশ্বাস দিয়ে ব্যাপারটাকে স্রেফ খেলা বলে বোঝানোর চেষ্টা করে। তারপরও তার প্রতি আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচল, বুকের গভীরে তার প্রতি ঘনিয়ে-ওঠা-ঘেন্নায় তার কাছে থেকে আমি ক্রমেই দূর থেকে দূরে সরে আসতে শুরু করেছিলাম।

সেদিন শানুর তীব্র শ্লেষ-মেশানো কটূক্তি... আমিই প্রশ্রয় দিয়ে 'মাতারি' গোছের ওই মহিলাকে ঘর পর্যন্ত টেনে এনেছিলাম। আমার নিজের সংসার ভেঙে গেছে বলে কাণ্ডটা ঘটানোর ব্যাপারে গোপন হাত ছিল। বিষয়টা আমার পরিকল্পিত, নইলে রাতে তাকে ডেকে নিয়ে এসেছিলাম কেন? এমন একটা জঘন্য দৃশ্য তাকে দেখতে হল কেন? বিকারগ্রস্ত মানুষের মতো একটানা বকে যাচ্ছিল শানু। রেজাউলের ওইটুকু খেলাতেই আমার শরীরের প্রতি অণু ইঞ্চি বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম তার মনের অবস্থা। তাই শানুর অমন অমূলক সন্দেহ-জড়ানো অভিযোগের মুখে মন প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেও, নিজেকে শান্ত রেখেছিলাম। বুঝতে দিইনি আমার মনের ভেতরে যন্ত্রণার কী ভয়াবহ তোলপাড়!

আমার নিজের যখন এই রকম মানসিক সংকট, শানু তখন নিজেকে সহজ করে আনে এবং ক্রমেই তার অস্তিত্বের সংগ্রামে মরিয়া হয়ে ওঠে। তার স্বামীর এই যে লজ্জা ঢাকতে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া, সে যদি আর না ফেরে? ক্রমেই তার কান্না ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে। এইভাবে এক সময় আকাশ ফর্সা হয়ে আসে। আমি দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঠায় বসে আছি। তার মনে স্বামীর বিরুদ্ধে যে সীমাহীন ক্রোধ, আমি দেখতে পাই, ক্রমেই সেটা উবে যেতে শুরু করেছে। অসহায়ভাবে সে এ-ঘর ও-ঘর করে। তার সব যন্ত্রণা, সব ভয় তখন একটি বিন্দুতে স্থির—নিশ্চয়ই তার স্বামী আর ফিরবে না। এই রকম মানসিক দ্বন্দ্বে বিক্ষত ও আবার যখন আমার বিরুদ্ধে মারমুখী, তখন নিজেকে টেনে তুলে আমি উঠে দাঁড়াই। উদ্ভ্রান্তের মতো ব্যাগ গোছাই। মাথার মধ্যে বনবন করছে একরাশ পোকা। মাঝখানে বিছানা, রেজাউল পাক খাচ্ছে, মেয়েটার অবিশ্রান্ত হি হি...। দৃশ্যটা স্পষ্টটা চোখে ভাসছে। এখনও কেন অবশ হয়ে যাই? মাঝখানে বিছানা, কী প্রবল ঘূর্ণি, কী চমৎকার খেলা... কাতুকুতু দিচ্ছে... খপ করে ধরে ফেলছে কখনও... স্রেফ শিশু বনে গেছে রেজাইল... পেয়েছি পেয়েছি...

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

চিৎকার। হা ঈশ্বর!

এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।

'তুমি তাহলে বাসায় ফিরে যাবে বলে ঠিক করেছ? চাচির হিম ঠান্ডা প্রশ্নে চমকে মাথা তুলি।

'হ্যাঁ', অস্বস্তি নিয়ে বলি, 'আসলে এই যে আমার হুট করে এখানে চলে আসা, পুরো ব্যাপারটাই ইমোশনালি ঘটেছে।'

'তাতে কী', চাচির গলায় না সমর্থন, না প্রতিবাদ, 'মানুষেরই এমন হয়। মানুষ কি আর সারাক্ষণ হিসেব করে চলতে পারে?'

আসলে বাথরুম থেকে বেরুতে বেরুতেই সিদ্ধান্তটা নিই। পুরো ব্যাপারটা কেমন যেন গুলিয়ে যেতে থাকে। শানুর মানসিক সংকটকে ক্রমেই নিজের করে নিতে থাকি। মানুষের এইরকম বিপর্যয়কর সময়ে কোনো অভব্য আচরণকে গুরুত্ব দিতে নেই। সত্যিই তো, ওর স্বামী যদি আর না ফেরে? লজ্জা বড়ো ভয়ানক ব্যাপার। এর দায়ভাগ বাহ্যত আমাকেই বহন করতে হবে, যদিও এক্ষেত্রে আমার বিন্দুমাত্র দোষ নেই। কাল্লুর মার সঙ্গে আমার জানা-শোনা না হলেও ব্যাপারটা ঘটতে পারত। স্বীকার করি, তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের পথ ধরেই ঘটনাটা ঘটবার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু ঠিক এই ব্যাপারটাতো অন্য কোথায়ও ঘটতে পারত! একই ঘটনা বাইরে কোথাও যে ঘটেনি তা-ই-বা বলি কী করে? যেহেতু এর সঙ্গে যে জড়িত, সে নিজেই ইনোসেন্ট নয়। অনেকদিন ধরেই সে কাল্লুর মাকে নানাভাবে ফোঁসলাচ্ছিল। আর এ-থেকেই বুঝতে অসুবিধে হয় না, এটা কোনো দুর্ঘটনা নয়। তার মনে অনেক আগের থেকেই এইসব কাজ করছিল। আমাকে কেন্দ্র করেও যে ভদ্রলোকের মনে এইসব ইচ্ছে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে না, তারই-বা নিশ্চয়তা কী? হয়তো নিজেকে সে সংযত রাখে। আমি লেখাপড়া জানা মেয়ে, অফিসে চাকরি করি—জায়গাটা খুব বিপজ্জনক, তাই হয়তো নিজেকে চেপে রাখে। আসলে সব মানুষের পক্ষে আত্মার কাছে শুদ্ধ থাকা সম্ভব হয় না। যেহেতু একজনের ইচ্ছেই তাকে জাগ্রত করে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখাটাই তো মানুষের সভ্যতা। আমার কি ইচ্ছে হয় না? রেজাউলের সঙ্গে আমার এতদিনের অভ্যাস। অথচ এক-একদিন কি মধ্যরাতে খোলস খুলে শরীরটা বেরিয়ে পড়ে না বিশাল আকাশের নীচে? সে নগ্ন হয়, ছটফট করে। কাতরায়। তাই বলে শানুর ঘর থেকে তার স্বামী বেরিয়ে এলেই আমি নিজেকে ছেড়ে দেব? আমার বোধবুদ্ধি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না?

সন্ধ্যায় দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া। ঝগড়ার উৎস আর কিছু নয়, টাকাকড়ির ঘাটতি। ঝগড়াঝাটির একপর্যায়ে কাঁদতে কাঁদতে শানু ঘুমুতে চলে যায়। তারপর তার পাশ থেকে উঠে মাঝরাতে তার স্বামী বেরিয়ে গেল। ঘটনাটা কোনোমতেই ক্রোধ থেকে ঘটেনি। আগে থেকেই ছক-করা ছিল। এখানে আমার অন্যায় কতটুকু? কাল্লুর মার সঙ্গে তার স্বামীর অমন নটঘটের দৃশ্যটা দেখতে শানুকে সাহায্য করেছি, এইতো? মাঝরাতে নিঃশব্দেও ঘটনাটা ঘটতে পারত। তাহলে সবকিছু থাকত শান্ত। কেউ কিছু না জানলেও কোনো কষ্ট ছিল না। বিপর্যয়কর কিছু ঘটত না। ব্যাপারটা নতুন করে উপলব্ধি করি। কিন্তু শানুকে এগিয়ে নেওয়ার সময় আমি কি জানতাম আসলে এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তাহলে, ঘটনার কোনখানে আমি? যাহোক, এখন আমার চাইতেও শানু বেশি অসহায়। ঝোঁকের মাথায় তাকে ফেলে আসা উচিত হয়নি আমার। এই রকম ভেবেটেবে নিজেকে নরম করে আমি চাচির ঘরে এসেছি। আমার এই সিদ্ধান্ত আমাকে নতুন করে অস্থির করে তুলছে। তাছাড়া গোড়া থেকেই আরেকটা টেনশান কাজ করছে, এই বুঝি ঘরে ঢুকলেন ইরফান চাচা। শুনেছি তিনি রাশভারী, ভীষণ গম্ভীর। তাঁর মুখোমুখি হওয়ার কথা ভাবতেই জ্বর উঠছে শরীরে। কীভাবে ভদ্রলোককে পাশ কাটানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

যায়, মনে মনে তার উপায় খুঁজতে থাকি। শেষে প্রশ্ন করি, 'চাচা ঘুম থেকে ওঠেননি?'

'না', প্রশান্ত জবাবে চাচি চা এগিয়ে দিতে দিতে বলেন, 'রাতে বাইরে আড্ডা দিলে উনি দশটা পর্যন্ত ঘুমোন।'

'আমাকে যে এক্ষুনি যেতে হয়।' চায়ে চুমুক দিয়ে ছটফট করি আমি। গলার কাছে শুধু আটকে যাচ্ছে।

'সে কী! দেখা করবে না তাঁর সঙ্গে?' চাচির বিস্ময়ে কোনো গাঢ়তা নেই। আমিও প্রশ্রয় পেয়ে বলি, 'আজ থাক। আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। আমি আরেক দিন আসব না হয়।'

চাচি কি আমার অস্বস্তিকে মূল্য দিলেন? আশ্চর্য! কোনো প্রতিবাদ করলেন না! এরা এত ভদ্র কেন? একটু বেশি মাত্রায়? নাকি তিনি আমাকে এড়াতে চাইছেন। বুড়ো বয়সে এরকম যুক্তিহীন ঈর্ষা! কী জানি! বয়স্কদের সাইকোলোজি আমি কতটুকই-বা জানি। আর যুক্তিহীনই বা বলি কী করে? মার সঙ্গে তাঁর স্বামীর কতটুকু সম্পর্ক ছিল? কতটা গভীর? এর কতটা জানেন চাচি? সে আমলের প্রেম কতটা ছোঁয়াছুয়ির পর্যায়ে গিয়েছিল? ধুৎ!

চাচির শোয়ার ঘরে কী বিশাল পালঙ্ক, কী ভীষণ উঁচু! এমন পালঙ্ক আমি জাদুঘরে দেখেছি। দেখে ভাবতাম, রাজা-বাদশাদের কী আজগুবি শৌখিনতা! সিঁড়ি বেয়ে পালঙ্কে ওঠো। কোনোদিন কি দ্রাক্ষারসের ঘোরে লোহার সিঁড়ি থেকে পা ফসকায়নি? অবশ্য রানি তো সঙ্গেই থাকতেন। উৎকৃষ্ট বাঁদি—নিশ্চয়ই সে-ই রক্ষা করত...। এই বিছানায় অবশ্য সিঁড়ি দিয়ে না উঠলেও চলে। অতটা উঁচু নয়। পালঙ্কের স্ট্যান্ডগুলো ভীষণ কালো। বেঁকে বেঁকে সাপের মতো ওপর দিকে উঠে গেছে। চাদরটা মখমলের। চেয়ার দুটোও রাজকীয় ঢং-এর। বিশাল তার আকার। সব কিছু মিলিয়ে ঘরের ভেতরে বেশ একটা দরবারি হাওয়া। দেয়ালে চমৎকার দুটো তেলছবি। সত্যিই চমৎকার। অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মের। দৈত্যের মতো একটা লোক... চারপাশে প্রচণ্ড ঝড়, দৈত্যটা তার সাত-সাতটা হাত উঁচিয়ে ধরেছে সাতদিকে। দুটো হাতের মুঠোয় পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। সারা ক্যানভাসে লাল-নীল রঙের ছোপ। অন্য ছবিটা ধ্বংসস্তূপের। নিখুঁত একটা অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ। ইট-পাথরের এত জীবন্ত রূপ ছবিতে আমি আগে কখনো দেখিনি। দেখতে দেখতে আমার ছবি আঁকার ঘুমন্ত ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। হাত নিশপিশ করে। আমার কেমন কষ্ট হতে থাকে। আমাকে অমন করে ছবি নিরীক্ষণ করতে দেখে চাচি বললেন, 'আমি এসবের কিছুই বুঝি না। তোমার চাচার এক সময়ের সংগ্রহ।'

এই রুচিবান ভদ্রলোকটি আমার মায়ের মতো আটপৌরে, অগভীর আর ম্যাড়মেড়ে এক মহিলাকে ভালোবেসেছিলেন? অদ্ভুত এক বিস্ময় আমাকে বিমূঢ় করে দেয়। সেই সাথে ভেতরে ভেতরে ভীষণ অহংকারীও হয়ে উঠি। এবং বেরিয়ে আসি। এখন কী যে ঝরঝরে আর নির্ভার লাগছে নিজেকে!

ইরফান চাচার সঙ্গে দেখা না হওয়ার স্বস্তিটা দ্বিগুণ। নির্মল বাতাসে গা ভাসাই এবং দীর্ঘদিন পর টানা রাস্তায় সোজা রিকশায় চেপে বসি।

চলো হে পথ চলো, বলতে বলতে প্রথমে আরেফিনের হলের দিকে যাওয়ার কথাই ভাবি। ব্যাপারটা নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার। কেননা, শানুদের সঙ্গে সে-ই আমাকে ভিড়িয়ে দিয়েছিল। তবে এও জানি ইরফান চাচার বাসায় যাওয়ার ব্যাপারটা সে কিছুতেই সহজভাবে নেবে না। কী ভাববে ও আমাকে? নির্বোধ? ব্যক্তিত্বহীন? ছ্যাঁচড়া?

আমার এই ইমোশনের ব্যাখ্যা কীভাবে দেবে সে? ফের গভীর গাড্ডায় তলিয়ে যেতে থাকি। শূন্য হয়ে আসতে থাকে সব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

উলটো পথ ধরে হাঁটছে অট্টালিকা, আকাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে এই-মাত্র-ওঠা সূর্য, দ্রুত ধাবমান ট্রাক-বাস আর উচ্ছৃংখল রিকশা-টেম্পো। হুড ফেলে মিহি রোদে মাথা পেতে দিই। সেই রোদ, বিস্তৃত রাস্তা, ট্রাফিক জ্যাম, লাল-হলুদ বাতির জ্বলা-নেভা—এইসব উজিয়ে রিকশা মেহেরুন্নেশা মার্কেট পার হয়। ডানপাশে সার সার জুতোর দোকান। রকমারি সব জুতোর ডিজাইন। বাঁয়ে মোড় নিয়ে রিকশা এক সময় হাঁফ ছেড়ে দাঁড়ায়।

ভাড়া চুকিয়ে প্রায় দৌড়েই বড়ো রাস্তা পার হই। বঙ্গবন্ধু হলের পেছন দিকের ভাঙা দেয়ালের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় হলের মূল গেটে। নামধাম, কার কাছে যাব, কখন ফিরব—এইসব ফিরিস্তি দিয়ে যখন টানা বারান্দা ধরে হাঁটছি, তখন দুপাশের জানলাগুলো দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক কৌতূহলী চকচকে চোখ আমাকে গিলে ফেলতে থাকে। কো-এডুকেশনে পড়েও এদের নারীদর্শনের সাধ মেটে না! গা-চিটচিটে গভীর অস্বস্তি নিয়ে দোতলায় উঠি। আমি পারতপক্ষে হলে আসি না। আজ নিয়ে সম্ভবত দু-দিন এলাম। আরেকদিন এসেছিলাম রেজাউলের সঙ্গে ডিভোর্স নিয়ে ঝামেলা বাধবার সময়। আরেফিনের একজন বন্ধু তখন সাক্ষী হিসেবে সঙ্গে ছিল।

যাহোক, ওর রুমে ঢুকতেই আরেক অস্বস্তির মুখোমুখি হই—একজন খালি গায়ে এই অসম্ভব গরমের মধ্যেই বুকডন দিচ্ছিল। আরেকজন লুঙ্গিতে মালকোচা মেরে ছোট্ট চৌকির ওপর পিঠ ঠেলে দোল খাচ্ছিল। হঠাৎ আমাকে দেখেই দুজন যেন কারেন্টের শক খায়। তেলতেলে শরীরে দ্রুত শার্ট চড়ায়। লজ্জা কাটিয়ে আমি ক্রমেই নিভে আসতে থাকি, আরেফিন নিশ্চয়ই বাইরে।

মেজাজটা মুহূর্তে খিঁচিয়ে ওঠে। লুঙ্গি ঠিক করে অন্যজন এক সময় নর্মাল পজিশনে এসে আরেফিনের ফিরিস্তি দেয়—'ওতো গতরাতে ফেরেনি।'

হলের বাইরে ও কোথায় রাত কাটাবে? এইসব যখন ভাবছি, তখন 'বসেন-বসেন' বলে ভদ্রতা সেরে তাদের ভেতর থেকে এক-একজন রুম ছেড়ে বাইরে ছুটে যেতে থাকে। বুঝতে পারি, আমার জন্য চা-বিস্কিট, কিংবা কোক-টোক আনতে যাচ্ছে।

আমি ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে সজোরে প্রতিবাদ করি, 'প্লিজ, আমি কিচ্ছু খাব না। এক্ষুনি চলে যাব। শোনো'... বলে ভাবনায় পড়ে যাই। এদেরকে কী সম্বোধন করব? আরেফিনের বন্ধু এরা। আপনি আমার ঠিক আসে না। এই রকম ভাবছি আর চোখ হাঁটাচ্ছি রুমটার গলিঘুঁজিতে। তিনদিকে তিনটে টেবিল। দুটি ক্যাঁচক্যাঁচে চৌকি। তার ওপর তোশকবিহীন চাদর বেছানো। একটা টেবিলের সামনের দেয়ালে সাঁটা অসংখ্য কাটা কাটা ছবি। মেরিলিন মনরো, শেখ মুজিব, ম্যারাডোনা, রেখা... তালগোল পাকানো রুচির সমন্বয়। তবে আরেফিনের দেয়াল ফাঁকা। হেঁটে তার টেবিলের কাছে যাই। ওটার ওপর ধান দিয়ে বোনা রবীন্দ্রনাথের মস্তক, দেখে স্বস্তিবোধ করি। একবার ভাবি, ছবিটা দেয়ালে আটকে দিয়ে যাই। কিন্তু তারপরই আবার মহা-অস্বস্তি। আরেকটা বই যেই হাতে নিয়েছি, অমনি তার ভেতর থেকে ঝুর ঝুর পড়তে লাগল স্ট্যাম্প আকারের নগ্ন দেহের কিছু ছবি।

আমার অস্বস্তি ততক্ষণে অন্য দুজনের মধ্যেও সঞ্চারিত। ওদের সামনে আমার কানজোড়া লাল হয়ে ওঠে। ওরা দ্রুত সেগুলো কুড়োতে তৎপর হয় এবং স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে বলে, 'আরেফিন এলে ওকে কিছু বলব?'

'শোনো', আমি সোজা রাস্তা ধরি, 'যখুনি আসবে, একটু কষ্ট করে বলবে, ও যেন সোজা আমার বাসায় চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

যায়।'

হল থেকে বেরিয়ে সেই পুরোনো রুটিন। নীলখেতের পাশে কড়া রোদে ভাজা হয়ে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা। মাথা বেয়ে ঝরতে থাকে নোনতা জল। এতটা পথের রিকশা ভাড়ার পুরোটা গচ্চা যাওয়ায় কেমন খচখচ করছে ভেতরটা। মাসের উনিশ আজকে। বাড়ি ভাড়া আর অন্যসব বিল মিটিয়ে, মাসের শুকনো বাজারগুলো সেরে ফেলার পর গোড়াতেই আমার হাতে ছিল বেতনের চার ভাগের মাত্র এক ভাগ। সেই টাকাগুলো প্রতিদিন বিন্দু বিন্দু করে খরচ করার প্ল্যান ভীষণ সূক্ষ্ম ছিল। কেননা, পাঁচ টাকা এদিক-ওদিক হলেই বেসামাল হবার জোগাড়। হিসেবের বাইরেই এ মাসে এক জোড়া স্যান্ডেল কিনতে গিয়ে আমার প্রায় ভরাডুবি হবার অবস্থা। অথচ ওটা না কিনেও উপায়ও ছিল না। গত দু-মাসে পিন মারতে মারতে ওটার এমন বেকায়দা অবস্থা করেছিলাম যে, ক-দিন আগে আলপিনের একটা ডগা আমার বাঁ পায়ের পাতায় আমূল ঢুকে গিয়েছিল। বাসায় এসে দ্রুত সেভলন ঘষেছিলাম। শানু ভয় দেখিয়েছিল, 'দেখো, আবার না সেপ্টিক বাধিয়ে বসো।' তিন-চারদিন বেশ ভয়ে ভয়ে ছিলাম। শানুর ধাক্কাতেই শেষ পর্যন্ত স্যান্ডেল জোড়া কেনা হয়।

ফলে, এখন বলতে গেলে, ঝাড়া হাত-পা। হাতে এখন আছে দেড়শো টাকার মতো। এই নিয়ে চলতে হবে পুরো মাস। গতকাল থেকে এবেলা পর্যন্ত আমার জীবন টানা রুটিনের বাইরে সম্পূর্ণ অন্যরকমভাবে কাটল। এতটা পথ রিকশায়, অনেকদিন হয় না। মাপজোক করে চলায় এখন এতটাই অভ্যস্ত হয়েছি যে, এতটুকু হেরফের হলে অনিঃশেষ অস্বস্তি হয়। অথচ আমার রক্তের মধ্যে আছে, বিয়ের আগে আরও বেশি ছিল, বোহেমিয়ানিজম, রুটলেসনেস... ঝোড়ো পাখি... দৌড়াও । আর সেই আমি কিনা আমার ডানাদুটোকে গোটাতে শিখেছি, রক্তের বুনো ধর্মকে শিখিয়েছি ধৈর্যের গান! কত কী যে আমি শিখেছি!

বাস এসে দাঁড়ায় শাঁ করে। ঘেমোগন্ধের দুর্বিপাকে আবর্তিত মানুষ লাফ দেয় দরজার দিকে। চাপে পড়ে ভেতরের মানুষ বেরুতে পারছে না। ফলে, আবে হালা মাস্দোরপুত... নানা খিস্তি। এসব ব্যাপারে আমি এখন অসম্ভব দক্ষ। বাস ছেড়ে দেবার সময় ভাই সরেন তো... মুখস্থ বলে বলে ভিড়ের মধ্যে নিজের গা ডুবিয়ে দিই। ভিড়ের মধ্যে আমার শরীরের কোন শুচিবাই নেই। তখন সে স্প্রিং, বল—এই রকম আরও কিছু।

সামনে পেছনে মানুষ, ঘামের গন্ধ, অন্ধকার, প্রায় চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকি। কুণ্ডলী পাকানো ভ্যাপসা গরম শ্বাস রুদ্ধ করে দেয়। বুকের ভেতরে পুঞ্জীভূত দুশ্চিন্তা—শানুর স্বামী যদি না ফেরে? কথাটা ভাবতেই বুকের ওপর বিশাল এক পাথর চেপে বসে। কথা, চিৎকারের মাঝখানে স্থির নৈঃশব্দে আধবোজা হই, ক্রমশ নিজেকে ছেড়ে দিতে থাকি...আর কী ঘটবে? আর কী ঘটার বাকি আছে? চলো হে পথিক, চলো...।

কিন্তু যত সহজে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি, ঘরের দরজার এসে অনুভব করি, অত সহজে কি পা ওঠে? আল্লাহ্ জানেন, কী পরিস্থিতির মুখোমুখি আমাকে হতে হবে। ভাবি, পা হেঁচড়ে চৌকাঠে রাখি। আঙুলে এক পৃথিবীর চাপ নিয়ে দরজায় নক করি। অবসাদ আর হিম শীতলতায় কিছুক্ষণ দম আটকে থাকি। নিজের দরজার সামনে নিজেই আজ আসামির মতো দাঁড়িয়ে। পরমুহূর্তেই ভাবি, ফিরে যাব? হায়রে আমার গ্লানির দ্বন্দ্ব!

দরজা খুলে দিল যে, তাকে দেখে আমি হাঁ। স্বস্তি, লজ্জা সব আমাকে এক সাথে ছেঁকে ধরে। আমার বিস্ময় যখন শেষ সীমায়, তখন দেখি দরজার চৌকাঠে হাসিমুখ শানু ও তার স্বামী দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে শানুর এগিয়ে আসার আগে তার স্বামী নিজেকে সহজ করে বলে, এই যে এসে গেছেন। আর আমরা তো এদিকে টেনশনেই মরি। তার চেয়েও আন্তরিক শানুর আচরণ। আমাকে দু-হাতে জাপটে ধরে টেনে ঘরে আনে, 'বাঁচালে তুমি! নিজের ওপর এত রাগ হচ্ছিল যে কী বলব! আসলে আমি কোনো মানুষই না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘না না, সে-কী’, আমার মুখ দিয়ে এ ছাড়া আর কোনো কথা বেরোয় না। দিন যতই যাচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা তত বাড়ছে। ভেতরে ভেতরে আমার এ রকম একটা অহংকার ছিল যে, আমি মানুষ চিনি। তাদের আচরণ চিনি। যে কোনো একটা ঘটনার, হোক তা সুন্দর, হোক না বিচ্ছিরি, তার পরিণতি সম্পর্কে কিছুমাত্র হলেও আমি আঁচ করতে পারি, অথচ কী ভুল ধারণাই না আমার! আমি কি ওদের এখনকার এই দৃশ্যকে সহজভাবে নিতে পারছি? তৃতীয় একজন হিসেবে এত মিনিট-ঘন্টা ধরে মানসিক ধকল সইবার পর আমার কাছে এই আপ্যায়ন তো নির্মল স্বস্তিকর হওয়ার কথা। ওদের সমঝোতায় আমার ভেতর থেকে কি গভীর একটা চাপ নেমে যায়নি? কিন্তু আমার স্বস্তি নষ্ট করে দিতে থাকা এমন একটা ঘটনার এত দ্রুত নিষ্পত্তি হয় কী করে? আমি এখানে থাকলে কী হত? কতটা বিষ থাকত গোখরোর থলিতে? কতটা অমৃত? তাহলে তো আমার ডিভোর্স হওয়ার কথা না। ভুল কি আমারই? আরও বেশি মানিয়ে চলার রীতিটা রপ্ত করতে পারিনি বলে? আসামি আমি? আমার ভেতরে সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে। জীবনটাকে এদের মতো সহজ করে নিতে পারলে আমাকে এত ভঙ্গুর পথ ধরে হাঁটতে হয়?

‘আরেফিন এসেছিল,’ শানু রহস্যময় ভঙ্গিতে বলে, ‘অনেকক্ষণ বসে গেছে।’ শুনে আমি ভেতরে জমে উঠি। বিহ্বলতা কাটিয়ে বলি, ‘কী বললে তুমি?’

শানু তার শাড়ির আঁচল দিয়ে আমার বিছানার ধুলো সরাতে সরাতে উত্তর দেয়, ‘আমি বলেছি, তুমি অফিসে গেছ।’

‘খুব ভালো করেছ, তুমি আসলেই গ্রেট!’ বলতে বলতে শানুকে টেনে ওর ঘরের দিকে নিতে থাকি। এখান থেকে চলে গেছি জানলে ছেলেটা খামোকা টেনশনে ভুগত। শানু বলে, ‘আমি তোমার মতো অত বোকা নই’... ওর অনাবিল হাসি দেখে এইবার আমার হাসার পালা, ‘জীবনে এই একটা কথাই এক্কেবারে খাঁটি বলেছ। দাও, কিছু খেতে দাও আমাকে। খিদেয় জ্বলে যাচ্ছি।’ ওর স্বামী তখন বাথরুমে। সেখান থেকেই সে চেঁচায়, ‘কেন, হাওয়া খেয়ে পেট ভরেনি?’

এভাবেই একটা অধ্যায়ের সহজ সমাপ্তি ঘটে যায়।

পরদিন অফিসে যেতেই লিফট বন্ধ। ব্যাপারটা দেখে প্রথমে দমে যাই। লিফটের দোরগোড়াতেই দেখা হয় বড়ুয়াবাবুর সঙ্গে। সিঁড়িতে পা দেওয়ার আগে বাঁ হাত দিয়ে আয়েশ করে মুখে পানের খিলি ঢোকালেন। তার পুরো চাঁদিটাই প্রায় ফাঁকা। ডানদিকের কয়েক গাছা চুল সজোরে টেনে উঠিয়ে দিয়েছেন বিশাল শূন্য অংশে। পান-খয়েরের রঙে ঠোঁট জোড়া তার সারাক্ষণ টকটকে লাল। ভুঁড়িটা দেখার মতো। বিশাল তার আকার। এই গরমে ওই রকম একটা বেঢপ শরীরে চড়িয়েছেন এমন একটা চকমকে লিনেন শার্ট, দেখতে জবরদস্ত লাগছে। আমাকে দেখামাত্রই তিনি বললেন, ‘কী খবর, পরশু আসেননি কেন?’

উত্তর না দিয়ে জানতে চাই, ‘অফিসের খবর কী?’

‘গেলেই দেখবেন’, সিঁড়িতে পা রাখেন তিনি, ‘আপাতত এক্সারসাইজটা শুরু করা যাক, আমার ফিগারটাতো আবার, কী বলেন, দেখার মতো, মাঝে মাঝে লিফট বন্ধ হলে...।’

‘কী ব্যাপার, লিফট বন্ধ কেন?’ প্রশ্নটা করেই জবাবের অপেক্ষা না করে সিঁড়ি ভেঙে আমিও তার পাশাপাশি হাঁটতে থাকি। ভেতরে তখনও আমার চিরকালীন প্রলয়—পদসঞ্চালন করো নারী, উপরে উঠিয়া যাও...। ‘লিফট বন্ধ কেন জানতে চাইছেন? ওই এক সমস্যা’, নাটকীয় স্বরে টেনে টেনে তিনি বলেন, ‘দাবি-দাওয়া।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

তিনতলায় উঠেই হাঁপিয়ে উঠি। শক্তি ক্রমেই লোপ পাচ্ছে কি? অফিস করার সময়ও প্রায়ই অনুভব করি, আজকাল অল্পতেই শরীরে কেমন যেন ঝিম ধরে যায়। চারপাশ ছায়া হয়ে আসে। তার মধ্যে ঢেউ খেতে থাকে লাল, নীল, গোলাপি বল । কিন্তু মনের শক্তির রাশ টেনে নিজেকে এলিয়ে পড়তে দিই না।

'পরশু বস আপনাকে কিছু বলেছেন?' সহজ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করেন বড়ুয়াবাবু। আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, 'পরশু কিছু বলেছেন মানে? আমি তো পরশু অফিসেই আসিনি।'

'তিনিও তো পরশু অফিসে আসেননি'... বলতে বলতে তাঁর পা পাঁচতলার সিঁড়ি ছোঁয়। আমার শরীর জুড়ে নীল স্রোত বয়ে যেতে থাকে, ক্রোধে আমি ভাষা হারিয়ে ফেলতে থাকি। নিজেকে সংযত করে ঠান্ডা গলায় কেবলই বলি, 'কী বলতে চাইছেন আপনি?'

এক সময় পাঁচতলায় গিয়ে দাঁড়াই দুজন। তিনি আমার দিকে সরাসরি তাকান, 'এত খেপে যাচ্ছেন কেন? আমরা যেমন, আপনিও তেমনি অফিসের এমপ্লয়ি। আমাদের হয়ে আপনি যদি জটিল একটা সমস্যার সমাধান করতে পারেন, আমরা তাকে অন্য চোখে দেখব কেন? অফিসে কাজ করা, সারাক্ষণ ভারসাম্য ঠিক রাখা মেয়েদের পক্ষেই তো সহজ।'

ফের মাথায় রক্ত উঠতে থাকে। মাঝখানে মাত্র একদিনের অনুপস্থিতি। এর ফাঁকেই এতখানি? আমার পা আর ছ-তলায় ওঠে না। চারপাশ ঘিরে কেমন ঝিম ঝিম অন্ধকার নামতে থাকে। এইবার সরল গলায় প্রশ্ন করি, 'পরশু বস আসেননি অফিসে?' কিন্তু পর মুহূর্তেই প্রশ্নটা নিজের কানেই কেমন হাস্যকর, জোলো শোনায়।

'কেন, আপনি জানেন না', বড়ুয়াবাবুর গলায় স্পষ্ট অবিশ্বাস।

'বিশ্বাস করুন'—কেমন অসহায় বোধ করতে থাকি। টের পাই, ঠিক হচ্ছে না। ওতে করে ভদ্রলোকের সামনে আরও বেশি... আরও বেশি... কিন্তু নিজেকে সামলাতেও পারছি না। কেমন কান্না পেতে থাকে, 'আপনি অন্তত বিশ্বাস করুন। আসলে পরশু, মানে, এত জ্বর, কী যে হল, বমি, শুধু বমি... নিজেকে বিকিয়ে চাকরি করব! উফ্ আপনাকে আমি বোঝাতে পারছি না।' থেমে থেমে কথাগুলো বলতে গিয়ে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠি।

'ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন?' তিনি এবার আমাকে আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে বলতে থাকেন—'অফিসের অবস্থা এখনও এতটা খারাপের দিকে মোড় নেয়নি। আসলে পরশু তিনিও ছুটিতে ছিলেন কী না! অফিস জায়গাটা তো খুব ভালো না, আপনি তো জানেনই'... পা টেনে-টেনে সাত তলায় উঠি। ভেতরটা দমে গেছে। এখানে শুধু আমাকে নয়, চমৎকার সম্প্রীতির মধ্যেও অনেককেই নানা রকম টিপ্পনি সহ্য করতে হয়। আমি নিজেও কি কম অভ্যস্ত এসবে? কিন্তু তারপরও কী হয়, ঠান্ডা হয়ে যাই, জমে যাই, মাথায় রক্ত চড়ে যায়, সহ্য করতে পারি না। আমার কপালটাই আসলে খারাপ। নইলে বস কেন সেদিনই ছুটি নিতে যাবেন?

জাহান্নামে যাক... নিজেকে সহজ করার জন্য টান টান এগিয়ে যাই টেবিলের দিকে। অফিসে এসেই চোখের সামনে পত্রিকা মেলে ধরার চিরাচরিত অভ্যাসে চোখ আটকে যায় একটা খবরে—আগামী সাতাশ তারিখ ঢাকায় বারো ঘন্টার হরতাল। এবং তার নীচেই 'পাশবিক' হেডিং-এ তিন বছরের বালিকার ধর্ষণজনিত মৃত্যুর খবর। কানে আসতে থাকে একটানা টাইপ রাইটারের খট খট শব্দ। নিজেকে ভাঁজ করে ফাইলপত্রে মাথা ডুবিয়ে দিয়েছি, পাশের টেবিলে সুলতানার গলা, 'শরীর খারাপ ছিল বুঝি?' কম্পিউটারের কি-বোর্ডের অস্পষ্ট অথচ বিরামহীন খুটখাট শব্দ কানের পর্দায় আছড়ে পড়তে থাকে, 'হ্যাঁ', আমি মাথা না উঠিয়েই বলি। কাচের পার্টিশানের ওপাশটা খালি। সম্ভবত আজও বস আসেননি। নির্ধারিত সময়ের বাইরে এক মিনিটের বেশি দেরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

হয় না তাঁর। আমাদের অফিসে তিনি কম্পিউটার মেশিন হিসেবে খ্যাত। কলিং বেল টেপার সঙ্গে সঙ্গে আহূত ব্যক্তির তাঁর সামনে হাজির হওয়া চাই-ই চাই। টাইপে বিন্দুমাত্র ভুল পেলে আমাকেই কি কম নাস্তানাবুদ করেছেন? চোখ পাকিয়ে বলে উঠেছেন, 'বি এলার্ট।' আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি, ব্যাপারটা কী করে যেন অফিসের সবাই টের পেয়ে গেছে। এরই মধ্যে ভেতরে-ভেতরে অফিসের পরিস্থিতি বেশ কয়েক দফা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। ইনক্রিমেন্ট আর বোনাসের সমস্যাই ছিল প্রধান। ইদের বোনাস বেতনের আট ভাগের এক ভাগ দেওয়ার চল বহুদিন ধরে। এমপ্লয়িদের বক্তব্য, ও দিয়ে মেইডসার্ভেন্টের শাড়িও হয় না। দুর্মূল্যের এই বাজারে ফি বছর জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। অথচ সবার প্রমোশন, ইনক্রিমেন্ট সেই কবে থেকে বন্ধ। দাবিদাওয়া সম্পর্কিত এইসব ফিসফাস বসের কানেও গেছে। কিন্তু প্রতিবাদ তখনও এতটা দানা বাঁধেনি। বসের এক কথা, মালিকের এখন লোকসান হচ্ছে। অথচ যত দিন যাচ্ছে, সবাই কোম্পানির প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ছে। এ রকম হতে থাকলে কোম্পানি বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া মালিকের কোনো পথ থাকবে না।

এইসব ফিসফাস, দীর্ঘশ্বাস, ক্রোধ, ঘৃণা, টিপ্পনি প্রতিদিন লেগেই আছে। অফিসে গেলে অবশ্য বেশির ভাগ সময়ই আমার ঠোঁটে তালা লাগানো থাকে। যে কোনো মূল্যেই হোক চাকরিটা আমাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। এমপ্লয়িদের দাবির সাথে আমার দাবির বিন্দুমাত্র দ্বিমত নেই। কিন্তু আমাকে সারাক্ষণ একটা ভয় ছেকে থাকে! কলিগদের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে আমার চাকরিটা যদি চলে যায়! ওটা এখন আমার বেঁচে থাকার প্রধান অংশ। কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে তাই সেটা খোয়াতে আমি রাজি নই। তাছাড়া বস এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট ভদ্র। তিনি কোম্পানি বন্ধের কথা না বলে কর্মচারী ছাঁটাইয়ের থ্রেট দিতে পারতেন। তাছাড়া তিনি নিজেই তো একজন কর্মচারী। তাহলে সবাই একযোগে তার পেছনে লেগেছে কেন, ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

ফাইল আর লেজারে মাথা ডুবিয়ে আছে কেউ। কেউ মগ্ন খোশ-গল্পে। আঁচ করতে পারি, আমাকে ইঙ্গিত করেও ফিসফাস কিছু কম হচ্ছে না। কেমন বিপন্ন বোধ করি। কলম চালাতে গিয়ে আঙুল জমে আসছে। পরিবেশটা ক্রমেই কেমন বৈরী হয়ে উঠছে। প্রথম যখন এসেছিলাম তখন সবারই কী সহযোগিতা! চাকরির মজাই ছিল অন্যরকম। সেই আমি কী করে ধীরে ধীরে সবার বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়িয়েছি! আদৌ দাঁড়িয়েছি কি না, কোনো পরীক্ষা ছাড়াই সেসব নিয়ে ইঙ্গিত, খোঁচাখুঁচি। ভীষণ অস্বস্তিকর সব ব্যাপার-স্যাপার! আগে এসব ছিল না। জীবন যে সহজ সুন্দর একতালে চলে না, আমাকে ঘিরে চলা এসব ঘটনাই তার প্রমাণ। চায়ের গাঢ় লিকারে ভাবনার গ্রন্থিগুলো ডুবে যায়। খয়েরি জল ছিঁড়েখুঁড়ে ধোঁয়া উড়তে থাকে।

'সত্যি করে বলো তো, পরশু তোমার সঙ্গে বসের দেখা হয়নি', সুলতানা চেয়ার টেনে আমার টেবিলের ওপাশে এসে বসেছে। অবচেতনেই টাটকা পেপারটা সশব্দে দোমড়ানো আঙুলের তলায় ঠেসে দিই। ফের মুখ নেমে যায়। বুকের ভেতর অবিরাম শব্দ। কেমন যেন ফুলে উঠছে ধমনি ও শিরা। টিপটিপ কাঁপছে মাথার দু-পাশের রগ। শীর্ণ ধূসর একটা বেড়াল অস্তিত্বের বাক্স থেকে লাফ দেয়। এইসব ছায়া গাঢ়তা থেকে মুখ তুলি। সামনে চিৎপাত পড়ে আছে ফাইল, প্যাড, কলম। তৈরি হও, নিজেকে বলি, তৈরি হও জঘন্য কৈফিয়তের জন্য। কিন্তু গলার মাঝপথে এসে কী আটকে যায়! বেশি কিছু বলতে পারি না। ভেবেছিলাম, মুখ ফুঁড়ে জঘন্য কিছু শব্দ বেরোবে, বদলে ভিজে আসছে কণ্ঠ, সেই স্বর নিজের কাছেই কী যে অচেনা ঠেকছে! ফলে আমি এইভাবে শুরু করি, 'সুলতানা, এই সামান্য পয়সার একটা চাকরির জন্য অফিসে না এসে বসের সঙ্গে ডেটিং করতে হবে? তুমিও একজন মেয়ে, আমি আশা করেছিলাম, তুমি অন্তত আমার সম্মানটা বুঝবে'... বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বলতে আচমকা থেমে যাই। তারপর যা বলি তার জন্য আমার নিজেরই কোনো প্রস্তুতি থাকে না। কেমন একটা ক্রোধ, ক্ষিপ্ততা আমাকে বিহ্বল করে তোলে, 'এর চাইতে তো বেশ্যাবৃত্তিই ভালো। ওসব লাইনে পয়সা-টয়সা আরও বেশি।' বলেই টের পাই, এই ঝাঁজের ভেতর দিয়ে নিজের দুর্বলতা যেন আরও গাঢ় হল। অপমানে লাল সুলতানা এবার প্রায় ছিটকে দাঁড়ায়, 'আমার এই সহজ কথাটার তুমি এইরকম মানে করলে? ছিঃ, তুমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছ?' তার এই তীক্ষ্ণ শ্লেষের মুখে নিজেকে ঝাঁঝাল করে তুলতে আর অসুবিধে হয় না। ঠোঁটে বিষ মাখানো হাসি ঝরিয়ে বলি, 'বস তো আজকেও আসেননি, খোঁজ নিয়ে দেখবেন আজকে তিনি কার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন? দেখুন না, অফিসে অন্য কোনো মহিলা স্টাফ অনুপস্থিত কী না!'

সুলতানা দাঁড়িয়ে ছিল। এবার চেয়ারে বসে পড়তে পড়তে বলে, 'দ্যাখো, আমি তোমার চাইতেও সিনিয়ার, অন্তত চাকরির বয়সের দিক থেকে। একটু মানিয়ে চলতে শেখো। এ রকম মেজাজ-মরজি নিয়ে তুমি কোথাও টিকতে পারবে না। অসম্ভব।'

আহ্... মানিয়ে চলা! শানু আর তার স্বামী... ফটোফ্রেমে বাঁধানো সুখী দম্পতি। মানিয়ে চলা... কী সহজ করে দেয় জীবনকে... আত্মাকে ইনজেকশন দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখো। মূর্তির মতো, মমির মতো বেঁচে থাকো... ।

অফিস থেকে বেরুবার আগেভাগে সুলতানার টেবিলে যাই। ততক্ষণে ভেতরে আমি জুড়িয়ে এসেছি। তার মুখোমুখি হয়ে বিনীত ভঙ্গিতে তাই বলি, 'দুঃখিত, খুব খারাপ ব্যবহার করেছি তখন। আমি সম্ভবত অতটা অভদ্র নই।'

'না না তাতে কী', সুলতানার গলার স্বর এখন কোমল, 'না বুঝে তুমি একটু বেশিই উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলে, যা হোক ।'

অফিস থেকে বেরিয়ে ক্রমেই আবার নিজের গাড্ডায় তলিয়ে যেতে থাকি। শুরু হয় আমার আত্ম-বিশ্লেষণ। আসলে আমি কখনোই জীবনে সাবলীল মন্থরতা পছন্দ করি না। আবার সৃষ্টি করা অমসৃণ পথ ধরে চলাটাকেও বড়ো কৃত্রিম বোধহয়। আমার প্রেমিক কিংবা আপনজন যখনই আমার কাছে তাদের নিবেদন করা প্রেম-ভালোবাসায় আমাকে ফেনিয়ে তুলতে চায়, তখন মনে হয়, সে আমার প্রাণের নয়। যে কখনোই আমার শত্রু হতে পারে না, সে কখনোই আমার প্রাণের মানুষ হতে পারে না।

কিন্তু সেই শত্রুতার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র মায়া না থাকে? আমি যার সঙ্গে এক ছাদের তলায় থেকেই সংসার করেছি, সে কি আমার সহকর্মীদের মতো স্বার্থপর ছিল? আমার কোনো সন্ধ্যা কি তার গাঢ় চুম্বনে উষ্ণ হয়ে ওঠেনি? তাহলে যুদ্ধ ঘোষণা করে বেরিয়ে এলাম যে? তবে কী শত্রুকেও হতে হবে আমার প্রত্যাশার মতোই মনোরম? ভাবতে ভাবতে একসময় বিশাল সিঁড়িতে থমকে দাঁড়াই। কী আছে আমার? বিদঘুটে অহংকারটুকু ছাড়া? আমার বন্ধু সত্যজিৎ একদিন প্রচণ্ড ঝাঁঝ-মেশানো স্বরে বলেছিল, 'তুই তোর রক্তের তৃষ্ণা নিয়ে এত গর্বিত, এত বিমর্ষ—এজন্যই! নিজের ছোবলে নিজেই মরিস!' এ জন্যই সত্যজিৎকে ভালো লাগে।' সে আমার বিমর্ষতা আবিষ্কার করেছিল, আমার যন্ত্রণাকে চিহ্নিত করতে পেরেছিল। তবে আমি কী চাই? চরম বন্ধু, না পরম শত্রু? রেজাউল কী ছিল? ও ছিল একটা ছকহীন অসহ্য কোনো কিছুর মতো। ফলে ওর সঙ্গে আমি বসবাস করতে পারিনি। মুখে থুথু ছুঁড়ে দিলে কেউ যদি হা হা করে হাসে সে-ও তো এক ধরনের ব্যক্তিত্বহীন যন্ত্রণাকর মানুষ, আমার কোনো প্রতিক্রিয়ারই সে কোনো রকম তোয়াক্কা করছে না। রেজাউলকে তো সে দলেও ফেলা যায় না। ছকহীন মানুষ আমি পছন্দ করি, তবে তার চেহারা যদি হয় রেজাউলের, তবে গুল্লি মারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

সেই ছকহীনতাকে।

হঠাৎ করে কেন জানি মার কথা মনে পড়ে। বড়ো হওয়ার পর মা একবার আমার জন্ম-রহস্যের বর্ণনা দিয়েছিলেন ঠিক এইভাবে : একদিন শেষরাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, আকাশ আলোয় আলোয় উজ্জ্বল। বারান্দার লাগোয়া জামরুল গাছে তুমুল বাতাস। কোথা থেকে একটা সুন্দর ময়না এসে গাছটার ডালে বসেছে। তার গলায় হার। মা আকুলভাবে প্রার্থনা করেন, ময়নাটা যদি আমার হত? সঙ্গে সঙ্গে কী হয়, হারসহ ময়নাটা মার মুখ দিয়ে ঢুকে সোজা পেটের ভেতরে চলে যায়। সেদিন খুব ভোরে মা বাবাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিলেন, 'দেখো, আমার একটা সোনার রত্ন ছেলে হবে।' আর সেদিনই আমি ভূমিষ্ঠ হই। মার সেই স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা এত প্রগাঢ় ছিল, দিন কয়েক তিনি আমার মুখের দিকে তাকাতেই পারেননি।

সোনার ময়না পুত্র হলে কী হত? আমার ছোটোভাই আরেফিন আজ আমার আয়ের ওপর দু-পা সোজা রেখে হাঁটছে। আর তার ডিভোর্সি মেয়েকে ঘিরে মার সেই যন্ত্রণার প্রগাঢ়তা নিশ্চয়ই আরও বেড়েছে। আরেফিনকে নিয়ে তার কী স্বপ্ন, আমার জানতে ভীষণ ইচ্ছে করে। বোনের উপার্জনে চলে, ভার্সিটিতে রাজনীতি করে, পরীক্ষায় ডাব্বা রেজাল্ট করে, সেই ছেলেকে ঘিরে মার ধূসর চোখের আলোটা বড়ো দেখতে ইচ্ছে হয়। এইসব ভাবি, ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত হয়ে ফের নিজেকে ঘুরিয়ে নিই। জীবনের ছকহীন রূপের কথা ভাবছিলাম, আমি কি কারও মধ্যে দেখেছি সেই রূপ? দেখেছি সেই বন্ধুকে যে কখনও আমার মায়াবী শত্রু হয়ে উঠতে পারে? সত্যজিৎ? রঞ্জু? এরা কী কেউ তেমন শত্রু হওয়ার যোগ্য? কী জানি!

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দোতলায় আরেফিনের মুখোমুখি হই। এমনিতে ওর গায়ের রং কালো। মুখের ওপর গুটি বসন্তের দাগ। তার ওপর রোদে পুড়ে এখন ওকে আরও কালো আর বেঢপ দেখাচ্ছে। কালো চামড়া চুইয়ে পড়া জলে ওর সাদা শার্ট জবজবে। ওকে দেখেই পোস্টকার্ড সাইজের নগ্ন ছবি, ছেলে দুটোর নাজুক অবস্থা... এইসব মনে পড়ে। কেমন অস্বস্তি হতে থাকে। নিশ্চয়ই এসব কথা ওর বন্ধুরা ওকে বলেছে। তাই ওকে দেখা মাত্রই মনে মনে একটু রেগে যাই। আবার ভাবি, এসব করার এইতো ওর বয়স। কিন্তু ওর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ও-রকম ছবি সংগ্রহের ব্যাপারটা মেলে না! যাহোক, ও এসেছে, তাই মুখে খুশির হাসি ফুটিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠি, 'তুই! কোত্থেকে?'

'তোমার কাছেই... একটা হেভি প্রবেলেমে পড়েছি', বলতে বলতে ও অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকায়।

'তাই তো ভাবছি, প্রবলেম ছাড়া তুই আর আমার খোঁজে অফিসে আসবি', মুহূর্তে কেমন তেতে উঠি। 'নিশ্চয়ই টাকাপয়সার দরকার?'

'দ্যাখো, অতটা স্বার্থপর আমাকে মনে কোরো না', হঠাৎ করেই ওর স্বর কেমন ঝাঁঝাল হয়ে ওঠে, 'তোমার টাকা-আতঙ্কের রোগ দেখা দিয়েছে। ভেব না, আমি তোমার কাছ থেকে টাকা না নিলে চলতে পারব না। প্রত্যেক মাসে তো আর নিই না।' কথা বলতে বলতে সিঁড়ি ধরে শ্লথ অবসন্ন নীচে নামতে থাকি।

'কী করবি, মাস্তানি?' বিশাল শাপলার চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে মানুষ... জট বেঁধে আছে রিকশা। চারদিকে বিক্ষিপ্ত করতালির শব্দ যেন।

'এ ছাড়াও অন্য পথ আছে', আরেফিন সহজ স্বরে বলে, 'আমাকে এত অকর্মণ্য ভাব কেন? ধুৎ, তোমার এখানে আসার আনন্দটাই মাটি।'

এবার আমার নিজেকে সামলে নেওয়ার পালা, 'বাদ দে। বল, প্রবলেমটা কী?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘প্রবলেম’, কী মনে হতেই হকচকিয়ে ওঠে সে। তারপর বলে, ‘তুমি হলে কেন গিয়েছিলে? আমি টেনশনে মরছি, অথচ দ্যাখো, তোমার কাছে এসে সেটা জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি।’ ওর মুখ লজ্জায় লাল, তার ওপরেই মনোরম হাসি ফুটে ওঠে।

‘আমি তো খেপেছি সে জন্যই। তুই সে প্রসঙ্গে না গিয়ে, এসেই...’। সামান্য হেঁটে বাসের জন্য স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াই, ‘বল তোর আসল সমস্যাটা কী? কাউকে বাগিয়ে নিয়ে আসিসনি তো?’

‘কী যে বল’, আরেফিন বাঁ হাতের চেটোয় বাচ্চা ছেলের মতো কপালের ঘাম মোছে, ‘আমি মরি পেটের ধান্ধায়...।’ ওর ঠিক এই ভঙ্গিটাই আমাকে ছেলেবেলায় টেনে নিয়ে যায়। পিঠাপিঠি দুজন। ওকে কাঁধে নিয়ে উবু হয়ে হাঁটছি আর ও হি-হি হাসতে হাসতে কিল বসাচ্ছে আমার ঘাড়ে আর মাথায়। হঠাৎ কী হয়... ঝপাৎ... ও হাত থেকে পড়ে যায় মেঝেতে। তারপর চিৎকার! আর আমি ভয়ে-আতঙ্কে দৌড়... দৌড়। অনেক রাত করে ফিরেছিলাম সেদিন। মাটির শাপলার ওপর কাক বসেছে। ‘হেই, হেস হেস’ শব্দে ওটাকে উড়িয়ে দিই।

‘বলো না, হলে কেন গিয়েছিলে?’ আরেফিন আবারও সেই একই প্রশ্ন করে।

‘কেন, তোর হলে আমি যেতে পারি না?’ কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটি।

‘সে তো পারোই। কিন্তু কখনও যাও না তো।’

হঠাৎ মনের ভেতরে ইরফান চাচার প্রসঙ্গ উথলে ওঠে! বলতে চাই ওকে। কিন্তু কী ভেবে চেপে যাই। জানি, প্রসঙ্গটা ও জানলেই গ্যাঞ্জাম বাধিয়ে বসবে। তাই ওকে জানাব না পলকে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ঝরঝরে হয়ে উঠি।

‘পাশ দিয়েই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কী মনে হল, ঢুকে গেলাম তোর হলে’, প্রসঙ্গটা পালটে ঝটপট বলি, ‘আচ্ছা, মেয়ে বলে আমি হঠাৎ করে কিছু করতে পারি না?’

এরই মধ্যে বাস এসে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড ভিড়। জানলা-দরজায় গিজগিজ করছে মানুষ। ধুৎ! আজ কুস্তোকুস্তি করে উঠতে ইচ্ছে করছে না। দাঁড়িয়েই থাকি। একটা মিছিল যায় স্লোগান দিতে দিতে। দুজন পেছনে সরে দাঁড়াই। আমার যুক্তি যে আমলে নিল না আরেফিন, সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল ওর মুখ দেখে। কিন্তু ঘাটাল না বেশি। বলল, ‘একটু পুরোনো ঢাকায় যাব। কাজের ধান্দা করছি। ফ্লাইং কিছু যদি করা যায়। ভার্সিটি জীবন শেষ করার আশা করতে করতে পিঠ দেয়ালে ঠেকে যাবে। সারাদিন শালার মিছিল-মিটিং। অবশ্য বিজনেসটার জন্য পুঁজি তো কিছু লাগবে’, ও ক্রমশ ধূসর-বিবর্ণ হয়ে উঠতে থাকে, ‘আসলে তুমি ঠিকই ধরেছ।’ এবার সে কেমন লজ্জা পায়, ‘সব তো তুমি পারবে না... কিছু যদি ম্যানেজ করতে পার।’

আমার ভেতরে হঠাৎ করেই দাপিয়ে আগুন জ্বলে ওঠে। ফুঁসে ওঠা সেই আগুনের শিখা যেন আমার দিকে শাঁ-শাঁ করে এগিয়ে আসতে থাকে। আর তার তাপে ঘামতে ঘামতে বলি, ‘আমি এক পয়সাও পারব না। কেমন কষ্ট করে চলি জেনেও যদি তুই... কষ্ট লাগে।’ মিছিলটা বাঁ দিকের পথে মোড় নেয়।

আমার উত্তর শুনে কেমন অসহায় ওঠে আরেফিন। বলে, ‘আমি জানি। কিন্তু এরকম বেকার অবস্থা আমার একদম অসহ্য হয়ে উঠেছে। টিউশনিটাও আজ চলে গেল।’

ওর কথা শুনে আঁতকে উঠি আমি। ভ্যাপসা গরম হাওয়ায় সাঁই সাঁই ধুলো উড়ছে। গা ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছে লোকজন। এর মধ্যে প্রচণ্ড ভিড়ের জন্য আরেকটা বাস মিস করি। অফিস শেষ। সবাই উদ্ভ্রান্তের মতো ঘরমুখো। আরেফিন না থাকলে এতক্ষণে যুদ্ধ করে আমিও উঠে যেতাম। কিন্তু পা দুটো কেমন যেন ভারী হয়ে আসছে। এসব প্রসঙ্গ আমাকে কেমন শিথিল আর অবশ করে দিতে থাকে। আমি এক-পা বাড়াতে চাইলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পেছন থেকে দু-পা টেনে ধরে কেউ, আমি এগোব কী করে? আমার মুখ দেখে আরেফিনই বলে, 'আমার জন্য কোনো চিন্তা কোরো না। ওরা বাচ্চাদেরকে বড়ো স্কুলে দেওয়ার ধান্দায় চড়া রেটে সেই স্কুলেরই এক টিচারকে রেখেছে। ভর্তির ইন্টারভিউয়ের সময় কোনো প্রবলেম যাতে না হয়, সে জন্যে।' না থেমে সে একনাগাড়ে বলে চলে, 'অবশ্য আমিও ধান্দা করছি। আরেকটা টিউশনির ব্যবস্থা হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। শালার এসব খুঁজে বের করাও এক ঝামেলা। জীবন যে কী ভয়ানক কঠিন হয়ে গেছে!' ওর কথার মাঝখানেই এবার আরেকটা বাস দেখে একলাফে আমি দরজার হ্যান্ডেল চেপে ধরি, 'তুই হতাশ হবি না, দেখি আমি কিছু টাকা ম্যানেজ করতে পারি কী না।' হাসতে-বাসতে হাত নাড়ে সে, 'আমি কাল বাসায় আসব।'

বাসায় এসে স্নান সেরে কুঁচি মরিচ-পেঁয়াজ দিয়ে যখন মুড়ি মাখাচ্ছি, তখন রহস্যময় ভঙ্গিতে শানু এসে আমার পাশে বসে। মুড়ি নিয়ে আমি আয়েশ করে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসি। তাকাই তার দিকে, এই এখন অদ্ভুত লাগছে ওকে। কথা না বলে শাড়িতে আঙুল জড়াতে থাকে। কিছু একটা বলার জন্য যেন উশখুশ করতে থাকে। আমার অনুমান মিথ্যে হয় না। নীরবতা ভেঙে এবার সে মনের কথা ঝপাৎ করে উগরে দিয়ে বলে, 'মনে হয় আমার খবর হয়ে গেছে।'

'মানে?' আমি বোকার মতো প্রশ্ন করি।

'আশ্চর্য, বুঝছ না?' যেন আমি তার স্বামী, না বোঝার ভান করে যেন মজা করছি। 'ন্যাকামো করছ! আচ্ছা তুমি ক-মাসের মাথায় টের পেয়েছিলে?'

এবার আমার পুরো শরীর থরথর করে কেঁপে ওঠে। কী অবলীলায় সবকিছু ভুলে গেছি। যখন মনে পড়ে, সমস্ত শরীর বেয়ে যেন বিষরক্ত নামে। ভুলে থাকার অভ্যাসকেও কী চমৎকার কৌশলে এরই মধ্যে আয়ত্ত করতে শিখে ফেলেছি! দু-দিন ধরে এত ভাবনা ভেবেছি! অথচ একবারও...। কেমন হতবিহ্বল তাকাই শানুর দিকে। এখন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু কেমন মিইয়ে যাচ্ছে মুড়িগুলো। সাদা দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে যাচ্ছে পিঠ। এত পুরোনো, ভেবে ভেবে এত কষ্ট পাওয়া এই অধ্যায়টি কিছুতেই আমার কাছে সহজ হয়ে ওঠে না। ছোট্ট একরত্তি একটা বাচ্চা... হাসপাতালের সাদা ছাদ কাঁপিয়ে তার চিৎকার... সেভলন... নার্স... থু থু... কান চেপে দৌড়োনো এবং সেই চিৎকারের ভয়াবহতা আমাকে ব্যাকুল, উন্মাদ করে তুলছে। হা আল্লাহ্, বন্ধ করো, বন্ধ করো, এই সব শব্দের মর্মান্তিক ক্রিয়া! বিশাল হাতুড়ি আমার মাথার ঘিলু দুমড়ে-মুচড়ে এক করে দিচ্ছে। এসবের মধ্যেই দু-ঠ্যাঙের ফোকর থেকে এ কী আজব চিজ টেনে বের করে আনলেন ডাক্তার, জন্মের পর থেকে আটান্ন দিন পেরিয়ে গেলেও যার চিৎকার থামে না? পতঙ্গের মতো আমি তখন দিকবিদিক ছুটছি— ফার্মেসি আর ওষুধ। রক্তাভ ঠোঁট গড়িয়ে অবিরল লালা ঝরছে। সবচেয়ে অসহ্য, টাকাকড়ির দুঃসহ টানাটানি। এ এক আজব চিজ যা নিয়ন্ত্রণ করছে মানুষের জন্ম আর মৃত্যু। তারই খোঁজে দিকবিদিক ছোটাছুটি। ধারকর্জ করতে করতে দেউলিয়া হওয়ার দশা। রেজাউলের মুখ বিবর্ণ, পাণ্ডুর। কিছু করতে পারছি না। ক্রমশ পিছোচ্ছি, পেছনে হা-হা শূন্যতা। এক সময় সবকিছু স্থির, নিশ্চুপ হয়ে যায়। নবজাতকের কান্না থেমে যায়। তারপর আমার দিশেহারা অবস্থা... আমি ঘরে, রাস্তায়, অফিসে সর্বত্র কান খাড়া করি,... যদি শোনা যায়... সেই চিৎকার, সেই কান্না? রাতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করি। আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে সেই চিৎকারের শব্দ, যার ভয়ে পালাতে চেয়েছিলাম। সেই শব্দ শোনার জন্য কত মাইলের পর মাইল বিনিদ্র রাত...।

'আমি দুঃখিত', আমার পালটে যাওয়া চেহারা দেখে নিজেকে সামলে নেয় শানু, সম্ভবত এতক্ষণে সে অনুভব করেছে তার গর্ভে সন্তান আসার প্রসঙ্গটা আমার সামনে তোলা তার উচিত হয়নি। আমি কি নিজেকে কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

সামাল দিতে শিখেছি? মুড়ি মুখে তুলে এবার প্রায় চেঁচিয়ে উঠি, সম্ভবত একটু জোরেই, 'সে কী, তলে তলে এতকিছু, আর আমি জানি না! কামালভাইকে বলেছ?'

শানুর উচ্ছ্বাস দেখবার মতো, ওকে তো ক-দিন ধরেই বলছি। আমার ডেট ওভার হয়ে যাচ্ছে, তবুও হচ্ছে না। নিয়মের বাইরে একদিনও যায় না আমার। আজ আটদিন পর ইলিশ মাছ খেয়ে বমি বমি...।

'ইলিশে অনেক সময় এমনিতেই বমি হয়।' বেচারিকে খামোকা হতাশ করি, মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, 'তোমার যেহেতু কখনও নিয়মের বাইরে যায় না, তাহলে হয়েই গেছে হয়তো। তুমি এক কাজ করো, ডাক্তারের কাছে যাও, টেস্টফেস্ট করিয়ে নিশ্চিত হওয়াই ভালো।'

রাতে অস্ফুট ফোঁপানো কান্না। অন্ধকারে উঠে বসি। সবে দু-চোখে ঘুম লেগে এসেছিল, ঠিক সেই সময় পৃথিবীর সবচেয়ে নাজুক এই শব্দ আমার তন্দ্রার ঘোর ছিন্নভিন্ন করে দেয় মুহূর্তে। অন্ধকার হাতড়ে বাতি জ্বালাই। সন্ধে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কামালভাই একগাদা কমলা আর আপেল হাতে নিয়ে হাজির হয়েছিল। ওদের পরিবারে এ এক অভাবিত ঘটনা। তাই শানুর উচ্ছ্বাস ছিল দেখবার মতো। ও আসলে অল্পতেই বর্তে যায়। এ আর কিছু নয়, নিজেকে ওর সবসময় ছোটো করে দেখার বোধ। নিজেকে ও অসুন্দরী মনে করে। অথচ ওর কালো মুখের চত্বরে কী অদ্ভুত গভীর দুটো চোখ। যত্নহীন হলেও চুলের এত মসৃণতা আমি খুব কমই দেখেছি। নাক একটু মোটা হলেও পাতলা ঠোঁটের সঙ্গে বেশ মানানসই। ওর শরীরও মন্দ না। শুধু কীসের সঙ্গে কী পরলে মানাবে, সেটা জানে না বলেই ওর সৌন্দর্য শেষ পর্যন্ত সম্পন্নতার স্পর্শ পায় না। এসব ধরার মতন চোখ কামালভাইয়েরও নেই।

না থাকুক। শানু তারপরও সুন্দর। নিজের শরীরের কালো রঙ নিয়ে আক্ষেপ করুক, মনে করুক নিজেকে কুৎসিত, যতই ভাবুক, গায়ের রঙ হলুদে-আলতায় মেশানো না হলে, তার আবার সৌন্দর্য কী, তাতে কিছু আসে যায় না। আমার চোখে তো শানু সুন্দর। অথচ কী অদ্ভুত ব্যাপার, ওর এই রকম আক্ষেপ স্বামী বেচারাকে পর্যন্ত স্পর্শ করেছে। শানুর রূপের ব্যাপারে স্বামীর অবশ্য গোড়া থেকেই কেমন একটা দোনোমনো ভাব ছিল। দুজন দুজনকে প্রথম দ্যাখে বিয়ের রাতে। শানুর ভাষ্য, স্বামী তাকে দেখে প্রথম দর্শনে ভীষণ হতাশ হয়েছিল। বলেছিল, 'ছবিতে তোমাকে এত কালো লাগেনি তো! ব্যাস, সেই রাত থেকেই ব্যাপারটা শানুর বুকে চেপে বসে।

'তোমরা বিয়ের রাতেই প্রথম দুজন দুজনকে দ্যাখো', আমি ওকে খোঁচা দেওয়ার জন্য অবাক হওয়ার ভান করি।

'তাছাড়া আর কী', শানুর বেশ অহংকারী গলা। 'তোমার মতো প্রেম করে বিয়ে করব নাকি?'

'ওরে বাব্বা, অপরিচিত একটা লোকের সাথে প্রথম রাতেই শুয়ে পড়লে?'

ও এবার খেপে যায়, 'তুমি মনে হয় অন্য গ্রহ থেকে এসেছ? যেটা পবিত্র, যেটা শুদ্ধ, তাকেই তুমি বাঁকা করে দেখছ, ব্যাপারটা কী বলো তো?'

'ওইসব কালোটালো বলেও কামাল ভাই তোমার সাথে ইয়ে করল?'

শানু হেসে ফেলে, 'পুরুষ মানুষ না! গন্ধ পেলে আর রং! সে তখন গন্ধে পাগল।'

'কেন? পারফিউম মেখেছিলে খুব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘বজ্জাতি কোরো না তো? নিজে যেন সারারাত বাতাস খেয়ে কাটিয়েছিলে। জেনে-শুনে বিয়ে করেও কত ঠেকাতে পারলে সংসার?’

‘তুমি যেভাবে সংসার ঠেকাচ্ছ’, আমিও খোঁচা দেই, ‘অমন করে কেউ জোড়া দিলে ভাঙা প্লেটও জোড়া লেগে যাবে।’ আমার জবাবের কী বুঝল না বুঝল, চুপ মেরে যায় শানু। আসলে ও কথায় খুব একটা প্যাঁচপোচের মধ্যে যেতে পারে না। তাই প্রসঙ্গটা আর বাড়াতে না দিয়ে কেবল বলে, ‘মেয়েদের অত জেদ ভালো না। জেদ সংসারের ক্ষতি করে।’

এই মহান যুক্তির পর তো আর কথা চলে না।

যা হোক, স্বাধীনতা পেয়ে স্বামী এখন প্রকাশ্যে তার সৌন্দর্যহীনতা সম্পর্কে নিরন্তর খোঁচা দিয়ে চলে। যেমন, ‘মাথায় ফুল গুঁজলেই কি রূপ বেড়ে যাবে? লিপস্টিক দিয়ো না, এমনিতেই কালো চামড়া, মুখে লালবাগের কেল্লা জ্বলবে।’ উপমার কী ছিরি! এ সব প্রশ্নের উত্তরে শানুর যুক্তি শুনলে গা জ্বলে যায়, ‘আমাকে তো আর আমি বানাইনি। আল্লা বানালে আমি কী করব?’

শানু আসলে ভীরু। ও-ওতো স্বামীর মুখের ওপর পালটা বলতে পারে, ‘আয়নাতে নিজেকে একটুখানি দেখোতো! খ্যাংড়াকাঠি, পাটশোলা কোথাকার! ভাঙা গালের নীচে তোবড়ানো থুঁতনি, এইটুকু মাথার দু-পাশে হাতির মতো বিশাল লটপটানো কান।’ তাহলেই তো স্বামীপ্রবর মুহূর্তে কোণঠাসা হয়ে যায়। তার মানে আমি কি চাই ওদের মধ্যে একটা অনিবার্য যুদ্ধ, যুদ্ধ শেষে বিপর্যয়? নীনা, পরাজয় তোমার রক্ত কণিকার কোথাও নেই? প্রতিদিন যুদ্ধ, এত বিপর্যয়। সব ছিন্ন করে এসেছ। তা-ও তা-ই চাও? কী নেশা এই যুদ্ধে... কী নেশা? আপস জানো না? আপস?

তো, এত আপেল হল, কমলা হল, বুড়ো বয়সে বিছানায় যাওয়ার সময় কাতুকুতু হল, বিছানার অশ্লীল শব্দ হল, বেরিয়ে বাথরুমে যাওয়া হল—এসবের মধ্যে কোনো বিপর্যয়ের কোনো শব্দ শুনিনি। এখন এমন করে কাঁদছে কেন শানু?

অবশ্য ওদের ব্যাপারই আলাদা। আমি হিসেব মেলাতে গিয়ে তল পাই না। এর মধ্যে একদিন রাতে ওদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া। ভীষণ ক্ষিপ্ত শানু সমান তালে চালিয়েছিল স্বামীর সাথে, ‘তোমার চরিত্র জানি না? অসভ্য, শুয়োর...।’ ‘বেশ্যামাগি, হারামজাদি’—কামালভাইয়েরও অস্পষ্ট হিস হিস ভেসে আসছিল।

তার উত্তরে ঝপাৎ! কী একটা কাচের জিনিস পড়ল মেঝেতে! এই রকম ঘটনার মুখে তৃতীয় কারো যা হয়, আমারও তা-ই হয়েছিল। কেমন বর্ণনাতীত একটা অস্বস্তি, অজানা একটা ভয় আর শঙ্কা! বিছানার সাথে সেঁটে ছিলাম। মনের গহনে তখন ব্যর্থ গুনগুন—কিশোরী বউ যায়... ভেতরে শানুর ঝাঁঝালো স্বর, ‘যা, যা বেশ্যাদের দালালিই কর গিয়ে। দুই পয়সার মুরোদ নেই’... ইত্যাদি ইত্যাদি। আয় ঘুম আয়—বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করি... ধান ভানলে চিড়ে দেব, রাজকন্যার নূপুর দেব, মায়ের কানের দুল দেব...।

হঠাৎ চিৎকার—‘মেরে ফেললরে—বাবারে।’ শানুর চিৎকারে ছিটকে দাঁড়াই। দৌড়োতে গিয়ে টের পাই ভারী পা মাটির সাথে সেঁটে যাচ্ছে। এইরকম ব্যক্তিগত যুদ্ধে যাওয়া কি ঠিক হবে? ভীষণ অসহায় বোধ করি। আবার চলে আসি বিছানায়। তারপর সব চুপ। বুক ঠান্ডা হয়ে আসে, মরে গেল নাকি?

কিন্তু তারপরই সেই চিরাচরিত পুরোনো ভঙ্গিতে শানুর অবিশ্রান্ত কান্নার দমক। লম্বা করে নিশ্বাস টেনে বিছানা আঁকড়ে ঘুমিয়ে যাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

সকালবেলা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। খুব ভোরে স্নান শেষ করা শানুর কী পবিত্র মুখ! টাওয়েল দিয়ে চুল ঘষছে। আমি জেগে আছি দেখে কাছে এল। সহজ করে বলল, 'রাতে খুব, মানে ইয়ে ফিল করেছ?' বিন্দু বিন্দু জল-ফোঁটা ওর চেহারাকে নরম করে তুলেছে। ওর সামনে নিজেকে সহজ করে তুলতে চাই, 'না না তাতে কী, এত হতেই পারে।' টাওয়েল দিয়ে তেমনি চুল ঘষতে ঘষতে শানু আবার নিজের ঘরে। 'এই ওঠো না, ঘুমের কী পাগলরে বাবা...।' ঘৃণায় বিষিয়ে উঠি। এরা মানুষ! এদের ভেতর থেকে কি মনের মৃত্যু ঘটেছে? মানুষ অভ্যাস দিয়ে সুখী হতে পারে? পরক্ষণেই নিজেকে সামলে উঠতে চাই, সবাইকে নিজের মতো মনে করছি কেন? এক জোড়া দেহের উত্তাপ যদি দুর্বিষহ মনের ক্লেশ মুহূর্তে মুছে দিতে পারে, আমার তাতে অসহ্য লাগার কী আছে?

কিন্তু আজকের কান্নাটা অন্যরকম। কামাল ভাইয়ের কথা শোনা যাচ্ছে না। কী এমন ঘটল যে অঝোরে কাঁদছে শানু? বিছানায় শুয়ে বই হাতে নিই। বাতি জ্বালানোই থাকে। শিবনারায়ণ রায়ের 'স্রোতের বিরুদ্ধে'। এর মধ্যে 'নাস্তিকতার ধর্ম জিজ্ঞাসা' শিরোনামের একটা প্রবন্ধ বেশ কিছুদিন আগেই সত্যজিৎ পড়তে বলেছিল। নানান অসুবিধায় এক পৃষ্ঠার বেশি এগোয়নি। সেই প্রবন্ধটারই ভাব ও ভাষার ঘূর্ণির মধ্যে ঘুরি—আচ্ছা, আমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি? কী জানি, বেশি দূর হেঁটে গেলে তাঁকে খুঁজে পাই না। মাঝে মাঝে যখন রেললাইন ধরে হাঁটতাম, তখনও বিয়ে হয়নি, দেখতাম, দূরে একটা ছায়া দাঁড়িয়ে আছে। নীলিমায় মিশে থাকা আবছা কুয়াশার মতো। তারপর এই যে দিন যাচ্ছে... এইসব দিনে আমার বিশ্বাসের গভীরে ঈশ্বর কোথায়? কোথায় সেই রেললাইন? ছুটতে ছুটতে অনেক দূর যাব। দেখব কি তখনও সেই ছায়া দূরে ঝাঁকড়া বটগাছের মতো দাঁড়ানো? অথবা সেখানে আদৌ ওরকম কিছু নেই? আমি সময়ের সাথে সাথে সেই রেল লাইন, সেই ছুটে যাওয়া, সেই ছায়াকে খুইয়ে ফেলিনি? কী জানি। আমি কি আমার সব জানি? আশ্চর্য! ক-দিন বেশ ভুলে ছিলাম। আজ হঠাৎ বইয়ের পৃষ্ঠায় আমার সন্তান হামাগুড়ি দিয়ে ওঠে। সবগুলো অক্ষর ধুয়ে-মুছে গিয়ে রূপান্তরিত হয় একটি শিশুর আকৃতিতে। সেই শিশু হলুদ শরীরে কেঁপে-কেঁপে ওঠে। মাড়ি দিয়ে চেপে ধরে স্তনের বোঁটা। ছাড়িয়ে নিলেই অবিশ্রান্ত চিৎকারে চরাচর কাঁপিয়ে তোলে।

আমি ফিরে যাই সেই জীবনে। আমার শরীরের রস কচলে ভেসে ওঠে সেই দৃশ্য। আমার বুকে মুখ ঢুকিয়ে ও যেন রাজ্যির যন্ত্রণা ভুলে থাকতে চাইত। স্তনের গভীরে যেন দুধ নয়, বিষ-মেশানো রক্ত তার কোষে কোষে। ছাড়িয়ে নিলেই সেই চিৎকার! কাত হয়ে থাকতে থাকতে গা ব্যথা হয়ে যেত আমার। এইসব যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্য রেজাউলকে তার বন্ধুরা টেনে নিয়ে যেত বাইরে...। মনে আছে জিনের গ্লাসে একরাত তারা তাকে ডুবিয়ে রেখেছিল। সেদিন ওসব ছাইপাঁশ গিলে তার সে কী ঘোর-লাগা দশা! টলতে টলতে শিশুটির ওপর হামলে পড়েছিল। 'এ আমার জীবনে শনি হয়ে আসছে, মৃত্যু হয়ে আসছে। আহ্, দমবন্ধ হয়ে মরে যাব।' আর আমি? পৃথিবীর কোন নেশায় ডুবলে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, ভেবে পাই না। ফিসফিস করে ওর নরম শরীর ভিজিয়ে বলতাম, 'ঘুমোও... সোনা ঘুমোও ।'

ঘুমোলেই স্বপ্ন দেখি আমি। বিজ্ঞানের ভাষায়, ঘুমের গাঢ়তা নেই। ঘুমের পর কি অপদেবতা আমাকে তাড়া করে? তবে যে স্বপ্নে বাবাকে খাড়া বটগাছে হনুমানের মতো ঝুলতে দেখলাম? উদ্বাহু সুদূর শূন্যে ঝুলছেন। সে কী অট্টহাসি তাঁর। ঘুম ভেঙে যায়। আগ্নেয়গিরির লাভার মতন হিংস্র জিব আমাকে পেঁচিয়ে ধরে। স্বপ্নের কত ধরন! বেশির ভাগ সময়ই জেগে থাকি। সারারাত পার করে দিই কাজলরেখার মতো রাজপুত্রের বিষসুচ ওঠাতে-ওঠাতে। সমস্ত সুচ ওঠানোর পর তার চোখের দুটো বাকি রেখে আমি স্নানে গিয়েছি, রাজপুত্র চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

মেলে যদি এই অপরিচ্ছন্ন কুৎসিত রূপ দেখে? এসে দেখি, শুধু চোখের সুচ খুলে দিয়ে ভিন্ন এক নারী রাজপুত্রের প্রণয়ী হয়ে গেছে। আমার হৃৎপিণ্ডের অলীক চিহ্ন তার আর দৃষ্টিগোচর হয় না। আঙুলের ফাঁক গলিয়ে আমার হাড্ডি হিম-করা প্রহর কাটে। কত কী যে মনে পড়ে! আমার বর্তমান জীবনের রূঢ় বাস্তবতা কুয়াশার মতন ঢেকে রাখে আমার শৈশব, প্রথম যৌবন। এত বেশি স্মৃতিকাতর আমি, সত্যজিৎ বলে, 'দুঃখ বিলাসী!' বিলাস! বড্ডো মিষ্টি শব্দ। একদিন জিভ দিয়ে ছুঁয়ে দেখা যেত? যৌবনের শুরুতে একজনের প্রেমে পড়েছিলাম। আমার জীবনে সে এক অলৌকিক সময় এসেছিল। ছেলেটা ছবি আঁকত... ইচ্ছে ছিল, সে হবে আমার পান্থপাদপ। প্রবল প্রেমতাড়িত হলে আমার দু-ঠোঁটে বিষ জমা হয়। আমি ছোবল দিয়ে দিয়ে সেই বিষ-মেশানো প্রেম ঢেলে দিতে চাই। কিন্তু সেই বিষ সহ্য করার ক্ষমতা কি একজনেরও ছিল? যাকে পান্থপাদপের মতো দেখতে চেয়েছিলাম, সে আমার দিকে একবারও ফিরে পর্যন্ত দেখেছিল? বিষ জমা হওয়ার সুযোগ কোথায়? তাকে বাস্তবের চেয়ে স্বপ্নেই পেতাম বেশি। সেই স্বপ্নও ছিল ফিনফিনে কবিতার মতো। একরাতে স্বপ্নে দেখি, কী এক ঘোরে সে বলে যাচ্ছে, 'এই নাও আমার অস্তিত্ব, বসাও কামড়, টানো রক্ত তোমার লকলকে ডাইনির জিব দিয়ে? শীর্ণ খাঁচার আগুনের এই স্রোত তুমুল হিংস্রতায় ফেনিয়ে তোলো। এর স্বাদ কখনো তুমি ভুলবে না। তোমার ঠোঁট থেকে মুছবে না এর দগদগে রং।' ঘুম ভাঙার পর কবিতার মতো, গানের মতো, সেসব উচ্চারণ আমার চারপাশ ছায়া করে ঘুরেছে। বাস্তবের পুরুষ আমার জীবনে তখন এভাবেই স্বপ্নে আসত, দাঁড়াত পান্থপাদপের মতো। আমি ছুরি চালাতাম রক্তের প্রত্যাশায়, সে দিত জল... শুধুই জল। কিন্তু মহিম, কী করে অস্বীকার করি, আমার যৌবনকে সে জাগিয়ে তোলেনি? লাইব্রেরির বইয়ের স্তূপে তার অজস্র চুম্বন... নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না... হাঁ করলেই... বই শুধু আর বই... কী করে অস্বীকার করি সেই স্পন্দন? চারপাশে বই সাক্ষী, তার দৃঢ় স্বীকারোক্তি, 'তোমার স্পর্শ আমার ঘুমন্ত সত্তাকে জাগিয়েছে, আমাকে পুরুষ করে তুলেছে। নীনা, তোমার কাছে আমার অপরিসীম ঋণ।' কী করে উড়িয়ে দিই মহিমকে? এইভাবে তখন আমার স্বপ্ন আর বাস্তব এক হয়ে যেত। এইসব ভাবতে ভাবতে মাঝরাতে ছটফট করে উঠি। বাতি নিভিয়ে নিজেকে বিছানায় চেপে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি।

ঘুম ভাঙে খুব ভোরে। জানালা দিয়ে ধবধবে বেড়ালের মতো আলো হামাগুড়ি দেয়। ছাদের ওপর দিয়ে খটখট উড়ে যায় হেলিকপ্টার। সারাটা শরীর শিরশির করছে। কী বিদঘুটে রোমাঞ্চকর স্বপ্ন! আমাকে প্রবল আদরে কেউ জাগাতে চাইছে। দীর্ঘদিন পর শরীরে এক ধরনের তৃষ্ণা অনুভব করি। চুলের গোড়া খামচে ধরি। কে সেই পুরুষ? প্রবল কুয়াশায় ডুবতে ডুবতে আবার ভেসে উঠি। বিবর্ণ চাঁদের আলো অবিশ্রান্ত খুলে যাচ্ছিল আমার শরীরের ভাঁজের পর ভাঁজে। চাঁদের সেই আলো ছায়া করে উদোম রেজাউলের বীভৎস শরীর টানটান দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি শিশিরের মতো ক্রমাগত বাতাসে মিশে যেতে থাকি।

দরজা খুলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। আকাশে কুঁচবরণ কন্যার মেঘবরণ কেশ উড়ছে। ভেজা বাতাসের নরম হাতছানি। চারপাশে ফসফরাসের ফিনকি তোলা আলো। ধমনিতে ছেঁড়াখোড়া শীতের ছায়া। পাশের বিল্ডিং-এর ছাদে নিমের ডাল দিয়ে দাঁত খিলান করছে একজন লোক। হারমোনিয়ামের সুর তুলে সা-রে-গা-মা সেধে চলেছে দূরের কোনো এক কিশোরী। বস্তির মধ্যে ঢং ঢং টিন-পেটানোর শব্দ। সব ছাপিয়ে আলটপকা আমার মগজে অন্য তরঙ্গ বয়ে যায়, বেহুলা লখিন্দরের বাসরঘরের কোনো ফোকর দিয়ে সাপ ঢুকেছিল? আমার বাসর ঘরেও কি তেমন কোনো ছিদ্র ছিল? কী যে ভাবছি আমি!

হেইট!

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠি। জানা হল না, শানু কেন রাত ভর এত কেঁদেছে। কামালভাই বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে সে বিছানায়। নিজেকে গুছিয়ে এক সময় আমিও অফিসে। এরপর রোজকার সেই রুটিন—টাইপ, ফাইল, বসের গম্ভীর মুখ, সহকর্মীদের পারিবারিক কাসুন্দি আর বলবেন না, মাত্র এক মার্কের জন্য আমার ভাইঝিটা স্ট্যান্ড করল না, কি একটা বিয়া করলাম দাদা, বারো মাস বউয়ের ব্যারাম লাইগ্যা থাকে, সকালে ভাই নাস্তা হয়নি। গিন্নির সাথে হেভি ফাইট, অফিসে আসার সময় কোনোদিন চিরুনি খুঁজে পাই না, কবে হরতাল? সাতাশ তারিখ? হে হে মন্দ না, একটা দিন রেস্ট, পোলার ফরম ফিলাপের টাকা দিয়ে এ-মাসে আমি ফিনিশ, শুকনো রুটি খেয়ে সারাটা রাত খালি পেট মোচড়ায়, খাঁটি কথা দাদা... এ ভাবে বাঁচা যায়, কে? মিসেস গুপ্ত? হ্যাঁ-হ্যাঁ ওর সাথে আমিও তো তাকে একদিন দেখলাম চাইনিজ রেস্টুরেন্টে, ছি ছি আরে থু, কী যে কন ভাই, দেশে শালার হরতাল-মিছিল ল্যাইগ্যাই রইছে, ধুৎ, একটা কলমেও যদি কালি থাকত, ছোটোভাইয়ের কাছে গেছিলাম টাকার লাইগ্যা, হের বউ যা করল! অ্যার চাইতে জুতাপেটা করলেই ভালো হইত, কী দেশ ভাই, দশ টাকার জিনিস ধাম কইরা আঠারো টাকা হইয়া যায়, কারো কোনো প্রতিবাদ নাই, সব মাগির পুত দালাল!

এত সব কোরাস ছাপিয়ে আমার কান এবার সতর্ক হয়ে ওঠে। একজন গলার স্বর নিচু করে বলে, 'আমাগো বসই হইল গিয়া এক নম্বরের দালাল। মালিকের কাছ থাইক্যা নিশ্চয়ই কমিশন পায়। বসুন্ধরায় প্লট কিনছে।'

কথাটা আর মাটিতে পড়ে না। সবাই সমস্বরে প্রশ্ন করে ওঠে, 'সত্যি?'

এবার একক ঝাঁকালো স্বর, 'হ্যায় কি একলা দালাল? অফিসের অনেকেই দালাল। টের পাওয়া যায় না।'

কিন্তু আজ এইসব পুরোনো কাসুন্দির ফাঁক গলিয়ে অকস্মাৎ পত্রিকার হেডলাইনে সাদ্দাম হোসেন কুয়েত দখল করে বসে।

অফিসে মহা হুলুস্থুল। তপ্ত সংলাপ বিনিময়। এর মাঝখানে আমার ঠান্ডা চোখ প্রতিদিনের অভ্যাসে হেডলাইনের পথ ধরে হাঁটে। কুয়েত সীমান্তে ইরাকের সৈন্য সমাবেশ। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ। এ ব্যাপারটার গুরুত্ব আমি সহজেই বুঝে উঠতে পারি না। কেউ চিৎকার করে ওঠে, 'মার্কিনের অত মাথা ব্যান্দা ক্যান... যা হোক... আমি নির্বিকার ছাপোষা মানুষ, সমস্ত কেওয়াস থেকে সন্তর্পণে গা বাঁচিয়ে অফিস শেষে আলটপকা বেরিয়ে আসি। ভিড় ঠেলে বাসে উঠি। ভ্যাপসা গন্ধ-ছাওয়া পথ, অন্ধকার গলি ধরে ধরে দরজায়। বাসায় এসে শুনি, কী বিশেষ দরকারে সত্যজিৎ আমাকে খুঁজে গেছে। তার আবার বিশেষ দরকার কী? ভাবতে ভাবতে শাড়ি পালটে বাথরুমে। শানুর মুখ থমথমে। আমি সন্তর্পণে ওর দিকে তাকাই শুধু। কিন্তু প্রশ্ন করি না। কী হয়েছে ও নিজের থেকেই বলুক। শাওয়ার উপচে জল পড়ছে। আজ বেশ ক-দিন পর অন্ধকার সরু বাথরুমটা জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে। ধুমসে গা চোবাই। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে থাকা তেতো ঘাম, জমাট ধুলোর জট খুলে যেতে থাকে। আহ্ শান্তি। ঘুম নামছে চোখে।

বেরিয়ে চুলে তোয়ালে জড়াচ্ছি, শানু প্রায় কেঁদে ফেলে, 'গতরাতে বাথরুমে গিয়ে দেখি রক্ত। যা ভেবেছিলাম ভুল। ভীষণ কষ্ট পেয়েছে তোমার কামাল ভাই। বলো আমি কী করব'... গলা রুদ্ধ হয়ে আসে তার।

মন খারাপ হয়ে যায় আমারও। বিছানায় টেনে বসিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেই। 'এ মাসে হয়নি, পরের মাসে হবে। তোমরা এত ঘাবড়ে যাও! পনেরো বছর পেরুনোর পরও কতজনের হতে দেখেছি।' ভেতরে দুর্বল থাকলে মানুষ সহজ সান্ত্বনা বড্ড দ্রুত লুফে নেয়। আগ্রহী গলায় জিগ্যেস করে, 'তুমি নিজে দেখছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘আমার এক খালারই হয়েছে’, স্রেফ মিথ্যে ঝেড়ে দিলাম, ‘দশ বছর পর হয়েছে।’

শানুর চোখ ঝলসে ওঠে, ‘কথাটা তুমি তোমার কামালভাইকে বোলো।’

ও চলে গেলে আমি আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসি। সত্যজিৎ আমাকে কেন খুঁজছে! আরেফিনটাও আসবে বলে এল না। তার ঠিক কত টাকা দরকার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। আমি এ মাসে সুলতানার কাছ থেকে দুশো টাকা লোন নিয়েছি। বেতন থেকে ওকে কিছু দেওয়া সম্ভব না। আচ্ছা, সত্যজিতের কাছে চাইলে কিছু লোন পাওয়া যাবে না? কিছু একটা শুরু করে জোড়াতালি দিয়েও যদি দাঁড়াতে পারে আরেফিন! আজকালকার ছেলেরা চালাক আছে। দেখা যাবে উড়তে উড়তেই শেষ পর্যন্ত বসার একটা জায়গা করে নিয়েছে।

এভাবে ক্রমশ আমার ফেলে আসা শহরের সামনে দাঁড়াই। রানুর মুখ মনে পড়ে। ওর ক্রম পতনের খবর পাই। হাত-পা অসাড় হয়ে আসে। কখনও ক্রোধ জমে ভেতরে। সবচেয়ে ছোটোটা মন্টু, হারিকেনের আঁকা-বাঁকা আলোর সামনে বই নিয়ে ঝিমোয়। এই বিংশ শতাব্দীর শেষেও ও-বাড়িতে হারিকেনের রহস্যময় ছায়া খেলা করে। বিল আটকে থাকায় তিনমাস আগে কারেন্টের লাইন কেটে দিয়েছে। আমি আসলে আমাদের পুরো পরিবারটার ওপর এত ক্ষিপ্ত কেন? নিজেকে বিশ্লেষণ করি, কিন্তু করলে কী হবে, ওদের সাহায্য করার আমার সামর্থ্য কোথায়? তাদের দুর্বিপাকের সমান্তরালে চলেছে আমার অক্ষমতা। কষ্ট থেকে রেহাই পাবার জন্যই কি ঘৃণা? ক্ষিপ্ততা? না, বাড়ি নিয়ে আর ভাবব না। রানু আমার রক্ত জল করে-দেওয়া-একটা অধ্যায়। এখন আমি সেই অধ্যায়ের প্রতিটি অক্ষর ভুলতে চাই। ম্যাগাজিন ওলটাতেই দেখি একটি শিশুর ছবি... আমি কোথায় যাব? মাথার দুটো শিরা চেপে ভাবি, সত্যজিৎ আমাকে খুঁজছে কেন?

এভাবে আরও একটা হপ্তা কেটে যায়। ঠিক দ্বিতীয় হপ্তার মাথায় এমন একটা অভাবিত ঘটনা ঘটে, যার ধাক্কায় আমার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আমার একাকার নিস্তরঙ্গ সময়ে যোগ হয় অদ্ভুত এক স্পন্দন। নিজেকে ভীষণ মূল্যবান মনে হয় আমার। এই ঘটনার আগে অবশ্য সত্যজিতের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তার কনফেকশনারির সামনে যেতেই বলল, ‘একটু দাঁড়া। হাতের কাজটা সেরে নিই।’ বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। অফিস থেকে সরাসরি তার ওখানে যাওয়ার পর সন্ধ্যা নেমে আসছিল। সামনে একটা চমৎকার ভেসপা। খুশি গলায় ও বলল, ‘এটা কিনেছি।’ পশ্চিমের আকাশ অসাড় করে দিয়ে রাত্তির নামতে চাইছে। আমি চঞ্চল হয়ে উঠি, ‘তুই কি শুধু এই খবরটা জানানোর জন্যই বাসায় গিয়েছিলি?’

‘আমাকে তুই ছোটোলোক মনে করিস নাকি?’ তেতে ওঠে সত্যজিৎ। নিজেই আবার বিচলিত মুখে উশকো চুলে আঙুল ঢোকায়, ‘অবশ্য মোটর সাইকেলটা কিনে খুব অস্বস্তি হচ্ছে। রঞ্জুর এই বিপর্যয়ের সময়...।’

‘কারো জন্য কারো জীবন আটকে থাকে না’, শাশ্বত বাক্যটি উচ্চারণ করি... সেই শাশ্বত কথাটা। তারপর জিজ্ঞেস করি, ‘রঞ্জু এখন কেমন আছে?’

‘বাপের প্যাদানি খাচ্ছে। সালাহিদনের ওখানে ঘনঘন গাঁজার আসর বসছে।’

তোদের এই ভণ্ডামি দেখলে গা জ্বলে যায়। তোরা আসলে একেকটা মেনি বেড়ালেরও অধম।

সত্যজিৎ ঠেলে-ঠেলে অনেক দূর নিয়ে এসেছে মোটর সাইকেল। বলল, ‘তুই কি আমার পেছনে বসবি? নাকি জাত যাবে?’

‘আমার অত সস্তা শুচিবাই নেই’, হেসে বলি, ‘কিন্তু আমি ঠিক বুঝছি না, ভেসপায় চড়ে কোথায় যাব?’

‘তুই আবার ভেবে বসিস না আমি কোনো সস্তা সুযোগ নিতে চাইছি। তোর জীবনটা তো পাঁকে পড়ে দুর্গন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ছড়াচ্ছে, দুজনেরই ভালো লাগবে। অবশ্য তুই যদি অস্বস্তি বোধ করিস...।'

'দেখ সত্যজিৎ, আগেইতো বলেছি আমার কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু এই শহরটা খুব ছোটো। ফলে মানুষের মনও বিশাল নয়।'

'তোর কে আছে? কাকে তুই কেয়ার করিস? তুই তোর আত্মাকে বিশ্বাস করিস না? তার কাছে সৎ থাকলেই হল।' সত্যজিৎ স্টার্ট দেয়।

উড়ে যায় ভেসপা। আহ্, হিসেবের বাইরে একটা দিন! ধীরে ধীরে রাতের শহর জেগে উঠেছে। হু-হু বাতাস আমার আঁচল শূন্যে উড়িয়ে নিচ্ছে। বাতাসের তোড়ে সত্যজিতের স্বর কাঁপছে, 'কী বলছিলি, ভণ্ডামি? একজন মানুষের এত বড়ো একটা ক্ষতি আর তুই তাকে ছোটো করে দেখছিস? রঞ্জুর অবস্থাটা তুই বুঝছিস না?' বিশাল আলোময় জগৎ সংকীর্ণ করে দিয়ে ভেসপা ছুটছে। এ এক অপূর্ব অনুভূতি। এরকম সুখ আর কোনোদিন পেয়েছি? রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে স্নায়ুতন্ত্র। তারপরও কথা বলতেই হয়। বাতাসের তোড় সামলে তাই বলি, 'গাঁজা খেলে এর সমাধান হবে? ত্রিশ ক্রস করেছিস। এই বয়সে ফ্রাস্টেশনের এই নমুনা মানায়? কান্দুপট্টিতে যেতে বলিস ওকে, যা করছে, তার পরের স্টেজ ওটাই।'

বাতাসের ধাক্কায় নিজের কানেই অস্পষ্ট শোনায় নিজের স্বর। ফুটপাত, ল্যাম্পপোস্ট, ট্রাফিক বাতি দ্রুত পেছনে ফেলে এক সময় ক্রিসেন্ট লেকের কাছে এসে সত্যজিৎ থামে। বিস্তৃত ধু-ধু সিঁড়ি। তার ওপারে জলের সিলকি চুল। স্রোতের তরঙ্গে সেই চুল কত রহস্যে যে পাক খাচ্ছে! 'এই জায়গাটা সন্ধ্যায় খুব রিস্কি, আমি বলি, 'পুলিশ বাজে সন্দেহ করে ধরে নিয়ে যায়। তাছাড়া চুরি-ছিনতাইও কম হয় না।'

'তোর অভিজ্ঞতা আছে মনে হচ্ছে। কার সাথে এসেছিলি?'

'সেই কৈফিয়ত আমি তোকে দিতে যাব কেন? এসে ভালো লাগছে না।'

'স্বতঃস্ফূর্ততা কী জিনিস, সে তুই জীবনেও বুঝবি না, অস্বস্তির জন্যই তোর খারাপ লাগছে। আমরা শুধু এই পথটা ধরে হাঁটব', বলে সে আগের প্রসঙ্গেই ঘুরপাক থেকে থাকে, 'কী বলছিলি, কান্দুপট্টি? তুই গাঁজা খাওয়াটাকে ওরকম বাঁকা চোখে কেন দেখিস বলতো?'

'সহজভাবে কোনো কিছু কেউ খেলে আমার আপত্তি নেই', আমি বলি, 'কিন্তু একটা কিছুতে ফ্লপ খেয়ে... বাংলা হিরো আর কী!' কথাগুলো একটানা বলছিলাম কোনো গভীরতা থেকে নয়। মনে প্রাণে চেপে-বসা কোনো অসাড় বোধ থেকে নয়, একটা কিছু বলা দরকার, ঠিক সে জন্যই।

দু-পাশে গাছ। সুপরিসর তকতকে পথ। সোডিয়ামের কাঁপা কাঁপা আলো। হু হু জলের বাতাস। আমার ঘুম পাচ্ছে। আসলে এসব কথা বলতেই কি আমি এখানে এসেছি? ওর গা ঘেঁষে হাঁটি। মোটর সাইকেল ঠেলে এগোচ্ছে সত্যজিৎ। এই আলো, এই হাওয়া ওকে অচেনা, চমৎকার করে তুলছে। উসকো চুল বাতাসে উড়ছে। ওর চোখ, খোঁচা দাড়ির নীচে ফর্সা গাল, বাঁ হাতে অদ্ভুত কায়দায় সিগ্রেট ধরানো... এই সত্যজিৎকে আমি চিনি? ঘুম ঘুম দৃষ্টি মেলে দিই সামনের দিকে। ঝাউগাছের ঝিরঝির হাওয়া... অদ্ভুত মাদকতা...। ও যদি আমাকে জড়িয়ে ধরে? হঠাৎ কেমন থির থির কেঁপে ওঠে শরীর। ও যদি আমার হাতটা একটু স্পর্শ করত?

'তোর সাথে রেজাউল দেখা করতে চায়', সত্যজিৎ আচমকা বলে। মনে হল সিরিয়াস কোনো কিছু নিয়ে কথা বলবে।

আবার কেঁপে উঠি। পরক্ষণেই সরিয়ে দিই সেই হাওয়া... আজ থাক। দীর্ঘদিন পর এমন একটা সন্ধ্যা, এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

রুটলেস পথচলা... থাক। সত্যজিৎ আমার হাত স্পর্শ করলে কী করব? এই অদ্ভুত নিসর্গ আমার সব ভাঁজ খুলে দেবে না তো?

'কিছু বলছিস?' সত্যজিৎ সিগ্রেটের আদ্ধেকটাই দূরে ছুঁড়ে দেয়। 'তোর সাথে কোথায় দেখা হয়েছে ওর?' নিজেকে গভীর গহ্বর থেকে ওপরে টেনে ওঠাই। 'বারে, আমার বেকারি ও চেনে না?' সত্যজিৎ সতর্ক করে দিয়ে বলে, 'তুই বিষয়টাকে গুরুত্বই দিচ্ছিস না!'

আমি ঠাট্টা-মেশানো স্বরে বলি, 'গুরুত্ব দেওয়ার মতো নতুন কিছু বলেছে নাকি?'

'খুব বাজে অবস্থায় আছে মনে হচ্ছে। ইন্সুরেন্সের চাকরিটা চলে গেছে। কোনো এক ফার্মে ঢুকেছে। সেখানেও সুবিধে করতে পারছে না। আমার সাথে পার্টনারশিপে বিজনেস করতে চাইল। যা হোক একটা কিছু করতে চায়।'

'টাকা কোথায় পাবে?' হঠাৎ বোকার মতো প্রশ্ন করে বসি।

'সেসব কিছু বলেনি। বলেছে তোকে দরকার। কিন্তু ওর বাজে অবস্থার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, সেটা অন্তত আমি সাফ সাফ বুঝেছি।'

'আমাকে দরকার! কেন?' প্রশ্ন করে কেমন থিতিয়ে আসতে থাকি। সত্যজিৎ হারামজাদা, এই চমৎকার জায়গায় এনে এমন একটা অধ্যায় না তুললে কি ওর হত না! নাহ্, জীবনেও আমার স্বস্তি হবে না। আমি জানি, এই অদ্ভুত সম্মোহনময় সন্ধ্যাটা দলামোচড়া করে আমরা এখন নোংরা করে তুলব। প্রসঙ্গটাই এমন, এ নিয়ে কথা বলে সুন্দর কোনো পরিণামে পৌঁছুনো অসম্ভব। সেই পরিস্থিতির জন্যই নিজেকে ক্রমশ প্রস্তুত করে বলি, 'তুই ওকে কিছু বলেছিস?'

'বলেছি কাল পাঁচটার পর সালাহিদনের বাসায় আসতে, তোকে আমি নিয়ে যাব।'

আমার সমস্ত চামড়া টানটান হয়ে ওঠে, 'সালাহদিনের বাসা ও চেনে?'

'গোয়েন্দাগিরি করছিস কেন? আমি ঠিকানা দিয়েছি।'

'সত্যজিৎ, তুই ওকে কথা দেবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলি?' আমার উত্তেজনা ফেটে পড়তে চায়, 'আমি কি খেলনা? হাতের মুঠোয় ভরে নিয়ে যাবি।'

'দেখ', সত্যজিৎ বলে, 'আমার বিশ্বাস থেকে ওকে কথা দিয়েছি। আমি যতদূর জানি তুই অত রক্ষণশীল না। যার সঙ্গে এতদিন কাটালি, ডির্ভোস হয়েছে বলে তার একটা কথা শুনতেও এখন তোর এত আপত্তি?'

তারপর কিছুক্ষণ নীরবতা। চারপাশে চকমকে আলো রাত্তিরকে সাদা করে তুলেছে। সোডিয়াম বাতির এলাকা পেরিয়ে এসেছি। কেমন ভয় ভয় করছে এখন। শিরশিরে অনুভূতিতে শরীর কাঁপছে। এতক্ষণ মোহগ্রস্ততায় ভয় উবে গিয়েছিল। শানুকে আর কী বলব, আমি নিজেই কি অল্পতেই বর্তে যাই না? আমার কি কোনো ব্যক্তিত্ব আছে? স্বপ্ন-মেশানো মিষ্টি দুটো কথা বলে কেউ আমাকে চাঁদের আলোয় শুইয়ে দিলে পরক্ষণেই ভাঁজ খুলে দেব না? অসহ্য লাগছে, যন্ত্রণা হচ্ছে, সব ছাপিয়ে সেই নাজুক প্রসঙ্গেই আবার ফিরে আসতে হয়, 'সে আমাদের বিয়ে-বিচ্ছেদ নিয়ে নতুন কোনো কাসুন্দি ঘেঁটেছে?'

'হ্যাঁ। তবে ও-কথা আমি বলতে চাই না।' সত্যজিৎ ঠান্ডা গলায় বলে, 'আমার কাছে ব্যাপারটাকে কাসুন্দি মনে হয়নি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘চেপে যাচ্ছিস কেন?’ এইবার হেসে ফেলি, ‘তুই জানিসই না ওর কোনো কথাতেই আমি আর অবাক হই না।’

‘কিন্তু এ-কথাটা তোর খারাপ লাগবে’, সত্যজিৎ গম্ভীর গলায় বলে, ‘অবশ্য আগেও একদিন ইঙ্গিত দিয়েছিল। কাল খোলাখুলি বলল। অবশ্য কথাটা তোকে বলতে সে-ই বারণ করেছে।’ এবার আমি নিস্পৃহ হয়ে পড়ি, ‘তাহলে বলিস না!’

কথা আর এগোয় না। আমি অবশ্য ভেতরে ভেতরে কৌতূহলে ফেটে পড়ছি। সত্যজিৎ উসখুস করতে থাকে। কিছুক্ষণ এভাবেই যায়। তারপর সত্যজিৎ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। বলে, ‘রেজাউল বলেছে ওর সাথে দৈহিক সম্পর্কের ব্যাপারে তোর কিছু বিকার ছিল, বিয়ে-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ওটাও একটা প্রধান কারণ।’

কথাটা শোনামাত্র বিদ্যুৎ-বেগে খাড়া হয়ে যাই। প্রচণ্ড ঝাঁকুনির সাথে সাথে একসময় থিতিয়ে আসতে থাকি। আমার বিপন্ন কণ্ঠস্বর সমস্ত চরাচরে আছড়ে পড়তে থাকে, ‘কী বলছিস তুই? ওরকম একটা ঘটনার এই বিশ্লেষণ দিল সে?’ খেপে ওঠে সত্যজিৎ, ‘তোদের ইন্টারনাল ব্যাপার-স্যাপারে আমি যেতে চাই না। তুই পেছনে বোসতো। বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি। তোদের এসব কিছু আমি বুঝি না। বিচ্ছেদের পেছনে এরকম কোনো কিছু থাকতে পারে ঘুণাক্ষরেও জানতাম না। আমি তোকে বিশ্বাস করেছিলাম। সারাক্ষণ তো তারই দোষ দিয়ে আসছিলাম। ধুর, কেন যে তোকে সব বলতে গেলাম! আমি আসলেই একটা পেটফাঁপা ছেলে।’

আমার বুক ঠেলে কান্না উঠছে। যেন ঘাই দিয়ে ওঠা একটা মাছ উলটো বাতাসের ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল, একদম জলের তলায়, এভাবে আহত যন্ত্রণার ঘেরাটোপ থেকে নিজেকে টেনে তুলে সত্যজিতের ভেসপার পেছনে বসি।

এক সময় সেই বাহন চলতে শুরু করে।

‘তুই কাল আসছিস?’

‘ছিঃ সত্যজিৎ! এরপরও তুই আমাকে মানুষ মনে করিস না?’

বুক খালি হয়ে আসছে। আমি আবার সেই শিশুর চিৎকার শুনতে পাই। পুরো রাত জুড়ে চরাচর ভেসে যেতে থাকে সেই কান্নার ধারাজলে কী অপূর্ব ছায়াঘন রাজপথ। এ-কী, কানের কাছে সাঁই সাঁই হাওয়া, না কান্না? রানু, কেন নিজেকে নিভন্ত সলতে করে দিলি? কেন আমার জীবনটা এইরকম হল? বারান্দায় দাঁড়াই, খোলা হাওয়ায় বাতাস নেব। উল্লাসমুখর শিশুরা মাঠের ওপর খেলছে। উচ্ছ্বল আনন্দে তারা একটা মরা ইঁদুর ছুঁড়ে দেয় শূন্যে। পিঁপড়ের দখলে থাকা পেট ফোলা সেই ইঁদুরটা আমার পায়ের ওপর ঝপাৎ এসে পড়ে। পৈশাচিক ঢং-এ লেহন করে পিঁপড়ের লম্বাটে জিভ। কেন সবসময় এ রকম দুর্গন্ধ? ক্রোধে ক্ষিপ্ত রেজাউল ক্রমশ রাক্ষস রাজা, এগিয়ে আসছে আমার দিকে। সাঁ করে ওর একটা হাত আমার চুলের গোড়ায়। ভয়ে বিবর্ণ আমি ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছি। আমার মাথা ঠোক্কর লাগাচ্ছে... কী অন্ধকার... কী পৈশাচিক কালো রক্ত! কী বীভৎস ঘৃণা! আহ! মরে যাব! চারপাশ ঝাপসা হয়ে আসছে। ঠোক্কর লাগছে... অন্ধকার... শুধু অন্ধকার! সেই মানুষ শেষে আমাকে জড়িয়ে ধরে অনুতাপে ভেঙে পড়ে! কিন্তু কেন?

বাসায় এসে কী হয়, কান্নায় ভেঙে পড়ি। বালিশ আঁকড়ে অঝোরে কাঁদতে থাকি। রেজাউল সত্যজিতের কাছে এভাবে তুলে ধরল আমাকে? সত্যজিৎ বাসার সামনে এসে আমাকে বারবার বোঝাচ্ছিল—ব্যাপারটা আমি যেন না জানি, রেজাউল বারবার সেটাই চাইছিল। সত্যজিৎ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেই তাকে ও-ভাবে বলেছে। আমি যেন সালাহিদনের বাসায় যাই। অত সহজেই সেন্টিমেন্টাল হওয়া আমাকে সাজে না। সমস্ত কথার মুখে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ছিলাম নিশ্চুপ। ঘরে এসে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। অবিশ্রান্ত জলের তোড়ে ভেসে এক সময় আমি শান্ত হয়ে আসি।

নিজেকে প্রশ্ন করি—কেন সত্যজিতের কাছে আমার ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করলাম না? নিজের দোষ এড়ানোর জন্য রেজাউল বিকারগ্রস্ততার কী ব্যাখ্যা করেছে কে জানে! আমার ওপর কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল সত্যজিৎ! বাসায় আসার পর পুরোটা ব্যাপার এক এক করে ওকে খুলে বলা দরকার ছিল। অবশ্য কী-ই বা খুলে বলতাম? ওরকম সূক্ষ্ম যন্ত্রণার ব্যাপারগুলো কি অন্যকে খুলে বোঝানো যায়? বিশেষ করে অবিবাহিত কাউকে? কিন্তু এতদিন পর রেজাউলই-বা কেন গায়ে পড়ে সত্যজিৎকে এসব বলতে এসেছিল? তাতে কী লাভ হয়েছে ওর? এত সাহস ও কোত্থেকে পায়? অতসব বিশ্রী কথা বলার পর আবার আমার সাথে দেখা করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে? সত্যজিতের ওপরও আমার রাগ কম হল না। ওর ভণ্ডামিটা মনে পড়লে গা জ্বলে যাচ্ছে, যার জীবন দুর্গন্ধময়, তাকে 'চল একটু বাতাস খেয়ে আসি' বলে ভেসপায় উড়িয়ে নিয়ে, ওইরকম একটা মনোরম পরিবেশে এ-কথাগুলো বলার জন্য অত নাটকীয়তার প্রয়োজন ছিল না। জঘন্য সব প্রসঙ্গ নিয়ে সত্যজিৎকে কৈফিয়ত দেওয়ার কোনো মানে নেই। যার যা ইচ্ছে ভাবুক। নাই-বা থাকল এরকমের পলকা বন্ধুত্ব! আর দশটা মেয়ের থেকে আমি যে আলাদা, সেটা প্রমাণ করার জন্য রেজাউলের সাথে দেখা করতেও আমি বাধ্য নই। অত ঘোড়ার ডিমের উদারতা আমার মধ্যে নেই। আমি টিপিক্যালই।

রাত সাড়ে ন-টায় আরেফিন আসে। ওকে দেখে নিজেকে সহজ করি, 'তুই এমন হাওয়া হয়ে থাকিস কেন, বলতো?'

'কী ব্যাপার, কাঁদছিলে নাকি?' আমাকে দেখামাত্রই ও বেশ বিচলিত হয়ে পড়ে।

'কান্না পাচ্ছিল, তাই কাঁদছিলাম'—প্রশ্নের উত্তরে কোনো ভান-ভনিতা করি না। 'তোর খবর কী? কী করবি, ঠিক করেছিস কিছু?'

'আশ্চর্য, বলো না, কাঁদছিলে কেন?' আরেফিন তখনও বিচলিত, 'জানোতো, তোমাকে আমি অত দুর্বল মনে করি না।'

'একটু কাঁদতেও পারব না? নিজের সামনেও আমাকে আমার সবলতার পরীক্ষা দিতে হবে? আমি তোকে কান্না দেখাতে গেছি?'

'আমার কাছে তুমি অনেক কিছু চেপে যাও।' কেমন ম্লান হয়ে যায় সে, 'আমি অনেকবার লক্ষ করেছি—খুব কষ্ট লাগে।'

'আসলে তোকে বলার মতো তেমন কিছু আমার জীবনে ঘটে না। তুচ্ছ প্রাত্যহিকতার এসব কাসুন্দি ঘাঁটতে আমার ভালো লাগে না।'

'বলার মতো সত্যিই কিছু ঘটে না?' আরেফিনের স্বর কেমন তির্যক হয়ে ওঠে, 'তুমি সেদিন রাগ করে বেরিয়ে গিয়ে রাতে কোথায় ছিলে, আমাকে বলেছ?'

মুহূর্তে কেঁপে উঠি। হকচকিয়ে তাকাই ওর দিকে, 'তোকে কে বলেছে?'

'যে-ই বলুক', আরেফিন গম্ভীর হয়ে ওঠে, 'আমি সেদিন তোমার অফিসে গিয়ে দেখতে চেয়েছি তুমি নিজের থেকে বলো কি-না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

এই এখন ভেতরে ভেতরে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকি। এ নিশ্চয়ই শানুর কাজ। অথচ সে সেদিন কী ভানটাই না করল! এরা যে কী জাতের মানুষ, সহজে বোঝা যায় না। সেদিন কী চমৎকার মিথ্যেটাই না ঝেড়ে দিল!

'তুইও-তো প্রায়ই হলের বাইরে কোথায় রাতে থাকিস, আমাকে বলিস?' পালটা আক্রমণ করে ওর চোখের দিকে তাকাই।

'প্রায়ই থাকি না', আরেফিনের গলায় বিরক্তি। 'আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ো না। বন্ধুর পুরো ফ্যামিলি দেশে গিয়েছিল। দু-রাত থাকতে হয়েছিল তার বাসা পাহারা দেবার জন্য। আচ্ছা, আমরা পরস্পরকে এইভাবে সন্দেহ করতে থাকব? কেউ সরলভাবে কিছু জানতে চাইতে পারব না? তাহলে আর সম্পর্ক কী? সবাই নিজের ইচ্ছে স্বাধীন চলি। কোনো সমস্যা থাকল না।'

'ওসব বাদ দিয়ে এখন তোর খবর বল।' আমি প্রসঙ্গ পালটাতে চাইলে ও বলে, 'কাল সারারাত ভার্সিটিতে গোলাগুলি হয়েছে। কী যে আতঙ্কে রাত কেটেছে।' আমি উদ্বিগ্ন হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাতেই মুহূর্তে এবার প্রসঙ্গ পালটায়, 'আজকের নিউজ দেখেছ? পাঁচশ কুয়েতি মারা গেছে। উপসাগরের দিকে মার্কিন বিমানবাহী রণতরী রওনা দিয়েছে। এই নিয়ে ঢাকায় উত্তেজনা।'

'ওসব হল গিয়ে জাহাজের খবর, আমরা ছাপোষা কেরানি। যা ঘটার ঘটতে থাক। এখন বল তোর ফ্লায়িং বিজনেসের খবর কী?'

'আমাকে দিয়ে হবে না। আমার এক বন্ধু ওসব করতে গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা খেয়েছে। ওর রমরমা অবস্থা দেখে প্রথমটায় একটু ঝুঁকেছিলাম। চিটাগাং পোর্ট এলাকা থেকে সিগারেট, কাপড়, কসমেটিক এসব এনে ঢাকার দোকানে দোকানে সাপ্লাই দেওয়া। ধরা খেলে বারোটা বেজে যায়। হেভি রিস্ক। ভাগ্যিস ও পথ আর মাড়াইনি।'

'যা হোক, আগেভাগেই তোর সুমতি হয়েছে জেনে খুশি হলাম', আমি ওকে আশ্বস্ত করে বলি।

আরেফিন এবার একটু নড়েচড়ে ওঠে। আমার কথায় খুশি হল কি হল না, বোঝা গেল না। শুধু বলে, 'আসলে বিজনেস করতে গেলে প্রচুর টাকার দরকার, প্রচুর'—বলতে বলতে হঠাৎ কী হয়, আরেফিনের স্বর নরম হয়ে আসে, 'একটা দুঃসংবাদ আছে।'

'দুঃসংবাদ, কীসের?' গভীর তল থেকে নিজেকে টেনে তুলি। প্রায় কাঁপা কাঁপা স্বরে সে বলে, 'পরশু আমার পকেট কাটা গিয়েছে। বাসে ভীষণ ভিড় ছিল। আমি দু-হাতে হ্যান্ডেল ধরে ছিলাম। আর সেই ফাঁকে... ভেবেছিলাম তোমাকে জানাব না কিন্তু...।'

'কত টাকা?'

'ন-শো।'

'অত্তো', আমি আঁতকে উঠি। 'এত টাকা তুই কোথায় পেয়েছিলি?'

এইবার আরেফিনের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে, 'টিউশনির টাকাগুলো উঠিয়ে একশো টাকা দিয়ে মন্টুর জন্য গুলিস্তান থেকে একটা শার্ট কিনেছিলাম। ও চিঠি দিয়েছিল। ঠিক করেছিলাম, পরদিন বাবাকে দেখতে বাড়ি যাব। বাড়ির একটা ছেলে খবর দিয়েছিল, বাবার শরীর খুব খারাপ। বাঁ পকেটে খালি মানিব্যাগ ছিল। ডান পকেটে ছিল শুধু টাকা। পকেটমার শালা তো আমার চেয়ে চালাক, মানিব্যাগের পকেটে হাত দেয়নি। আমি জানি তোমার খারাপ লাগছে। কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপার চেপে যাই কী করে...।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘খুব ভালো হয়েছে’, রাগে-দুঃখে আমার কান্না আসতে থাকে। ‘ঘটনা ঘটেছে পরশু, আর তুমি এসেছ কিনা আজ! বোঝাই যাচ্ছে ব্যাপারটা তোমার গায়ে লাগেনি।’ বলতে বলতে ওকে যাচ্ছেতাই ভাবে অপদস্থ করার ঝোঁক আমাকে মুহূর্তে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত করে তোলে। তাই ওর চোখের দিকে প্রখর তাকিয়ে অনর্গল বলতে থাকি, ‘আমি সব সময় লক্ষ করেছি টাকার প্রতি তোর মায়া কম। যদি করতি আমার মতো একটা চাকরি, সহ্য করতি অফিসের লোকজনের টিপ্পনি, বসকে জড়িয়ে অশ্লীল ইঙ্গিত, তার পরও স্রেফ দু-হাজার টাকার জন্য মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হত, আধবেলা খেয়ে-না-খেয়ে বাড়িতে নিয়মিত টাকা পাঠাতে হত, ছোটোভাইটিকে পড়ার খরচ জোগাতে হত, তখন বুঝতি আসলে টাকা কী জিনিস! তাহলে আর পকেটে টাকা নিয়ে বাসের মধ্যে উদাসীন হয়ে পড়তি না। রামছাগল না হলে তোর মতো ছাত্রের পকেট কাটা যায়?’

কথাগুলো একদমে বলে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে আসি এবং আরেফিনকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আমি বাথরুমে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিই। এমন কান্না পাচ্ছে কেন? বুক-ঠেলে ওঠা চাপা যন্ত্রণাময় তেতো রস গলার কাছে এসে চোখ ভিজিয়ে দিচ্ছে। বালতি থেকে জল তুলে মুখে ঝাপটা দিই। আসলে বড্ড অল্পেই আজকাল ভেঙে পড়ি। তাহলে কি এ-ই সত্য সহজেই ফুরিয়ে আসছি? অল্প পাওয়ার বালবের আলোয় বাথরুম ফ্যাকাসে, হলদেটে। দেয়ালের চারপাশে চুন-সুরকি উঠে গেছে। এক চিলতে ভেন্টিলেটার, তা-ও মাকড়সা ঢেকে রেখেছে। এত ছোট্ট-পরিসরের জায়গা, দম নেওয়া যায় না। নিজেকে সামলে হালকা হয়ে যখন বেরিয়ে এসেছি, হতভম্ব হয়ে শুনি, আরেফিন বেরিয়ে গেছে। বোকার মতো শানুকে বলি, ‘তুমি একটু আটকাতে পারলে না?’ এবার ওর বিস্ময়ের পালা, ‘তোমাদের মধ্যে কী হয়েছে আমি তার কী জানি? আমাকে দরজা বন্ধ করতে বলল, করে দিলাম।’

নাহ্, নির্ঘাৎ মরে যাব। আসলে একটু বেশিই হয়ে গেছে হয়তো। টাকার জন্য ওর কষ্ট কি কম ছিল? সেই কষ্টেই হয়তো দু-দিন আসেনি। মাঝে মাঝে সর্বগ্রাসী জেদ আমাকে অন্ধ করে দেয়। চেয়ারে বসে ছোট্ট টেবিলটায় মাথা রাখি—তাহলে কি আমি সবার কাছ থেকে কেবলই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি! তাই যদি হয়, তাহলে সব দোষ কি আমার? হঠাৎ হুশ হয়, আরেফিন বলছিল বাবার শরীর খারাপের কথা! আশ্চর্য, এরকম একটা দুঃসংবাদ আমাকে তখন বিন্দুমাত্র স্পর্শ করল না? ঠিকই বলে সে, টাকা আমাকে বিকারগ্রস্ত করে তুলছে। আরেফিন নিশ্চয়ই ব্যাপারটা লক্ষ করেছে। প্যারালাইজড হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন বাবা। মা চোখে দেখে কম। এমন কী বয়স তার? অথচ সন্ধে হলে ঘরের ভেতরেই অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে চলাফেরা। শুধু বাবা-মাকে নয়, বাড়ির সবাইকে আমার এখন দূরবর্তী দ্বীপের মানুষ মনে হয়। বাবার চক-সাদা ঠান্ডা চোখ, মার জোরে জোরে নিশ্বাস টানা আর কেবলই নিজেকে তার শাপশাপান্ত করার একঘেয়ে দৃশ্য-পরম্পরা আমাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে চায়। এইরকম যে-বাড়ির পরিবেশ, সেখানে বাবার আর কী খারাপ হবার আছে? যে অবস্থায় আছেন তার চেয়েও খারাপ পরিণতি কী? তবে কী সেই জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছেন তিনি । না, না—এত খারাপ কিছু হলে তার খবর শুধু আরেফিন পাবে কেন? এতই যদি আমি অস্পৃশ্য, তবে আর ইনিয়েবিনিয়ে চিঠি লিখে সেই মেয়ের পয়সা নাও কেন? গা ঘিনঘিন করা সব মাছির ঝাঁক! আমার ময়লা-নোংরা চাটতে লজ্জা করে না?

এদিকে অফিসে প্রবল উত্তেজনা। সাদ্দামের কুয়েত দখল নিয়ে সহকর্মীরা দু-দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে। তাকে বাহবা দিচ্ছে কেউ। কেউ আবার তার অভিযানকে স্বেচ্ছাচারিতা মনে করে যুক্তরাষ্ট্রকে সার্পোট করছে। এই নিয়ে অফিস এক-একদিন উপসাগরীয় অঞ্চলের মতোই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আমি ছাপোষা কেরানি মানুষ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

জীবনের সাধারণ যুদ্ধেই কুপোকাত। ফলে কোনো উত্তেজনাই আমাকে স্পর্শ করে না, কেবল জানার জন্যই প্রতিদিনের নির্জন চোখ হেডলাইনে হাঁটাই—'যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে ইরাকের হুঁশিয়ারি, আক্রান্ত হলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেব' 'ইউরোপের প্রতি ইরাক—বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে হলে যুক্তরাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করুন' ইত্যাদি । ক্রমশ দু-চোখে ঘুম নেমে আসতে থাকে আমার—।

এর দিন কয়েক পরেই ঘটে যায় সেই অভাবনীয় ঘটনাটি। চেয়ারে চিৎপাত শুয়েছিলাম। বাইরের দরজা-লাগোয়া ঘরখানা আমার হওয়ায় স্বভাবতই দরজা খোলার দায়িত্ব আমারই। শিবনারায়ণ রেখে আমি পড়ছিলাম ভিনসেন্ট ভ্যানগগের আত্মজীবনী। আমার সামনে টেবিলে বইটা খোলা অবস্থায় ঘুমোচ্ছিল। মুখ থুবড়ে পড়ে থাকার মতো চমৎকার বই। ভ্যানগগের জীবনের শুরু, একের পর এক ছবি আঁকছে, বিক্রি হচ্ছে না। চরম অর্থ-সংকটে তার বিপর্যস্ত অবস্থা। তারও আগে কয়লাখনির শ্রমিকদের সাথে কাটানো দুঃসহ জীবন। তার মধ্যেও নিরন্তর ছবি এঁকে যাওয়া। পড়তে-পড়তে কেমন হতাশ বোধ করছিলাম নিজের কথা ভেবে। তুচ্ছ বিঘ্নের মুখেই সব ছেড়েছুড়ে দিই। ভিনসেন্ট কি পরাজিত হননি? বইটা সামনে রেখে স্থির বসেছিলাম। ভেতরে যুদ্ধ চলছিল, কেন আত্মহত্যা? তারপরও তার শিল্পের তো জয় হয়েছে। ভাবনার এইসব চক্র থেকে নিজেকে ঝটিতি বের করে ভ্রূ কুঁচকে দরজা খুলে দিই। একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক। সুঠাম, দীর্ঘদেহী। উজ্জ্বল ফর্সা রং। ক্লিন সেভড্ মুখ, দিঘল কপাল। জুলফির চুলে পাক ধরেছে। পোশাকেও বেশ আভিজাত্যের ছাপ। পলকেই ভদ্রলোকের পুরোটা আদল দেখে নিয়ে ভাবি তিনি হয়তো শানুদের কেউ হবেন। পাশ ফিরে ডাকতে যাব, তিনি একটু গলা ঝেড়ে জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা, এখানে নীনা নামের কেউ থাকে?' আমার পায়ের গতি থেমে যায়, বিস্ময়-মেশানো স্বরে বলি, 'আমিই নীনা।'

'আমি কি ভেতরে আসব?'

'ছিঃ ছিঃ দেখুন দেখি কাণ্ড', দরজা থেকে আমি হাত সরিয়ে নিই, 'আসুন!'

তিনি ভেতরে এলে চেয়ার এগিয়ে দিই। প্রথম দর্শনেই মনে হয় মানুষটার অবয়বের সঙ্গে আমার এই খুপরি ঘরখানা ঠিক যেন খাপ খাচ্ছে না। কিন্তু সব ছাপিয়ে ভেতরে দুর্মর কৌতূহল, এই ভদ্রলোকের সাথে আমার পূর্বজন্মে কেন, ইহজন্মে কোথাও দেখা হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না! অথচ তিনিই কিনা আমার কাছেই এসেছেন! কিছুতেই মেলাতে পারি না। তারপর তিনি যা বললেন, তাতে আমার হৃদযন্ত্র বন্ধ হবার দশা হয়।

'আমি কি সম্বোধনটা তুমি করে করতে পারি?' বলে বেশ রহস্যময় ভঙ্গিতে তিনি হাসেন, 'তাহলে কথা বলতে আমার একটু সুবিধে হত।' আমি প্রচণ্ড অস্বস্তির সাথে উচ্চারণ করি, 'নিশ্চয়ই, কিন্তু আপনাকে ঠিক...।'

'আমাকে তুমি কখনো দেখনি। আমার নাম ইরফানুল কবির,... আমি...।' বলতে বলতে তিনি থেমে যান।

অস্বস্তি কাহাকে বলে, কত প্রকার ও কী কী... আমার শুরু হয়ে যায়। প্রথম কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি না। তারপর টাল সামলে নিয়ে থেমে থেমে চাপা উত্তেজনায় বলি, 'আশ্চর্য! আপনি! আমি ভাবতেই পারছি না। ঠিকানা পেলেন কোথায়?'

'ঠিকানা দিয়েছে আমার স্ত্রী, তুমি তার কাছে দিয়ে এসেছিলে। ততক্ষণে চেয়ারে তিনি সহজ হয়ে বসেছেন, 'আমি ঠিক এখনও বুঝতে পারি না, সেদিন তুমি আমার সাথে দেখা না করে চলে এলে কেন? অথচ আমার কাছেই গিয়েছিলে। আমি খুব অবাক হয়েছি।'

'আমি, মানে—আসলে সেদিনকার পুরো ব্যাপারটাই আমার জন্য ছিল ভীষণ লজ্জার। এই নিয়ে পরে এত গ্লানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

হয়েছে যে কী বলব! আসলে এইরকম যোগাযোগহীনতার মধ্যে এভাবে কোথাও যাওয়াটা আমার জীবনে সাধারণত ঘটে না। সেদিন যে আমার কী হয়েছিল, মনে হয়, মাথার ভেতরকার কিছুই ঠিক মতন কাজ করছিল না। যাওয়ার পর মনে হয়েছে, কাজটা ঠিক হয়নি। আসলে অস্বস্তি এড়াতেই আপনার সাথে দেখাটা হয়নি।'

'চলেই যখন গিয়েছিলে, তখন ওভাবে চলে আসাটা তোমার অন্যায় হয়েছে।' বেশ অধিকার নিয়ে তিনি বলেন, 'একটু চিন্তা করে দ্যাখো, ব্যাপারটা যৌক্তিক হয়েছিল কি-না।'

অন্যায়! ন্যায়! আমার ভেতর জটিল প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এক জীবন পেরিয়ে গেল। একদিন ভুল করেও নিজের চাচাতো ভাই, তার বউ-ছেলেমেয়েদের কোনো খোঁজ নিলেন না। আর আজ সেই তিনি আমার উপযাচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আমার অন্যায় খুঁজে বের করছেন। কী বিচিত্র মানুষের চরিত্র। বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে আমি তাঁর সামনে ততক্ষণে সহজ হতে শুরু করেছি, 'দেখুন, গোড়াতেই আমার অন্যায় হয়েছিল। সত্যি বলতে কি আপনার বাসায় আমার ওইভাবে ছুটে যাওয়া উচিত হয়নি। খুবই ছেলেমানুষি হয়েছিল!'

আমার কথা শেষ হতেই নেমে আসে ঠা-ঠা নীরবতা। ডাল বাগার দেওয়ার শব্দ রান্নাঘরে। ভোঁ ভোঁ করে এই ঘরে পাঁচ ফোড়নের গন্ধ ঢুকছে।

ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্বের মোহ এমনই যে, এই গন্ধ আমাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেয়। লক্ষ্য করি, শানু দু-বার উঁকি দিয়ে গেছে। এইবার শান্ত গলায় তিনি বলেন, 'আমার বাসায় যাওয়ার জন্য তুমি কেন অনুতপ্ত সেটা যে আমি বুঝতে পারছি না, তা নয়। হয়তো ভাবছ, যাদের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই, আন্তরিকতার কোনো সম্পর্ক নেই, তার ওখানে এমন হঠাৎ...? আচ্ছা, আমার এই চলে আসাটাও বেশ নাটকীয় নয়? জীবন কি সব সময় এক ছকে চলে?'

অন্তর্যামী নাকি? যা হোক। আমি তাঁর কথার মুখে যথারীতি চুপচাপ থাকি। গাঢ় হয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। বাতি জ্বালাতেই পুরো ঘর পাঁশুটে আর হলদেটে হয়ে ওঠে। নাহ্ আরেকটু বেশি পাওয়ারের বালব না লাগালেই নয়। মাড়হীন সবুজ তাঁতের শাড়ি আমার গায়ের সাথে লেপটে আছে। আঙুলের ডগায় কালো মতন একটা ঠোয়া। সেই আঙুল জিভে ছুঁইয়ে বসে থাকি।

ভদ্রলোক ঢোকার পর আমার গরিবানা যেন হঠাৎ করেই আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। বিছানার রং-চটা ম্লান চাদরটা নীচের দিকে কেমন বেঢপ ঝুলে আছে। টেবিলের পায়াটার নীচে ঠেকনোস্বরূপ যে ইট, সেটা দাঁত-কেলিয়ে যেন হাসছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দেয়ালে ঝুল-কালির অসংখ্য বিদঘুটে দাগ। অমসৃণ মেঝেটা আজ বড্ড বেশি স্যাঁতসেঁতে। এবং জং-ধরা লটরপটর ফ্যানটা আজ যেন মাত্রাহীন জোরে ঘটর ঘট ঘটর ঘট শব্দ করছে।

'আমি যদি যোগাযোগ রাখতাম'—নীরবতা ভাঙেন তিনি, 'তুমি যথেষ্ট ম্যাচিওর্ড। জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে তোমার। যোগাযোগ রাখলে সেটা কি সার্বিক বিচারে কল্যাণকর হত?'

চমৎকার যুক্তি! এবার আমি অন্যপথ ধরি। তিনি কী ইঙ্গিত করতে চাইছেন? তার কথার ভেতর দিয়ে মার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারটা দিনের মতো স্পষ্ট। এর চাইতে ভদ্র করে আর কিছু বলা যায় না। আমি যে ব্যাপারটার এই দিকটা নিয়ে একবারও ভাবিনি, তা নয়। আমাদের সেই দুঃসহ দারিদ্র্যের সংসারে আমার মা-বাবার ভেতরে এই প্রসঙ্গ যেভাবে, যে-রকম অশ্লীলভাবে ঢুকে যেত, ভদ্রলোক যোগাযোগ রাখলে তার রূপ কী হত, আমি যে তা নিয়ে ভাবিনি, তা নয়। কিন্তু আসলে আমার ক্রোধের উৎস সেটা না। মাকে তিনি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিলেন। পারিবারিকভাবে জানাজানিও হল। শেষ মুহূর্তে তিনি সিদ্ধান্ত পালটালেন কেন? কেন দীর্ঘদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

নিশ্চুপ থাকার পর তিনি হুট করে ঢাকায় এসে বিয়ে করে ফেললেন? আর বাবা, সব জেনে তিনি মহান হবার ভূমিকায় নেমে পড়লেন। বিয়ে করলেন মাকে। তারপর তার সুরত কোনখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আমি কি তিল তিল করে সেটা দেখিনি? আমি কাকে শ্রদ্ধা করব? কী হলে সব সুন্দর হত! তার কী জানি আমি? জীবনকে আমি নর্দমায় শুয়ে কীটের মতন করে দেখেছি। না, আমার কারো প্রতি কোনো ক্রোধ নেই। তিনি কেন আজ সেই নর্দমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, আমার আপত্তি সেখানেই। না থাক, আপাতত থাক—মনকে থিতু করি। তাই নাজুক ব্যাপার-স্যাপার থেকে আলগোছে নিজেকে ছাড়িয়ে সহজ করে বলি, 'আপনাকে চা দিই?'

'আচ্ছা, তুমি কি আমাকে এড়াতে চাইছ?'

ভেতরে ভেতরে সাহসী হয়ে উঠি। হেসে বলি, 'আপনাকে এড়াব এত সাধ্য কোথায়? আপনি হচ্ছেন কিংবদন্তির নায়ক।'

'তুমি কিন্তু আমাকে অপমান করছ!'

'না, না সে কী!' আমি দু-হাত জোড় করে বলি, 'আসলে আমি একদমই ভদ্রতা শিখিনি। এ আমারই দোষ। অশিক্ষাও বলতে পারেন। যা হোক, আপনার গল্প বলুন, শুনি।'

তিনি বলেন, 'গোড়ায় জট রেখে গল্প কতদূর এগোবে, বুঝতে পারছি না।' সেই ত্রিশ বছর আগের জট কি আমি খুলতে পারব?'

ফের ভেতরে তেতে উঠতে থাকি, 'আমি বুঝি আমার সময়কে। সে জন্যই আপনার বাসায় আমার ছুটে যাওয়ার গ্লানিকে আমি বড়ো করে দেখেছি। আজ আপনি এসেছেন, কাল আপনার বাসায় যেতে আমার আর গ্লানি হবে না।'

'গ্লানি হবে না?' তার মুখে হাসির ফোয়ারা, 'সত্যি বলছ তুমি?'

'সত্যি বলছি, হবে না। আপনার বাসায় যাওয়ার আগে অতীতের ওইসব ইতিহাস সত্ত্বেও আপনার সাথে আমার, আমি ব্যক্তিগতভাবে আমাকেই মিন করছি, যদি একদিনেরও আন্তরিক পরিচয়ের সুযোগ ঘটত, তাহলে আমার ওই যাওয়া নিয়ে কোনো গ্লানি হত না। সেটা ছিল না বলে পরে বেশ অনুতাপ হয়েছে।'

'তোমার এখানে এসে খুব ভালো লাগছে'... এই সহজ উচ্চারণের পর এতক্ষণে তিনি পুরো ঘরটা চোখ চালিয়ে দেখেন। আমার অস্বস্তির মধ্যে এই রুক্ষ ঘরখানা আবার জেগে ওঠে। কী মনে হতে পায়ে আমি তড়িঘড়ি স্পঞ্জ ঢোকাই। ভেতরে যাব, পেছনে হঠাৎ সেই গমগমে গলা—'এই ছবিটা কার আঁকা?'

'কোন ছবিটা?' ভাবতে-ভাবতে আমি যেন পাতাল ফুঁড়ে উঠি, চারপাশে তাকাই—কোথায় ছবি?

চেয়ারটা ছোটো হওয়ায় ভারী দেহে তার বসতে অসুবিধা হচ্ছে। আমার সেই বিখ্যাত ঘটর ঘটর ফ্যানের তুচ্ছ হাওয়ায় তিনি ভিজে উঠছেন, কিন্তু মুখখানা ভাবান্তরহীন, তর্জনী দেয়ালের দিকে—ওই যে দেয়ালের ওই ছবিটা।

ওহ্! দেয়ালে তো আবার একটা ছবি আছে। ধুলোর আস্তরে প্রায় ঢাকা। ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার কোনো বোধই ছিল না।

তবুও অস্বস্তির সাথে বলি, 'আমার।' এক সময় প্রচুর আঁকতাম। হাতুড়ে শিল্পী ছিলাম বলতে পারেন। আমার কথায় বিস্মিত হয়েই যেন উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ছবিটির দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে লজ্জায় আমি লাল হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

উঠি। ধুৎ! ছবিটা এভাবে এখানে না থাকলেই হত। অসম্ভব যত্নে তিনি ছবিটা নামিয়ে তার ওপর জমে থাকা ধুলো ফুঁ দিয়ে সরান, 'এক সময় আঁকতে, ছেড়ে দিয়েছ কেন?'

কুণ্ডলী পাকিয়ে আসে ধোঁয়া। সেই জট-পাকানো উদ্ভ্রান্ত দিনগুলো। শিল্পী হওয়ার কী দারুণ শখ! পরে নিজে নিজেই হেসে মরেছি, এসব কোনো ছবি? অথচ শুরুতে ছবি আঁকার জন্য কী করিনি! দুর্নিবার এক নেশায় উদ্ভ্রান্তের মতো দিকবিদিক ছুটতাম রং-তুলির টাকার জোগাড়ে। অবশ্য ছবি আঁকাআঁকির ব্যাপারে বাবার স্পষ্ট নিষেধ ছিল। প্রচণ্ড ধার্মিক মানুষ বাবার মতে ছবি আঁকা মস্তো গুনাহ্। বিশেষ করে মানুষের ছবি। কিন্তু স্বাধীন, বেয়াড়া তুলি কি মানুষবিহীন শুধুই প্রকৃতির সীমাবদ্ধ ক্যানভাসে তৃপ্তি কিংবা স্বস্তি খুঁজে পায়? পায় না। মা বলতেন, 'মন দিয়ে পড়, ওটা কোনো কাজ হল?' ফলে, আমার চারপাশে স্রোত, একটা ছবি আদ্ধেক এঁকে রেখেছি। রং শেষ। হাতে ফুটো পয়সা নেই। রাতভর এক ধান্দা, কী করে রং কেনা যায়? মাঝরাতে উশখুশ করতে করতে পিচ্চি মন্টু বিছানা ছেড়ে আমার কাছে আসে, 'ও আপা আমি সেলিমদের উঠোনে একটা দুল খুঁজে পেয়েছি, মাকে দেখাতেই ছোঁ মেরে নিয়ে লুকিয়ে রাখলেন। কাউকে বলতে না করেছেন, মনে হয়, সোনার।' গা বেয়ে সন্তর্পণে বিছে ওঠে, টান হয়ে উঠে বসি। লাইটের ঝাপসা আলোয় মন্টুর মুখ ভয়ার্ত দেখায়। ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করি, 'মা ওটা কোথায় রেখেছে, দেখেছিস?'

'সিলিং-এর পুঁটলিতে, কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে।'

'বাবা জানেন?'

'না, মনে হয় ওটা সেলিমের বোনের'... ভয়ে বিবর্ণ মন্টু তখনো রীতিমতো হাঁপাচ্ছে।

'কে বলেছে সেলিমের বোনের?' আমার স্বরে ক্ষিপ্রতা। 'তুই দেখেছিস?' ওকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হচ্ছে না ভেবে, গলার স্বরে দৃঢ়তা এনে বলি, 'তাছাড়া ওটা যে সোনারই তৈরি, সে কথা কে তোকে বলল? মা কি চোখে ঠিক মতো দেখেন? বুঝলি, তুই আর কোনোদিন পড়ে থাকা জিনিস কুড়িয়ে আনবি না। যা, শুতে যা।'

খুব আস্তে 'আচ্ছা' বলে ধীরে পা ফেলে শুতে যায় মন্টু। এরপর পুরো রাত দম আটকে পড়ে থাকার সময়টায় মার প্রতি অদ্ভুত একটা ঘেন্না এসে জড়ো হয়। সেই ঘেন্না ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এ আমি কোথায় জন্মেছি? অশ্লীল রুটিগুলোর উপার্জনকারী বাবার প্রতি, ঘরের আবর্জনার দুর্গন্ধের প্রতি, আপসকামী রানুর প্রতি, টিনের ফুটো আর তুলো ফুঁড়ে বেরুনো তোশক—এই সব কিছুর প্রতি জমা হয় দম-বন্ধ করা অখণ্ড এক ঘৃণ্য অনুভব।

আমি কি এখান থেকে পালিয়ে যাব? কোথায় যাব আমি? সামনে কেবল ধু ধু পথ। কেবল শূন্যতা। এই কি মায়ের রূপ? পয়সা দেখলেই চোখের কোটর উপচে যার মণি বেরিয়ে আসে? আর বাবা? সন্তান কি স্ত্রী, কারোর ওপর তার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। ঘুমের মধ্যে যদি কেউ তার পকেটে হাত দেয়, সেই ভয়ে কোথায় কোন ইটের নিচে, দেয়ালের ফোঁকরে হাড়কিপটে বুড়োর মতন টাকা লুকিয়ে রাখেন। ডিম ভেঙে বেরিয়ে আসা কিশোরী রানু টাক-পড়া মজুমদারের হাফ বিল্ডিং-এ গিয়ে হয়ে উঠছে ক্ষয়ে-যেতে-থাকা যুবতী। এবং সত্যি বলতে কি এইরকম এক সংসারে আমার ছবি আঁকার নেশা মানায়? তবুও সেই নেশাই আমাকে প্রায় উন্মাদ করে তুলেছিল। আমাদের সংসারের এই বীভৎস আর বিশ্রী এই ঘৃণ্য পরিবেশে এটাই যে আমার আত্মার একমাত্র আশ্রয়। আর, আর সেই ভয়াবহ রাতটিকে আমি ভুলতে চাই। কী অসহ্য! কী যন্ত্রণাকর সেই রাতটির নিশ্ছিদ্র অভিযান। পরদিন ঝুলন্ত পুঁটলিতে দুল নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

মা ক্রমাগত হাতড়ে চলেছেন। তার যে চিৎকার করার জো নেই। পাগলের মতো হাতড়াচ্ছেন শুধু। ড্রয়ার, মিটসেফ, তোশকের তল। ঠিক এর দু-দিন পর সস্তা কাঠের একটা ইজেল, ছবি আঁকার শিট আর কিছু রং-তুলি কিনে... মায়ের মুখোমুখি আমার বিড়ালের মতো থাবা, আর, আমার দিকে তাকানো মন্টুর স্থির সাদা চোখ... বড়ো তুচ্ছ হয়ে যাই... প্রতিদিন সেই চোখের সামনে ক্ষুদ্র হয়ে যেতে থাকি।

বিয়ের পরও সেই অবস্থার কোনো রূপান্তর ঘটে না। যেন পৃথিবীতে এই জীবনই যাপন করতে এসেছি। অর্ধেক বাবার সংসারে, বাকি অর্ধেক স্বামীর সংসারে। বিয়ের আগে আমার ঘোর উন্মাদনায় শিল্পিত হয়ে-ওঠা অদ্ভুত যুবকটির শরীর সংসারের ক্রমাগত পেষণে পাঁশুটে হয়ে উঠতে থাকে। যে ছেলে আগে আমার সামনে শার্ট খুলতে লজ্জা পেত, কিছুদিন পর থেকে সে-ই কিনা বিছানায় শুয়ে লুঙ্গি চাঙ্গে উঠিয়ে লম্বা করে শ্বাস টানে, নাক ঝেড়ে ময়লা ছুঁড়ে ফেলে মেঝেতে। মুখে কফ নিয়ে হক হক করে কথা বলে। আমার চোখের সামনে খুলে যায় মানুষের মৌলিক চেহারার বাস্তব দরজা। রেজাউলও, আমার দিকে তাকালে যে তরঙ্গগুলো তার চোখে ঝিলিক দিত, সেসব হারিয়ে ক্রমশ কী ম্রিয়মাণ!

আমি পরিণত হতে থাকি নিরুত্তাপ শীতল মানুষে। সাতাশ বছর বয়সেই আমি যেন ক্ষয়িষ্ণু এক বৃদ্ধা। মফস্সল থেকে বয়ে নিয়ে আসা একমাত্র শৌখিনতা—ছবি আঁকার নেশা খসিয়ে ফেলি অস্তিত্ব থেকে এমনভাবে, যেন রং নয়, ক্যানভাস নয়, প্রাণ থেকে খসিয়ে ফেলছি একমাত্র সবুজ, ঘাস মুছে নিংড়ে পিষে নিভিয়ে দিয়েছি শেষ আলোর রশ্মিটুকুও। তারপর দীর্ঘদিন পর আজ সেই প্রসঙ্গ ওঠায় আমি বিমোহিতের মতো ইরফান চাচার দিকে তাকাই, কথা বলতে পারি না। তিনি আবার প্রশ্ন করেন, 'আঁকা ছাড়লে কেন? আত্মবিশ্বাসের অভাব?'

'এসব থাক', আমি ম্লান হেসে বলি, 'আমাকে দিয়ে এসব হবে না।'

'আমার ঘরে একটা চমৎকার ইজেল আছে, তুমি ভাবতেই পারবে না কত সুন্দর।' ছবিটা যথাস্থানে রেখে তিনি আবার চেয়ারে, 'তুমি ইচ্ছে করলে সেটা নিতে পার।' পরক্ষণেই তিনি বিব্রত, 'অবশ্য সেটা নিতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে?'

আমি নিরুত্তর।

'তুমি চাইলে তোমার ছবি আঁকার সব উপকরণের ব্যবস্থা আমি করতে পারি।'

'আপনি কেন সেটা করবেন?'

'ওহ্ কেন করব? করব নিশ্চিত স্বার্থ থেকে', হাসতে হাসতে তিনি যুক্তি দেখান, 'একটা সময় তুমি যখন সত্যি সত্যিই নাম করে ফেলবে, তখন তার পেছনে পেছনে আমার নামটাও চলে আসবে। আমি যদি তোমাকে দিয়ে শুরু করাতে পারি, ব্যাপারটা বুঝতে পারছ তুমি? প্রেরণাদাতা! কম ভাগ্যের কথা!'

আমার ছবি দেখে তিনি সত্যিই মুগ্ধ। এবং সেটা টের পেতেই এক ধরনের বিহ্বলতা আমাকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। তিনি তো সমঝদার লোক। সেদিন তার বাড়িতে গিয়েই ব্যাপারটা বুঝেছিলাম। তার আলিশান বাড়ি, দুর্লভ সব সংগ্রহ! এইরকম অভিজাত আর সত্যিকার রূপবান পুরুষের পাশে আমার মা কী ভীষণ বেমানান! আজ এতকাল পর এরকম একটা বৈপরীত্যের কথা ভাবতেও আমার কেমন লজ্জা করছে।

ধ্যুৎ, কী সব ভাবছি!

মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করে আবার প্রসঙ্গে ফিরে আসি এবং ভদ্রলোককে বেশ বিনয়ের সঙ্গেই বলি, 'আপনি আসলে আমার ছবি আঁকা ছেড়ে দেওয়ার ভেতরের ব্যাপারটা টের পেয়ে গেছেন, কিন্তু করুণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

করতেও লজ্জা পাচ্ছেন।' আমার ভেতরে ফের কথা বলার প্রবণতা মাথা চাড়া দিতে থাকে। 'তাই আমার পেছনে আপনার অবদানের কথাটথা বলে ব্যাপারটাকে আপনি হালকা করতে চাইছেন, যাতে আমি স্বস্তিবোধ করি।'

'আমার স্ত্রীই বলেছিল, তুমি খুব বুদ্ধিমতী।' ইরফান চাচার মুখে ভুবনভোলানো বিনয়ী হাসি, 'নইলে আমাদের প্রথম পরিচয়টা এরকম সহজ হয়ে উঠত না।

'আপনি কিন্তু মূল প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাচ্ছেন', বলতে বলতে আমি গরমে হাঁসফাঁস করি, 'বুদ্ধিমতী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে কিন্তু আপনি প্রমাণ করে দিলেন, আমি আপনার আসল উদ্দেশ্যটা ধরতে পেরেছি।'

ভদ্রলোকের কাঁচা-পাকা জুলফি চুইয়ে জল পড়ছে তখন। বুকে ফুঁ দিতে দিতে চুলে আঙুল চালান তিনি। প্রশস্ত কপালের পেছনটায় পাতলা চুল। তিনি গম্ভীর, সহসা মনে হবে রাশভারী। আমি নিজের ব্যক্তিসত্তাকে তার সামনে জোরালো করার জন্য প্রথম থেকেই সহজ তর্কে গিয়ে ক্রমশ তাঁর আসল ব্যাপারটা আঁচ করতে পারি, আর তার আন্তরিক আচরণে আমি ক্রমশ মুগ্ধ হতে থাকি।

তিনি বলেন, 'প্রচুর টাকা যেমন মানুষকে ব্যক্তিত্ববান করে না, তেমনি, আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, দারিদ্র্যও মানুষকে ব্যক্তিত্বহীন করে তোলে। কেননা, দারিদ্র্যের কারণে মানুষকে অনেক নীচে নামতে হয়। নিজের সাথে অনেক আপস করতে হয়। কিন্তু কেউ কেউ আছে নিজের নেশা বা পরম প্রবণতাকে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিয়ে নিজেকে নামিয়ে নেয় সেইখানে, সেই অনেক নীচে। কিন্তু তুমি চিন্তা করে দেখো পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু আপেক্ষিক। তুমি ভ্যানগগের জীবনী পড়েছিলে তো? আর্টের জন্য কী করেননি ভ্যানগগ? চরম দারিদ্র্যক্লিষ্ট ভাইয়ের সাহায্য তিনি হাত পেতে নেননি?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, একটিমাত্র ছবিকে কেন্দ্র করে আপনি আমার প্রতি এত আশাবাদী হয়ে উঠলেন কেন? তাছাড়া নিজেকে একদম তলায় নামিয়ে নেওয়ার কষ্ট যে কী দুঃসহ, ঠিক সেই অবস্থায় না পড়লে কেউ সেটা বুঝতে পারবে না।' আমি ছটফট করে উঠি, জোর দিয়ে বলি, 'সবার পক্ষে যুদ্ধটা সহজ নয়, যতখানি সহজ যুদ্ধ করতে বলাটা।'

'তোমার ছবিতে কী দেখেছি আমার কাছে সেটা বড়ো কথা নয়। এক সময়ের প্রচণ্ড নেশাকে তুমি আজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ, আমার কথাটা সেখানেই। এবং এই অবজ্ঞা, এই অনীহা অথবা অভিমান, যাই বলো, জীবনের কোন পরাজয় থেকে, কোন দুঃখবোধ থেকে? সেটা ভালো কি মন্দ সে বিচারের ভার তো তোমার না', রুমাল দিয়ে মুখ মুছে তিনি আবার আমার দিকে সরাসরি তাকান, 'নিজেকে নামিয়ে নেওয়ার কষ্ট... তুমি যদি সে জন্য ছবি আঁকা ছেড়ে থাকো, আমার আপত্তিটা সেখানেই। আমি মানুষের মধ্যে কোনো রকম সম্ভাবনা, হতে পারে সেটা ছোট্ট স্ফুলিঙ্গের মতো, ঝলসে উঠে মরে যেতে দেখতে খুব কষ্ট পাই। যুদ্ধ সব সময়ই কঠিন, সবার জন্যই। প্রায় সবকিছু সহজ করে নেওয়াটাই মানুষের জন্য পরম স্বস্তিকর।'

'শুরুর সময় নেশাটাই প্রধান ছিল, অত কিছু তখন ভাবিনি।' আমি বলি, 'তাছাড়া পৃথিবীর আরও সব লোক থাকতে আপনি আমাকে কেন জাগিয়ে তুলতে চাইছেন? এক বেলার পরিচয়ের সূত্রে ব্যাপারটা একটু বেশি নাটকীয় নয় কী?'

'আমার এইরকম চলে আসা, এতক্ষণ ধরে কথা বলা সেটাওতো নাটকীয়।'

'কিন্তু কেন এতসব নাটকীয়তা? বিষয়টি কি কোনো পূর্ব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জন্ম নেওয়া? এবার আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ছেলেমানুষের মতো হেসে ফেলি, 'আপনার মনে এমন কোনো অনুতাপ আছে, যার শোধ আপনি এভাবে করতে চাইছেন?'

ভীষণ গম্ভীর হয়ে ওঠেন তিনি। এবার আমার ভয়ের পালা। প্রখর যুক্তিবান মানুষটি ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে উঠছেন। আমি ভেতরে ছুটি। কী নাস্তা পাঠাতে হবে শানু জানতে চায়। আমার তখন চরম বিব্রতকর অবস্থা। অবশ্য তার থেকেই শানুই আমাকে উদ্ধার করে। গুরুত্বপূর্ণ গেস্ট ভেবে বস্তির একটা ছেলেকে দিয়ে সে-ই নাস্তা আনিয়ে নিয়েছে। নাহ্ মেয়েটা সত্যি সত্যি ভালো। শানুকে আমার নতুন করে ভালো লাগে।

টেবিলে নাস্তা সাজিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে বলি, 'প্রচণ্ড গরম। আপনার যে খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি। এমন ঘিঞ্জি গলিতে আগে আর কখনো নিশ্চয়ই আসা হয়নি?' তিনি তেমনই গম্ভীর, আমার কথার জবাবে কিছু বললেন না।

দিন কয়েক টান দিয়েছি, অস্বস্তির সাথে সাথে এক ধরনের তীব্র পুলকও বোধ করি। হেঁটে দরজার কাছে যাই, মূলত অস্বস্তি এড়াতেই, একটু বাতাসের আশায় দরজা মেলে দিচ্ছি, দেখি আবছামতো একটু দূরে, ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বস্তির সেই শিশুটি। ন্যাংটো, মুখে আঙুল। প্রতিদিন যে শিশুটি আমার অনন্ত সুখের উৎস ছিল, দিন কয়েক তাকেও আমি বেমালুম ভুলে ছিলাম। উজাড় করা মায়ায় আপ্লুত হয়ে বারান্দা ধরে হেঁটে যাই, ভেতরে শানু। কেমন উত্তেজনা কাজ করছে, 'হেই... হেই... কাল্লু' ওকে ফিসফিসিয়ে ডাকি, কিন্তু ও পিছিয়ে যাচ্ছে—কোমরে অস্পষ্ট ঝুন ঝুন... আমার সন্তানের সাথে এর অস্তিত্ব মিশিয়ে আমি কতদিন... নিজের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত কতদিন... আসলে তো ওকে আমি ভালোবাসি না, ভালোবাসি ওর ভেতরে বাস করা আর একজনকে। ও খোলসমাত্র, ওর সাথে আমার যা কিছু, তার পুরোটাই প্রতারণা—আমি এগোই, ওই খোলসটার দিকেই। বারান্দা থেকে নীচে নেমে যাই, ওর এই আচরণ অস্বাভাবিক, নিশ্চয়ই শানু ওকে ঠ্যাঙানি দিয়েছে।

'হেই... কাল্লু...' অন্ধকারের অস্পষ্টতায় আমার কণ্ঠে ফিসফিস তরঙ্গ কাঁপে— 'আয়-আয়'। উলটোমুখি দৌড় দেয় সে। ফাঁকা স্যাঁতসেঁতে কুৎসিত বস্তির মধ্যে তার ছোট্ট শরীরখানা মিলিয়ে যায়। কতক্ষণ থির দাঁড়িয়ে থাকি। একে একে সব খুইয়ে ফেলছি, ওর মার জন্যও হঠাৎ মায়া উপচে পড়তে থাকে। সেদিন সারারাত মহিলাটিকে সইতে হয়েছিল কী অপরিসীম গঞ্জনা, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। যা কিছু ঘটেছে, সেখানে আমি তৃতীয় পক্ষ। আমি কখনও ওই ঘটনার গভীর কষ্টের জায়গাটায় প্রবেশ করতে পারব না। এছাড়া যিনি সেই নাটকের নায়ক, তাকেই যদি শানু মন উজাড় করে গ্রহণ করতে পারে, সেখানে এই মহিলাকে মাঝখান থেকে ক্রিমিনাল বানিয়ে কী লাভ?

অবোধ সেই শিশুর অন্ধকারে মিশে যাওয়ার কষ্ট নিয়ে ঘরে ঢুকি। ভেতর থেকে কষ্টের সেই চাপটাকে ফুঁ দিয়ে ওড়াতে চাই, 'আপনি নাকি রিটায়ার করার পাঁচ বছর আগেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, চাচি সেদিন বললেন, আমার খুব অবাক লেগেছিল। অদ্ভুত মানুষতো আপনি!'

কিন্তু তিনি কিছু ভাবছেন। আমার একটিমাত্র কথার বাণেই তার এই বিপর্যস্ত অবস্থা, আমার সামনে একটি দুর্বলতার প্রায় খোলামেলা উদ্ঘাটন। এবার বিরক্তবোধ করি, প্রশ্ন মেলে ধরি, 'সারাদিন কী করে সময় কাটান? আমার তো দম ফেলবারই সময় নেই। আপনি তো আমার মতো এরকম একটা ঘরে থাকবার কথা ভাবতেও পারেন না, তাই না?' এই রকম খুচরো কথা চালাতে থাকি।

নিঃশব্দে চায়ের কাপ হাতে নেন তিনি। জীবনে এই প্রথম তাঁর বয়সী একজন লোকের সঙ্গে কখনো সিরিয়াস,

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কখনো হালকা, কখনো সরস, কখনো এলোমেলো কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু হঠাৎ কী মনে হতেই ভাবি, আচ্ছা, যেভাবে কথা বলছি, বেয়াদবি হয়ে যাচ্ছে নাতো? ক্রমশ তিনি আমার সহজাত ঘোরের মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকেন। আসলেই কি তিনি আমার ঘরে এসেছেন, কারও সাথে আমার তর্ক হয়েছে? পুরোটাই বইয়ের ঘোরে ডুবে থাকার বিভ্রম নয়তো? দৃষ্টি প্রসারিত করি। কেমন ঝাপসা লাগছে সবকিছু। আমি মিশ্র প্রতিক্রিয়ার শিকার হই। কী জটিল বিভ্রান্তি, গুলিয়ে ফেলি সবকিছু। খিলখিল হাসি, আমার সাথে অবিশ্রান্ত আধোকণ্ঠের বকবক... শিশুটি কেন ওখানে দাঁড়িয়েছিল? ওই অন্ধকারে? শিশুরা কি অন্তর্যামী? আমার ভান করার ব্যাপারটা কি ও টের পেয়েছে? ওর মায়ের উঠিয়ে দেওয়া ভয়ের দেয়াল এতটাই উঁচু, ও যা কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে না? এসে দাঁড়ায় পুরোনো অভ্যাসে, মায়ার টানে... তারপর কী ভয়, কী বাধা উলটোমুখী দৌড়... দৌড়।

'শোনো নীনা', নিস্তব্ধ ঘরে অকস্মাৎ তার স্বরের ধ্বনি,জানি না তুমি আমাকে কীভাবে গ্রহণ করেছ! কিন্তু তোমার ভাবনার সমান্তরালেই যে দাঁড়িয়ে থাকবে আমার স্বভাব বৈশিষ্ট্য, এমন দাবি তুমি করবে এতটা যুক্তিহীনও আমি তোমাকে ভাবতে পারি না। সহজ দৃষ্টিতে দেখতে পারলে জীবনের অনেক চাপ কমে যায়। তুমি তোমার পেইন্টিংয়ের পেছনে আমার উৎসাহের কারণ হিসেবে যার ইঙ্গিত করেছ, সে প্রসঙ্গে আমি খুব স্পষ্ট করে বলতে পারি যে, অনুতাপ করার মতো আমার জীবনে কিছুই ঘটেনি। আমি বিশ্বাস করি, অনুতাপেই পাপ নিহিত... বলে তিনি থামলেন। ধূমায়িত চায়ে চুমুক দিলেন।

নিঃশব্দ সময় পেরিয়ে যায়, স্পষ্ট চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি ফের বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, একটি ভুলের অন্যরকম খেসারত মানুষ অনুতাপের ভেতর দিয়েই দিতে চায়, যা দিয়ে সে এক সময় মন থেকে সেই বিষয়টাকে মৃত করে দিয়ে ঝাড়া হাত-পা হয়ে যায়। অনুতাপের খেসারত দিয়ে কোনো বিষয়কে তুচ্ছ করে ফেলা আমার ধাতে নেই। তাছাড়া আমার জীবনের সবকিছুর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। যা জন্ম নিয়েছিল এবং যে বিষয়ের মধ্যে আমি এক সময় ছিলাম। পরবর্তী জীবনে প্রায়শ্চিত্তের বিনিময়ে মন থেকে মুছে আমি সুখে বাস করতে থাকব, এ-ধরনের সহজ সাপটা ফাঁকির ব্যাপারটাকে যে-কোনো সচেতন মানুষই ঘৃণা করবে, অন্তত আমি করি।'

চা শেষ করে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। এবার আমার পালা। কী এক ঢেউ, ভেতর থেকে ধাক্কা দিচ্ছে, এত কথা... পৃথিবী জুড়ে, এত কথার কারুকাজ! কেমন ক্লান্ত লাগছে... তবুও শুরু যখন করেছি, তার থেকে হুট করে আমি বেরিয়েও তো আসতে পারি না। বলি, 'আপনি এটা কী বলছেন, পৃথিবীর সভ্য মানুষই অনুতপ্ত হয়। যে নিজের ভুলকে ভুল মনে করে না, যার ভেতর কোনো গ্লানি নেই, সে সুস্থ মানুষ হয় কী করে? আপনি একজন খুনির কথা ধরুন। সে টাকার জন্য একটি মানুষকে খুন করল... ধরা যাক, তার কোনো শাস্তি হচ্ছে না— আমাদের দেশে এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু সবাই চলে গেল, একাকী একটি ঘরে সে শুয়ে আছে, আত্মার কাছে সে কোনো জবাবদিহি করছে না—এ-রকম ক্ষেত্রে আপনি তাকে কী বলবেন? এই যে লোকটা অনুতপ্ত হচ্ছে না, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ছে, অনুতপ্ত হলে কি সে পাপী হয়ে যেত? বলতে বলতে আমি কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ি, অনুতপ্ত হয় না একমাত্র সেই মানুষ, যে কেবল নিজের সিদ্ধান্তকেই সর্বোচ্চ মূল্য দেয়, যে দাম্ভিক, আত্মার কাছে যে শুদ্ধ নয়। ভাড়াটে খুনিরা অনেকটা ওরকমের হয়।'

কিন্তু আশ্চর্য! আমার এমন একটা ধাক্কা খেয়েও তিনি স্থির। নিঃশব্দে একটু দাঁড়িয়ে আবার বসলেন। একটা ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে তাই দিয়ে নিজেকে বাতাস করতে করতে তিনি আবার শান্ত স্বরে বলতে থাকেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘এক্ষেত্রে খুনিও তার আত্মার কাছে পরিষ্কার। সে যদি জানতই কাজটা তার অন্যায় হচ্ছে, তাহলে সে খুন করত না।’

তার যুক্তির জবাবে আমি এবার প্রায় চেঁচিয়ে উঠি, ‘কী আশ্চর্য! আপনি এটাকে সাপোর্ট করবেন? মানুষ হয়তো ভুলটা অন্যায় জেনে করে না, তখন হয়তো আত্মার কাছে সে পরিষ্কার, কিন্তু পরে? সে যদি তার ঝোঁকের মাথায় করা কঠিনতম দোষটা ধরতেই না পারল, আপনি তাকে শুদ্ধ সচেতন মানুষ বলবেন?’

‘সত্যি বলতে কি, আমার কাছে অনুতাপকে একটা ফাঁকি মনে হয়’, তিনি তার অবস্থানে তখনও অনড়, ‘মানুষ অনুতাপ দিয়ে তার গভীরতর অন্যায় থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়। এর ভেতর দিয়ে তার সেই মূল অন্যায়ের ভার কমে যায়।’

‘আপনি ভুল বলছেন’, আমি বলে উঠি, ‘এভাবেই তার মূল অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়।’

‘গভীরতর একটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে অনুতাপের ভেতর দিয়ে করবে?’ আশ্চর্য স্থির তার গলা, ‘এভাবে সে নিজের ভেতর থেকে পালাবে?’

‘আপনি বোধহয় তার বাহ্যিক শাস্তি প্রেফার করেন? যেমন একটি চোরের গণপিটুনি? একজন খুনির ফাঁসি... আমি আরও সূক্ষ্মতা থেকে কথাগুলো বলছি’, অসহিষ্ণু গলার সঙ্গে বলে চলি, ‘আমি চাই আত্মার শাস্তি। আত্মার শাস্তির ভেতর দিয়ে মানুষ শুদ্ধ হয়ে ওঠে।’

ঘরের গুমোটতা ক্রমেই বাড়ছে। সেই সাথে বাড়ছে রাতের বয়স। বস্তির ভেতর থেকে হই-হুল্লোড়, চিৎকার ভেসে আসছে। এরা অনেক রাত অবধি অহেতুক হই-হল্লা করে। পাশাপাশি মাইকের মাতাল শব্দতো রয়েছেই। দিনরাত এখানে হিন্দি ফিল্মের গান বাজে। সামনের রেস্টুরেন্ট থেকে পরোটা ভাজার গন্ধ আসছে। এসবের মধ্যে তিনি ভয়ানক ঘামছেন, দেখে তর্ক করার স্পৃহাটা কেমন মিইয়ে আসতে থাকে। আসলে আমার সঙ্গে কথা বলতে ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করছেন? অবাক ব্যাপার, স্বল্প পরিচয়ের এই মানুষটিকে আমার আর দূরের বলে মনে হচ্ছে না। তার সঙ্গে সমান তালে চালিয়ে যেতে পারার যন্ত্রণাকর একটা আনন্দও আমাকে অভিভূত করছে। তিনি এবার ধীরে মাথা নাড়েন, ‘আমি তোমার যুক্তিকে পুরোপুরি অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমরা যুক্তিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে মূল বিষয় থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি’—বলতে বলতে তিনি সযত্নে চায়ের কাপটা টেবিলে জায়গামতো রাখেন। তারপর সোজা হয়ে বসে সোজা আমার মুখের দিকে তাকান, ‘কথা হচ্ছিল, অনুতাপের খেসারত নিয়ে। পৃথিবীর সব পাপকে তুমি এক সমান্তরালে দাঁড় করাচ্ছ কেন? চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণ, পরকীয়াপ্রেম, নাস্তিকতা... সবকিছু কি পাপ? প্রেম একটা পুণ্যের বিষয়, কিন্তু এই প্রেমই স্বামীর অগোচরে কেউ যদি করে সামাজিকভাবে সেটা পাপ হিসেবে চিহ্নিত হবে। কিন্তু যে দুজন এর সাথে সম্পৃক্ত, তাদের কাছে এটা মহাপুণ্যের মনে হতে পারে। তর্কের খাতিরেও সবকিছু এক পাল্লায় ফেলে মাপলে চলবে কেন? এখন ওসব তর্ক বাদ দিয়ে আমরা আমাদের প্রসঙ্গে আসতে পারি, কী বলো?’ তিনি যেন হঠাৎ হাওয়া পালটাতে চাইলেন। আমি ‘বলুন’ বলে কেমন থিতিয়ে আসতে থাকি।

‘আমি আমার জীবনের একটি অধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যে অধ্যায়ের প্রতি আমার ভেতর শ্রদ্ধা আছে, তাকে আমি অনুতাপ দিয়ে ছোটো করব কেন? অনুতাপ হলেই না তার খেসারতের প্রশ্ন। অনুতাপকে সেই অর্থেই আমি পাপ হিসেবে ইঙ্গিত করেছি। আগেই বলেছি অনুতাপের পরবর্তী অধ্যায়ই খেসারত। মানুষ গভীর অন্যায় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্থূলভাবে তার খেসারত দিয়ে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু আমি আমার এই যুক্তিও শাশ্বত

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বলে দাবি করছি না। তোমার মতো আমিও আমার সময়কে বেশি গুরুত্ব দিই। কিন্তু সময় কি দাঁড়িয়ে থাকে নীনা?' এইবার যেন ভীষণ উঁচু একটা দালান থেকে উদোম গায়ে নেমে আসতে থাকেন তিনি। 'সিঁড়ি ভাঙতে গেলে হাঁপাতে হয়, চুলে পাক ধরেছে। পঞ্চপাণ্ডবের কথা জানোতো? কী প্রবল যুদ্ধ, রক্তক্ষয়, মৃত্যু...। যুদ্ধ শেষ হলে কী হতাশা! কেন এই হত্যা? রক্ত? কার মৃত্যু হয়েছে? সবাই তো তার আপনজন, আত্মীয়। শেষে সে রওনা হল মহাপ্রস্থানের পথে। কত পথ... কী দীর্ঘ সেই যাত্রা! বুকের মধ্যে কত তোলপাড়... কত নদী... খাল। একে একে সবাই হাঁপিয়ে পথের মধ্যে থেমে পড়ল। বাকি রইল যুধিষ্ঠির। কী দারুণ মনোবল নিয়ে সে একাই সেই দীর্ঘপথ ধরে হেঁটে গেল। নীনা, মিছিমিছিই এতটা পথ পেরিয়ে এসেছি। একবার সব খুইয়ে ভেবেছিলাম যুধিষ্ঠির হব। কার জন্য অনুতাপ? কার জন্য খেসারত? সবাই কি আমার নিজের মানুষ ছিল না? আমি নিজেই বিরাট একটা পথের ওপর মুখ-থুবড়ে-পড়া মানুষ। আমার সামান্য উৎসাহে তুমি যদি আবার শুরু করতে পার, আমি ভালো বোধ করব। এর মধ্যে কোনোরকম ভণ্ডামি নেই, তেমন স্থূল কোনো উদ্দেশ্য নেই, আকারে-ইঙ্গিতে তুমি যেটা বোঝাতে চেয়েছ।'

কী অবসাদ! চারপাশে আবার ছায়া। মনে হচ্ছে ধূসর ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে আমার পুরো অস্তিত্ব পাক খাচ্ছে। ঘুরছে। এবার সত্যিই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে নিঃশব্দে বারান্দায় এসে একটু থেমে আমাকে স্পন্দিত করে অনুচ্চস্বরে বললেন, 'এও আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা। এসে ভালোই হল। না এলে জীবনে অনেক বড়ো কিছু থেকে বঞ্চিত হতাম।'

'আমি আপনার বাসায় যাব', তিনি রাস্তায় নেমে গেলে প্রায় চিৎকার করেই বলি, 'আপনার সেই ইজেলটা অবশ্যই নিয়ে আসব।'

অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসেন তিনি এবং ল্যাম্পপোস্টের মৃদু আলোয় সামনের নোংরা অমসৃণ দুর্গন্ধযুক্ত গলির পথ ধরে তার দীর্ঘ দেহটা ক্রমেই মিলিয়ে যেতে থাকে। একটা মাদি কুকুরের ওপর হামলে পড়েছে একটা পুরুষ কুকুর। বস্তির ভেতরে কেউ মায়াকান্না জুড়ে দেয়, সেই কান্না ছাপিয়ে ওঠে টিন-পেটানোর শব্দ। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। কামড়াকামড়িরত কুকুরদুটো এবার বস্তির দিকে হাঁটা দেয়। এইসব দেখা শেষে এক সময় ঘরে আসি। মহাপ্রস্থানের পথে মুখ-থুবড়ে-পড়া যুধিষ্ঠিরের দেহ আমার চেতনা তোলপাড় করে। না, এ তার বিনয়। তিনি মুখ থুবড়ে পড়েননি, তার প্রতিটি অভিব্যক্তিতে সেই সুদৃঢ়-ভঙ্গিটিই প্রকট। ভাবতে ভাবতে নতুন করে বিস্ময়ের ঘোরে তলিয়ে যাই। পুরো ঘটনাটিকেই আমার জীবনের সাথে সামঞ্জস্যহীন ভ্রম বলে মনে হতে থাকে। আমার এই গুরুত্বহীন, নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত বেঁচে থাকার মধ্যে তার এই উপস্থিতি, আমার পেইন্টিং, কিংবা আঁকাআঁকির ব্যাপারে তার এতটা গুরুত্ব দেওয়া, এখন সেসব বন্ধ বলে আবার শুরু করতে তার অনুপ্রেরণা-মেশানো তাগিদ, সবার ওপরে এসব কিছুকে এতটা মূল্য দেওয়া—আমার প্রাত্যহিকতার সাথে ঠিক মেলে না। একান্ত নিজের মতো করে বেঁচে থাকার চেয়ে আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ আর কিছু নেই। এর পেছনে যদি মার ছায়াও থেকে থাকে, থাক না, তাতে কী! আমি আমার স্বকীয়তা নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছি। তাতে করে মার সম্মান আরও বেড়েছে। তাঁর মেয়ে নিজের দারিদ্র্যের বিপন্নতা নিয়ে কারও পায়ের কাছে নত হয়নি। হঠাৎ কী হয়, মার জন্য মনটা কেমন করে ওঠে। আমার সেই মা, একদিনের জন্যও তিনি সংসারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলেন না। কী যে ভয়াবহ ছিল সেই দিনগুলো! চরম দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধ করে, সংসারের ক্রমাগত পেষণে, তাঁর ভেতর থেকে স্নেহ আর ভালোবাসার অবলুপ্তি ঘটছিল। চালের সাথে নুন জোড়া দিতে দিতে সারাক্ষণ মেজাজ খিটখিটে থাকত। কোনোদিন তিনি বাবার শ্রদ্ধা পাননি। সংসারের একশোটা ফুটো বন্ধ করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

নানা সূক্ষ্ম চাতুরি তিনি রপ্ত করতে শিখেছিলেন। তাঁর ভেতর থেকে সরলতা, সততা এই শব্দগুলো ক্রমেই অপসৃত হচ্ছিল। আর তাঁর সেদিনকার আচরণতো অভিনব। মনে পড়ে, একদিন পাশের বাড়ির একটি মুরগি রানু নিঃশব্দে জবাই করে চুলোয় চড়িয়ে দেয়। মা অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে ব্যাপারটা না দেখার ভান করেন। শেষে মুরগির মালিক এলে, মা কিছুই জানেন না এমন অভিনয় করে কী বিচিত্র স্বরে গলা টেনে বলেছিলেন, 'আহা! কেমন লাগে বলেন তো, জলজ্যান্ত একটা মুরগি হারিয়ে গেল! দেশটা আসলে চোর-ছ্যাঁচোড়ে ভরে গেছে।' এও দেখেছি, আমাদের চাচাদের কাছে টাকা চাইতে গেলে, প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই কাঁদতেন তিনি। বলা যায়, আমাদের জন্যই নিজেকে তিনি নামাতে নামাতে এমন নিচুতে নিয়ে ঠেকিয়েছিলেন যে, তাঁর জন্য আমাদের অনুভব, অনুরক্তি আর শ্রদ্ধাবোধের সবকিছুই উবে গিয়েছিল। মার মতো অমন আর্ট-কালচার-বিবর্জিত ক্ষয়িষ্ণু মহিলার ছায়া যদি পড়েও থাকে ভদ্রলোকের বোধে ও বিচারে, তবুও আমার অহংকারে কিছুমাত্র আঘাত লাগবে না।

এক সময় আমার শরীর হিম কাঁপিয়ে টেকো মজুমদারের আবির্ভাব ঘটে। বিছানায় বসেছিলাম, দেয়ালে হেলান দিয়ে, মগজে সহস্র ক্রিয়া, আসলেই কি চাঁদের নীচে আমাকে শুইয়ে দিলে সব ভাঁজ খুলে দেব? এতটাই কাঙাল হয়ে আছি? চন্দ্র কি অপদেবতা? আমাকে বিবশ, শ্লথ করে তুলবে? আমি তো বিয়ের রাতে বেহুলাই ছিলাম, তিল পরিমাণ সমস্ত ফুটোফাটা বন্ধ করে যখন সমর্পিত হতে যাচ্ছিলাম লখিন্দরের বুকে, তখুনি কী করে যেন প্রবেশ করে মনসা! তবে কি আত্মার দরজা দিয়ে আসা? মনসাই কি ছিল আমার যথার্থ প্রেমিক? বুকের মধ্যে বেজে ওঠে কান্নার কীর্তন।

আমার এরকম চিরকালীন দ্বন্দ্বের ছায়াপ্রাচীর বড়ো হয়ে উঠতে থাকলে দুর্ভেদ্যতা অতিক্রম করে রানু হেঁটে আসে, মজুমদারও, আমি সেই দৃশ্যের দিকে দীর্ঘদিন পর দর্শক হয়ে তাকিয়ে থাকি।

আমাদের বাসার ক-টা বিল্ডিং পর মজুমদারের হাফ বিল্ডিং ছিল? গুনতে থাকি। তিনটে বাসা ছিল মাঝখানে। এই লোকটার চোখের সামনেই আমরা জন্মেছি, বড়োও হয়েছি। পোড়ো সেই বাড়িতে সে একাই থাকত। বড়ো হয়ে জেনেছি, তার স্ত্রী-কন্যারা সবসময় দেশের বাড়িতেই থাকে। ছেলে-সন্তান-জন্ম দেয়নি বলে বউকে ঘৃণা করত সে। তবে আর বিয়ে করেনি কেন? তার সম্পর্কে এরকম সহস্র প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিল না। তার বিল্ডিং ছিল আধাআধি তৈরি। এর পেছনকার আজব কাহিনিটিও সেই ছেলেবেলা থেকেই আমাদের কাছে তাকে রহস্যময় করে তুলেছে। বিল্ডিং-এর কাজ যখন আধাআধি, এক রাতে স্বপ্নে দেখে, সে যদি গোটা বিল্ডিংটা তৈরি করে, তবে তার চাপে পড়ে তার মৃত্যু হবে। সে জন্যই এ কাজে সে আর এগোয়নি। মজুমদার স্বপ্নবান। তার সব স্বপ্নই ফলে যায় বলে স্বপ্নকেই নিজের ঘাতক মনে করে সে।

মজুমদার! শব্দটা উচ্চারণের সাথে সাথে যে বিদঘুটে অবয়ব আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়, আমি তার সঠিক বর্ণনা দিতে পারব না। তবে তার চোখের ওপর ভ্রূ ছিল না। ডুমুর দানার মতো বীভৎস লাল চোখ, ভাঙা চোয়ালে বিশাল কালো জরুল। জরুলের ভেতর দিয়ে বেড়ে ওঠা গুচ্ছ চুল। স্পষ্ট মনে হত একটা কুনো ব্যাং বসে আছে। মুখ জুড়ে যা বিখ্যাত, সে ছিল তার নাক। সবচেয়ে ভয়াবহ নাকের দুটো কালো গর্ত। দশাসই শরীর। প্রায় সাত ফুট লম্বা। উচ্চতার সাথে চরম বেখাপ্পা তার দুটো হাত—অসম্ভব সরু আর খাটো। তার পোশাকও ছিল বেঢপ, বিচিত্র। কালো পাঞ্জাবির নীচে ঝুলঝুল করত গাঢ় লাল পাজামা।

আমাদের শহরে বিখ্যাত ছিল সে তান্ত্রিক হিসেবে। তার দেখা স্বপ্নকে সবাই সমীহ করত। সুদখোর হিসেবেও ছিল তার কুখ্যাতি। বলতে গেলে পাড়ার নিম্নবিত্ত সমস্ত পরিবারই ছিল তার সেই টাকার কাছে জিম্মি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

এসবেরই একটা ছিল আমাদের পরিবার। এবং এমন একটা লোকের কাছে সেই ছোট্ট বেলায় মা যখন আমাকে টাকা আনতে পাঠাতেন, আমার রক্ত জমাট বেঁধে দই হয়ে যেত। যেতে না চাইলে, সংসারের সহজ হিসেবে, পরের বেলা খাওয়া বন্ধ, ফলে যেতে বাধ্য হতাম। যতবার গিয়েছি, তার অদ্ভুত আচরণে মনের ভয় দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে। একদিন সন্ধ্যায় তার ঘরে গিয়ে দেখি, সমস্ত ঘরে ধূপের ধোঁয়া। বাতি নেভানো। আমি গিয়ে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ঘরে সে জ্বালিয়ে দিল কুপির শিখা। তারপর চোখ বন্ধ করে বিড় বিড় করে একনাগাড়ে বলতে লাগল—'দোহাই! দোহাই! জিন-পরির... সাত আসমানের...' মজুমদারের সামনের পাটিতে দুটো দাঁত নেই, ফলে কালো মোটা ঠোঁট জোড়া ফুঁড়ে লকলকে জিভে বেরিয়ে পড়ে। তার জিভের এই আচরণ তাকে ক্রমশ আরও ভয়াবহ করে তুলতে থাকে। আর তাই দেখে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে বাসায় এসে আমি হাঁপাতে থাকি। মার চোখ জ্বলজ্বলে, 'দিল'? আমি নিরুত্তর। মা আরেকটু কাছে আসে, 'ধমক দিয়েছে?' আমি ভয়ে ভয়ে সব খুলে বলতেই মা বললেন, 'লোকটা তান্ত্রিক। গায়েবি ক্ষমতা আছে। তোর বাবা বলে, সারারাত সে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। আল্লা-ভগবান দুজনকেই ডাকে।'

কী ভয়াবহ কথা! এরকম একজন লোকের কাছে মা আমাকে অবলীলায় পাঠায়? আমার প্রতি তার কি একটু দয়ামায়া নেই? রানুর অবস্থা ছিল আমার চেয়েও মারাত্মক। জন্মের পর থেকে রানুর মধ্যে ভয় বলে কোনো কিছু ছিল না। অথচ সেই রানুরও একমাত্র আতঙ্ক মজুমদার! তাকে দেখলে ভয়ে সে এতটুকু হয়ে যেত।

রানুর যখন তিনমাস বয়স, তখন মজুমদার একদিন তাকে হাত বাড়িয়ে কোলে নিয়েছিল। চোখ মেলে তার মুখ দেখে রানু এমন ভয়ংকর জোরে চিৎকার দিয়ে উঠেছিল যে, সন্ত্রস্ত মা তাকে বুকে টেনে নিয়েছিল। কত ছোটোবেলার কথা, অথচ সেই দৃশ্য আমার চোখে এখনও স্পষ্ট। রানুর ভয় দেখে মজুমদার কী রকম ক্রূর আর বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। পাড়ার মধ্যে তার এমন একটা প্রভাব ছিল, তার সম্পর্কে যে ভয়, সেটা কেউ তার সামনাসামনি প্রকাশ করত না। আমাদের সেই ঘিঞ্জি পাড়ার প্রত্যেকের আর্থিক অবস্থা ছিল এক ও অভিন্ন চেহারার। অর্থাৎ সচ্ছলতা ছিল প্রত্যেকের নাগালের বাইরে। ফলে মজুমদারকে তোয়াজ করা ছাড়া আর কারো কোনো গত্যন্তর ছিল না। মজুমদারের স্বাভাবিক ব্যবহার ছিল ভদ্র আর নরম। কিন্তু টাকা শোধ করতে না পারার অক্ষমতায় অনেক ভদ্রলোককে আমি তার পা জড়িয়ে কাঁদতে দেখেছি। নিষ্ঠুরতা ছাড়া এ ব্যাবসায় প্রফিট নেই। তার নিজেরও কথা ছিল তাই।

আমাদের চোখের সামনেই মজুমদার দেখতে দেখতে চরম বিত্তবান আর চূড়ান্ত ক্ষমতাধর হয়ে উঠল। সবকিছুর মূলে তার ওই সুদের ব্যাবসা। তার কাছে দেনার দায়ে কতজন যে সর্বস্ব হারিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, তার গোনাগুনতি নেই। এসবের অনেক কিছু পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শোনা, কিছু কিছু আমার একেবারে নিজের চোখে দেখা। এসবই হত মজুমদারের সুদ পাহাড় সমান হয়ে যাওয়ায়। তারপরও কিন্তু তার প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করতে পারত না। তাই ভয়ে জমে গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করতাম, 'আপনারা কেন ওর কাছ থেকে টাকা আনেন? আমাদেরও যদি কোনোদিন বাড়ি থেকে বের করে দেয়?'

'আমরা তো অত বেশি টাকা নিই না'—মা আমাকে বুঝিয়েছিলেন। 'মাসের মাঝামাঝি তার কাছ থেকে টাকা আনি, তোর বাবা মাস পয়লা বেতন পেলে কিছু সুদ দিয়ে টাকাটা শোধ করে দেয়। এ ছাড়া বাঁচব কী করে?' আমি সেই বয়সে অত হিসেব মেলাতে পারতাম না। কিন্তু একটা জিনিস টের পেতাম, মজুমদারের প্রতি বাবার অসীম ভক্তি। বাবা নিজে ছিলেন ধর্মভীরু মানুষ। চাকরি ফেলে তবলিগ করে বেড়াতেন। মাঝেমধ্যে মসজিদে রাত কাটাতেন। কাঁধে ছিল দু-দুটো আপন ভাইয়ের বোঝা। তাদের মানুষ করার দায়িত্ব। সংসারের খরচের

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ভয়ে বেশিরভাগ সময় টাকা-পয়সা না দিয়েই পালিয়ে বেড়াতেন। চরম সংকটের মুখে কখনও মজুমদারের পরামর্শ নিতেন। বাবা বিশ্বাস করতেন, মজুমদারের নির্দেশে তিনি জীবনের অনেক ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছেন। অবসর পেলেই বাবা তার ওখানে গিয়ে সময় কাটাতেন। তাই সংসারের সব সংকটের মুখোমুখি মাকেই হতে হত। মার আদি বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদে। তার জ্ঞাতিগুষ্টির সবাই ওখানে। তার নিজের বাবা-মা অবশ্য মারা গেছেন বেশ কিছুকাল আগে। তাই সংসারে তাকে কুণ্ঠিত হয়েই থাকতে হত। যার ফলে জোড়াতালি দিয়ে সংসার চালানোর খুব বেশি প্রতিবাদ তিনি করতে পারতেন না। এবং আমাদের সেই জোড়াতালির সাথে মজুমদারের সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। ফলে এইরকম একজনের সাথে আমাদেরই সবচেয়ে হার্দ্যিক সম্পর্ক থাকায় মা বেশ গর্ব করতেন। একদিনের একটা ঘটনা এখনও আমার চোখে জল এনে দেয়। সংসারে নয়-ছয় টাকা বুঝিয়ে দিয়ে বাবা চলে গেছেন লম্বা তবলিগে। কয়েকদিন জোড়াতালি দিয়ে চালানোর পর এক ভোরে মা এক সের গম দিয়ে আমাকে আর রানুকে পাঠিয়ে দিলেন সেটা ভাঙিয়ে আনতে। রাতে শুকনো রুটি গিলেছি। ভোরে উঠে দস্তুর মতো কাঁদতে শুরু করেছে মন্টু। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। রানুর খালি গা, তার প্যান্টটা ঝুলঝুল করছে। এক হাতে গমের পোটলা আর অন্য হাতে রানুকে ধরে হাঁটছি। প্রচণ্ড রোদ। মাথা ঝিমঝিম করছে। শূন্য ক্ষুধার্ত চোখের সামনে পাশের রেস্টুরেন্টগুলো কী জমজমাট, মোগলাই পরোটা, কিমাপুরি... রানুকে টানতে টানতে সেখান থেকে আটা কলের কাছে নিয়ে আসি। এবং প্রচণ্ড ভিড় মিলের মধ্যে গমের বস্তাটা বাড়িয়ে দিলে দোকানের হর্তাকর্তা একজন প্রায় খেঁকিয়ে ওঠে, 'আমরা এক সের করে গম ভাঙাই না।'

দাঁড়িয়ে থাকি। অনেকক্ষণ। রানুর মুখ শুকিয়ে কাঠ। জিভ দিয়ে শুধু ঠোঁট ঘষছে। 'আয় রানু হাঁটি, আয় রানু... লক্ষ্মী রানু...।'

চোখ উপচে জল আসছিল আমার।

আবারও প্রায় অনির্দিষ্ট হাঁটা। রোদে রানুর ফর্সা টকটকে গাল লাল হয়ে উঠছে। দরদরে ঘামে ওর সারা শরীর চোপসানো। কী দূরতিক্রম্য, ভঙ্গুর সেই পথ! হাঁটছি, শেষ হয় না। গলি, রিকশার ভিড়, স্কুল ছুটির গ্যাঞ্জাম সব পেরিয়ে আর-এক আটার কলে। সেখানেও একইরকম ভেংচি। রানু হাউমাউ কাঁদতে শুরু করে। আমি অনেক কাকুতিমিনতি করি। আটার কলের কর্মচারীরা কি আমাদের ভিখিরিটিখিরি ভাবছে? নিজের পোশাকের দিকে তাকাই। চাচাতো বোনের দেওয়া পুরোনো ঝুলঝুলে জামাটা হাঁটুর তল অবধি গড়াগড়ি খাচ্ছে। ধুলোয় পুরো গা ডুবে আছে। রুক্ষ চুলের একটা বেণি লটপট করছে ঘাড়ের ওপর। সেই প্রথম নিজেকে ভীষণ অপমানিত আর ছোটো বোধ হয়। রানুকে টেনে বাইরে আনি। অনুজ্জ্বল আলোর পথ ধরে কসাইপট্টি অতিক্রম করি। লাল মাংস, সাদা মাংস, সেইসব পেরিয়ে এক সময় ক্লান্ত হয়ে রেললাইনের ওপর রানুকে বসাই। সূর্যদেবতা ঘিলুর ওপর আসন গ্রহণ করেন। রানুর নাক বেয়ে সর্দি ঝরছে। ক্রমাগত হিক্কা তুলছে সে। ধুলো আর ঘামে ঝাঁকড়া চুলো রানুর মুখটা এমন আঠালো হয়ে আছে যে, গলা দিয়ে তার কান্নার স্বরটাও নেতিয়ে বেরোচ্ছে। আমিও কেমন ঝিমিয়ে এসেছি—'হেই রানু এই রেললাইন কোথায় গিয়েছে বলতো?' রানু কাঁদছে।

'হেই রানু আমরা মরে গেলে কোথায় যাবরে?' রানু কাঁদছে।

রেললাইন টপকে টপকে হাঁটছি। ব্যথায় পা-জোড়া টন টন করছে। কেমন বনবন চক্কর দিচ্ছে মাথা। 'হেই রানু ওই দেখ লাল ঘুড্ডি।' কান্না থামিয়ে রানু ঘুড়ি দেখে, সেই দৃশ্য দেখে রানুর মুখে যে হাসি ফুটেছিল, তাকে আমি এখন মোনালিসার সেই দুর্জ্ঞেয় হাসির সাথে তুলনা দিতে পারি। নাক-মুখ ফুলে উঠেছে—এরই মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ঘুড়ি দেখে শুরু হয় ফের তার কান্না। কী করে ওকে থামাই? গা ছেড়ে দিয়েছে, কী করে ওকে বাড়ি নিয়ে যাই? গল্প শুরু করি, রানু আমরা যখন বড়ো হব, চাকরি করব, রেশমি আপার মতো বিয়ে হবে আমাদের। তুই তো সুন্দর, তোর বর তোকে কত খাবার, এই ধর পোলাও, মাংস, অনেক তরকারি, আইসক্রিম, কতকিছু খেতে দেবে! হাফপ্যান্ট টেনে হাত চোখের কাছে নিয়ে আসে রানু... মুছতে-মুছতে ম্লান উজ্জ্বলতায় এইবার প্রাণ থেকে সে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে, 'সত্যি?'

তারপর ওই রকম এক অবশ সকালের আবর্তে পাক খেতে-খেতে এক সময় পরাজিতের মতন বাসায় ফেরা। বুক ঠেলে তেতো কান্না উঠছিল, রানুর মুখে কী গুঁজে দেব? মা নিশ্চয়ই তীর্থের পাখির মতো বসে আছেন। কিন্তু না, বাসায় এসে দেখি, ডেকচিতে চাল ফুটছে। মা চাচার বাসা থেকে কিছু চালডাল নিয়ে এসেছেন। আহা! কী গন্ধ! অদ্ভুত মাদকতা সেই লাল ভাতের গন্ধে!

বাবার ফেরার কথা দু-দিন আগেই। কিন্তু ফেরেননি। দুপুরের সমস্যা না হয় মিটল, রাতের বেলা? এমনিতেই এর-তার কাছ থেকে ঋণ করি বলে পাড়ায় আমাদের ভাবমূর্তি যথেষ্ট খারাপ, কেননা, ঋণ ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের পরিবারের অক্ষমতা আর উদাসীনতা তুলনাবিহীন। আরেফিন তখন বড়ো চাচার ওখানে থাকে। বাবা দায়িত্ব নিয়েছিলেন নিজের ছোটো দু-ভাইয়ের। তাদের একজন এম এ ফাইনাল ইয়ারে, অন্যজন পাস করে চাকরি খুঁজছে। আরেফিনের দায়িত্ব নেওয়া বড়ো চাচাদের বিশাল অবস্থা। রেশমি আপার বিয়েতে সে কী রাজকীয় হইচই। তবুও কেন ছোটো দু-চাচার ভার বাবার ঘাড়ে বর্তেছিল, আমি বুঝতাম না। শুধু এইটুকু বুঝতাম বড়ো চাচাদের কাছে আমরা ছিলাম চরম অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যের পাত্র। মা ছাড়া কেউ ও বাসায় পারতপক্ষে যেত না। মা যেতেন আরেফিনকে দেখতে। সংসারের কাসুন্দি ঘেঁটে কান্নাকাটি করতে, চাচার পরিবারের কাছে যেটা ছিল জঘন্য বিরক্তিকর। বাবাকে 'অকম্মার ধাড়ি' আখ্যা দিয়ে তারপর হয়তো মার দিকে কিছু ছুঁড়ে দিতেন চাচা। বলতেন, 'আমি এখানে দানখানা খুলে বসিনি। হোপলেসটাকে বলে দিয়ো, সংসার টিকিয়ে তবে তো আল্লার নাম। তারতো এখন পথে ভিক্ষে করতে নামতে বাকি।' মা খুব যত্নের সাথে টাকাগুলো আঁচলে বেঁধে নিয়ে আসতেন। বলতেন, 'তোর চাচা মানুষ নয়, ফেরেশতা। আমার আরেফিনকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে।' কী অল্পেই না বর্তে যেতেন মহিলা! তার মান-অপমানবোধ ছিল চূড়ান্ত রকমের ভোঁতা। ছোটো চাচাদের বাবা মানুষ করছেন, সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও বড়ো চাচা এই দায়িত্বটি এড়িয়ে গেছেন। এই সহজ হিসেবটি আমার মতো এক কিশোরী বুঝলেও, সরল সেই মহিলাটি বুঝতেন না।

দুপুরে তো গরম ভাত হল। রাতে? মা বললেন, 'আজ নিশ্চয়ই তোর বাবা ফিরবেন।' বাবা ফিরছেন না, দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। মা উঠোনে বসে ক্রমাগত কেঁদে চলেছেন। তার ধৈর্যের দেয়াল ধসে যাচ্ছে। ক্রমশ নিজের জন্ম, সন্তানদের জন্ম, এসব কিছুকে ক্রমাগত অভিশাপ দিয়ে চলেছেন। এসব দেখেটেখে ভাবতে থাকি, আচ্ছা, কোনোকিছু করে আমি নিজেই কি পারি না বাসার সবার রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে? ভাবতে ভাবতে অদ্ভুত একটা ফন্দি আসে মাথায়। মনে হচ্ছিল, এটা করতে পারলে আমার অসাধারণ একটা ক্ষমতা দেখানো হয়ে যাবে। আমি আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্য হয়ে যাব। ভাবতে ভাবতে রোমাঞ্চিত হয়ে ঘরে ঢুকি। আমাদের সারা বাড়িতে অসংখ্য তেলাপোকা। ভাঙা মিটসেফের ওপর একটা বিস্কুটের সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে মা রেখে দিয়েছেন, ওটা খেয়ে তেলাপোকা মরে কী না তা-ই পরীক্ষা করে দেখার জন্য। পেটে প্রচণ্ড খিদে থাকা সত্ত্বেও, কী হয়, আমি সেই আহার সংগ্রহ মিশনের কথা ভুলে যাই। বিস্কুটটা দেখে আমার জিভে জল এসে যায়। বিষ-মাখানো বিস্কুটের টুকরোটা পাশের বাসা থেকে নিয়ে এসেছিলেন মা। অযুত-নিযুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

তেলাপোকা ঘরে, বিছানায়, রান্নাঘরে, মিটসেফের ড্রয়ারে। রাতে ঘুমুলে গায়ের ওপর দিয়ে হাঁটে। আলনার কাপড়গুলো পর্যন্ত কাটতে শুরু করেছে। আমাদের সংসারে তেলাপোকাগুলো যেন হ্যামিলনের গল্পের ইঁদুরের মতন হয়ে উঠছে। কী করে রাত যাবে? ভিক্ষে করতে বেরোব? মা তো নিজেকে ছেড়ে দিয়ে উঠোনে বসে আছেন। তার চুলে বিলি কাটছে রানু। আমি মিটসেফের সামনে দাঁড়িয়ে। সেই বয়সেই আমি কী সব অনুভূতি-অনুভবে তাড়িত হতাম—কেয়ামত, পুলসেরাত, মৃত্যু... ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতাম গোরস্থানের সামনে। বুক হু হু করত। বাবার কাছে ধর্মের গল্প শুনে শুনে আমার মনে এমন ভয় জমে গিয়েছিল যে, আল্লাহকে মনে হত ভয়ংকর কিছু। খুব কষ্ট হত আল্লাহ্ নিষ্ঠুরের মতন আমাদের কেন পৃথিবীতে পাঠালেন, এইসব ভেবে। এবং ভাবনার পাশাপাশি চোখ জোড়া প্রথম তাক করে আছি বিস্কুট সোজা। হঠাৎ দেখি একটা তেলাপোকা এগিয়ে আসছে। অন্যদিক থেকে আরেকটি। পৃথিবী ছায়া করে বিকেল চলে যাচ্ছে। আমি স্থির দাঁড়িয়ে। বিস্কুটে ঠোক্কর লাগাচ্ছে। আমার চোখের পলক পড়ছে না। শরীরের গিঁট আলগা হয়ে আসছে। একটি মৃত্যু। এর ঘাতক আমরাই... কী চমৎকার, বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে, ফুসলে...।

ক্রমাগত ঝিমিয়ে পড়ছে তেলাপোকা দুটো। তবুও বিস্কুটটা ছাড়ছে না। রানুর অতো ক্ষুধা... কেউ যদি তাকে ডেকে একটা চমৎকার বাখরখানির লোভ দেখিয়ে, কিংবা একটা জিলিপি, বিষ মেশানো, ক্ষুধার্ত রানু চকচক করে উঠছে... মুখ বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমার রগের ভেতর হিম স্রোত বইতে শুরু করে। আমি কান্না হারিয়ে ফেলি।

ঝিমুতে ঝিমুতে দুটো তেলাপোকাই উলটে গেল। আমার মধ্যে অদ্ভুত এক অনুভবের গাঢ়তা। মাকে বড়ো নিষ্ঠুর মনে হয়। মনে হয় একদিন বিস্কুট খাইয়ে মা আমাদেরকে যদি এইভাবে মেরে ফেলেন? এরকম সংসারে মজুমদার ছাড়া বাঁচার আর রাস্তা কী? কিন্তু মজুমদারকে দেখে রানু যে একশো হাত দূরে। সমস্যার সমাধান আর হয় না। বহুবার সে বহু প্রলোভনে রানুকে কাছে ডেকেছে। জন্মের পর থেকেই সে কাছে এলেই রানু চিৎকার করে ওঠে। এই নিয়ে প্রথমে ধমক, শেষে বাবা কয়েকদিন মেরেওছে রানুকে। কেননা রানুর এই ভয়ের মুখে মজুমদারের চেহারার কঠোর ভাব বাবার নজর এড়ায়নি। মজুমদার কখনো রানুর ওপর বীতস্পৃহ হোক, তার জন্য রানুর ওপর নেমে আসুক কোনো অলৌকিক শাস্তি—বাবা ভয় পেতেন। মজুমদার যেন বাবাকে সম্মোহন করে রেখেছিল। আমি মন্ত্র, ধোঁয়া এসব দেখে একবার ভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। মন্টুও খুব ছোটো। মা তাই আমাকে আবার একা পাঠালেন দৈত্যটার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসতে।

নিজের ভারী পা দুটো টেনে নিয়ে আবার আমি হাফবিল্ডিংয়ের দোরগোড়ায়। পুরো শরীর থরথর করে কাঁপছে। চারপাশে রাত নেমে এসেছে। ভেজানো দরজায় উঁকি দিয়ে দেখি, মেঝেতে শুয়ে আছে মজুমদার। আমার পায়ের শব্দে ভূতের মতন তাকায়। ইশারা করে ডাকে, 'হেই... এদিকে আয়...' ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাই।

তারপর জানতে চায়, 'কত?'

আমি বলি, 'তিরিশ টাকা।' খুব সহজ মানুষের মতো সে উঠে ড্রয়ার খুলতে থাকে। ঘরের সেই আবহাওয়া এখন উধাও। সহজ আলোয় আমিও কেমন রেশমগুটির ভাঁজ ভেঙে ঝরঝরে হয়ে উঠি। বলি, 'আচ্ছা বিছানা ছেড়ে আপনি নীচে ঘুমোন কেন?' সে উত্তর না দিয়ে আমার দিকে টাকা বাড়িয়ে দেয়। তারপর গমগমে গলায় জিজ্ঞেস করে, 'তোর বাপ এখনও ফেরেনি?' আমি অস্ফুটে উচ্চারণ করি, 'না।'

তারপর নিস্তব্ধতা। ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে আসার জন্য পা বাড়াচ্ছি হঠাৎ ঘরের বাতি নিভে যায়। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পুরো ঘর ডুবে গেলে আমি চিৎকার করার জন্য হাঁ করি। কিন্তু আমার অবশ হয়ে আসা শরীরের ভেতর থেকে কোনো শব্দ বেরোয় না। টের পাই আমার বিস্তারিত পায়ের সামনে অর্গল এবং তারপরই অকস্মাৎ পেছন থেকে আমাকে জাপটে ধরে মজুমদার। সব জানালা বন্ধ। ঘুটঘুটে অন্ধকারের ভেতরে আমার ভারশূন্য দেহটি সে শূন্যে উঠিয়ে ফেলে। আমার বুকের সবটুকু জল চুমুক দিয়ে শুষে নিল যেন কেউ। কাকুতিমিনতি করব, তার কোনো উপায় নেই, কেননা আমার কথা বলার শক্তি লোপ পেয়ে গেছে। কিছু বুঝে উঠবার আগেই সে আমাকে সেই অন্ধকারে প্রথমে দু-হাত ওপরে তোলা অবস্থাতেই চক্কর খাওয়ায়। আমার মনে হয় নীচে গভীর গহ্বর। দৈত্যরাজার তর্জনীর ওপর আমার শরীরখানা টলমল করছে। এই বুঝি পড়ে গেলাম... এই বুঝি... ভীষণ উঁচু পাহাড়ের অমসৃণ গায়ে ধাক্কা খেতে-খেতে আমার দেহটা ছিন্নভিন্ন হয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। আচমকা আমাকে সে ধপাস করে মাটির ওপর নামায়। গরমে দু-কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। পেট উগরে বমি আসছে। তারপর কী হবে? ভয়ে-উত্তেজনায় আমার মৃতপ্রায় অবস্থা। আচমকা বাতি জ্বলে ওঠে। দরদর করে ঘামছে মজুমদার। ঘামে, আঠায় মারাত্মক হয়ে উঠেছে তার চেহারা। চারপাশ কেমন অস্পষ্ট লাগছে। মনে হল এই চক্করের মধ্যে পড়ে আমার মাথার ঘিলু কচলে গেছে। কিছুক্ষণ এভাবে যায়। পরক্ষণেই শুরু হয় তার হা হা হাসি। সে হাসির কী বিকট শব্দ! মনে হল পুরো হাফবিল্ডিংটা থরথর করে কাঁপছে। দাঁতহীন মাড়ির নীচে তার লম্বা লাল জিভখানা ধাক্কা খেয়ে বেরোচ্ছে, ফের ভেতরে ঢুকছে। এক সময় যেন কাতুকুতু দিচ্ছে কেউ, এমন ভঙ্গিতে আঁকাবাঁকা হয়ে হাসতে হাসতে প্রশ্ন করে, 'খুব ভয় পেয়েছিলি, না?'

আমি বোবার মতো ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে আছি তার দিকে। ঠান্ডা, বাকস্তব্ধ।

'সন্ধ্যায় আরেকবার তুই এসেছিলি না?' মজা করার ভঙ্গিতে খিক খিক করে সে হাসে। ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ি, 'হ্যাঁ।'

'তারপর পালিয়ে গেলি কেন?'

আমি নিরুত্তর।

'কেন পালিয়ে গেলি, ভয়ে?' ভয়ানক কঠিন তার কণ্ঠস্বর। ধীরে মাথা নাড়ি, 'হ্যাঁ।'

'কী দেখে ভয় পেয়েছিলি? আমার চেহারা?'

কাঁপতে কাঁপতে বলি, 'জানি না।'

'আমার চেহারা খুব বিদঘুটে?'

'না।'

'ফের মিথ্যে বলছিস? রানু আমার চেহারা দেখে ভয় পায়, না?' আচমকা এই প্রশ্নে আমি ঘাবড়ে যাই, সহসা উত্তর খুঁজে পাই না। আমাকে সজোরে ঝাঁকুনি দেয় সে, 'বল ও আমার চেহারাকে ভয় পায় কি না?'

'হ্যাঁ।'

এবার কী এক ক্রুদ্ধতায় সমস্ত ঘরে সে চক্কর খেতে থাকে। তাকে যেন অদ্ভুত এক জান্তব খেলায় ধরেছে! চক্কর খাওয়া শেষে আমার দিকে ঠান্ডা চোখে তাকায়, 'তোকে একটা জিনিস দেখাই'—বলতে বলতে কাপড়ের পুঁটলি খুলে সে একটা বেড়ালের মৃতদেহ বার করে আনে। তার ফোলা শরীরে আঠার মতো রক্ত। আমার নাকের সামনে সেটাকে সে ঝুলিয়ে ধরে আমাকে প্রশ্ন করে, 'ভয় পাচ্ছিস?' ভয়ে আবারও আমার রক্ত দই। আর সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বলতে থাকে, 'বদজিনদের আমি হত্যা করি পশু হত্যা করে। রানুর ওপর জিন আছর করেছে। আমি তন্ন তন্ন করে সেই জিনটাকে খুঁজছি, প্রত্যেকটা প্রাণীর ভেতর। আমি নিশ্চয়ই তার সন্ধান পাব। মজুমদার পরাজিত হবে? ছোঃ।'

'বেড়াল মারলে বদজিন মরে যাবে?' আবার বোকার মতো প্রশ্ন করে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

'শুধু বেড়াল না। আরও জীবজন্তু, যেমন ধর, পাখি, খরগোস, কুকুর... এদের মধ্যে খারাপ জিনগুলো বাস করে। তাও সব কুকুর, বেড়াল না, তাদের চেহারা দেখলেই আমি বুঝতে পারি।'

'কিন্তু রানুর বদজিনটা ঠিক কার ভেতর?'

'ও একটা স্ফুলিঙ্গ। ওর মতো আগুন আমি দুনিয়ায় দেখিনি। ওর জিন যার-তার দেহে থাকবে না।'

কী অবাস্তব বিদঘুটে সব কাণ্ড। লোকটা কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? সে হঠাৎ চোখ বোজে। আবারও বিড়বিড় করে। কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে নাকের সামনে বেড়ালটা দোলাতে দোলাতে আবার তার সেই হাসি শুরু হয়। এবার আমি সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলি, 'আমি বাসায় যাব। কেন ভয় দেখাচ্ছেন আমাকে?'

'রানুর জিনটা'... বিড়বিড় করে সে, 'তোর বাপকে বলেছি, তবলিগে যাওয়ার আগে সে বিশেষভাবে এই দায়িত্বটা দিয়ে গেছে। হারামির বাচ্চাটাকে খুঁজে বের করতে চেষ্টার তাই বিরাম নেই। রানুর প্রতি আমার অন্যরকম এক মায়া আছে, বুঝলি। আমি বেঁচে থাকতে বদ জিনটাকে ছেড়ে দেব না।'

'বাবা এসব জানেন?' আমার বিস্ময় তখন চরমে।

'তাহলে কী বলিস? মুরুব্বি মানুষের অনুরোধ, নইলে শুধু মায়ার জন্য এমন রাম খাটুনি কেউ খাটে? প্রাণীর পর প্রাণী হত্যা করতে হচ্ছে, কেমন কঠিন ব্যাপার তাহলে বুঝে নে!'

এবার আমি সত্যিই চিন্তিত, পুরো ব্যাপারটা খেলো কিছু নয়। কেবল আমিই এসবের গুরুত্ব বুঝতে পারছি না। তবুও ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি, 'রানুর বদজিন যদি হাতির পেটে থাকে? খামোকা বেড়াল, পাখি মারছেন।' শুনে খেপে ওঠে সে, 'হাতি কি লোকালয়ে থাকে? বেশি পাকামো আমার সহ্য হয় না। তুই তো বেশ চালাক। মিছেই ভয়ের ভান করছিস। শোন রাতে স্বপ্নে দেখেছি, শূন্য বোতল নিয়ে আমি ঘুরছি। এই স্বপ্নের অর্থ আমি গরিব ঘরের বউ পাব। তুই রানুকে বোঝাবি। আমি ওকে পছন্দ করি। আমি ওর মঙ্গল চাই।'

'আমি বাসায় যাব', গলায় কান্না আটকে আবার মিনতি করি।

'যা না, আমি কি বাধা দিয়েছি তোকে?' খেঁকিয়ে ওঠে সে। পায়ে এক পৃথিবীর চাপ নিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে দরজার কাছে যাই। আমার গলায় দম আটকে থাকে। এই বুঝি পেছন থেকে থাবা দিল কেউ, এই বুঝি আমার দেহটা শূন্যে উঠে গেল।

পা-পা করে বেরিয়ে রাস্তায় নেমেই দৌড়, দৌড়...।

বাসায় এসে মার কাছে টাকাগুলো দিয়ে আমি হাউমাউ কাঁদতে থাকি। মা ভীষণ ভয় পেয়ে যান, 'এত দেরি হল কেন? কোথাও গেলে খবর থাকে না।' আমার কান্না ক্রমেই বাড়ছে।

মা কেমন ঠান্ডা হয়ে যান। আমাকে টেনে রান্নাঘরে নিয়ে ফিসফিস করে প্রশ্ন করেন, 'কীরে, কাঁদছিস কেন?'

মিটসেফের ওপর থেকে তেলাপোকা ঝাঁপ দেয়, আমি নিরুত্তর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

মার কণ্ঠ আরও চাপা, 'তোকে খারাপ কিছু বলেছে? কিছু বলছিস না যে?' মার প্রশ্নের মুখে আমার কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেলে মা আমাকে ধাক্কা দিয়ে রান্নাঘরের একদম কোনায় নিয়ে যান। তারপর গলায় সন্তর্পনে গাঢ়তা এনে জিগ্যেস করেন, 'তোর কাপড় খুলেছিল?'

আমি মাথা নাড়ি, 'না।'

'খারাপ কোনো ইঙ্গিত দিয়েছে?'

'না।'

হাঁপ ছেড়ে মা শেষে রেগেই ওঠেন, 'তাহলে এভাবে কাঁদছিস কেন?'

আমি এবার অসংলগ্ন বলে যাই, 'মা, সে একটা বেড়াল মেরে ধুৎ, কী সব... অন্ধকারে আমাকে ওপরে তুলে... বলল, রানুর ওপর কী সব জিন-টিনের আছর!'

'পির-আওলিয়ার সাথে তার যোগাযোগ আছে', মা বললেন। 'ওই ভাবে সে ধ্যান করে। তাইতো ভাবছিলাম, ওর স্বভাব-খারাপের কোনো কথা তো শুনিনি। রানুর ব্যাপার নিয়ে তোর বাবাই ওকে বলেছে। ওর নাকি বেশ ক্ষমতা আছে। যা চায়, তাই হয়ে যায়।' আমি কেমন খেপে উঠি, 'লোকটা পুজোও করে, ইদও করে, বাবা কী করে তাকে ভক্তির চোখে দেখে?' মা অলস ভঙ্গিতে ঠোঁট বাঁকান, 'কী জানি, তোর বাবা বলে এসব লোক সব ধর্মের উর্ধ্বে।'

স্পষ্ট মনে পড়ে, ওই বয়সেও সেদিন চিৎকার করে প্রতিবাদ করেছিলাম, 'আমার বাবাও তবে ওর মতো ভণ্ড।' মা আমাকে কষে চড় লাগিয়েছিলেন।

এই রকম আবহাওয়ায় আমরা যখন বড়ো হয়ে উঠছি, আমার চারপাশে বাবা তখন ক্রমেই ধর্মের দেয়াল তুলছেন, ক্রমাগত রোজা-নামাজের উপকারিতার কথা বিশ্লেষণ করছেন, বিধর্মীর শাস্তি নরকের দাউদাউ আগুনে জ্বলে-পুড়ে কেবলই খাক হওয়া—এইসব বলে বলে আমাদের মনে ধর্মের পবিত্র আবহাওয়া সৃষ্টির ও তার কাছে আরও গভীরভাবে আত্মসমর্পিত হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। চাচাদের চাকরির সংস্থান হওয়ায় তারা তখন অন্যত্র। দিনভর সংসারের কাজ আর শূন্যবাড়িতে মাথা গুঁজে বসে থাকা। কতক্ষণ সহ্য হয়? এমনিতেই চরে-বেড়ানো-মেয়ে আমি। রানুকে নিয়ে সিনেমা হলের পোস্টার দেখা, স্কুল ফাঁকি দিয়ে নদীর ধারে ঘুরে বেড়ানো, কালীপুজো হচ্ছে, কালীর লকলকে লম্বা জিভ, ধোঁয়া উড়ছে, কালীর সহস্র মুণ্ডু... ভীত চোখে তাকিয়ে আছি, এসব করে করে সময় পেরিয়ে যেত। আর ঘরে ফিরে এই টোটোমির জন্য বাবার হাতে রামধোলাই। তখন আমার ডানা গজাচ্ছে। ধর্মের সাধ্য কি আমার পায়ে শেকল পরায়? কিন্তু বাবার কঠোর চোখের পাহারা, কী করে উড়ব? অগত্যা তর্কে জড়াতাম। মরলে যদি এতই শাস্তি, তবে আল্লাহ্ দয়াবান কী করে হন?' 'কেন মেয়েরাই শুধু নিজেকে কাপড় দিয়ে ঢেকে পথ চলবে?' 'পুরুষের পর্দার ব্যবস্থা নেই কেন?' অসহিষ্ণু বাবা প্রথম প্রথম প্রশ্রয়ই দিতেন। ধর্মের প্রয়োজনে খোলামেলাই বলতেন, 'মেয়েরা উগ্র হয়ে চললে পুরুষরা কুপথে যায়।' আমি বেশ সাহসী কণ্ঠে উচ্চারণ করতাম, 'পুরুষদের খালি গা দেখে যদি মেয়েরা কুপথে যায়?' আমার সেই প্রশ্নে ঘরে বজ্রপাত হত। উত্তরে বাবার হাতের সজোরে বসানো থাপ্পড়। 'পুরুষ আর নারীর শরীর এক হল?'

বেহেশতের হুরির বর্ণনার সময় বাবার চোখজোড়া হত দেখার মতো। সেই চোখে আমি ভয়াবহ দুর্বার লোভের ছায়া দেখতাম। কী করে ওই চোখের মানুষ মার মতো ক্ষীণাঙ্গীকে নিয়ে ইহজীবন পার করছেন, ভেবে অবাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

হতাম। একদিন আরেকটি থাপ্পড়ের প্রত্যাশায় প্রশ্ন করি, 'অন্য ধর্মের লোকেরা বেহেশতে যাবে না?' বাবা কঠোর গলায় উত্তর দিলেন, 'না।' আমার প্রশ্ন, 'কেন? একটি শিশু জন্মেই তবে কেন মুসলমান হয় না? শিশু তার চারপাশে যা দেখবে তাই শিখবে। এমনতো হতে পারে, আমিই ভুল ধর্মে জন্মেছি। কিন্তু আমি কি আমার বাবা-মার শেখানো চিন্তার বাইরে যেতে পারব?' রাগে-ক্রোধে বাবার কেঁদে ফেলার উপক্রম হয়। তিনি নিশ্চিত ধরে নেন, আমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। এর পেছনে মার আশকারাই বেশি। কিন্তু আমিই-বা এমন অমীমাংসিত উত্তরে কী করে স্থির থাকি? প্রশ্ন করা চলবে না এ কী ধরনের রেওয়াজ? আসলে আমি তখন বাইরে ঘুরে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক বুঝতে শিখছি। বাবার চরম অমতে ঢুকে গেছি এমন একটা সংগঠনে, যেখানে সবাই ছেলে। আমি আর রানুই শুধু মেয়ে। আবৃত্তি, বক্তৃতা সবই হত সেখানে। চরম দারিদ্র্য, কষ্টের পাশাপাশি আমার জীবনের অদ্ভুত গোপন স্বাধীনতা। স্টেজে দাঁড়িয়ে 'লিচু চোর' কবিতা কীভাবে আবৃত্তি করতে হবে কর্মকর্তারা পরম যত্নে আমাকে বোঝাচ্ছেন। সার সার চোখ যখন আমাকে দেখবে, তারা কি ঘুণাক্ষরেও ভাববে, স্টেজে আবৃত্তিরত ওই মেয়েটি আটামিলের কর্মচারীকে একসের আটা ভাঙাতে গিয়ে কী রকম কাকুতিমিনতি করে থাকে? এদের টিনের ঘরে আসবাব বলতে দুটি ভাঙা চেয়ার, নড়বড়ে চৌকি, তোশকের পেট ফুঁড়ে বের হওয়া কালো হয়ে যাওয়া তুলো, একটা আলনা, ওয়াড়বিহীন বালিশ, থকথকে মেঝে? এদের সর্বাঙ্গে তেলাপোকা হাঁটাহাঁটি করে? তার সঙ্গে আমার তর্কের বহর দেখে বাবা নিশ্চিতই ধরে নেন বাইরে কোনো কম্যুনিস্টের সাথে আমার খাতির হয়েছে। যে আমাকে বিভ্রান্ত করছে। আর তাই নিয়ে তার কী দুঃখ আর জেরা!

স্টেজে উঠে অহংকারে, উত্তেজনায় ঘেমে উঠতাম। এসব ব্যাপারে রানুর কোনো উৎসাহ ছিল না। আমি যখন অনুষ্ঠান শেষে চরমভাবে উত্তেজিত, কাঁপছি... 'রানু কেমন হয়েছে বলতো?' রানু তখন শিল্পীদের মধ্যে বিতরণ করা লাড্ডু খাওয়ায় ব্যস্ত। ঠোঁট উলটে কেবল বলত, 'এসব দেখলে আমার হাসি লাগে। খাবারের ব্যাপার না থাকলে আমি আসতামই না।' ভীষণ মর্মাহত হয়ে চেপে ধরতাম ওকে, 'এতে হাসির কী আছে? কী দেখলে তোর হাসি পায়?' রানুর গালভর্তি লাড্ডু, মুখের ওপর তির্যক হাসির আভা। 'এই যে, একটা কবিতা হাত নেড়ে নেড়ে বলা'... শেষে রানু সত্যিই হাসতে শুরু করত। 'এত লোকজনের সামনে একজন দাঁড়িয়ে হাত নেড়েনুড়ে নানা ভঙ্গি করে যাচ্ছে। কাণ্ড!'

আমার বুক ভেঙে যেত। কেন, যাতে আমার অপরিসীম আনন্দ, রানু, আমার এত কাছের রানুর কাছে সেটাই বিরক্তিকর?

স্কুলে পড়তাম। অবশ্য সেখানে পড়াশোনার কোনো বালাই ছিল না। সারবদ্ধ ছাত্রীরা কেবল রিডিং পড়ে যাও। টিচার উলের বল মেঝের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে কাঁটা হাতে সোয়েটার বোনায় মগ্ন অথবা আমাদের কিছু লিখতে বলে দিব্যি চোখ বুজে ফেলেছেন। জঘন্য, একঘেয়ে সময়। আর কী করা, পেছনের বেঞ্চে বসে তখন খাতায় আঁকিবুঁকি করো। আঁকার নেশাটা আমার সেখান থেকেই। স্কুল ফাঁকি দিতাম ভীষণ। সংগঠনের বন্ধুদের সাথে হয় কোথাও ফুটবল খেলা দেখতে চলে যেতাম, নয়তো ধান্দায় থাকতাম কোথায় কার বিয়ে অথবা রাস্তার মিছিলে শামিল হয়ে যেতাম। কিন্তু সবশেষে বিদ্রে করল রানুই। ও ওসবে যাবে না। কিছুতেই বুঝে পায় না ও, এসবে ভালোলাগার কী আছে! প্রথমে ওকে অনেক বোঝালাম। শেষে একদিন রীতিমতো খেপেই উঠলাম, 'তুইতো শুধু খাবার আর কোথায় কী পাওয়া যায় এইসব বুঝিস। যা লোভী হচ্ছিস দিন দিন। এসব তোর ভাল লাগবে কেন? খাবার পেলে তুই যা খুশি তাই করতে পারিস।' বাবা পাশের ঘরে শুয়ে ছিলেন। রানু তাকে শুনিয়ে চেঁচিয়েই বলে ওঠে, 'তোমরা ছেলেদের সাথে কী করে বেড়াও, আমি জানি না বুঝি? বলে দেব

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বাবাকে।'

আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়, 'তোর মতো নাকি?' বলতে বলতে হামলে পড়ি ওর ওপর, 'তোর মতো আমি? খাবার দেখলেই জিভ লকলক করে, অসভ্য।' এরপর যা হওয়ার হয়। বাবা উঠে আসেন। আমার পিঠে প্রহার বরাদ্দ হয় এবং শেষ রায় আরও কঠিন—জীবনের জন্য ওসব সংগঠনে যাওয়া বন্ধ। যদি যাই, তবে...। রানুর কারণে আমার চারপাশে প্রাচীর ওঠে। রানুর ওপর অভিমানে, কান্নায় দীর্ঘদিন ওর সাথে আমার কথা বন্ধ থাকে।

আবারও শুরু সেই দুঃসহ জীবনের। দিন চলতে থাকে সেই একতালে। এরই মধ্যে হঠাৎ ঘটে যায় অভাবিত একটা ঘটনা। প্রাইমারি পাশ করায় আমি তখন অন্য স্কুলে। সকালে স্কুলে গিয়ে রানু আর ফেরে না। সে সাধারণত স্কুলের বাইরে কোথাও যায় না। পুরো পাড়া তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর, খোঁজ নেওয়া হয় স্কুলে, আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে। না, কোথাও নেই রানু! সন্ধ্যায় ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়ি আমরা।

সিলেটে কি একটা বিশাল ওয়াজ মাহফিল, বাবা সেখানে গেছেন। শহরের আনাচেকানাচে তখন মহাসমারোহপূর্ণ দুর্গাপূজার আসর। ভীত ফ্যাকাসে মা আমাকে ঠেলে পাঠিয়ে দেন, 'যা তো নীনা, একটু পূজামণ্ডপে খুঁজে আয়।' রানুকে খোঁজার ছলে দশভুজা দর্শন! বিস্তৃত রেললাইন ধরে ছুটতে থাকি। আসমান জুড়ে কুয়াশায় ডুবন্ত চাঁদ। সেই আলোয় ভিজতে ভিজতে এক একটা করে ব্যবধানে থাকা স্লিপার টপকাই। আমাদের বাড়ির কাছে যে মণ্ডপ, সেখানে গিয়ে দেখি প্রচণ্ড ভিড়। ধূপের গন্ধে পুরো পরিবেশ অদ্ভুত রকমের নেশালু! মাইকে কান ফাটিয়ে গান বাজছে। ভিড় ঠেলে ঠেলে ফাঁকফোকর গলিয়ে এগিয়ে যাই। লাল নীল, লাইটে জমজমাট করে সাজানো হয়েছে পুরো প্যান্ডেল। আমার চোখ তন্ন তন্ন খোঁজে রানুকে। এক সময় আমি সোজা মণ্ডপের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। বাঁশ দিয়ে পুরোটা জায়গা ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ওপাশে বিভিন্ন পাত্রে সাজানো নানারকম ফলমূল—তরমুজ, আপেল, কলা, আনারস...। তার ওপাশেই যেন রাজপুরী। দশহস্ত বিস্তার করে দেবী দুর্গার অপরূপ মূর্তি। চারপাশে আরও সারবদ্ধ মূর্তি। এই প্রথম আমি নিজের চেহারা নিয়ে ভাবনায় মগ্ন হই। এবং রানুর সৌন্দর্যের কাছে আমার চেহারার ম্লানিমাটা টের পাই। কেমন কষ্ট লাগে। দশভুজার সামনে সেই প্রথম রানু এবং আমার দূরত্ব আবিষ্কার করা। কী আশ্চর্য আমি যেন ঘোরে পড়ে গেছি। রানু কোথায়? সামনের সৌন্দর্য আমাকে টেনে ধরেছে। থোকা থোকা ফলের গন্ধও এমন মর্মান্তিক মধুর হতে পারে? রানু যদি এতগুলো ফল একসাথে দেখত? ফিরে যাব, হঠাৎ দেখি ঢোল বাজানো শুরু হয়ে গেছে। একটা কুঁজোমতো লোক ধিনাক ধিনাক শুরু করতেই বাকি ঢুলি যেন ফুর্তি পায়। এবং তারপরই বৃত্তাকারে মেয়ে-পুরুষের একটা বড়ো দল পাখির পালক মাথায় গুঁজে নাচতে শুরু করে। মাটির পাত্র থেকে সাপের দেহের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। মুহূর্তে আমি আমার সমস্ত পৃথিবী সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে পড়ি।

হঠাৎ টের পাই পেছন থেকে আমার হাত ধরে টানছে কেউ। ঘোরের মধ্যেই পেছন ফিরে তাকাই। এই ছেলেটিকে এর আগেও আমি এখানে দেখেছি। কী যেন নাম? ধোঁয়ায় ঘোর লেগে যাচ্ছে! হ্যাঁ মনে পড়ছে, অজয়! সে কানের কাছে ফিসফিস করে, মজা দেখবে এসো। আরও মজা? ভিড় ঠেলে মোহগ্রস্তের মতো বাইরে বেরিয়ে আসি। সে আমাকে টানতে টানতে প্যান্ডেলের কোনায় নিয়ে যায় আর তর্জনী তুলে দেখায়—রক্তমাখা মুখে একটি কালো মোটা ভয়ংকর লোকের হাসি। সে হাসছে বিরামহীন হাঃ হাঃ। পুরো পূর্ণিমা রাত এই দৃশ্যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। ঢক ঢক করে গলায় ঢালছে পাঁঠার রক্ত। তার মুখ, বুক আর ভুঁড়ি চুইয়ে নীচের দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। ভয়ে আমি চোখ বন্ধ করে ফেলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘এই বুঝি মজা হল?’ অজয়ের দিকে প্রশ্নবোধক চোখে তাকাই। ভীষণ নিষ্ঠুর মনে হয় ছেলেটিকে।

‘ভয় পাচ্ছ?’ জানতে চায় সে। এত চমৎকার একটি ছেলে আমাকে এতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, আমি কেমন অভিভূত হয়ে পড়ি। সে আমার কম্পিত হাত ধরে টানে—‘আসল মজা তো এখনও দেখোইনি।’ ভিড় ঠেলে আমাকে সে এক সময় পুজোমণ্ডপের পেছনে নির্জনে নিয়ে যায়। আবছা আলো-ছায়ায় প্রথমে সে আমার বুকে হাত রাখে। এরকম অভিজ্ঞতা এই প্রথম। বয়ঃসন্ধির স্তন বড়ো মারাত্মক, মনে হয়, বিষপিণ্ড বয়ে বেড়াচ্ছি। তাই সে স্পর্শে প্রথমে মনে হয় যন্ত্রণায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পরক্ষণেই অলৌকিক এক সুখানুভূতি সারা দেহে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়। আমার কম্পিত ঠোঁটের ওপর নেমে আসে তার মুখ। পৃথিবীর চারপাশে তখন ছায়া ছাড়া আর কিছুই থাকে না। এমন এক বোধ, এমন এক ঢেউ! ওর মুখে বিচিত্র গন্ধ! কেমন গা ঘুলোচ্ছে। পাশাপাশি কী এক অমোঘ অবশতা আর ক্লান্তিতে ঘুম পায়। কিন্তু চুম্বনদাতার অস্থিরতাও কম ছিল না। তাড়াতাড়ি আমার হাতে একটা আধুলি গুঁজে দিয়ে ভিড়ের মধ্যে সে উধাও হয়ে যায়।

এ তো মহামজা! পুরো বিষয়টা বুঝতে আমার কিছুটা সময় যায়। একটি চুমু? স্রেফ একটি চুমু, আর কিছু না? আর তার জন্য আস্ত একটা আধুলি? শরীরে স্পর্শের সুখ শুধু টের পেয়েছি। কিন্তু অন্য একটা লোক তার মুখ আমার মুখে ডুবিয়ে দেবে? ঘেন্না নেই ওর? এ আবার কেমন মজা? স্রেফ থুথু ভরে যাওয়া ছাড়া? কুয়াশাভেজা প্রেতচন্দ্রের বয়স বাড়ে। এখন আধুলিটাই বিস্ময়। আধুলিটাই আনন্দ। সামনে বিস্তৃত আলোকিত রেললাইন। আমি নাচতে নাচতে বাড়ির পথ ধরি। কুয়াশাভেজা আলোর স্পর্শে আমার ঠোঁটজোড়া ভিজে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই অবসাদ। নিস্তব্ধ রাত নেমেছে। রানু কি বাসায় ফিরেছে?

বাসায় যেতেই মা উদ্ভ্রান্তের মতো দৌড়ে আসেন, ‘পেলি?’ অপরাধবোধ, লজ্জায় পরক্ষণেই আমি জমে যাই। মা আমার রাস্তার দিকে এইভাবে চেয়েছিলেন?

আর রানু? ফেরেনি তাহলে?

রাত বাড়ছে। রানু ফেরে না। বাড়ন্ত মেয়ে, প্রতিবেশীদের ভয়ে মার পক্ষে কিছু বলাও সম্ভব হচ্ছে না। পুরো পাড়া ঘুমিয়ে পড়েছে। রানু ফেরে না। মধ্যরাত, বিছানায় পড়ে অঝোরে কেঁদে চলেছেন মা। রানু ফেরে না। আমার চোখে রানুর সেই মুখ... পুঁটলিতে গম... উত্তপ্ত পথ। লাল হয়ে উঠছে, রানু কাঁদছে।

হাঁটুতে মুখ গুঁজি। অবিশ্রান্ত কান্নার মধ্যে দিয়ে এক সময় সকাল হয়। মা এত ভালোবাসেন রানুকে? আমিও যদি কোথাও যাই? অনেক অনেক দূরে? মা এইভাবে কাঁদবেন। যদি অজয় আমাকে বিয়ে করে? আমাকে সন্ধ্যার সেই অলৌকিক দুর্গা বানিয়ে দেয়? মার ভালোবাসা প্রকাশের ব্যাপারটা এত গরিব কেন?

বিছানায় সাথে লেপটে আছেন মা। ঘরের রাতের কিছু ভাত ছিল। ভাজার জন্য আমি শিথিল হাতে পেঁপে কুটছি, হঠাৎ কাঁপা আঙুল দার ওপর পড়তেই রক্তে আঙুল ভিজে ওঠে। আর সেই আঙুল জিভে ছোঁয়াতে যাব, ঠিক তখুনি দরজায় রানু। উসকো চুল, রাতজাগা চোখ! আমি দা ফেলে প্রায় চিৎকার করে উঠি। মা লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসেন। ওকে জড়িয়ে ধরে আমি ঘরে আনি, ‘কোথায় ছিলি তুই?’

অদ্ভুত চোখে রানু আমার দিকে তাকায় শুধু, কিছু বলে না। আমি উত্তেজনায় খেই হারাতে শুরু করি, ‘মৃত্যুর দশা হয়েছিল আমাদের, কোথায় ছিলি?’ রানু নিঃশব্দে বসে থাকে। কোমর থেকে দ্রুত বের করে ওকে আধুলিটা দিয়ে দিই। আমি রীতিমতো হাঁপাতে থাকি, ‘তোকে কত খুঁজলাম। পুরো পুজোর প্যান্ডেল, কী সুন্দর নাচ, অজয়দা... ধুৎ...। কোথায় ছিলি তুই? আমি তো ভয়ে শেষ, ভেবেছি জীবনেও আর তোকে দেখব না।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

রানুকে কেমন শ্রান্ত অবসন্ন লাগছে। বেশ অচেনা মানুষের মতো সে বিছানায় গিয়ে শোয়। আমাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে। একটি শব্দও উচ্চারণ করে না। মা কত কাঁদল, আমিও, 'আশ্চর্য, কথা বলছিস না কেন তুই?' এবার মার পালা। অবিশ্রান্তভাবে রানুকে ঝাঁকুনি দিতে দিতে তিনি বলেন, 'বল কোথায় ছিলি? বড়ো হচ্ছিস না? মাথায় বুদ্ধি নেই? বল... বল..., বল...' মা কান্না শুরু করেন। সেই প্রথম রানু আমার কাছে অচেনা হয়ে ওঠে।

সারাদিন অঘোরে ঘুমোনোর পর সন্ধ্যায় রানুর ঘুম ভাঙলে আমি প্রায় আছড়ে পড়ি ওর ওপর। ওর চুলে হাত রাখি, আঙুল ফুটিয়ে দিই। পুজোর গল্প করি। অবশ্য রানুকেও সেই প্রথম অধ্যায় লুকোনোর প্রয়োজন পড়ে। অজয়ের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সবটুকু গল্প বলি। 'জানিস রানু, এত ফল... এত...।' বিরক্ত বোধ করে সে। বালিশ আঁকড়ে চোখ বোজে। রানু আমাকে বাদ দিয়ে একলা একটি রাত কোথায় কাটিয়ে এল? কৌতূহলে, কষ্টে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিল। রানু এত বড়ো হয়ে উঠল কবে? এত রহস্যময়ী? ওর পাশে স্থির হয়ে থাকি। রাত বাড়ে। ছেঁড়া বালিশ ফুঁড়ে তুলো বের হয়ে রানুর চুল সাদা করে দিচ্ছে। সস্নেহে ওর মাথা থেকে তুলো সরাই। আকুল হয়ে প্রশ্ন করি, 'কোথায় ছিলি রানু, আমাকে বলবি না?' বাইরে হাওয়া। টিনের চালে তুমুল হাওয়ার শনশন। তার একটু পরই বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। স্নায়বিক চাপের প্রাবল্যে আমার দমবন্ধ অবস্থা। ক্রমেই তলিয়ে যেতে থাকি। চমৎকার বৃষ্টির ঠান্ডায় ঘুম নামছে চোখে। ফিসফিস করি 'লক্ষ্মী রানু।' রানু কি একটা আস্ত রূপকথার বই চাপা দিয়ে রাখছে?

অনেক রাতে আমাকে শূন্য থেকে ধপাস ফেলে দিয়ে রানু বলে, 'আমি মজুমদারের ঘরে ছিলাম।'

'কো-থা-য়?' কী বলছে আমি সহসা বুঝে উঠতে পারি না।

'বললামই তো', রানু বিকারহীন। 'দেখো, মাকে আবার বোলো না যেন। অবশ্য বললেই-বা কী! আমি কারো ধার ধারি নাকি?'

'না না, কিন্তু তুই'... আমি কাঁপতে কাঁপতে শুরু করি, 'এত ভয় পেতি ওকে...। রানু, তুই পাগল হয়ে গেছিস? সারারাত ওই ভয়াবহ রাক্ষসের পাশে? কী করে?'

রানু নিশ্চুপ। অসম্ভব তাচ্ছিল্য ভরে সাদা দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। 'সারারাত ওখানে ছিলি?' আর্তকণ্ঠে ফিসফিস করি। 'তোকে কিছু করেনি?' রানু চুপ।

'তোকে, মানে (মার ভাষায় বলি) তোর সাথে খারাপ কাজ করেছে?'

'না।' রানু ঠান্ডা গলায় বলে, 'ও আমার বাবা-মার চেয়ে অনেক ভালো।'

'কী বলছিস তুই, কিছু করেনি?' বিস্ময়-ছোঁয়া গলায় আবার প্রায় চেঁচিয়ে উঠি। 'সারারাত তবে কী করলি?'

রানু আমাকে উন্মাদ উদ্ভ্রান্ত করে দিয়ে ফের চুপ হয়ে যায়। সারারাত ঘুম হয় না। রানুও জেগে আছে টের পাই। কিন্তু কী আজব এই বিপন্নতা, কেউ এগোতে পারছি না। এক সময় রানু আমাকে একজন পরিণত মানুষের মতো দেয়ালে ঠেস দিয়ে ধরে বলে, 'শুনতে চাও কী হয়েছিল? আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব?'

আমি অস্ফুটে বলি... 'তবুও।' রানু বলতে শুরু করে, 'সন্ধ্যায় ওর বাড়ির সামনে দিয়ে মুদির দোকানে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ টের পাই, পেছন থেকে কেউ আমাকে জাপটে ধরেছে। চেয়ে দেখি, মজুমদার। মাগো, কী শক্তি! আমাকে একটানে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রথমে সে দরজা বন্ধ করে আমাকে চেঁচাতে নিষেধ করে। তারপর কী কী সব বলে আমার মুখে ফুঁ দেয়। আমি যেন কেমন অবশ হয়ে যেতে থাকি। আমাকে সেই অবস্থায় তালা দিয়ে রেখে সে বাইরে যায়। কিছুক্ষণ পর বিরাট একটা বাক্স নিয়ে আসে। তুমি না দেখলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বিশ্বাস করতে পারবে না। এত যে খাবার মিষ্টি, ফল, বিরানি...। আমার সামনে ওগুলো সাজিয়ে আমাকে খেতে আদেশ করে। আমি তখনও ভয়ে কাঁপছি। এত খাবার একসাথে? আমার তখন পাগল হবার মতো অবস্থা। আমি খেতে শুরু করি, আর সে শুরু করে গল্প। এত আজব গল্প জানে লোকটা! আমি যেন কেমন হয়ে যাই। তাকিয়ে থাকি তার দিকে।' রানু থামে। আমি বাকরুদ্ধ হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। আবারও সে শুরু করে, 'এরপর ধ্যানে বসে সে। মাঝরাত অবধি আমাকে বসিয়ে রেখে ধ্যান করে। আবার খাওয়া, আবার গল্প, শুনবে কী কী সব গল্প?' আমার স্তম্ভিত অবস্থা দেখে রানু থেমে যায়, 'লোকটা খুব ভালো, জানো আপা?'

'বাবা যদি জানে?' বোকার মতো প্রশ্ন করি।

'বাবা তো আমার সব দায়িত্ব ওর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন', রানু বলল, 'বদজিন ছাড়ানোর জন্য। আমার ওপর নাকি খারাপ জিন আছর করেছে। সেজন্য আমি মনমরা থাকি, আমার শুধু খিদে লাগে।' বলতে বলতে ঘুমে ঝিমিয়ে পড়তে থাকে রানু।

বাবার প্রতি ঘেন্নায় বিষিয়ে উঠি। আমার কেমন কান্না পেতে থাকে। 'রানু, লোকটা ভালো না, তোকে সে এইভাবে বশ করে ফেলল? ওকে তোর ভালো লাগল?' রানু আমার কথা শোনে না। নিজেই যেন বিড়বিড় করছে, এমন গলায় বলে, 'কত কথা বলল আমাকে, তার নিজের জীবনের কষ্টের কথা। আমি কি ছাই এত বুঝি? বলল, একদিন ভূমিকম্প হবে, সব তলিয়ে যাবে। বিল্ডিং তোলার সময় একরাতে তাকে কোনো পির স্বপ্নে নির্দেশ দিয়েছে, সে যেন পুরো বিল্ডিং না বানায়। তাহলে মাথায় ওর তিনতলা ভেঙে পড়বে আর সে মারা যাবে। দ্যাখো না, সে জন্যই সে খাটের নীচে ঘুমোয়, ছাদ ভেঙে যাতে তার বুকের ওপর না পড়ে। একটা ছেলে হয়নি বলে তার কত দুঃখ। আমি স্বপ্নে কী কী দেখি সব সে জানে।'

'পাগল! আস্ত পাগল', আমি চেঁচিয়ে উঠি। 'তুই আর কোনোদিন ওর ওখানে যাবি না।'

'আপা, আমাকে সে বলেছে, ভূমিকম্প হলে সে আমাকে রক্ষা করবে। তার সে ক্ষমতা আছে। আমাকে এত ভালোবাসে লোকটা। আমার জন্য সে বেড়াল, খরগোশ, কুকুরছানাকে ইনজেকশান পুশ করে মেরেছে। ধ্যান করার সময় লোকটা হাউমাউ করে কাঁদছিল—আমি ওকে এতদিন ঘেন্না করতাম ভেবে আমার এত কষ্ট হচ্ছিল। লোকটা অসম্ভব দুঃখী, আমরা ওকে চিনতাম না।'

রানুকে তাহলে কিনে নিয়েছে মজুমদার। সারারাত বিছানায় ছটফট করি। বাবা-মা-ভাইবোনের প্রতি সেই থেকেই আমার বিন্দু বিন্দু ঘৃণার শুরু। রানু পরদিন থেকে সত্যি সত্যি বদলে যায়। আমাকে সে এড়াতে শুরু করে। নিত্য নতুন পোশাকে আবৃত, মোহিত রানু কেমন প্রাণবন্ত, হাসি-খুশি হয়ে উঠতে থাকে। ওর সেইসব বিচিত্র পোশাক দেখে ঈর্ষায় বিষিয়ে উঠতে থাকি। পাশাপাশি যন্ত্রণায়। ইতোমধ্যে মজুমদারের ওপর বাবা-মার নির্ভরতা আরও চারগুণ বেড়েছে। কেননা, সে রানুর ওপর আছর করা জিনকে তাড়িয়েছে। রানুও প্রাণবন্ত, মিশুক হয়ে উঠেছে। ওকে দেওয়া পোশাক, সুস্বাদু খাবারদাবার—সব কিছুকেই তারা রানুর প্রতি মজুমদারের পরম স্নেহের উপহার হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বাবাকে এখন প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, 'বাবা, এখন কোথায় তোমার ধর্ম?' এবং সবশেষে আমি একা। কাগজে আঁকিবুঁকি করি। তুলিতে রং চড়াই। ভালো লাগে না। শুরু হয় আমার অবসন্ন, ছন্নছাড়া দিন। এখন বুঝি, তখন পর্যন্ত আমি শৈশবে ছিলাম, জীবনের টানাপোড়েন কখনও আমাকে আমার বয়সের অনুভবগুলো উপভোগ করতে দেয়নি। শৈশবেই নিজেকে মনে হয়েছে জীবনের পোড়-খাওয়া যোদ্ধা নারী। কিন্তু এক সময় আমার দেহের একটা পরিবর্তন সত্যিই আমার জীবনে আক্ষরিক একটা পরিবর্তন ঘটায়। এত অসহায়, এত বিপন্ন নিজেকে আমার আর কখনও মনে হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

আমি জানতাম মেয়েদের এসব হয়। কোনো যন্ত্রণা নয়, ব্যথা নয়, হঠাৎ করেই হয়ে যায়। কিন্তু এর বাস্তব রূপটা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।

ক-দিন ধরে টানা জ্বর। এসবের মধ্যেই বিশ্রী সব শরীরের মধ্যে কী এক তাপ অনুভব করি। বাইরের টানাহ্যাঁচড়ায় আমি ছিলাম ক্লান্ত। আর তারই সঙ্গে যোগ হয় দেহের বিপন্নতা। বিছানায় কাঁচুমাচু শুয়ে রাতের বেলা কেবল কাঁদতাম। এমন কেউ আমার জীবনে ছিল না, যে এসে আমার মাথায় হাত রাখলে আমি একবিন্দু নির্ভরতা পাব। সেই বয়সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন মনে পড়ে, অজয়ের ঘটনার পর যখন শৈশব যাই-যাই করছে, আমি আমার দূরাত্মীয় পুরুষদের নানারকম চেহারা দেখতে শুরু করেছি, বাসায় অতিথি এলে ছোটো বলে হয়তো তাদের কারও সাথে আমাকে শুতে পাঠিয়ে দিলেন মা। মাঝরাতে সেই মানুষের গভীর নিশ্বাস হিংস্র হতে থাকলে পালাতে গিয়ে শুনতে পেতাম অদ্ভুত সব শব্দ, কাউকে বললে লাশ ফেলে দেব।'

অন্য ঘরের মেঝেতে বসে হাঁপাতে থাকতাম। কাউকে বলা হত না। নিজেকে এভাবে বাঁচাতে বাঁচাতে একরাতে স্বপ্নে দেখি, আমাকে পিছু ধাওয়া করে দৌড়োচ্ছে কিছু পুরুষ। সে কি সুদূর বিশাল পথ! কিছুতেই আমার পা চলে না, আমি টাল খেয়ে পড়ি, ফের দাঁড়াই। পুরুষগুলো চলে যায়। মাঝ রাস্তায় পড়ে আছি, হঠাৎ দেখি অজয়... আশ্চর্য! ওকে দেখেই এমন তরঙ্গ ওঠে, কী কোমল স্পর্শ ওর... এক ঘোর রোমাঞ্চ থেকে জেগে ওঠার পর, খুব ভোরে দেখি, আমার হাফপ্যান্টে রক্ত। আমি কেমন বোকা আর হতবাক হয়ে যাই। সারা শরীরে জ্বরের ছোঁয়া। অদ্ভুত ভয় হয়, বারবার পরীক্ষা করি, কোথাও কেটেছে কি না! না, এই ঢল গভীর পাতাল থেকে উঠে আসা। আমার হাত-পা কাঁপতে থাকে, মনে হয়, কোনো ঘোর অন্যায় করে ফেলেছি। কেমন দিশেহারা, অসহায় বোধ করি। কোথাও কোনো ব্যথা নেই, যন্ত্রণা নেই, দীর্ঘদিন পর মাকে বড়ো আপন মনে হয়।

কাপড় তৈরির কায়দা শেখাতে শেখাতে মা অনেক কিছু বলেন, আগের মতো আর স্বাধীন দিন নেই আমার। আচারআচরণে আমাকে বদলাতে হবে... ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার বুক হু হু করে। চোখ উপচে জল আসে। সব শেষে মা ফিসফিস করেন, 'সাবধানে থাকিস। এখন কেউ তোকে কিছু করলে পেটে বাচ্চা এসে যাবে।'

কিছু করলে মানে? আমি আবারও দিশেহারা। এত সহজে কথাগুলো বলছেন মা। তিনি কি ধারণা করেন, আগে কেউ কিছু করতে পারে আমাকে? আর অজয়? সে যদি আমাকে আবার চুমু খায়? অথবা সেই চুমুটি সে যদি এখন খেত, আমার বাচ্চা হয়ে যেত?

অদ্ভুত এক বিভ্রান্তিময় দিন শুরু হয়। আমার তো রানু ছাড়া সেই অর্থে কোনো বান্ধবী নেই। কার কাছে এত সব জানাব?

রানুও তো এখন দূরের। কী অসম্ভব যন্ত্রণায় একঘেয়ে দিন পেরিয়ে যেতে থাকে ক্রমাগত।

'হেই রঞ্জু'—নীলখেতের কাছে ফুটপাত ধরে রঞ্জুকে হাঁটতে দেখে বাসের জানলার কাছে বসেই চিৎকার করে উঠি। সে নির্বিকার হাঁটছে দেখে আবারও চিৎকার 'রঞ্জু... এই...।'

আচমকা মাথা ঘোরায় সে। কেন্নো কিলবিল ভিড়ে আমাকে খুঁজে পায় না। জানলা দিয়ে লম্বা হাত বাড়াই, 'এই যে...।'

আমাকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সে। এবং জরুরি ভঙ্গিতে হাত নাড়ে, 'নেমে এসো।' সামনের প্রচণ্ড ভিড়ের দিকে ওর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করি, 'নামতেটামতে পারব না, তোমার খবর বলো।'

'নেমেই এসো না, খবর আছে'—ওর এই রকম অনুরোধে আমি একটু বেকায়দায় পড়ে যাই। অস্বীকার করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পারব না রেজাউলের সাথে বিচ্ছিন্ন হবার পর সত্যজিৎ, রঞ্জু আর সালাহদিনের অসম্ভব আন্তরিক সহযোগিতার কথা। ওদের চমৎকার সান্নিধ্যের কথা। তিনজনের নিবিড় আন্তরিক সহমর্মিতা না থাকলে সে সময় কোন স্রোতের টানে কোথায় ভেসে যেতাম, কে জানে!

আসলেই কি ভেসে যেতাম? এমন চরম বিপর্যয় তো আমার জীবনে আরও এসেছে। সেসব বিপর্যয়ের বেশির ভাগ সময়ই চারপাশে কেউ থাকেনি, তখন কি ভেসে গেছি? অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, আমার সংকট-দুর্যোগের সেইসব দিনে যারা আর্থিক-মানসিক সহযোগিতা দিয়েছে, ভেঙে পড়ার মূহূর্তে বন্ধুর মতো সাহস জুগিয়েছে আর এইভাবে আমাকে পথ চলতে প্রেরণা জুগিয়েছে, তাদের সংখ্যা আঙুলে গোনা হলেও, তাদের কাছে আমি ঋণী নই।

কাল সারারাত এবং আজ সারাদিন অফিসে আমি ডুবে ছিলাম সেই অতীতের ভেতর, যার খোঁয়াড়ে ঢুকতে চাই না পারতপক্ষে। কিন্তু কী যে হচ্ছে, সারাক্ষণ মগজে কুটকুট কামড়ে চলেছে পোকা। কত ঘটনার সমাবেশ। ওসবে ঢুকতে না চাইলেও বাধ্য হচ্ছি। কখনো হয়তো জরুরি ফাইল নাড়তে-নাড়তে আচমকা মনে হল, আমাদের সেই পারিবারিক জীবনে ইরফান চাচা ঠিক কোথায় ছিলেন? ফাইলের কাগজটা খুঁজে পাওয়ার পর দেখা গেল প্রশ্নবোধক সেই স্মৃতির কথাটা বেমালুম ভুলে বসে আছি। সুলতানার কাছে আরও কিছু টাকা ধার চাই।

সুলতানা নিজেও খুব স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে নেই। পরদিন বেতন হবে। সে-ও তার পারিবারিক সমস্যা আর শূন্য হাতের কাসুন্দি ঘাঁটে। এসব কিছুকে এখন আমার কাসুন্দিই মনে হয়। একঘেয়ে, চরমরকমের। গা বাঁচিয়ে থাকতে চাই। কিন্তু পারি কী? বাধ্য হয়ে সব শুনি, শোনার ভান করে মাথা নাড়ি, অথচ মগজে পোকা হাঁটে নিঃশব্দে—আমার দুজন চাচা, সে সময় তারা কোথায় ছিলেন? এখন তারা কোথায়? মেজো চাচা ভালো চাকরি পেয়ে বন্দরনগরীতে। তাদের কেউ কি বড়োভাইয়ের বিন্দুমাত্র ঋণ শোধ করেছেন?

বুক ঠান্ডা হয়ে আসে। হাত-পায়ের গিঁট আলগা হয়ে যায়। চোখের সামনে ফর ফর পাক খায় লাল-নীল লেজার। খটখট টাইপের শব্দ, ক্রমেই বাড়ছে। যেন কঙ্কালের হাড়ে বাতাস লেগেছে, এমনই মড়মড়। এসব শব্দ থেকে বাঁচতে চাই, কঙ্কালের অদৃশ্য হাড় থেকে তীক্ষ্ণ আঙুল বেরিয়ে এসে সেটা আমার বুক ফুঁড়ে ভেতরে ঢোকে। ক্ষত মুখে কাদামাটি চেপে ধরি। অনেক কাক, এক সাথে চিৎকার করছে। 'দি বার্ডস'-এর সেই দস্যু পাখি, কী অসম্ভব চিৎকারে ছুটে আসছে, আমি উদ্ভ্রান্তের মতো দৌড়োচ্ছি। দৌড়োতে দৌড়োতে হোঁচট... কাক আমার পা খেয়ে চলে গেছে। মাথা চেপে ধরি। টেবিলের কঠিন কাঠে ঠেসে ধরি নিজেকে।

'তোমার শরীর খারাপ?' সুলতানা ঝুঁকে পড়ে। তারপর রুমাল দিয়ে সে দ্রুত তার ঠোঁটের ওপরের ঘাম পাফ্ করতে শুরু করে। পর মুহূর্তে কী ভেবে টেবিল থেকে ব্যাগ এনে ক্রমাগত হাতড়ায়—'এই নাও আরও দুশো। কাল তো বেতন পাচ্ছই।'

আর রেজাউল? আমার জীবনে তার উপস্থিতি কতটা জমজমাট? কোন পর্যায়ে আমাকে কতটুকু আলোড়িত করে তার প্রবেশ ঘটেছিল? তারও আগে? আমি কি আর কাউকে ভালোবাসতাম? তাকে ঘিরে আমার স্বপ্নের রূপটা ঠিক কেমন ছিল? আসলে কি আমার কোনো স্বপ্ন ছিল? এত চরিত্র! চরিত্রের এত বিচিত্রতা! ভাবতে গেলে খেই হারিয়ে ফেলি। অবসাদে নুয়ে আসতে থাকি। কী অস্বাভাবিক বিমূর্ত এক ছবির ভেতর থেকে একটা আকৃতি নিয়ে বেরিয়ে আসে তার মুখ। সেই আর্টিস্ট, তার পাতলা দেহ, চোখ, মুখ, আত্মার বিস্তৃতি... আমি তার কতটুকু চিনেছিলাম? আমার এই জীর্ণক্লিষ্ট প্রাণে এখন কতটা ব্যাপকতার ছায়া? ', অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

আমি টাকাগুলো ব্যাগে ভরতে গিয়ে নিজেকে সেই মহাচক্র থেকে টেনে তুলি। 'আসলে বেতন পাওয়ার পর শুরু হয় এত হা হা চাহিদা, ফলে তার পাওয়ার আনন্দ কোনোদিনই পাইনি। আগে থেকেই খরচের হিসেবটা ঠিক করা থাকে।'

'তুমি এমাসে দুশো টাকাই শোধ কোরো', সুলতানার সস্নেহ স্বর, 'আসলে আমাদের কারোর সমস্যা কারো চেয়ে কম নয়। মাঝে-মাঝে আমার নিজেরই এত বিশ্রী লাগে! আগের দু-শো সুবিধেমতো শোধ কোরো, অস্থির হোয়ো না।'

বাস থেকে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আধাসেদ্ধ আমি ফুটপাতে নেমে আসি। রঞ্জুর ওপর খেপেই উঠি প্রায়—'এরপর বাসায় যাওয়ার রিকশা ভাড়া দিয়ো। আমি আর কুস্তি করে বাসে উঠতে পারব না।'

'কত টাকা চাই তোমার?' রঞ্জুর কণ্ঠ গম্ভীর হয়ে ওঠে।

'কী ব্যাপার, একবার ছ্যাঁকা খেয়ে পকেট কাটতে শুরু করেছ নাকি?'

'আরে না না...' এইবার সে হেসে ফেলে, 'ওটাতো আরও পরের অধ্যায়। অত দূর যাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি এখনও।'

ঝিমন্ত বিকেল। বাস, লরি, ট্রাকের ঊর্ধ্বশ্বাস চলাচল। লাল বাতি জ্বলছে, সবুজ বাতি নিভছে, হলুদ বাতি, ট্রাফিকের সুতীক্ষ্ণ বাঁশির ফুঁ... ইউরেকা... মাথার মধ্যে পাতানো স্টেডিয়াম, ফুটবল খেলা শুরু হয়। আমাদের পরিবারে ইরফান চাচাকে নিয়ে তিক্ততার একদিনের স্মৃতি মনে পড়ে যায়। আমি তখন সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েছি। একদিন প্রোগ্রাম শেষ করে ফিরতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়েছিল। বাসায় এসে দেখি যুদ্ধ লেগে গেছে। বাবা হম্বিতম্বি করে গলা চড়াচ্ছেন। এত যে ক্ষীণকণ্ঠী মা, তারও গলা শীর্ষগ্রামে। আমার বিস্ময় থার্মোমিটারের একশো পাঁচে। দরজার সামনের ছড়ানো বালুতে পা ঠেসে যাচ্ছে, স্পষ্ট মনে পড়ছে সব, বাবা বলছেন, 'দেখতে হবে না কার মেয়ে? মার চরিত্রেরই কোনো ঠিক নাই...।'

'কী বলতে চাও তুমি?' আমি আগেও লক্ষ্য করেছি, এই একটি প্রসঙ্গেই মা মারমুখী। বাবা টের পেয়ে সেই সুযোগটাই নিতেন বেশি। 'এতই যদি চরিত্র খারাপ জানতে, তবে বিয়ে করেছিলে কেন? তখনতো পাগল হয়ে উঠেছিলে।'

'পাগল হয়ে উঠেছিলাম!' বাবা দাঁতে দাঁত পিষেন, 'কী অমন রূপ তোমার! দয়া করেছিলাম, দয়া। নইলে একজনের ছুঁড়ে ফেলা উচ্ছিষ্টকে অন্যজন তুলে নেয়?'

'এই তোমার দয়ার নমুনা?' মা হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেন। 'বিয়ের পর থেকে বাঁদি-দাসীর মতো খাটছি, একটা দিন ভালো করে দুটো কথা বলেছ?' মা মোটেই যুক্তির পেছনে পালটা যুক্তি দিতে জানতেন না। বাবার এরকম কুৎসিত ব্যবহার চরমে উঠলে তিনি দস্তুরমতো পরাজয় বরণ করতেন, অনেকটা শানুর মতো করে। তাঁর পরাজয়ের নমুনাও ছিল সাধারণ। সবশেষে কেবল বলতেন, 'আল্লাহ্ তো সব দেখছেন, তিনিই এর বিচার করবেন।'

আমার কাছে এ ব্যাপারটাই ছিল সব থেকে বেশি অসহ্য। এ জীবনে মার চোখে প্রচুর জল দেখেছি। বাবার স্নেহ কি কোনোদিন পাইনি? যেহেতু বাবা, স্নেহ ছিল না বিশ্বাস করি কী করে? কিন্তু অনুভব করেছি কখনোও? তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকি—প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয়, তৃতীয়... সবগুলো পৃষ্ঠা তছনছ করি। বাবাকে ঘিরে আমার জীবনে কোনো নাজুক মুহূর্ত নেই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘কী ব্যাপার? ঝিম মেরে গেলে কেন?’ রঞ্জু আমাকে ধাক্কা দেয়। ‘চলো হাঁটি।’

খাড়া ফুটপাথ ধরে দুজন হাঁটতে থাকি। শুকনো বিকেল জুড়ে ধুলোর তোলপাড়। পা থেকে মাথা একাকার তার প্রলেপে। দুটো আধন্যাংটা ছেলে সাঁ রাস্তা পার হয়। ওদের কানের পাশটা পিষে দৈত্য গাড়ি ছুটে যায়। আমি ফের ভাবনায় ডুবতে যাব, রঞ্জু রাস্তার পাশের হকারের কাছ থেকে পত্রিকা তুলে নেয়। হেডিং-এ দ্রুত চোখ বুলিয়ে বলে, ‘নীনা, বিশ্বযুদ্ধ লেগেই যাবে মনে হচ্ছে।’ আমি তল থেকে উঠি, ‘তোমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে?’ ফুটপাতের ধুলোর মধ্যে বসে পড়ে রঞ্জু। বলে, ‘সাদ্দাম, যাই বলো—বাপের ব্যাটা।’ ওর চোখ-মুখ পত্রিকার পাতালে হারিয়ে গেলে আমি অবাক হয়ে বলি, ‘তুমি তার এইসব সাপোর্ট করছ?’

‘তবে কি বুশ ব্যাটার পক্ষে যাব?’

‘না, না, আমি সে কথা বলছি না।’

‘তাহলে কী বলতে চাইছ?’

‘সাদ্দাম তো আর মগের মুল্লুক পায়নি যে, মন যা চাইল, হুট করে তাই করে ফেলবে। একটা দেশ দখল করা চাট্টিখানি কথা নয়। এখন ঠ্যালা সামলাও। ও ব্যাটার মার্কিনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর শক্তি আছে?’

আমার কথা রঞ্জুর কানের গর্তে সেঁধোয় না। কানের লতি ছুঁতে পারে বলেও মনে হয় না। কী হয়, গলা ছেড়ে পত্রিকার মূল হেডিং আর খবর পড়তে শুরু করে, ‘ইরাকের আকাশে ঝাঁক ঝাঁক বিমান... মার্কিন বাহিনী প্রস্তুত’, ‘ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর এত মার্কিন রণসজ্জা আর হয়নি’। আমি বিরক্তবোধ করতে থাকলেও ওর এই সশব্দ পত্রিকা পাঠে কৌতূহল বোধ করে কেউ কেউ। ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে যায় ফুটপাতের বারোয়ারি লোকজন। সোৎসাহে তারা রঞ্জুকে বলতে থাকে, ‘পড়েন ভাই, আরও জোরে জোরে পড়েন।’ ও একটু পড়তেই, ভিড় থেকে একজন খিস্তি ঝেড়ে বসে, তাও আবার ছড়ার ছন্দে—‘কেউ বলে সাদ্দাম সাব্বাশ, এইদিকে আমাদের পোঁদে বাঁশ।’ ছড়া শুনে হাঃ হাঃ হেসে ওঠে কেউ। আবার কেউ খেঁকিয়ে ওঠে, ‘মুখ খারাপ করেন ক্যান?’ ছড়া-বলিয়ে লোকটা এবার ঝাড়া গলায় বলতে থাকে, ‘মুখ খারাপ করব না মানে, সাদ্দাম কুয়েত দখল করল, আর আমাদের দেশে জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়ে গেল!’ অন্য একজন বলে, ‘রাত আটটার পর মার্কেট বন্ধ রাখতে হবে। বিদ্যুৎ, তেল—সবকিছুর ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিজনেস এখন চাঙ্গে।’ সবাইকে ছাপিয়ে আরেকজনের গলা, ‘যাই কন ভাই, যুদ্ধের ফলে কিন্তু আমাগো সরকারের লাভই হইছে। তার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলতেছিল, তার অর্ধেক শক্তি সাদ্দাম নিয়া গ্যাছে।’

এইসব যখন চলতে থাকে এবং বেশ জমাট বাঁধার উপক্রম, আমি তখন রঞ্জুকে টেনে ওঠাই। উঠে দাঁড়িয়ে ও পেপারখানা উপস্থিত লোকজনের মধ্যে ছুড়ে দিয়ে আমার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে উপসাগর এলাকা পেরিয়ে আসে, ‘নীনা আমার ভালো লাগছে বেশ। ব্যাবসাটার ফাঁড়াটা সম্ভবত কাটিয়ে উঠছি।’

নখ খুটতে খুটতে প্রশ্ন করি, ‘কীভাবে?’

‘সত্যজিতের সোর্সে একজন পার্টনার জুটে গেছে। দুজনে পার্টনারশিপে বিজনেস করব। জাতে বাঙালি তো, তুষের আগুনের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলেও মরব না।’

‘তোমার পরিচিত সেই পার্টনার?’

‘বললাম তো সত্যজিতের সোর্সে। পরিচিতি ছিল না, এখন হয়েছে, অসম্ভব ফর্সা’, কোঁকড়া চুলের রঞ্জুকে বাতাস ধূসরিত করে তুলছে। তার ওপর বাসা বাঁধছে হলদেটে রোদ। ফুটপাতের শেষ মাথায় এসে দাঁড়াই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

সামনে খোলা চৌরাস্তা। অসংখ্য বিজ্ঞাপন, চারদিকে বিচিত্র সব ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। অপর পাশে লাইন ধরে কসমেটিক, বেকারি, গার্মেন্টস, পোশাকের দোকান। গন্ধ আসছে, অদূরেই কাঁচাবাজার। প্রচণ্ড ভিড়। আচমকাই পারম্পর্যহীনভাবে ভেবে বসি, আমার দেহটি কেউ যদি খাড়া বাঁশের ওপর চৌরাস্তায় স্থাপন করে? ধুৎ!

'শোনো, আমি আমার স্বল্প অভিজ্ঞতায় মুরব্বিআনা ফলাই'—'পার্টনারশিপ বিজনেস খুব ঝুঁকির ব্যাপার। টাকা খুব বাজে জিনিস। তোমাকে নতুন করে কী বোঝাব, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যেও এইসব বিজেনেসের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে খুনোখুনি হয়ে যায়। আর তুমি বলছ সদ্য পরিচিত, আমি কিন্তু ঠিক ভরসা পাচ্ছি না।'

'ব্যাপারটা নিয়ে আমি যে ভাবিনি তা নয়', রঞ্জু বলে, 'কিন্তু ধাক্কা খেয়ে আমিও শক্ত হয়ে গেছি। কোনো শালা আমার পাছায় লাথি দিতে আসলে আমিও তার শরীরের মেইন সেন্টারের সব কলকবজা ঢিলে করে দেব।'

আমার কণ্ঠ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, 'সেই তো গোলমালের মধ্যেই যাওয়া হল।'

'নীনা, তুমি আমাদের বাসায় যাবে?' রঞ্জু জানতে চায়। 'ওসব হিসেবের গ্যাঁড়াকলে আর পা দিতে চাই না। তোমার সাথে দেখা হল কোথায় দুটো মিষ্টি মধুর কথা বলব, চলো আমার বাসায় চলো।'

'হঠাৎ?'

'এমনিতেই।' রঞ্জু এরপর অসংলগ্ন কথা বলতে শুরু করে, 'তুমি কি বিয়েটিয়ে করবে না? এইভাবেই জীবন কাটাবে?'

'বিয়ে করব না কখনও বলেছি?' অদ্ভুত রহস্যময় হয়ে ওঠে আমার হাসি, 'তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

রঞ্জু প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে হাসতে শুরু করে, 'আগের বিয়েটা করেই না মুশকিলে ফেলেছ। ফাদার স্ট্রেট রাস্তা দেখিয়ে দেবে। এমনিতেই তো নানাভাবে ফেঁসে...।'

'দুজন তখন রাস্তার বাতাস খাবো', এইবার আমি হাসতে শুরু করি, 'ওপরে থাকবে আ-কা-শ, তলায় জমিন!'

'তুমি শালা আরেকটু সুন্দর হলে সালাহদিনের সাথে ভিড়িয়ে দিতাম। হাঁদাটার আবার মেয়েদের গায়ের রং ফর্সা হলে তাদের ভেতরের নাটবল্টু না থাকলেও চলে। গবেটতো, চামড়াটাই সব। এই নিয়ে করবে সাহিত্য!'

'তুমি ওর দিকে আমাকে ঠেলতে চাইছ কেন? আমার বাতাস খাওয়ার প্রস্তাবটা পছন্দ হল না?'

'সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে ইয়ার্কি কোরো না'—রঞ্জু ক্রমশ গম্ভীর হয়ে ওঠে, 'আমি নিজেও বেশ ইয়ার্কি করে ফেলেছি। নীনা, তুমি কিছু মনে কোরো না।'

হাঁটতে হাঁটতে টের পাই, আরেফিনের হোস্টেলের সামনে এসে পড়েছি, হঠাৎ করেই হুঁশ ফিরে আসে। কোনো রকম আগাম চিন্তা ছাড়াই রঞ্জুকে হঠাৎ বলি, 'তুমি আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারবে?'

'কত টাকা?'

'আমি তোমার অবস্থা জানি', হঠাৎ ভেতরে খুঁতখুঁতি শুরু হয়... 'তোমার পক্ষে যতটা সম্ভব। দূর! হঠাৎ করে চেয়ে বসলাম। এখন খারাপ লাগছে।'

'ভদ্রতা কোরো না', রঞ্জু পরিস্থিতি সহজ করে দেয়, 'হাজারখানেক হলে চলবে?'

'না, না অত না, তোমার এমন অসুবিধেয় সময়...।'

'আবার তো শুরু করছি', সে বলে, 'ঝুঁকি না নিলে শাইন করা যায় না। যেখানে লাখখানেক টাকা গচ্চা দিয়েছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

সেখানে এক হাজার টাকা, ফুঁঃ! কাল তোমার অফিসে দিয়ে আসব।'

রঞ্জুকে বিদায় দিয়ে বিস্তৃত পথ ধরে সোজা আরেফিনের হোস্টেলে। টানা বারান্দায় অতঃপর হেঁটে দরজায় নক করা। একজন ঘুমোচ্ছিল—দরজা খুলে ঘুমজড়ানো কণ্ঠেই জানাল, 'আরেফিন বাড়ি চলে গেছে।'

রাস্তায় নেমে আমার নিজের সাথে নতুন যুদ্ধের শুরু—টাকাশূন্য অবস্থায়, আমাকে কিছু না বলেই সে বাড়ি চলে গেল? আমি নিশ্চয়ই তেমন রূঢ় কোনো আচরণ করিনি? রাগে, ক্ষোভে গলা রুদ্ধ হয়ে আসে। ওর আত্মসম্মান বোধ এত টনটনে হয়েছে? আর এই জিনিসটাই কিনা বিকোতে বিকোতে আমি প্রায় শূন্যে নামিয়ে এনেছি নিজেকে। আসলে আমি এদের কাছের কেউ না। এরা আমাকে তাদের নিজেদের যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই ব্যবহার করছে। এরা হাড়-মাংস শুষে নেবার পর আমার কঙ্কালের ওপর দাঁড়িয়ে ঠিক একদিন ডুগডুগি বাজাবে। আমি এই রকম স্বার্থপর ভালোবাসার জন্য নিজেকে আর কত খোয়াব? পরক্ষণেই স্নায়ু টানটান হয়ে ওঠে, বাবার কি শরীর খুব খারাপ? এখনও তবে মরে যাচ্ছে না কেন?

আয় আয় ঘুম আয়... রাতে বিছানা পেতে নিজেকে শোয়াই। মাথার নীচে বালিশ দিয়ে দিই... চুলে হাত বুলিয়ে দিই... ঘুমোও... নীনা ঘুমোও... কী যেন গানটা? এক বছর হাইস্কুলে গার্লস গাইড করেছিলাম... কে যেন শিখিয়েছিল? সারিবদ্ধ মেয়েরা... সাদা ড্রেস, তার ওপর ভাঁজ করা সবুজ ওড়না, নৌকা বাইছি এমন অঙ্গভঙ্গি করে গাইতাম... চল চল চলরে নৌকা বেয়ে যাই, রো রো রো ইয়োর বোট, জেন্টেল ডাউন দি স্ট্রিম। সুরটা কেমন? যেন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে এমনই গুঞ্জন! সরে যায় ছবি, সরে যায় গান, এগিয়ে আসে মহিম। বটতলায় পেইন্টিং-এর একটি আনাড়ি প্রদর্শনী ছিল তার। কিছু বিচ্ছিন্ন লোক জমেছিল। তার একটা ছবির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। বৃষ্টিতে ভিজছে নতমুখী একটা মেয়ে। সাবজেক্টটা এমন আহামরি কিছু ছিল না। কিন্তু তার ভেতরে এমন নির্মলতা... বৃষ্টির জল দেখে মনে হচ্ছিল, ছুঁয়ে দিলে মেয়েটার গাল থেকে টুপ করে খসে পড়বে। আমার অবাধ তর্জনী বারবার ধাবিত হতে চাইছিল গালের সেই জলের দিকে। নতুন শিল্পী, ডাঁট রাখতে পারেনি, নিজেই চলে এসেছিল আমার কাছে। 'আপনার পছন্দ হয়েছে?'

'কিছু হয়নি' বলে ছেলেমানুষি তাচ্ছিল্যে অগ্রাহ্য করব ভাবছি, চোখ পড়ে অবয়বে। অবিন্যস্ত চুল। বিনীত ভঙ্গি... সেই থেকে সূত্রপাত। তারপর পায়ে পায়ে হাঁটিয়াছি কত পথ... উড়িয়াছি কত আকাশে... ভাসিয়াছি কত সমুদ্রে... সেই ছেলেটি এখন কোন দূরতম দেশে? আমার জীবনে সে এক অপূর্ব প্রেম এসেছিল। কীভাবে প্রহর যায়, টের পাই না। ওর কনিষ্ঠ আঙুল ঠোঁটে তুলে নিতাম, স্বপ্নের মধ্যে কবিতার মতো করে বলতাম, 'মহিম, আমাকে তুমি অতিক্রম করে যাও। এই জ্যোতিষ্ক, এই আলো, এই চক্রাকার স্রোত, এই নিঃঝুম বিষ আমি সহ্য করতে পারছি না।' তারপর? তারপর তার সাথে রিকশায় শহরতলির কত পথ চলিয়াছি, থামিয়াছি, ভাবিত হইয়াছি, পুনরায় চলিয়াছি। সে কি ছিল নিছক এক ছটফটে বয়সের মোহ সুগন্ধির মৌজ? প্রশ্ন করতাম নিজেকে। তার স্পর্শ ছিল মৃত্যুর মতো। তার নিশ্বাসের শব্দে ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতাম। কী ছিল সেটা? সে আমার খাতায় লিখেছিল, তোমার হাতে ইতোমধ্যে যে কয়েক ফোঁটা রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছি, পৃথিবীতে তেমন সাবান নেই, যা দিয়ে তুমি এর দাগ তুলে ফেলবে। হাত যদি কেটে ফেল, তবু তার নোনা গন্ধ তোমাকে ছাড়বে না। এসবই কি ছিল স্তুতি? মিথ্যে ছিল? মনে পড়ে, লাইব্রেরিতে জীবনের প্রথম সে চুম্বনের প্রস্তাব রাখল। কী এক ঘোরে সমর্পিত হওয়ার পর ছিটকে যাই। অজয়ের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে তার দেওয়া আধুলির কথা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ কী অসম্মানের ব্যাপার ছিল সেটা! তারপর মহিম, মাতাল-করা মহিম। আমি হাত ঢোকাই কামিজের তলায়। বিপন্ন ভঙ্গিতে পিছু হটতে থাকি। তোমাকে আঙুলের স্পর্শও দেব না... ভীষণ খারাপ এসব...। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বলত, 'নীনা, ওই আঙুলের ডগা ভেদ করে চলে গেছে আমার সুচের মতো চোখ। তন্ন তন্ন করে ঘুরে এসেছে তোমার শরীরের তীর্থে। এখন সে আঙুলে ঠুলি পরালেও আমার ভ্রমণচিহ্ন ঢাকা যাবে না।' আমাকে এসব সে বলত বড়ো বেদনাতুর, বড়ো গভীর কণ্ঠে। আমি কাঁদতাম... কেউ আমাকে এভাবে গুরুত্ব দেয়নি। মহিম, তুমি যদি আমাকে ফেলে যাও, আমার ক্রন্দনময় রাত, রেললাইন, প্রকৃতি তোমাকে ক্ষমা করবে না। আমাকে তখন উন্মাদ-প্রায় করে তুলেছিল ওকে হারানোর ভয়, কেননা, আমার পাশ ঘেঁষে বসলেও কেবলই মনে হত আমার পাশে সে নেই। আমার হাতে হাত রাখত, গভীর স্বরে কথা বলত, কিন্তু মনে হত তার সামনে আমার ছায়া স্পষ্ট নয়। কী অসহ্য বেদনা আমার! সে ছিল আমার তুলনায় অনেক পরিণত। সেই বয়সে আমার এই অনুভবও অপরিণত ছিল না, আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মাটির দশভুজা ছিলাম মাত্র, সে আমাকে আশ্রয় করে পুজো করত আমার পেছনের প্রাণাধিক দেবতার। আমি তা আবিষ্কার করি দীর্ঘদিন পর।

'আমি ভালোবাসি মেঘ... চলিষ্ণুমেঘ... ওই উঁচুতে ওই উঁচুতে... আমি ভালোবাসি আশ্চর্য মেঘদল'... এসব প্রসঙ্গ থাক নীনা। চলো অন্য প্রসঙ্গে যাই। কিন্তু ওই যে আমার বাবার ঘর। প্যারালাইজড বাবা পড়ে আছেন...। আমি দেখছি হাতল-ভাঙা চেয়ারে এসে বসেছে সেই যুবক। কী করে আমি এই প্রসঙ্গের ঘোর চক্র থেকে বেরোই? হারিকেনের ধূসর আলো মাঝখানে রেখে ওই তো আমরা সেই ঘরে বসেছি। নিঃশব্দে, অনেকক্ষণ। কেউ কিছু বলতে পারছি না।

রানু বলত, 'কী এক ঢ্যাঙা মিনমিনে পুরুষ, ও আমার হাত ধরলে ঘেন্নায় মরে যাব। তুমি ওর সাথে সম্পর্ক করেছ? তোমার যা রুচি!' ওকে ঘিরে রানুর এসব মন্তব্যে আমার কান্না পেত। সুন্দর কী জিনিস রানু তা জানে না, এমন মনে হত। ঘুমোও নীনা ঘুমোও, দেয়াল বেয়ে টিকটিকি উঠছে। বাতি জ্বলছে ঘরময়। একটি টিকটিকি, দুটো টিকটিকি... তিনটে টিকটিকি... বালবের চারপাশে অসংখ্য পোকা, একটা পোকা, দুইটি পোকা... ওমা! মেঝের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে ও আবার কে আসছে? পাকিয়ে-ওঠা-কুয়াশা আর ধোঁয়া ফুঁড়ে, মাথায় শিং? ঘাড় ওঠাই। ধীরে ধীরে সরে যায় সব। পুরো ফাঁকা মগজের ওপর একটি শিশু হামাগুড়ি দেয়। ক্রমশ বড়ো হতে হতে ঘর জুড়ে দাঁড়ায় সে। একটি শিশু... একটি শিশু... একটিই...। ওকে আমি কোলে তুলে নিই। মাড়ি দিয়ে ও স্তন চেপে ধরে। যন্ত্রণায় ছটফট করে ছাড়িয়ে নিই। এবং তারপরই সেই অবিনাশী চিৎকার। দুধের ভারে স্ফীত স্তন টনটনে যন্ত্রণায় কাতর। যেন বিষফোঁড়া...। সেফটিপিনের ডগা দিয়ে মুখ ছুটিয়ে দিই। বোবা স্তনের মুখ খুলছে না, ভেতরে থই থই সাদা ভাষা, কী যন্ত্রণা! তোর দাঁত নেই কেন রে বাচ্চা? ছিঁড়ে ফেল! সেফটিপিনের ডগায় বিষাক্ত স্তন রক্তবমি উগড়ে দিতে থাকে। ডাক্তার ছুটে আসে, 'এ-কী করছেন আপনি!' রানু, তোর যখন বিয়ে হবে, কত পোলাও...। ওইতো আটামিল... আরেকটু হাঁট, আরেকটু...। কী অসহ্য শিশুর চিৎকার! বিছানায় ছটফট করি, শিশুটিকে ছুঁড়ে দিই শূন্যে। আজ ওর কপালে সাদা শিং? আশ্চর্য! নিজের সন্তানের মুখ এত অপরূপ, এত মায়াময়? আমি যার চক্র থেকে কিছুতেই আর বেরুতে পারি না?

পিলপিল করে সেই শিশুটি আঁচলের তলায় ঢুকে যায়। লম্বা নখ দিয়ে পেট আঁচড়ায়, ওর গায়ে কী চমৎকার দুধের গন্ধ। যেন সদ্য দোয়ানো হয়েছে। তুলেতুলে শিশুটাকে চেপে ধরি বুকের সাথে। টের পাই, ওর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ছেড়ে দিই। তারপরই চিৎকার। কান চেপে ধরি। হাসপাতালের প্যাসেজ ধরে দৌড়োই। বন্ধ হোক! বন্ধ হোক এই মৃত্যুময় কান্না। আর এখন? মধ্যরাতে কান খাড়া করি—কোথায় চিৎকার? কোথায় সেই কান্না? আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অস্থির, উন্মাদ, তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে। চিল, ও চিল তুমি কি আমার শিশুর কান্না দিতে পার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

না।

খরগোশ, ও খরগোশ তুমি কি...

না।

মৃগেল, ও মৃগেল মাছ...।

না।

বাতি নেভাই। ঘুটঘুটে অন্ধকারে দু-কান চেপে বিছানার ওপর হামলে পড়ি। আচ্ছা, ছোটো চাচা গলায় দড়ি দিয়েছিল কেন? অমন লোহার মতো কটকটে মানুষটা! ধুৎ, তার চেয়ে নাচি, কী চৌকস ঘাঘরা, রাত্তিরে বেরিয়েছি সিনডারেলা! হায়! আমার জুতো কই? ধুৎ!

নীনা, ওই দ্যাখো ঢাকা স্টেডিয়াম। ওই হল যাদুঘর, ওইটা শিশুপার্ক। বাঁ পাশে? পুরোনো রেডিও স্টেশন।

ওইটা নিউমার্কেট... নীনা, সব শেষে রামপুরা টিভি ভবন। ঘুমোও নীনা, ঘুমোও। রাত বাড়ছে, ঘুমোও।

এইভাবে দিন যায়। একঘেয়ে তরঙ্গহীন, প্রতি মুহূর্তের সাথে মর্মান্তিক অর্থ-যুদ্ধের ভেতর দিয়ে। এর মধ্যে একদিন বিকেলে হঠাৎ রেজাউল আমার অফিসে আসে। অফিসের গ্যাঞ্জাম-ট্যাঞ্জাম, প্রতিবাদ-ট্রতিবাদ কেমন ঝিমিয়ে এসেছে। কী অদ্ভুতভাবে এরা দপ করে জ্বলে ওঠে; আবার একসময় তেলহীন সলতের মতো এদের দপ করে নিভে যেতেও সময় লাগে না। সেদিন যথারীতি আমি আমার টেবিলে। বড়ুয়াবাবু তার টেবিল ছেড়ে আমার মুখোমুখি বসে বেশ অনেকক্ষণ, কী বলব, সংসারের প্যাচপ্যাচে পাঁচালি গাইলেন। এই হাস্যকর মানুষটার রিডে চাপ দিলে কখনোই অন্য কোনো সুর নয়, কেবলই একঘেয়ে সা-রে-গা-মা বাজে। এইরকম মুহূর্তগুলোই আমার কাছে সব চাইতে অসহ্যকর। খেলাধুলোয় আমার আগ্রহ নেই, তারপরও রোজার মিলার সর্ব্বোচ্চ কটি গোল করেছে, ম্যারাডোনার বস্তির পরিবেশ কেমন ছিল, এসব নিয়ে ঝেড়ে যাও আধ ঘণ্টা, কিংবা ফিল্মের খবর, বছরে যা একটিও দেখা হয় না—বোম্বের শাবানা আজমির সাথে আমাদের শাবানাকে মিশিয়ে দাও, স্মিতা পাতিলের চেয়ে ববিতা কম কীসে—এইরকম হযবরল দাবি তুলে কচলে যাও ঘণ্টাখানেক, শুনব, মন দিয়েই শুনব, মাঝে মাঝে নিজের খোঁড়া যুক্তি ফলিয়ে তর্কও করব, কিন্তু ছেলের আমাশা, বউয়ের হাতে ঝাঁটাপেটা হওয়া, বাবার চোখের ছানিকাটা—এসব গেয়েছো তো, নীনা স্ট্যাচু। দু-কান বন্ধ করে চেয়ে থাকবে হাঁ করে। নো মন্তব্য, নো সহানুভূতি।

আমি কি গাই না এসব মশার গান? এক সময় নিজেকে আক্রমণ করি। রঞ্জুর কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সময় আরেফিনের কথা, নিজের কষ্ট করে চলার কথা, বাড়ির অবস্থার কথা বলিনি? বেচারা কতটা ভদ্র হলে অফিসে এসে টাকা দিয়ে যায়। আবার আমার এসব কৈফিয়ত শুনেটুনে সহানুভূতিও জানায়। আমি কেন এত স্পর্শকাতর? কিন্তু নিজের পক্ষে যুক্তি বের করতে আমার জুড়ি নেই, পরক্ষণেই ভাবি, আমি তো সারাক্ষণ কাসুন্দি ঘাঁটছি না, একজন মানুষের কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে টাকাটা নেওয়ার সময় মুখ বুজে নেওয়াটা অস্বস্তি আর লজ্জাকর। তাই বলার জন্যই বলা, তাতে কোনো প্রাণ ছিল না। কিন্তু এরা বিনা স্বার্থে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এই নাজুক প্রসঙ্গগুলোকেই নানাভাবে বিশ্লেষণ করে করে নগ্ন করে তোলে। আমি তার কী উপকারে আসব? কেন নিজেকে মিছেমিছি ছোটো করে তোলা? কী জানি? হয়তো বুকের ভার কমে—এই রকম সিদ্ধান্তে আসি। নিজের বুকে-চেপে-বসা পাথর টুকরো করে ছড়িয়ে দাও সবখানে। কিন্তু আমি এত স্বার্থপর হয়ে উঠেছি কবে থেকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বড়ুয়াবাবু উঠে গেল, রীতিমতো চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছি। অফিস ছুটি হতে আর মাত্র কয়েক মিনিট। হঠাৎ খোলা দরজা দিয়ে রেজাউলকে ঢুকতে দেখি। ঢুকেই সে তার স্বভাব-অস্থিরতায় চারপাশে তাকাচ্ছে। সম্ভবত আমাকেই খুঁজছে। দেড় বছর হল ডিভোর্স হয়েছে। এরপর আজ দ্বিতীয় দিন। তার অদ্ভুত ভাসা দুটি চোখ গর্তে ঢুকে গেছে। গালের চামড়ায় ভাঁজ। শুকিয়ে, উসকোচুলের আস্তরে, কেমন মায়াময় হয়ে উঠেছে চেহারা। মানুষের আর্থিক অবস্থার ছাপ এত প্রকটভাবে শরীরে পড়ে? কলম বন্ধ করে বোকার মতো তাকিয়ে থাকি। এক হিমশীতল সাপ তার ফণা দিয়ে আমার বুক থেকে জল উদ্গিরণ করে। গলার কাছে নিশ্বাস আটকে আসতে থাকায় কেমন ঠান্ডা বোধ করি।

একটু বেপরোয়া কায়দায় সে আমার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ নিঃশব্দ সময় কাটে। আমি তাকে চেয়ার টেনে বসতে বলি। ফ্যানের বনবন শব্দ মগজ তোলপাড় করছে। মাঝখানে এক টেবিলের দূরত্ব। নিঃশব্দে চেয়ার টেনে সে আমার দিকে ঠান্ডা চোখে চেয়ে বসে থাকে। চূড়ান্ত নাটকীয়তা আর কী! কী যে অস্বস্তিকর মুহূর্ত! আমি ড্রয়ার টানি। ফাইল ভরে চাবি লাগাই। চাবির রিং টেবিলে ঠুকে অপেক্ষা করি—সে কিছু বলবে। দুঃসহ জড়তা। দুজনের কেউই কিছু বলছি না। কেমন আছ, জিজ্ঞেস করে অস্বস্তি এড়াব, রেজাউল বলে, 'সালাহদিনের ওখানে যাওনি কেন?' এতক্ষণ এই প্রসঙ্গটি ভুলে ছিলাম। সত্যজিতের সেই উক্তি... আমার অসহ্য অপমান ধীরে ধীরে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সোচ্চার করে তোলে। আমি ঠান্ডা গলায় বলি, 'আমন্ত্রণটা তোমার ছিল, যাওয়াটা নিশ্চয়ই আমি আমার বলে দাবি করতে পারি?'

'পুরোনো অভ্যাস তাহলে পালটায়নি দেখছি', কেমন ম্লান হাসে রেজাউল। তারপর বোকার মতোই বলে, 'আমার কিন্তু বিশ্বাস ছিল, তুমি আসবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষাও করেছি। ভয়ংকর বাজে দিন গেছে।'

'বিশ্বাস করতে পারলে পরমায়ু হয়, আমি ঠিক সেইটেই কাউকে করতে পারি না', হাসতে হাসতে বলি, 'নিজেকে আরও বেশি না।'

'তুমি কি আমাকে কিছুক্ষণ সময় দেবে?' এইবার সে সোজা পথ ধরে। কী সম্মানিত সম্বোধন! ভালো লাগে। সংসার করার সময় তার এক টুকরোর জন্য অধীর কাঙালের মতো পথ চেয়ে থাকতাম। দূরত্ব কত অচেনা করে তোলে মানুষকে। আমি বলি, 'ঠিক আছে, চলো।'

দুজন একটা ছোটো রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসি। এখানে এসেও একই অস্বস্তি। কেউই শুরু করতে পারছি না। টেবিলে আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি করে ভাবতে শুরু করি, আমার জীবন থেকে সেই অমোঘ প্রেম মহিমের প্রস্থানের কত পরে রেজাউলের প্রবেশ ঘটেছিল? কত বছর, কত দিন, কত ঘণ্টা? আমি ইচ্ছে করলে হিসেব করে বলে দিতে পারি। এর পরের প্রতিটি দুঃসহ দিন আমার চেতনার খরামাটি লাঙলের ফলার মতো ইঞ্চি ইঞ্চি চষে গেছে। আমি কী অস্বীকার করব, ওই রকম তীব্র প্রত্যাখ্যানের দুর্মর কষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর রেজাউল আমাকে কিছু মাত্র আন্দোলিত করেনি? সে আমার এক গভীর অভিজ্ঞতা। আমার মর্মান্তিক নিঃসঙ্গতা! কী ফিকে চা, বিকেল, ঘুটঘুটে রাত্রি, বৃষ্টিপতন, নির্ঘুম মধ্যরাত! এর মধ্যে রেজাউলের উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাকে নতুন পথ দেখিয়েছিল। সেই একই পথ ধরে চলা, যে পথে মহিমের সাথে হেঁটেছি, রিকশায় একইরকম সন্ধ্যা। শুধু বয়স বেড়েছে বলে সেই তরঙ্গগুলো ছিল না, ওইরকম ছেলেমানুষি অন্ধ কান্না, আবেগগুলো ছিল না। আমি তখন অনেক পরিণত। কিন্তু ভেতরে অদ্ভুত আন্দোলন ছিল। সেই প্রথম অনুভব করি—পুনরাবৃত্তির মাধ্যমেই আমরা প্রতিদিন সৃষ্টি করে চলি। আমি বুঝেছি এক জায়গায় আটকে থাকার জন্য মানুষের জন্ম হয় না। যত কষ্টকর হোক, যত অমসৃণ হোক, প্রবল মায়ায় শেকড় উপড়ে হাঁটার যন্ত্রণা যত গভীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

হোক, মানুষের বিচিত্র পথে ধাবিত হওয়াটাই জীবনের সহজ প্রবণতা। জীবন এমনই, কুয়োর জলে চুবিয়ে ফের তাকে টেনে না তুললে জীবনের খাঁই মেটে না। এ-ই তার প্রক্রিয়া! অসভ্য খেলা! ফলে জীবনের তাগিদেই রেজাউলকে আঁকড়ে ধরেছিলাম। জানতাম, তার চাকরিটা মামুলি। বেতন সামান্য। কিন্তু তাই দিয়ে একটা রুম ভাড়া করে সেই ছোট্ট শহরে তার একদম একা, চমৎকার গোছগাছ থাকা আমাকে টেনেছিল। তাছাড়া বাবার অবস্থা তখন ভয়াবহ। চাকরি করে প্রথম ক-মাস ছোটো চাচা বেশ চালাচ্ছিল। দূরে থাকত, মাসে-মাসে টাকা পাঠাত। তারপর স্ট্রোক করে বাবার বিছানায় পড়ে থাকা। ছোটো কাকার চাকরি ছেড়ে চলে আসা, তার মৃত্যু... উপর্যুপরি এইসব ঘটনা-দুর্ঘটনা আমাদের সংসারটাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এদিকে আরেফিন ইন্টারমিডিয়েটে থার্ড ডিভিশন পাওয়ায় এরকম গাধা তিনি মানুষ করবেন না বলে বড়ো চাচা তাকে ঘর থেকে বের করে দেন। যা হোক, সব মিলিয়ে আমার প্রতি রেজাউলের আকর্ষণটা ছিল ওই সব দুঃসহ বাস্তবতার পেষণের মধ্যেও রীতিমতো এক অলৌকিক আহ্বানের মতো। মজুমদারের সাথে রানুর সম্পর্কের গেরো তখন আলগা হয়ে এসেছে। বাড়ি থেকে তার বউ আর মেয়েদের নিয়ে এসেছে সে। টগবগে রানু নিভন্ত সলতের মতো ফুরিয়ে আসছে। এইসব মর্মান্তিক পরিস্থিতি আমার ভিতর থেকে মহিমের ছায়া গুঁড়িয়ে ফেলেছিল। মনে পড়ে তার প্রবল প্রেমের উচ্চারণ, 'নীনা আমরা বিয়ে করব। আকাশ ও নক্ষত্রের মহাসভা যার সামান্য স্তবক হবে সেই বিয়ের মন্ত্র। একদিন আমাদের শাপমুক্তি ঘটবে। তখন সব ছদ্মবেশ খুলে যাবে।'

আমি কেঁদে ফেললাম। 'কীসের শাপ মহিম? কী অপরাধ করেছি আমরা?'

তারপরও সেই ভস্ম থেকে যন্ত্রণার মতো করে ফুঁড়ে উঠত তাকে ঘিরে আমার পরাজয় আর গ্লানি। আসলে সে নিজের মধ্যে নিজেকে স্থির করে উঠতে পারত না, ফলে আমার সান্নিধ্য তাকে আনন্দের চেয়ে বেদনার্ত করত বেশি। মনে পড়ে, এক বিকেলে সে বিষণ্ন গলায় বলেছিল, 'এই যে তোমার হাত, সুন্দর, আমি স্পর্শ করছি, আমি কি সত্যিই ঠিক সেই সুন্দরকেই স্পর্শ করতে চেয়েছি? নীনা, আমি কি জানি ভেতর থেকে আসলে কতটুকু তোমাকে চাই? নীনা, বড়ো গ্লানি হয়, আমি সম্ভবত তোমাকে ঠকাচ্ছি। সত্যিই তোমাকে ঘিরে আমি আমার সত্যিকার অনুভবটা জানি না।'

এইসব বলত, যখন আমার বাসায় তার যাতায়াত বাড়তে শুরু করে। বেদনায় কাতর হয়েও আমি এই স্বীকারোক্তির কোনো তল খুঁজে পেতাম না। সে আমার অনেক স্কেচ এঁকেছে। কিন্তু সেইসব স্কেচে কিছুতেই আমি আমার মুখ খুঁজে পেতাম না। তার বদলে কী এক দেহ, কী এক ভঙ্গি, কী এক মুখ, আমার ভীষণ চেনা। আমি সেই রঙের ঝোপে হাত গলিয়ে আসল বিষয়টাকে তুলতে চাইতাম, কিন্তু রং তো নয়, যেন ময়ূরকণ্ঠী জল, হাত দিতেই তরঙ্গিত হয়ে সেই রূপ হারিয়ে যেত। অনেক পরে, অনেক খুঁজে... আমি যখন পুরো ব্যাপারটা টের পাই, তখন আবিষ্কার করি, আমার ভেতর থেকে সে রানুকে টেনে বের করেছে, নির্মাণ করেছে, সেই অবয়ব। আমার সারা পৃথিবীতে ধ্বংসস্তূপ নেমে আসে। আমি রানুর অদ্ভুত সুন্দর ম্লান চেহারার দিকে চেয়ে থাকি। ভেতরটা ভেঙে তছনছ হয়ে যায়। রানু, তোর সুন্দরের কাছে আর কত ছোটো হব? ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি। ভাঁজ ভেঙে খাড়া করাই। মূলত রেজাউলকে এরপর থেকেই আমার মুমূর্ষুর মতো আঁকড়ে ধরার পালা। তখন আমি অনেকটা নিশ্চিত—আবেগের বাড়াবাড়ি না থাকলেও, এই সেই মানুষ, যার কাছে আমার নিজস্বতার মূল্য আছে। তারপর? তারপর স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল? কী জানি। নাকি সবকিছুই ছিল বিভ্রান্তি, জটিলতা? আমি যার তল খুঁজে পাই না।

খটখটে কালো টেবিলে ধোঁয়ার আপ্লুত গরম চা আর সিঙ্গাড়া। এপাশে আমি, পাশে বসে কাপে রেজাউলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

চুমুক—'আমরা কি আবার শুরু করতে পারি?' এরকম ভয়াবহ একটা প্রস্তাব রেজাউল এত আচমকা দেয় যে, আমি হকচকিয়ে যাই। পর মুহূর্তে নিজেকে সামলে কাপ টেনে নিই। নিঃশব্দে চুমুক দিই। ডান হাতে সিঙাড়ার পেট টসকে দিয়ে আলু বের করে আনি। বলি, 'সেটা কি খুব ভালো হবে?' এরপর সীমাহীন নীরবতা। ভিড় কমে এসেছে রেস্তোরাঁয়। বিচ্ছিন্নভাবে লোকজন বসে চা খাচ্ছে। টুকটাক গল্প করছে। অন্যদিনের চাইতে আজ উত্তেজনা কম। চারপাশে চোখ হাঁটিয়ে রেজাউল ঝেড়ে কাশে, 'শোনো, আমি এখন ভীষণ খারাপ অবস্থায় আছি। অবশ্য অর্থসংকটকে এখনও ততটা পাত্তা দিচ্ছি না। ব্যাপারটা মানসিক। এত শূন্য আর একলা লাগে যে তোমাকে কী বলব, একেকদিন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। খুব ভালো কিছু আমার না হলেও চলবে।'

কী বোকার মতো বকে যাচ্ছ'—এবার আমি কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু হয়ে পড়ি, 'তুমি শুধু তোমার ভালো থাকা নিয়ে ভাবছ। কিন্তু যে প্রস্তাবটা তুমি দিয়েছ, তার সাথে আমার মতামত আর সিদ্ধান্তের বিষয়টাও জড়িত, না-কী?'

'তুমি কি এখন ভালো আছ?'

আমি স্পষ্ট জবাব দিই, 'হ্যাঁ'—

'নীনা, এ তুমি জেদ থেকে বলছ। এ রকম পরিস্থিতিতে একটা মেয়ের ভালো থাকাটা অস্বাভাবিক। সংসারতো করেছ বেশ কিছুদিন।'

আমি বলি, 'আমার চরিত্র খুব স্বাভাবিক আর নির্মল হলে নিশ্চয়ই ডিভোর্সের প্রশ্ন আসত না।'

'তুমি কি এখনও তোমার সেই পুরোনো অস্বাভাবিক জেদকেই আঁকড়ে থাকবে?' প্রশ্ন করে চায়ে ফের চুমুক দেয় রেজাইল। 'আমি যদি বলি, এর পরিপ্রেক্ষিতে তুমি প্রতিদিন তোমার জীবনে কষ্টকেই প্রাধান্য দিচ্ছ, বেশি, যা তুমি চাও না। কিন্তু জেদের কাছে পরাজিত হওয়াটাও তোমার জন্য অসম্মানজনক। এতে কি শুধু বিপর্যয়ই বাড়ছে না?'

রেজাউলের হাতে পত্রিকা। এইসব বিরক্তিকর প্রসঙ্গ থেকে নিজেকে সরাতে টেনে নিয়ে সেটা, মেলে ধরি। চক্রাকারে হেড লাইন ঘোরে। 'যুক্তরাষ্ট্রে বাজেট সংকট', 'বড়ো ধরনের সংঘর্ষের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন আতঙ্কিত', 'হাজার হাজার বছর যুদ্ধ করব—সাদ্দাম', 'ক্যাম্পাসে আবার বন্দুক যুদ্ধ—নিহত-১ গুলিবিদ্ধ ৮', 'ইরাক কুয়েতের তেলক্ষেত্রে বিস্ফোরক পুঁতে রেখেছে'... ইত্যাদি। পত্রিকা ভাঁজ করে রাখি। আমার পত্রিকার নিউজ সমস্ত রেষ্টুরেন্টে সঞ্চারিত। ভিড় বাড়ছে। তুমুল উত্তেজনা প্রতিটি টেবিলে। এসময় অনুভব করি, বিশাল রণক্ষেত্রে ভাসছে আমার লাশ। মনে হয়, লাগুক যুদ্ধ, সব লন্ডভন্ড হয়ে যাক। কিন্তু আমরা যারা ছাপোষা, তারা বড়ো সুবিধাবাদী। গলি-ঘুপচি পেরিয়ে মুহূর্তেই নিজের জীবনে ফিরে আসি।

'দেখো', এবার আমি সহজ গলায় সরাসরি বলি, 'খুব ভালো আছি—এমন অবিশ্বাস্য উচ্চারণ করব না। কিন্তু চমৎকার স্বাধীন আছি। পাশাপাশি সংসার করার সময় আমি যা ছিলাম তার চেয়ে সুস্থ আছি, অন্তত মনের দিক থেকে। স্বাধীনতার একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে। আমি আশা করি তুমিও তাই আছ, তেমনই আনন্দে।'

'এসব বাদ দাও'—রেজাউল অন্যপথে হাঁটে। তুঁমি কি আমার বেকারত্বকে ভয় পাচ্ছ? আমার চাকরি এখনও যায়নি। মাঝখানে প্রবলেমে পড়েছিলাম, এখন কেটে যাচ্ছে সেটা। মোটকথা, আমার পক্ষে একা চলাটা এখন অসম্ভব কষ্টকর হয়ে পড়েছে, বিশ্বাস করো নীনা, একেক দিন মরে যেতে ইচ্ছে হয়।'

'তুমি পুরো ব্যাপারটাকে এত হালকা করে দেখছ!' আমি রীতিমতো তেতে উঠতে থাকি, 'ডিভোর্সটা একটা ইয়ার্কি নাকি? আমাকে এত সহজ, সস্তা ভাবছ কী করে, সেটাই আমার অবাক লাগছে। তোমার আনন্দ আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কষ্টের সাথে সাথে আমি আন্দোলিত হব—এই সামন্ত ধারণাটা এখনও পালটাতে পারনি? শোনো রেজাউল, ডিভোর্স হয়েছে আমাদের দুজনেরই অপরিসীম অসমঝোতা, কষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে। আমার প্রতি তোমার ভালো আর মন্দ লাগা বারবার বদলাক, আমার তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু তোমার প্রতি আমার যতটুকু শ্রদ্ধা আছে, এইসব ফালতু আবেগ প্রকাশ করে সেটা অন্তত নষ্ট হতে দিয়ো না।'

'ফালতু আবেগ?' রেজাউল কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ে। 'একে ফালতু আবেগ বলছ? ভালো মিথ্যে বলতেও শিখে গেছ দেখছি! যেখানে ঘৃণা থাকে, বিচ্ছিন্নতা হয়, সেখানে আবার যৎসামান্য শ্রদ্ধাও থাকে নাকি? কৌশলী কথা বাদ দাও নীনা, আসলে বলো স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতাতেই তোমার আনন্দ। যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াতে পারছ, তাই সংসারকে খাঁচা মনে করছ। তুমি চিরকাল তা-ই ছিলে। সংসার এজন্যই তোমার কাছে অসহ্য ছিল। সংসারে চলতে গেলে পৃথিবীর বাউন্ডেলে স্বাধীন মানুষও কিছু বন্ধন মেনে নেয়।'

'তুমি কিন্তু এইবার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ, স্পষ্ট করে বলো তুমি কী বোঝাতে চাইছ?'

'সত্যজিত, সালাহদিন', গড়গড় বলে যেতে থাকে সে। 'তোমার কত শুভাকাঙ্ক্ষী জুটে গেছে। স্বাধীনতার আনন্দ তো তোমার থাকবেই।'

'শোনো', কোনো পূর্ব চিন্তা ছাড়াই এইবার নির্লিপ্ত কণ্ঠে আমি বলি, 'সালাহদিনের সাথে কয়েক দিন আমি শুয়েছি। তার সাথে আমার সম্পর্কটা শুধুই শারীরিক। অতএব আমার সাথে তার বিয়ের প্রশ্নই আসে না। আমার কিছু প্রবলেম আছে, তুমি জানো। আমার পক্ষে বিভিন্ন বিকৃতিতে যাওয়া কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এখন বলো, আমাকে নিয়ে নতুন করে সংসার পাতবে? তাহলে আমি রাজি আছি। কিন্তু ওদের কাউকে অস্বীকার করে নয়।'

রেজাউল চায়ের প্লেট সন্তর্পণে সরিয়ে রেখে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসে। তারপর টেবিলের ওপর রাখা আমার হাতে মৃদু চাপ দেয়—'খেপে গেলে এত উলটোপালটা বকো তুমি। ঠিক আছে, এ জেনেও আমি রাজি, তুমি কবে আসছ?'

এই একটা জায়গায় এসে আমার কষ্ট হতে থাকে। দীর্ঘদিন একসাথে থাকার ফলে আমার স্বভাবটা ওর চেনা হয়ে গেছে। আজ এতদিন পর ঠিক এই মুহূর্তটির এমন মূল্যায়ন, আমি ঠোঁট চেপে নিজেকে সামলাই। মৃদু ভঙ্গিতে হাসি, 'তুমি ভাবছ ঘটনাটা সত্য নয়, তাই হালকাভাবে নিচ্ছ। খুব উদারতা দেখাচ্ছ?'

'মোটেই তা নয়', রেজাউল বলে, 'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করেছি।'

এইবার ফাঁপড়ে পড়ে যাই। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বিষয়টার জন্য একটা দিক তুলে ধরি, বলি, 'এই সমাজ তোমার কাছে আমাকে যেতে দেবে কেন? ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী আমাকে অন্য কারো ঘর করে পরে তোমার কাছে আসতে হবে। তুমি সেটা মানতে পারবে?'

রেজাউল বলে, 'আগে রাজি হও। সেসব পরের ভাবনা। সময় বদলাচ্ছে না? প্রয়োজন হলে দু-জন আবার বিয়ে করব। নীনা, এখন কোনো কৌশল না করে আরেকটা সত্য কথা বলো, সত্যজিত তোমাকে কিছু বলেছে?'

'কোন ব্যাপারে?' সিঙাড়ার আলু নিস্পৃহ ভঙ্গিতে নখে বিদ্ধ করি। রেজাউল যেন জুতসই ভাষা না পেয়ে সরলভাবেই আমতা আমতা করে, 'এই ধরো, মানে তোমার সেক্সচুয়াল...?'

'এ ব্যাপারে সত্যজিৎ কী বলবে?' ভেতরে জ্বলে উঠতে থাকা আগুন চেপে আমি অবাক হওয়ার ভান করি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘তুমি কী বলতে চাইছ? তোমার প্রাক্তন স্ত্রীর এইসব ব্যক্তিগত ব্যাপার অন্য একজন তার কাছেই বলবে? তুমি কী বলতে চাইছ বুঝলাম না!’

‘তখন খেপে উঠলে সেজন্য জিজ্ঞেস করলাম।’

‘তুমি তাকে কিছু বলেছ বলে মনে হচ্ছে? নইলে এ-প্রসঙ্গে ওর নাম আসবে কেন?’

‘গোয়েন্দাগিরির অভ্যাসটা ছাড়ো’, রেজাউল সিগ্রেট ঠোঁটে নেয়। ফস করে দেশলাই জ্বালায়—আমি ওকে কিছু বলিনি। ওর সাথে তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, আমারও। অনেককিছু থেকে অনেক প্রসঙ্গ উঠতে পারে। তাই ওর নামটিই আগে মনে এল।’

কী দুর্বল অজুহাত! আমি যখন তেতে উঠছি আবারও, তখন রেজাউল বলে, ‘সত্যি করে বলো তো নীনা, সালাহদিনের ব্যাপারটা, ইয়ার্কিইতো করেছ?’

এবার আমার ভেতরে নতুন করে ধস নামার পালা। আসলে ও যা, তার থেকে বেরোনো ওর পক্ষে অত সহজ নয়, যেটা আমি ভেবেছিলাম। আমি ভেবেছি, ঠিক ওই প্রসঙ্গে রেজাউল আসলে আমাকে চিনতে পেরেছে। যার ফলে আমার কষ্ট বেড়েছিল। ওর এই প্রশ্নে এক অস্বস্তিকর ঘেরাটোপ থেকে আমার সটান বেরোতে সুবিধে হয়, আমি বলি, ‘না, ইয়ার্কি করিনি, ওর সাথে আমি শুয়েছি। আমার এই নিঃসঙ্গ জীবনে সেটা কি অবাস্তব কিছু? আমার তো কারো সাথে দায়বদ্ধতা নেই।’

এরপর রেজাউলের সিগারেট ফুরিয়ে আসে। বেয়ারা এসে কাপ-প্লেট নিয়ে যায়। রেস্তোরাঁয় শ্বাসরুদ্ধকরভাবে ভিড় বাড়তে শুরু করে। কাপ-প্লেটের টুংটাং এবং জনতার অসংলগ্ন হইচই-এর মধ্যে ঢাকার মাথায় সন্ধ্যা নেমে আসে। আমরা দুজন বেরোই, সমস্ত শহরে আলো জ্বলে উঠেছে।

রেজাউল যাওয়ার সময় বলে, ‘আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিনি।’ আমিও হাসতে হাসতে বলি, ‘তোমার এই কথার মধ্যেই তোমার বিশ্বাস লুকোনো আছে। তার চেয়ে বলো বিশ্বাস করতে কষ্ট পাচ্ছ।’

‘আমি কি এর পর তোমার সাথে দেখা করতে পারি?’ রেজাউল সন্তর্পণে প্রসঙ্গ এড়ায়।

‘আমাদের যত কম দেখা হয় দুজনের জন্য ততই মঙ্গল, তোমার কী মনে হয়?’

‘এইবার তুমি তোমার মত আমার ওপর চাপাচ্ছ... যাহোক, আমি যাই’—ভিড়ের মধ্যে রেজাউলের অস্পষ্ট পাতলা দেহ মিশে যায়। তারপরও আমি কতক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে থাকি।’

বাসায় ফিরে দেখি হুলুস্থুল। শানু বাড়িওয়ালার সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত। সেই যুদ্ধে সে একক নেতৃত্ব দিচ্ছে। পেছনে তার স্বামী। শানুর ঘর্মাক্ত মুখ, বুকের আঁচল মাটিতে খসে পড়া, ক্রমাগত তার নিশ্বাস নেওয়া—এসব দেখে ব্যাপারটাকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। আমি যখন দরজায়, তখন সেই চূড়ান্ত ঝগড়ার শেষ পর্যায়। আমি তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে দরজায় দাঁড়িয়ে বিমূঢ় হয়ে যাই। ‘ছাড়ব না বাসা, দেখি ব্যাটা তুই কী করতে পারিস। বুঝি না ভেবেছিস, ভাড়া বাড়ানোর পাঁয়তারা, তিনমাস আগে না একবার বাড়ালি? মামুর বাড়ির মোয়া, না? আজ এটা, কাল সেটা।’ ‘চুপ কর বেটি’—বাড়িওয়ালা ক্ষিপ্ত স্বরে বলে, ‘আমার বাড়ি, না পোষালে আমি ছাড়তে বলব। তোমার মতো পাঁচ পয়সার বেটির কাছে ভাড়া বাড়ানোর জন্য পাঁয়তারা কষতে হবে?’

‘ভদ্রভাবে কথা বলেন’, এবার শানুর স্বামী এগিয়ে আসে এবং আমাকে দেখেই যেন প্রসঙ্গটা আবার উত্থাপন করে, ‘একটা মেয়ে চাকরি করে। রাত করে সে ফিরতেই পারে। নানা কিসিমের ছেলেদের সাথে ফেরে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

আপনি দেখেছেন? আপনি একজন মুরব্বি হয়ে পাঁচ কথায় কান দেন কেন? আপনি তো এখানে থাকেন না। অন্যের কথায়...?'

'হয়েছে, ওর সাথে অত ভদ্রতা মারাতে হবে না', শানু ফুঁসে ওঠে, 'বলে কি-না বাড়িটাকে বেশ্যাখানা বানাচ্ছি। কেনরে ব্যাটা? বুড়ো বয়সে তোর কাস্টমার হওয়ার সাধ জেগেছে নাকি? তোকে আমি চিনি না? সেদিন ইনিয়েবিনিয়ে কী সোহাগভরা কথা! একটা মেয়ে, মাথার ওপর স্বামী নেই, গাছ নেই... কত কথা... ফাঁস করে দেব আসল মতলব?'

শানু একটানা বকে যায়। উফ্! শানু এই পর্যন্ত পারে? আর আমি? এই অশ্লীল প্রসঙ্গটার কেন্দ্রবিন্দুতে? কেমন জমে যাই। অবশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। শানু আমাকে টেনে ভেতরে আনে। 'আয়তো নীনা, দেখি, ব্যাটা কী করে আমাদের তাড়ায়!' তারপর আরও চিৎকার। আরও অসহ্য সব যুক্তি, পালটা যুক্তি, বাড়িওয়ালার এক সময় হঠাৎ প্রস্থান। তারপর রাত। শানুর গজগজ, আমার অসহ্য পীড়ন। নিজের বাঁচার প্রতি আবারও আমার ঘেন্না।

বিচিত্র ঘিনঘিনে সব অনুভূতি নিয়ে বিছানায় চেপে শুতেই মগজের শিরা চোখ মেলে থাকে। সত্যজিৎ আমাকে কী ভাবছে? সে কি তবে রেজাউলেরই বন্ধু? আমি স্রেফ বন্ধুর স্ত্রী? কিন্তু সেদিন ভর দুপুরে সালাহদিনের ঘরে গাঁজা খেতে খেতে যে লোকটা অদ্ভুত সব কথা বলে আমার কাছে গাঁজার মতো জিনিসটাকে মহান করে তুলল, আমার প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠল, তাকে অত সহজে আমি ঝেড়ে ফেলি কী করে? কী করুণ ক্রন্দনময় হয়ে উঠছিল তার কণ্ঠস্বর। এদেশ আমার নয় নীনা? এত বছর ধরে এত রক্ত-ঘাম মিশিয়ে দিচ্ছি এই মাটির সাথে, অথচ দেখ, ওপারে কারা যেন মসজিদ ভাঙছে, তার জন্য কী জঘন্য তিরস্কার আর অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে এপারের আমাদের। বাড়িওয়ালা কাল শাসিয়ে গেল, 'সব টাকা-পয়সা তো বর্ডার পার করে দিয়েছেন, আপনি মশাই বসে থাকছেন কেন? জলদি কেটে পড়েন।' ওপারে আমার কে আছে যে যাব? শুধু ধর্ম কি আত্মীয়তা দিতে পারে? সৌদি আরব তোদের দেশ? নীনা, সেদিন কী ঘৃণায় গলি ধরে লোকগুলো ইটপাটকেল নিয়ে ছুটে এসেছিল আমার দিকে। এই দেখ, মাথা কেটে গেছে', সত্যজিৎ শিশুর মতো তার মাথা মেলে ধরেছিল আমার সামনে, 'এই দেখ ফুলে গেছে।' সত্যজিৎ টলমল পায়ে দাঁড়িয়েছিল। 'এই দেশ ছেড়ে গেলে আমি বাঁচব? নীনা, তুই কোনোদিন বুঝবি না, কী গভীর যন্ত্রণা এতে। গতকাল থেকে সালাহদিনের বদ্ধ ঘরে পালিয়ে আছি, নীনা দেখ আমার এই নুলো, ভোঁতা, স্যাঁতসেঁতে হৃদয় থেকে দাউদাউ আগুন বেরোচ্ছে, আমি পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছি, নীনা, আমাকে ধর। একজন মানুষের যখন দেশ থাকে না, তার মতো রিক্ত ভিখিরি আর কে আছে পৃথিবীতে?' আমি তাকে জাপটে ধরেছিলাম। 'সত্যজিৎ, সভ্য লোকেরা এসব করছে না, প্লিজ, তুই স্থির হ। এরা সবাই না।' তারপর জীবনে প্রথম বড়ো মায়ায় সে আমার মুখ তার হাতে তুলে নিয়ে গভীর জড়তাময় কণ্ঠে বলেছিল, 'খাঁচার মধ্যে যে হলুদবরণ পাখি শুধু নিজের ঠোঁট কামড়ায়, আর ডানা ঝাপটায়, কিন্তু উড়াল দিতে পারে না কখনো, অমন কোনো ছবির ফ্রেমে তোকে মানায় না। তুই বড়ো ভালো কাজ করেছিস নীনা, অন্তত উড়াল তো দিলি।'

'মুখ থুবড়ে যদি টিনের চালে পড়ি?'

'আবার উড়াল দিবি।'

'তবে তুই কাঁদছিস যে বড়ো?' আমি তাকে খোঁচা দিই, 'ক-জন মৌলবাদীর উসকেনো রাজনীতির কাছে এইভাবে টোসকা খেয়ে গেলি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘এ অন্য যন্ত্রণা। দেশের মাটি আমাকে পর করে দেবে? স্রেফ ধর্মের জন্য?’

‘মাটি তোকে পর করেনি।’ আমি ঠান্ডা গলায় বলি, ‘মাটির কী দোষ? তুই এভাবে ভেঙে পড়লে ওই অসভ্যদেরই যে জিতিয়ে দেওয়া হয়।’

‘ওই হল, ক্যাঁচাল করিস নাতো। আমাকে একটু কাঁদতে দে’... বলে সে হাউমাউ করে সেদিন কেঁদেছিল। সালাহদিন আর আমি বহু কষ্টে তাকে সামলেছিলাম। সেই গভীর প্রাণের মানুষটি শুধুই রেজাউলের বন্ধু? সেসব কি তবে ভান ছিল? আমি ছটফট করি। যে অত গভীর কণ্ঠে উড়ালের কথা বলল, আজ রেজাউলের সামান্য সর্দি-মেশানো কান্নাতেই সে সমঝোতার প্রস্তাব রাখছে? রেজাউলকে নিশ্চয় ও-ই আমার অফিসের ঠিকানা দিয়েছে। আমি এখন কোথায় দাঁড়াই?

বন্ধের দিন সকালে ইজেলটা আনতে ইরফান চাচার ওখানে যাব, হন্তদন্ত সত্যজিৎ এসে হাজির। এসেই বলে, ‘তুই বেরোচ্ছিস কোথাও?’

আমি ওকে দেখে রীতিমতো অবাক। এইরকম সকালে ওর আচমকা আবির্ভাব, বাড়িওয়ালার সাথে শানুর তর্ক —আমি কেমন অস্বস্তি নিয়ে চেয়ার টেনে ওকে বসতে বলি। সত্যজিৎ বলে, সালাহদিন গতকাল অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। পিজিতে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি।’

‘কোথায়? কীভাবে?’

ঠিক এই সময় এরকম খবরের জন্য আমার কোনো প্রস্তুতি ছিল না, কেমন অসাড়বোধ করি।

‘প্রেস থেকে ফিরছিল। ফর্মা কয়েক প্রুফ শিট হাতে নিয়ে। টিকাটুলির মোড়ে রাস্তা ক্রস করবে, শালার এক মিনিবাস... অল্পের জন্য বেঁচে গেছে।’

‘এখন অবস্থা কেমন?’

‘বেশি ভালো না। অনেক জায়গায় কেটেছে। যন্ত্রণায় খুব তড়পাচ্ছে।’

আমি মোটামুটি তৈরিই ছিলাম। বেরিয়ে পড়ি তার সাথে। সন্তর্পণে রুমাল দিয়ে ঠোঁট থেকে লিপিস্টিকের প্রলেপ মুছে ফেলি। তারপর ওর পাশে সহজ হয়ে বসার চেষ্টা করি। রিকশায় অনন্ত স্তব্ধতা। সেদিনকার ঘটনার পর থেকে সত্যজিতের সাথে মানসিকভাবে সহজ হতে পারি না। অবশ্য তারপর আজই প্রথম দেখা। তা-ও দুজনের মাঝখানে একটা দুর্ঘটনার নিঃশব্দতা। আমি অস্বস্তি নিয়ে আবাহনী মাঠের দিকে চেয়ে থাকি। এক সময় সায়েন্স ল্যাবরেটরি, মাসকো সুজ। বাঁয়ের রাস্তা হেঁটে গেছে খাড়া হাতিরপুল কাঁচা বাজারের দিকে। এবং ডানে মুজিব হল। আমরা দুজন কেউই এতটা পথ কথা বলি না। এক সময় বায়ে সিলভানা। শাহবাগের মোড়ে এসে মুখ খোলে সত্যজিৎ, ‘প্রচুর রক্ত গিয়েছে। আমি ছিলাম বেকারিতে। হঠাৎ একটা ছেলে এসে খবর দিল। ওর বাবা-মা এত দূরে থাকে। কেউ এখনও জানে না।’

‘খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করা যায় না?’

‘সে-ই দিনাজপুর! দেখি, চেষ্টা করছি। শালা লেখা লেখা করে গেল। মাথার মধ্যে আর কিছু নেই। ক-দিন ধরে প্রেস আর বাসা ছাড়া দুনিয়া ভুলে গিয়েছিল। চাকরি করে যা জমিয়েছিল, সব ওই বইয়ের পেছনে ঢেলেছে। এখন এ রকম একটা দুর্ঘটনা, আরও কত খরচ।’

‘কী আশ্চর্য, নিজের টাকায় বই বের করছিল! প্রকাশক পায়নি?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

রিকশা দাঁড়ায় পিজির সামনে। যাকগে, একটু ঘুরে যেতে হবে। প্রকৃতি জুড়ে এখন কাচ স্ফটিকের উজ্জ্বলতা। সেই ধাঁধানো আলোর তোড়ে ঢাকার বিখ্যাত কাকেরা কেবলই ঘাই খাচ্ছে। ক্রমশ এগোই। লিফটের সামনে ভিড়। গেটম্যানকে হাজারো কথার প্যাঁচ দিয়ে বুঝিয়ে এখানে এসে হাঁ হয়ে থাকি। অতঃপর সিঁড়ি ভাঙো। এক ধাপ, দু-ধাপ তিন ধাপ... ওপরে উঠছি... আরও ওপরে। 'কী বলছিলি? নিজের টাকায়?' সত্যজিৎ নিশ্বাস টানছে, 'নতুন লেখক, প্রকাশক পাবে কোথায়? অত পথঘাট চেনাও নেই তার।'

আবার সেই হাসপাতাল। আমার বীণায় হাজার তন্ত্রীর শব্দ। প্রলম্বিত প্যাসেজ ধরে হাঁটি। কেমন শ্লথ, অবসন্ন হয়ে আসছে পা। সেভলনের টানা গন্ধ আমার মগজ ফুঁড়ে ঢুকে আমাকে ছায়াচ্ছন্ন করে তোলে। যেন সহস্র মৃত্যুর আর্তনাদ আছড়ে পড়ছে চারদিকে। দৃষ্টি রুদ্ধ করে রাখে অদৃশ্য কাচের পাল্লা। এক নিরন্তর হাহাকারের শব্দ আমার জান তোলপাড় করে আমাকে রক্তহীন করে তুলতে থাকে। সেই ঊষর ভূমিতে উজ্জ্বল মানবশিশু বৃত্তাকারে হামাগুড়ি দেয়। হাঁটে, দৌড়ায়, শেষে চিৎকারের ভেতর দিয়ে তার সশব্দ ভূ-পতন। এক অর্থহীন শূন্য স্তব্ধতা ছিন্নভিন্ন করছে সেই হলুদ শিশুটির টানা চিৎকার। জন্ডিসের সে-কী সর্বগ্রাসী ভূমিকা! বেনিআসহকলা পাক খেয়ে মিশেছে একটি বিন্দুতে—হলুদ। পৃথিবীতে শুধু এই একটি রঙেরই বিষাক্ত ছায়া। আমার পা টলছে। কেমন ঝিমঝিম লাগছে। আমাকে ছিঁড়েখুঁড়ে, কচলে একাকার করে প্রবেশ করছে সেই গন্ধ! হ্যাঁ, এই হাসপাতালের গন্ধই তো শিশুটির শরীরে ছিল। এই গন্ধে পুরো হাসপাতালকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই মৃত্যু হয়েছিল ওর।

আশ্চর্য নীল বিষের ভাণ্ড ডাক্তার তুলে দেন আমার হাতে, 'পান করো।'

নিজেকে টেনে সেই বিশাল সাদা ঘরে ঢুকি। ওপরে সীমাহীন সাদা ছাদ। তার নীচে নিশ্চল সালাহদিন। বিকৃত মুখে যন্ত্রণা সামলাচ্ছে। তার পা, কপাল বলতে গেলে গোটা সালাহদিনই প্লাস্টারে ডোবানো। চারপাশে অসহ্য যন্ত্রণার গোঙানি। ওর চুলে হাত রাখি। তাতেই ও এমন আকুলভাবে আমার দিকে তাকায়, কেমন অস্বস্তিতে পড়ে যাই। ঠোঁট অল্প ফাঁক করে তারপরও ও হাসে। আমি কপট রাগে বলি, 'এর মধ্যেও হাসছ? কাণ্ড তোমার!'

যেন ফিসফিস, এমন অস্পষ্ট গলায় সে বলে—'হাসব না? আজই যে প্রথম বুঝলাম, পৃথিবীতে আমি একা নই।'

'নিজেকে একা ভাবতে পারার সুখ এটাই', আমি বলি। 'পৃথিবীর কাছে যখন কিছু চাওয়ার থাকে না, তখন আকস্মিক অল্প প্রাপ্তিই বড়ো হয়ে দেখা দেয়।' আমার সাদা মসলিনের শাড়ি হাসপাতালের গন্ধে ভিজে ওঠে। 'না, না', হাত নাড়ে সে, 'তুমি বুঝছ না।'

'আজ কথা বোলো না, আমি ওকে বাধা দিয়ে ওর চুলে আঙুল ঢোকাই। আমি কাল আবার আসব। পরে এ নিয়ে তর্ক হবে।' আরও দীর্ঘ নিঃশব্দ সময়। যখন উঠব, তখন সত্যজিৎ আমাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য দাঁড়ায়। ওকে বলি, 'আমি একাই পারব, তুই ওর কাছে থাক। তাছাড়া ওর বাড়িতে খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।'

'নীনা, তুই কোনো কারণে রাগে করেছিস আমার ওপর?'

'না।'

সিঁড়ি ধরে নামছি। কে যেন ডাক দেয় পেছন থেকে। ওপর থেকে তিন ধাপ নেমে গেছি। ডাক শুনে মাথা ঘোরাই। স্রেফ হনুমান, একজন লোক। অসংলগ্ন চুল তার কপাল ঢেকে রেখেছে। খাড়া নাকের নীচে অসম্ভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পিচ্চি দুটো চোখ। আরও আছে খোঁচা দাড়ির বাহার। শুকনো, ঢ্যাঙা শরীরের ওপর ফ্যাকাসে শার্ট। প্যান্টও রং-ওঠা। ভীষণ চেনা লাগছে লোকটাকে। কিন্তু নির্জন সিঁড়িতে কেমন ভয়ও লাগছে। মৃত সন্তানের দুঃস্বপ্নের ঘ্রাণ তখনও আমার সর্বঅস্তিত্ব গ্রাস করে রেখেছে, আমি সহসা কিছু বুঝে উঠতে পারি না।

'কেমন আছেন?'

'ভালো', বলে আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকি। ভদ্রলোক কে, খুঁজে বের করার কোনো মানে নেই। এমন একজন বিদঘুটে লোকের সাথে আমার কোনোকালে পরিচয় ছিল না, এটা আমি নিশ্চিত। চেনা লাগার সূত্র ধরে এমন নিঃশব্দ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকাটা বোকামি।

'আমাকে চিনতে পারেননি?' এবার সে নেমে আসে। 'এত ভয় পান আপনি? সেদিনও ভয় পেয়েছিলেন। অথচ বরাবরই একলা চলছেন দেখছি।'

'মানে?' আমি দাঁড়াই। 'কবে ভয় পেয়েছি?' এত অধিকারের সুরে কথা বলছে, অথচ আমি তাকে চিনতে পারছি না। কোথায় দেখেছি একে? মনে মনে হাতড়াতে থাকি। ধুৎ—হাত গিয়ে ঠেকে মৃত সন্তানের তলপেটে।

'সেদিন বাসা খুঁজে পেয়েছিলেন?' সে আর এক ধাপ এগোয়। তার এই প্রশ্নে উদ্ভাসিত হয়ে উঠি, 'ওহহো সেই যে... আপনিতো মশাই সেদিন ক্লান্ত হয়ে আমাকে রাস্তায় ফেলে চলে গেলেন। তারপর ঘুরতে ঘুরতে...।'

'যাহোক পেয়েছিলেন তো?'

'হ্যাঁ তা পেয়েছিলাম।'

'আসলে আমার ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ ছিল। একজনের কাছে টাকা পেতাম। তখন না গেলে তাকে কিছুতেই পেতাম না। সে বিদেশ চলে যাচ্ছিল।'

'না, না, আপনি অনেক করেছেন।' আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। 'কী ব্যাপার, হাসপাতালে কেন?'

'আমার ছোটোভাইটাকে হপ্তাখানেক আগে ওর এক বন্ধু স্ট্যাব করেছে। অনেক রাতে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে...'

'বলেন কী!' আমি আঁতকে ওঠি। 'বন্ধু বলেছেন কেন, ওতো সাক্ষাৎ শত্রু ছিল।'

'হ্যাঁ, তাতো ছিলই। আসলে আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুতই ছিলাম, এমন একটা কিছু একদিন ঘটবে। ওর সার্কেলটা খুব খারাপ ছিল।'

'চলুন, ওকে দেখে আসি।' ক্ষীণ একটা দায়িত্ববোধ থেকে নিজেকে টেনে তুলি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভদ্রলোক জানতে চায়, 'আমি কেন এখানে এসেছি। আমি সালাহদিনের সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তিসহ হাসপাতালের প্রশস্ত রুমে প্রবেশ করি। একটা হাত ওপর দিকে স্ট্যান্ডের সাথে ব্যান্ডেজসহ বাঁধা, বুকেও ব্যান্ডেজ, ঘুমিয়ে আছে। পাশে এক বৃদ্ধা। ফ্যানের বাতাস আছে। তবুও তালপাতার পাখা দিয়ে মাথায় বাতাস করছে। তার দু-চোখ ঝিমন্ত। এই রকম অপরিচিত একটা বৃত্তে কীভাবে শুরু করতে হয়, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। মাথায় সাদা ঝুঁটি নার্স এসে টুল পেতে বসেছে। অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। উদ্ধার করে সেই ভদ্রলোকই, 'আপনি সম্ভবত বাসায় যাচ্ছিলেন?'

'হ্যাঁ, চিকিৎসা কেমন হচ্ছে?'

'হাসপাতালের চিকিৎসা!' তার স্বরে শ্লেষ মেশানো, 'হচ্ছে মোটামুটি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘এখন কেমন আছে?’

‘ভালোই, তবে জাগলে বেশ কান্নাকাটি করে। চলুন হাঁটি।’ সিঁড়ির মুখে এসে সে জানতে চায়, সালাহদিন কত নাম্বার রুমে আছে? আপনার বন্ধু যেহেতু, একবার যাব। রুম, বেড নাম্বার সব জানিয়ে সিঁড়িতে পা রাখছি, বলল, ‘আপনি কি আবার আসবেন?’

‘তা আসব বইকি। ও আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এলে আপনার ওখানেও যাব।’

‘ওহ্ হো, জানা হল না, আপনার বাসা কোথায়?’

‘রায়ের বাজার।’ বলে ক্রমশ সিঁড়ি ধরে নীচে নামতে থাকি।

পেছন থেকে সে বলল, ‘আমার নাম ওমর।’

‘ও-আচ্ছা।’

এই করতে করতে দুপুর গড়িয়ে গেছে। টানা রাস্তা ধরে হনহন হেঁটে রিকশা নিই। উফ্! দুঃসহ এক পরিবেশ। মানুষের আর্ত গোঙানি! বিষাক্ত সেভলনের গন্ধ! একজনের হাত-পা ওপর দিকে খাড়া করে বাঁধা। মল-মূত্র-থুথু-ব্যান্ডেজ, অবিশ্রান্ত স্মৃতি, কলজে খামচে-ধরা শিশুর কান্না, হাসপাতালের প্রতিটি খাঁজে আমি ওর মৃত্যুময় গায়ের গন্ধ পাই। কথা বলছিলাম, কিন্তু কেমন উদ্ভ্রান্ত, অবশ লাগছিল। কলজে মুচড়ে ঝরছিল নীল কষ। ঘূর্ণায়মান পাখা ছাদের সাদা তোলপাড় করছিল।

খোলা রাস্তায় নেমে টানা নিশ্বাস নিই। তারপর আমাদের আদি পৃথিবীর জং-ধরা হাওয়া এক সময় সব কাদা ধুয়ে নেয়। ট্রাফিক বাতি, মানুষের ঊর্ধ্বশ্বাস চলা, চাকার ঘূর্ণি, বিউটিপার্লার, সিনেমা হলের রঙিন ব্যানার, উত্তপ্ত পিচঢালা পথ, সার সার সাজানো দোকানপাট এইসব অতিক্রম করে আমার রিকশা এক সময় হাজারো প্যাঁচ পেরিয়ে সেই প্রাচীন বাড়ির সামনে।

আশ্চর্য কাকতালীর ব্যাপার। এই বাড়িতে আজ নিয়ে মোট দু-দিন আসা এবং দু-দিনই সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সেদিন রাস্তায়, আজ হাসপাতালে। কী উচ্ছৃঙ্খল চেহারা! অবশ্য অসম্ভব বিনীত সে। সেদিনকার অস্বস্তির মূলে ছিলেন ইরফান চাচা। আজ অস্বস্তি হচ্ছে তার স্ত্রীর কথা ভেবে। তেমনই জড়তা নিয়ে আমার স্বয়ংক্রিয় তর্জনী দরজায় নক করে। এক সময় দরজা খুলে যায় এবং আজকে দরজায় মালিক নিজেই। আমাকে দেখে আন্তরিক উদ্ভাসনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন, ‘কী আশ্চর্য ব্যাপার, তুমি?’

‘ইজেলটা নিতে এসেছি’—হাসি চেপে বলি।

‘তা, ওটা কি দরজায় দাঁড়িয়েই নেবে?’

‘ঠিক আছে, আপনি চাইলে কিছুক্ষণ বসতে পারি।’ এইরকম হালকা চটুলতা দিয়ে শুরু হয়। সেই পুরোনো কামরা, মোগলাই হাওয়া, গুমোট গন্ধ। সোফায় নিজেকে ঠেসে দিয়ে আর কথা খুঁজে পাই না। স্লিপিং গাউন পরা ইরফান চাচা বেশ তাজা, ঝরঝরে। সেভ করা উজ্জ্বল গাল, আন্তরিক হাসি। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে তার চোখে আমাকে ঘিরে গাঢ় বিস্ময়। আমি দাঁড়াই, ‘বলি, একটু চাচির সাথে দেখা করে আসি।’

‘অত ভদ্রতার কোনো দরকার নেই’, তিনি বলেন, ‘তুমি বোসো, এমনিই দেখা হয়ে যাবে। এ বাসায় এরকমের ভদ্রতা না করলেও চলে।’

আমি বসি, কিন্তু সোফার বাক্সে বন্দি আমার অস্তিত্বে খচ খচ লেগেই থাকে। না, ‘এটা ঠিক ভদ্রতা নয়, সেদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

এসেছিলাম তিনি খুব আন্তরিক ব্যবহার করেছিলেন।'

'ঠিক আছে, পরে দেখা করে যেয়ো'—তিনি বলেন, 'এখন বলো, তুমি কেমন আছ?'

'নাতিশীতোষ্ণ', আমি হেসে ফেলি।

'চমৎকার বলেছ। তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অবস্থার মধ্যে আছ। আমার বুঝলে, গরমে প্রচণ্ড গরম লাগে, শীতে প্রচণ্ড শীত, ওরকম না-গ্রীষ্ম না-শীত আবার জীবনে আসেনি।' তারপর সীমাহীন স্তব্ধতা। তিনি কিছু ভাবছেন। সোফায় আধশোয়া অবস্থায় হেলান দিয়ে। ভ্যানিটি ব্যাগ হাতড়াই, মেঝেতে জুতো ঘষি, আবারও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি সেদিনকার দেখা কামরাটি। ফ্যানের চকচকে ঘুরন্ত ব্লেডের দিকে দ্রুত ধাবমান সাদা মসলিন। অবিন্যস্ত হাতে সামলে আজই লক্ষ করি, অশ্রুর মতো তার রঙ।

'ভ্যানগগের জীবনী শেষ হয়েছে?'

'না।'

'কেন, আগ্রহ পাচ্ছ না?'

'বইটা চমৎকার। কিন্তু আমি কেমন কষ্টের মধ্যে পড়ে যাই।'

'কষ্টকে এড়িয়ে কি শিল্প সম্ভব নীনা?'

'কী জানি! তবে কেন জানি কষ্ট খুব একঘেয়ে লাগে আমার কাছে। কষ্টের যন্ত্রণা আজকাল টের পাই কম, কিন্তু ওই একঘেয়েমি, ওটাই আর সহ্য হয় না।'

ফস করে লাইটার ধরিয়েছেন। ঠোঁটে সিগারেট। অতঃপর ধোঁয়া। এবং পরক্ষণেই নিশ্বাসের সামনে ধাই ধাই নেচে ওঠে গাঢ় সেভলনের গন্ধ। হাসপাতাল, সাদা ছাদ, বদ্ধ ঘর, সব একাকার হয়ে যায়। বমি আসতে থাকে। হাঁসফাঁস করে দাঁড়াই, 'আচ্ছা, আপনার সবগুলো রুমে সময় সময় এমন তীব্র সেভলনের গন্ধ! কেন বলুন তো?'

'আমার মিসেসের প্রিয় গন্ধ ওটা', তিনি বলেন, 'পানির সাথে সেভলন দিয়ে প্রত্যেক দিন ঘর মোছায় সে। মজার ব্যাপার, জীবাণু ধ্বংসের কোনো উদ্দেশ্য থেকে যে এমনটা করে, তা কিন্তু নয়। স্রেফ সেভলনের গন্ধের জন্য।

'সেভলনের গন্ধ প্রিয়!' আমি আকাশ থেকে পড়ি, 'মানুষ সত্যিই বড়ো অদ্ভুত অথচ এই গন্ধটা সবচেয়ে অসহ্য আমার কাছে। মনে হয়, ওটা রক্তের, মৃত্যুর গন্ধ!'

'তুমি অস্বস্তি ফিল করছ?' তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

'না না, ঠিক আছে,' আমি নিজেকে দ্রুত সামলে নিই। তিনি বলেন, 'জানো, ওর আরেকটা অদ্ভুত শখ আছে, টিকটিকি পোষা। সারা ঘর টিকটিকিতে ভরে যাবে, এটাই ওর স্বপ্ন।' আমি হেসে ফেলি, 'আশ্চর্য মানুষের শখ। তারপর কেমন ঘোরে-পড়া-মানুষের মতো বিড় বিড় বলে যাই, 'জানেন, সেভলনের গন্ধের সাথে আমার একটি সন্তানের মৃত্যুর স্মৃতি জড়িত। এই গন্ধ পেলেই ওর চিৎকার, তার লাশ আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।'

অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ছেন, পুনরায় টানছেন। তার মুখ ধোঁয়ার কুয়াশায় ছাওয়া। একটু পর ধীরপায়ে উঠে যান তিনি। আমি তার পদবিক্ষেপে বিষণ্ণতার একটা ছাপ দেখতে পাই। কিন্তু কী আশ্চর্য মানুষ, আমার এই অনুভবের মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন না? এক জঘন্য তেতো বিস্বাদে আমার প্রাণ অসহ্য হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ওঠে। নিজের কাছে নিজেকে প্রচণ্ডরকমের বিচ্ছিরি লাগতে থাকে। আমি সেই বিশাল শূন্য ঘরে একা বসে থাকি। কেন এইরকম ভাবে প্রকাশ করলাম নিজেকে? কখনো কোথাও তো করি না? আজ এমন গলায় আটকে থাকা জমাট শ্বাসবদ্ধ মুখ ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে এল কেন? কেমন অসহায় লাগে। আমি কি চলে যাব? কেমন হবে সেই হঠকারিতা? একা বসে হাঁসফাঁস করি। কিছুক্ষণ পর উদ্ভাসিত মুখে তিনি প্রবেশ করেন। হাতে ইজেল। ড্রয়িং রুমের এক কোনায় স্থাপন করে ফুঁ দিয়ে ধুলো ওড়ান। তারপর শিশুর পিটপিটে চোখে আমার দিকে তাকান, 'পছন্দ হয়েছে?'

আসলেই অদ্ভুত। খাঁজকাটা, কারুকাজ করা। ইজেলের এমন ময়ূরকণ্ঠী রূপ আমি আর দেখিনি। নীচের স্ট্যান্ডটাকে হাঁসের ছড়ানো পা বলে ভুল হয়। বার্নিশের বাদামি রঙে প্রগাঢ় গভীরতা। কিছুক্ষণ আগের বুকে-চেপে-বসা তিতকুটে অনুভবটা ফরফর কোথায় উড়ে যায়!

'অদ্ভুত'—আমি চেঁচিয়ে উঠি। 'শিল্পীর আঁকা ছবির চেয়ে তার মডেলের পোজ সুন্দর, ব্যাপারটা এরকমই ট্র্যাজিক হয়ে দাঁড়াবে। আমি এটার ওপর যা চড়াব এর সৌন্দর্যের সামনে সেটা ম্লান হয়ে যাবে না?'

'এত হীনম্মন্যতায় ভোগো কেন?' তিনি বলেন, 'নিজের ওপর কিছুটা হলেও আস্থা রাখার চেষ্টা করো। আমি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তোমার আঁকাআঁকির ব্যাপারে ঝুঁকিনি। প্রথাগত শিক্ষার অভাবে তোমার কাজে সংযম কম। কোনো ব্যাকরণ মানেনি তোমার ছবি। কিন্তু তোমার স্বতঃস্ফূর্ত তুলির টান, রঙের সিলেকশান, অপূর্ব—আমি কি একটু বেশি প্রশংসা করে ফেললাম?'

'কেন, অনুতাপ হচ্ছে? কথার ব্যাপারেও এত ব্যাকরণ মানেন আপনি! এত বেশি ভদ্রতা বোধের আবরণ দিয়ে নিজেকে তৈরি করেছেন, স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশের মধ্যে এত হিসেব-নিকেশ, জানেন আমার একদম ভালো লাগে না।'

'ঠিক আছে, সারেন্ডার করছি।' হাত তোলেন তিনি। 'খোলা মনে বলছি, তোমার ছবি আঁকার হাত চমৎকার।' এরপর ট্রে-ভর্তি নাস্তা আসে। চারপাশে বিকেল। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। এর মধ্যে আমার আঁকা ছবিকে কেন্দ্র করে এমন একজন সমঝদারের উচ্ছ্বাস, কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি।

'গ্রিক মিথ সম্পর্কে তোমার কেমন ধারণা আছে?' প্লেট থেকে টুকরো আপেল তুলে জানতে চান তিনি, 'আগ্রহবোধ করো?'

'খুবই ভাসা ভাসা', আমি বলি, 'বন্ধুদের কাছ থেকে শুনে যতটুকু...।'

'তোমার পেইন্টিং-এর ক্ষেত্রে এসব ধারণা তোমাকে অনেক সাহায্য করবে। রঁদ্যার স্কাল্পচারে গ্রিক মিথের প্রভাব পড়েছিল। শুধু তাঁর নয়, আরও অনেক শিল্পীর, তোমার মনে হতে পারে, পুরোনো আজগুবি সব গল্প। এসব শুনে মজা পাওয়া যেতে পারে, কিংবা ফালতু মনে হতে পারে সব কিছু, ভাবতে পার পেইন্টিং-এর ক্ষেত্রে এইসব কাহিনি আবার কী ছায়া ফেলবে?'

'আসলে চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে নানা পর্বে এত বিচিত্র সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, এত বিপুল কাজকর্ম হয়েছে যে, এখন কিছু করতে গেলেই হাত কাঁপে। আসলে আমি বা আমরা এখন যা করছি, নতুন কিছু কী? পুরাতনের পুনরাবৃত্তি নয় কি?'

'তুমি কিন্তু খাচ্ছ না,' তাঁর কথায় সংবিৎ ফিরে পেয়ে আমি দ্রুত পায়েশের প্লেট হাতে তুলে নিই। কী মজার গন্ধ! খিদে তোলপাড় করা, অপূর্ব!

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘সেই কাহিনিটির কথাই ধরো’—তিনি আবার শুরু করেন। ‘খুবই প্রচলিত অরফিউসের কাহিনি—তার বাঁশির মাদকতায় স্তব্ধ বন, উড়ন্ত বিহঙ্গের ডানা বিবশ ক্লান্ত। আমি সাজিয়েই বলছি, তোমার সুবিধে হবে,’ বলতে বলতে তিনি আপেলের আরেকটা টুকরো হাতে নেন। পুরো ঘরে গুহার অন্ধকার ভর করে। তিনি বলেন, ‘তো সেই অরফিউসের কমলকলি সুন্দরী প্রেমিকা ইউরিডাইসের হঠাৎ মৃত্যু ঘটে। ফলে পাগল হয়ে যায় অরফিউস। শুরু হয় তার অন্তহীন পথ চলা। যেভাবেই হোক প্রাণ সঞ্চারিত করতে হবে ইউরিডাইসের দেহে। নইলে তার বেঁচে থাকা অর্থহীন। সে মৃত্যুপুরীর দিকে রওনা দেয়। তার সুরের কান্নায় মুগ্ধ হয়ে মাঝি নদী পার করে দেয়। মুগ্ধ হয় মৃত্যু-দরজার প্রহরী তিন মাথাঅলা ভয়াল দর্শন দৈত্যরূপ কুকুর। মৃত্যুরাজ হেডেস অরফিউসের বাঁশির কান্নায় স্থবির হয়ে যায়। সে বলে, ‘‘তুমি যাও, তোমার স্ত্রী তোমাকে অনুসরণ করবে, কিন্তু সাবধান, আলোক রাজ্যে প্রবেশ করার আগে তুমি পেছনে তাকাবে না। তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।’’ নীনা, তুমি এর পরের অধ্যায়টিকেই চমৎকার করে পেইন্টিং-এ আনতে পারো। সেই ট্র্যাজিক অংশটি... অরফিউস যাচ্ছে। হাতে তার বীণা। সেই বীণায় আনন্দ! বিষাদের সুর নেই। অরণ্য প্রান্তর ছায়া অতিক্রম করে সে হাঁটছে। অনেক পথ হাঁটার পর তার সংশয় জাগে। পেছনে তার প্রিয়তমা স্ত্রী আছে তো? সেই সংশয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আলোকরাজ্য প্রবেশের আগেই সে পেছন ফিরে তাকায়। কিন্তু হায়! এ-কী দেখছে সে! তার প্রেমিকা ক্রমশ অস্পষ্ট অস্পষ্টতর হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে! তুমি, বাঁশি হাতে যুবক, পেছনে প্রেমিকার অর্ধস্পষ্ট রূপ, পুরোটাই অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মে আঁকতে পারো। প্রেম নিয়ে হাজার বছর আগে থেকে সাহিত্য রচিত হচ্ছে, আসলে বর্তমানে তুমি বিষয়টাকে কীভাবে উপস্থাপন করছ, সেটাই আসল কথা। তোমার কল্পনার দৌড়, তোমার বিশেষ আঁক রীতি, বিষয় ও আবহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রঙের ব্যবহার—এসবের সমাহারেই তোমার সৃষ্টিকর্ম শিল্প হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে যতখানি তুমি তোমাকে নিয়ে উপস্থিত, তোমার শিল্পকর্মও ঠিক ততখানিই সবার থেকে বিশিষ্ট হতে বাধ্য। আচ্ছা, শিল্পীর ওপর একটু বেশি মাতব্বরি ফলিয়ে বসছি নাতো আবার?’

‘আপনি একটু বেশি ভদ্রতা করেন,’ আমি হেসে বলি, ‘শিল্পী হিসেবে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলছেন, তাতে করে চারুকলার ছাত্ররা রীতিমতো হাসবে। যাকগে, আপনার কথা অদ্ভুত লাগছিল শুনতে। আমি জীবনের এইসব বিষয় থেকে অনেক দূরে সরে গেছি।’ তিনি বলেন, ‘হৃদয়ের যত কষ্ট, গ্লানি সব এক করে ছড়িয়ে দাও সাদা কাগজে, নীনা, দেখবে কষ্ট একঘেয়ে নয়, বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। অর্থকষ্টের যে গ্লানি আছে, অন্য কষ্টের স্রোতে সেটাও ভেসে গেছে। তখন তোমার কষ্ট ধাবিত হবে আরও বড়োত্বের দিকে। এইসব টুকরো কষ্টকে তখন হাস্যকর মনে হবে—’

‘আপনি আমার কতটুকু জানেন?’ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলি, ‘কেন ভাবছেন আমার কষ্টের মূল কেন্দ্রবিন্দু অর্থ?’

‘কখনো তা নয়, তুমি বুঝতে ভুল করেছ,’ তিনি প্রতিবাদ করেন। ‘অর্থকষ্ট তোমার অনেক কষ্টের একটি অংশ।’ এরপর তিনি আমাকে অভিভূত, বেদনার্ত করে বলেন, ‘একটি সন্তানের মৃত্যুর ভার যার ওপর আছে, তার সম্পর্কে কিছু না জানলেও তার কষ্টকে আমি ক্ষুদ্র করে দেখতে পারি না। আমাকে অতটা অযৌক্তিক ভেব না।’

এরপর তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে যান আশ্চর্য একটা কামরায়, যেখানে গিয়ে আমার ভেতরের পৃথিবী খুলে যায়। কী অদ্ভুত সংগ্রহ! সারবদ্ধ সাজানো শত শত বই। দেয়ালে অপূর্ব সব পেইন্টিং। আলমিরা খুলে শিটে আঁকা প্রচুর ছবি দেখালেন। বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করা। ধুলো জমে গেছে সব ছবিতে। কিছু-কিছু উঁই পোকার শিকার। আর পুরো ঘর জুড়ে কী নেশা-উদ্রেকী গন্ধ! যেন শত বছর দরজা বন্ধ ছিল। এমনই পুরোনো, বিচিত্র। মাটির বালিহাঁস, ব্রোঞ্জের বিভিন্ন মূর্তি। কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ি। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ভারী মর্মরস্তম্ভ। 'আশ্চর্য! এত কালেকশান, আপনি যত্ন নিচ্ছেন না কেন?' অস্ফুটে প্রশ্ন করি।

'যত্ন নিতে নিতে হাঁপিয়ে উঠেছি,' তিনি বললেন, 'ত্রিশ বছর ধরে চাকরির ফাঁকে ফাঁকেই এই সবের পেছনে ছুটেছি। আসলে সব সুন্দরেরই সমঝদার চাই। এ ক্ষেত্রে বলতে পারো আমি একা-ই।' পেতলের বাজপাখিটার ডানার খাঁজে ধুলো। ফুঁ দিই। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এ-ব্যাপারে চাচির আগ্রহের কথা জানতে চাই না। প্রশ্নটা বড়ো মামুলি শোনাবে। যাই হোক, ভদ্রলোক আমাকে ক্রমশ অভিভূত করছেন।

'ইচ্ছে করলে এইসব সংগ্রহ তুমি নিয়ে যেতে পারো'—এত আচমকা তিনি এই প্রস্তাব দেন যে, আমি হকচকিয়ে উঠি। তিনি বলেন, 'আমার কাছে এসবের গুরুত্ব কমে এসেছে। তোমার সবে শুরু। তোমার আগ্রহের যে তীব্রতা, আমার এখন আর সেটা নেই, তাই এগুলো তোমার কাছে বহুদিন যাবৎ নতুনই লাগবে।' এত বছরের বিন্দু বিন্দু সংগ্রহ কী অবলীলায় দু-দিনের পরিচিত একটি মেয়েকে দিয়ে দিতে চাইছেন তিনি! এত বছর তবে আগলে রাখলেন কী করে? মায়া বলেও তো একটা জিনিস আছে।

'আশ্চর্য ইমোশনাল মানুষ তো আপনি,' আমি বলি, 'এখন আবেগ থেকে দিয়ে দিতে চাইছেন, পরে অনুতাপ হবে।'

'আমি সিদ্ধান্ত হঠাৎ করেই নিই।' তিনি বললেন, 'এবং সেই সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত মনে করি। পরে এ নিয়ে আমার অনুতাপ হয় না।'

'আমি আবার কারো হঠাৎ-সিদ্ধান্তকে বেশি গুরুত্ব দিই না,' হাসতে হাসতে বলি। 'কাউকে কিছু দিতে হলে, ধীরে ধীরে সেটা প্রাণ থেকে তৈরি হলেই ভালো। আমার তাই মনে হয়। এত চমৎকার সংগ্রহ, নিতে ইচ্ছে হবে না কেন? কিন্তু আমি নেব না। নেওয়ার জন্যও যে নিচ্ছে তার একটা ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা দরকার। আমার মোটেই সেরকম যোগ্যতা নেই।'

'হ্যাঁ বুঝেছি, চমৎকার বিনয় তোমার।' খুব যত্ন করে বালিহাঁসটাকে হাত থেকে আগের জায়গায় রেখে বড়ো একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলেন—'এর মধ্যে রং-তুলি আছে। এগুলো নিতেও তোমার কোনো প্রস্তুতির দরকার আছে?'

এরপর একজন মানুষের, বিশেষ মানুষের প্রগাঢ় প্রভাব প্রাণের মধ্যে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসা, তাঁকে আরও ঘনিষ্ঠতায়, বিচিত্রভাবে আবিষ্কার করা, আর্ট, স্কাল্পচার, সাহিত্য আর জীবন নিয়ে তাঁর সঙ্গে নিরন্তর তর্কে জড়িয়ে পড়া, ফলে সালাহদিন, সত্যজিৎ আর রঞ্জুরা আমার কাছে ক্রমাগত ফিকে বিবর্ণ হয়ে আসতে থাকে। সরে যেতে থাকে দূরে। আর চাচি, প্রথম প্রথম বাসায় এসে ভদ্রমহিলার কারণে খুব অস্বস্তিবোধ করতাম। আমি জানি না তাঁর বাসায় আমার এখন এই হঠাৎ জুড়ে বসার ব্যাপারটার বিশ্লেষণ তিনি কীভাবে করছেন? প্রথম দিন তাঁর যে ব্যক্তিত্ব দেখেছিলাম, তাতে করে চাচার সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তর্কে ডুবে থেকেও ভেতরে কেমন যেন জমে থাকতাম। সারাক্ষণ কী একটা অস্বস্তি খচখচ করত! কিন্তু এক সময় আবিষ্কার করি, চাচার সাথে তার সীমাহীন দূরত্ব। তিনি যেন আমার মার অন্য এক আধুনিক সংস্করণ। এই প্রাসাদ বাড়ি আগলে রাখতে পেরেই যেন তার সুখ। এখানে তার অধিকার-অনধিকারের বিষয়ে কোনো বিকার নেই। শিল্প-সাহিত্যের ধারে-কাছেও তাঁর অনুভূতি নেই। চাচার ব্যাপারে তাঁর ভয় আছে খুব। তাঁর কাছে তিনি তাই চিরকালই স্পর্শাতীত, দূরের। তাদের ওখানে আমার উপস্থিতির মুখে তাঁকে প্রতিবারই গম্ভীর, নিঃশব্দ দেখেছি। এটা তার স্বভাব। এর মধ্যে গভীর কোনো পছন্দ বা বেদনা প্রচ্ছন্ন নেই। ব্যাপারটা উপলব্ধি করে আমিও ক্রমশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

দুরন্ত হয়ে উঠি। তাঁর সেই উদাসীনতার আশ্চর্য সুযোগ গ্রহণ করতে শুরু করি। এক-একদিন তার সাথে দেখাও হয় না, চাচার সাথে আড্ডা দিয়েই বাসায় চলে আসি। রাতে বিছানায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকি।'

একদিন চাচা খুব কৌশল করে প্রশ্ন করেন, 'তোমার মা চমৎকার সেলাই জানত, সেলাইও কিন্তু একটা শিল্প, এখনও করে নাকি?'

'মার চোখের ভীষণ অসুবিধে'—আমি বলি, 'সবকিছুই ঝাপসা দেখেন। আগে দেখতাম, নিজের সেলাই করা এটাসেটা পাড়ায় বিক্রি করতেন। সেলাইকে শিল্প বলছেন? সেদিক থেকে বিচার করলে, রান্নাও কিন্তু একটা শিল্প।' চাচা কেমন দমে যান। যেন স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে এমন মুখ করে নিঃশব্দে বসে থাকেন। আমাল ভালো লাগে সেই মুখ দেখতে। কারও কিছুকে ঘিরে জেগে-ওঠা স্বপ্নকে দপ করে নিভিয়ে দিতে আজকাল এমনই আমার সুখ। বরং সেই ম্লান মুখ পর্যবেক্ষণ করে, তার অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম সত্যকে টেনে বের করে, এমনই আমার আনন্দ।

এর মধ্যে একদিন হাসপাতালে গিয়েছি। সালাহদিন অনেকটা সুস্থ। আমি হাসপাতালের সেই বিচিত্র হাহাকার কাটিয়ে উঠেছি অনেকটা। ঘা শুকিয়ে আসছে তার। টুল টেনে পাশে বসে কেমন আছে জানতে চাই। সে তার বই, প্রুফ দেখার কাজ শেষ করতে না পারার ব্যাপারস্যাপার নিয়েই দুঃখ করে বেশি। বলে, 'এদেশে সাহিত্যের কোনো দাম নেই। এত খেটে গাঁটের পয়সা খরচ করে যাও-বা একটা বই বেরোল, চলবে না। নিজে সেধে-সেধে পুশিং সেল করে যে ক-টা কপি পার করা যায়। সাহিত্যচর্চাটা গরিবদের জন্য শৌখিনতা ছাড়া আর কিছুই না।'

চিরকালই তর্ক করা আমার অভ্যাস। তার সেই হতাশাকে ঘিরে প্রতিবাদ করি, 'সাহিত্যের ক্ষেত্রটাই এমন। যুগে-যুগে গোটা পৃথিবীতে তাই হয়ে এসেছে। সারাজীবন সাধনা করো। কিছু হলে মৃত্যুর পর তার মূল্যায়ন হয়। তুমি যদি ভেঙে পড়ো, তবে অন্য মাধ্যম বেছে নিতে পারো। মূল্য পাওয়ার, জনপ্রিয় হওয়ার অনেক সহজ পথ আছে।'

'কিন্তু তাই বলে একটা অনিয়ম শত বছর আগে থেকে চলে এসেছে বলে আমরা সেটাকে নিয়ম বানিয়ে মেনে নেব?' বেড়ে শুয়ে কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ে সালাহদিন—'এরকম অবিচারের কোনো প্রতিবাদ করব না?'

'করো, আন্দোলন করো', আমি বলি, 'একা একাই করো।'

'তুমি মনে হয় এইরকম অসহনীয় স্ট্রাগলকে সাপোর্ট করছ?' তার এ-প্রশ্নের জবাবে আমি বলি, 'যত সুবিধেই তোমার চারপাশে থাকুক, মহৎ শিল্প সৃষ্টি কোনো সংগ্রাম ছাড়া সম্ভব নয়। অবশ্য চারপাশে কিছু সুবিধে থাকলে, শিল্প সৃষ্টির প্রাপ্তি থাকলে জীবনের নির্মমতা অনেকটা কমে আসে, সংগ্রাম হয় একান্ত ব্যক্তির। প্রাত্যহিকতার সাথে যুদ্ধ করে যে মেধার অপচয় ঘটে, শিল্পের পেছনে সেটা ঢালা যায়। তবু আমি তোমার ক্ষোভকে অস্বীকার করছি না।'

'সেই তো ফিরে তুমি আমার যুক্তির পথে এলে,' কথা বলতে বলতে বিছানায় কেমন ঝিমিয়ে পড়ে সালাহদিন।

তারপর হেঁটে-হেঁটে সেই কামরাটায় যাই, যেখানে শয্যাশায়ী আহত ওমরের ভাই। নিঃশব্দ পায়ে তার সিটের পাশে দাঁড়াই। রক্তাক্ত একজন লোককে টানতে-টানতে একটা সিটের পাশে মাটিতে শোয়ানো হল। কী অসহ্য চিৎকার তার! পুরো মেঝেতে রক্তের টানা দাগ। তার চারপাশ ঘিরে রেখেছে বিলাপরত আত্মীয়স্বজনরা। রক্তের ছোপে ছোপে মাছিদের হল্লা। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কিশোরের দিকে তাকাই। গলা পর্যন্ত তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

সাদা চাদরে ঢাকা। ছাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। চোখে অসম্ভব ভয়। সেই ছেলেটির মা, সেই বৃদ্ধা তখনও বাতাস করে যাচ্ছেন। একটু পরে ওষুধ হাতে ওমর আসে। আমাকে দেখে একজন অসুস্থ রোগীর সামনে এমনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, রীতিমতো অস্বাভাবিক লাগে। 'কী আশ্চর্য! আমি ভাবতেই পারিনি, আপনি আবার আসবেন।'

'কেন? সেদিন তো বলে গেলাম, আবার আসব।'

'এরকম কথা তো কতজনই বলে', ওমর শব্দ করে হাসতে থাকে। 'সত্যি আপনার আন্তরিকতার প্রশংসা করতে হয়।'

'দেখুন, আমি আপনাকে নয়, আপনার ভাইকে দেখতে এসেছি,' তার উচ্ছ্বাস বিরক্তিকর হয়ে ওঠায় তাকে দমিয়ে দিতে চাই।

'আমি কি বলেছি আপনি আমার জন্য এসেছেন?' তার এই প্রশ্নে এইবার আমি হেসে ফেলি।

কিন্তু এত স্বল্প পরিচয়ে এসব প্রসঙ্গ কী রকম বেখাপ্পা লাগতে শুরু করে। একে তো নোংরা বিপর্যস্ত চেহারা, তাছাড়া কেমন গায়েপড়া ভাব। লোকটাকে সত্যিই বিরক্তিকর লাগতে থাকে। সবচেয়ে অসহ্য প্রস্তাব দেয় সে বারান্দায় বেরিয়ে, 'আমি কি আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি?'

'কী বলছেন আপনি?'

'আপনি কি আমার কথা শোনেননি?'

'শুনেছি।' ঠান্ডা গলায় বলি, 'অতটা না করলেও চলবে।'

'আপনি কি আবার আসবেন?' জানতে চায় সে। 'ওহ্ বলাই তো হয়নি, সেদিন আপনার বন্ধুকে দেখতে গিয়েছিলাম। অনেক কথা হল।'

'খুব ভালো করেছেন,' বলে আমি সিঁড়িতে পা বাড়াই।

'ও কি আপনার ক্লাসমেট ছিল?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'ক্লাসমেট ছাড়া এ দেশে মেয়েরা মন খুলে কোনো ছেলেকে বন্ধু বলতে দ্বিধা করে কী-না!'

'না, ক্লাসমেট ছিল না। তাছাড়া দ্বিধান্বিত হওয়ার মতো বাস্তবতা আমি কাটিয়ে উঠেছি সেই কবে।'

'আপনি কি বিরক্ত বোধ করছেন?'

'না।'

তারপরও টের পাই, লোকটা পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে অনুভব করি তার প্রতি বিরক্তি কমে আসছে। কারণ তল্লাশ করতে গিয়ে আবিষ্কার করি, যত অসহ্য চরিত্রেরই সে হোক, সে আমাকে গুরুত্ব দিচ্ছে খুব। আমাকে তার গুরুত্ব দেওয়া কী হয়, তার প্রতি আমাকে নরম করে তুলছে।

কিন্তু মাত্রাধিক গুরুত্ব যে অসহনীয়, সেটা টের পাই আরও কিছুদিন পর। তার আগে আমার নিঃসঙ্গ রাতের মধ্যে ঝরে পড়তে থাকে সার সার শীত, আমি কুঁকড়ে যাই, ফের দাঁড়াই, রক্তের মধ্যে মিশে থাকে মিহিগুঁড়ো নোনতা জল, শ্মশান রাত্তির পেরোনোর পর সেই একঘেয়ে হিসেবের সকাল... আলো নেই, স্বপ্ন নেই, কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

দৃষ্টির সামনে অদৃশ্য চক্রবাক। এইরকম যখন দিন যাচ্ছে, এর মধ্যে আরেফিনের এক রুমমেট আসে বাসায়। জানায়, বাড়ি থেকে আরেফিন এসেছিল। হল তল্লাশি হয়েছে, ওর খাটের নীচে অস্ত্র পাওয়া গেছে। গেটের কাছে খবর পেয়েই সে গা-ঢাকা দিয়েছে। রুমমেটের ভাষ্য—অস্ত্র রাখার মতো অত ডেসপারেট রাজনীতিতে এখনও আরেফিন যায়নি। এটা ওর কোনো বিপক্ষ দলের কারো কাজ। ব্যক্তিগত শত্রুতা ওর অনেকের সাথে আছে। এখন হলে তালা। সে আপাতত বাড়ি যাচ্ছে। বাবার অবস্থা খুবই খারাপের দিকে, আমি যেন খবর পাওয়া মাত্র চলে যাই। সবকিছু শুনেটুনে কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়ি। বেতন পেয়েছি, হাতে কিছু টাকা এখনও আছে। তাছাড়া রঞ্জুর দেওয়া টাকাটা খরচ হয়নি। আরেফিনের জন্যই রেখেছিলাম। বাড়ি যেতে হলে এই মুহূর্তে এই টাকাটা খুবই কাজে লাগবে। কিন্তু অফিস থেকে ছুটি পাওয়াই একটা সমস্যা। সর্বত্র চাপা ক্ষোভ। বিন্দুমাত্র নড়চড় বস ক্ষমা করছেন না। তাছাড়া ভেতরে ভেতরে কেমন একটা আতঙ্ক, আরেফিনের খাটের নীচে অস্ত্র! এমন বিপজ্জনক অবস্থায় বাস করে ও? অন্য কেউ অস্ত্র রেখেছে—এ আমাকে সান্ত্বনা দেওয়া নয়তো?

'তুমিও কি পার্টি করো?' রুমমেট ছোকরাকে জিজ্ঞেস করি।

'করি, আরেফিনের সাথেই।'

'আচ্ছা, এ-ব্যাপারটা আমি একদমই বুঝি না। কেন এত ঝুঁকিপূর্ণ রাজনীতির সাথে নিজেকে জড়িয়েছ? ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য?'

'বাহ্, আমি ক্ষমতায় যাব কেন? আমার দল যাবে। এই রকম অবিচারকে প্রশ্রয় দিয়ে চুপ থাকতে বলেন?'

'কীরকম অবিচার?'

'এই যে ছাত্রদের ওপর পুলিশের হামলা, বাজারে জিনিসপত্রের ঊর্ধ্বগতি, কোটি-কোটি টাকার ঋণে জর্জরিত করে দেশকে দেউলিয়া করে তোলা, আরও শুনবেন?'

'আসলে তোমাদের রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য কী? আমি ঠিক মতো তোমাদের বুঝে উঠতে পারছি না। সব ছেড়ে তোমরা কীসের পেছনে ছুটছ? সত্যিই কি তোমরা দেশের কল্যাণ চাও? না-কি দলীয় স্বার্থেই যা করার করছ?' আমার এই প্রশ্নে সে বলে, 'রাজনীতি সম্পর্কে অত অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা আমার নেই, এ-ব্যাপারে আমরা আমাদের ভার্সিটির নেতার আদর্শকে ফলো করি বেশি। তবে এটা বুঝি, ভীষণ দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে। আমরা এক ভয়ংকর অবস্থার শিকার। কল্পনা করতে পারবেন না, সর্বত্র কী ভয়ানক অনাচার চলছে।'

'কিন্তু আমি যতদূর বুঝি, দেশের কল্যাণের জন্য তোমরা কেউ ক্ষমতা চাও না। তোমরা যে লোভে সরকারকে টেনে নামাতে চাইছ, সরকার সেই একই লোভে প্রাণপণে গদি আঁকড়ে আছে। ক্ষমতার লোভ কার নেই?' আমার এ কথায় সে ঝাঁঝ-মেশানো স্বরে বলে, 'আগে তো সামনে পড়ে থাকা কাচের টুকরো সরাই, তারপর আমরাও যদি কাচ বিছিয়ে রাখি, সেটা সরানোর জন্যও নিশ্চয়ই পরবর্তী প্রজন্ম থাকবে। অনাচার সব সময়, সব দেশের জন্যই সমান অনাচার। স্বেচ্ছাচারিতার দুর্ভোগ কেমন হয়, সে তো ইরাককে দিয়েই দেখছেন। হাজার হাজার মানুষ সাফার করছে।'

'যুক্তরাষ্ট্র কি কম স্বেচ্ছাচারিতা করছে?' ভাসা জ্ঞান থেকেই আক্রমণটা করি, 'সাদ্দাম স্রেফ কুয়েত দখল করেছে, আর গোটা বিশ্বকে আঙুলের ডগায় তুলে নাচাচ্ছে যে মার্কিন, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কোথায়? নাকি সে পৃথিবীর মাথা বলে সবকিছু কিনে নিয়েছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘আপনি সাদ্দামকে সাপোর্ট করছেন?’

‘আমি কোনো স্বেচ্ছাচারিতাকেই সাপোর্ট করছি না। ফকল্যান্ড দ্বীপ এবং কুয়েত দখল... দুটোই আমার কাছে সমান অপরাধ। আমি অসম্ভব সুবিধাবাদী মানুষ। রাজনীতি করি না। রাজনীতির অত প্যাঁচও বুঝি না। সারাদিন নিজের আনন্দ-বেদনার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি, সেজন্যই তো তোমার কাছে বিষয়গুলো বিস্তারিত জানতে চাইছি।’

‘এই যে শহরে হরতাল হচ্ছে, আন্দোলন হচ্ছে, সাদ্দামের প্রসঙ্গে ফেটে পড়ছে বিশ্ব,’ অসহিষ্ণু শোনায় ছেলেটির গলা, ‘আপনার কোনোরকম বিকার নেই বলতে চান?’

‘বিকার থাকবে না কেন? কিন্তু যখন শুনি হলের মধ্যে অস্ত্র মজুদ থাকে, বাবা-মার কষ্টার্জিত উপার্জনে পড়তে আসা ছেলেরা নানা ঘটনার যোগে মাস্তানে পরিণত হয়, তখন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমার ভয়টাই লাগে বেশি। আর হয় অশ্রদ্ধা। শহরের মানুষ হুজুগে মাতাল। সাদ্দামকে ঘিরে ওরা হুজুগে না মাতলে সরকারের বিরুদ্ধে তোমাদের পথের আন্দোলনটা এভাবে ভেস্তে যেতে পারত না।’ আমি বলি, ‘হরতাল হলে আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো লাভ বা ক্ষতি অনুভব করি না। অফিসে যেতে পারি না... ঘরে একঘেয়ে সময় কাটে... এইটুকুই অসুবিধা বোধ করি।’ ছেলেটা দাঁড়ায়... ‘আপা, দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাচ্ছে। যখন ছুরিটা আপনার বুক এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করবে, তখন ঠিকই জাগবেন, কিন্তু তখন আর সময় থাকবে না।’ আমি হাসি—‘আমার তো সেটাই ভয়... ছুরিটা কখন বুকে এসে বেঁধে... আরেফিনকে নিয়ে সেজন্যই তো আমার চিন্তা, তুমি হয় তো ক্ষুব্ধ হচ্ছ আমার এরকম স্বার্থপরের মতো চিন্তা দেখে। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমাকে তোমাদের দলীয় কোন্দল, স্বার্থপরতা, ক্ষমতার লোভ এসব কিছুই টানে না। শুধু একজন ছাত্র যখন গুলিবিদ্ধ হয়, আমি অসহায় একটা পরিবারের কথা ভেবে বিচলিত হই। ছেলেটার রক্তের ওপর পা রেখেই তার দল ক্ষমতায় যায়। সেই রক্তের সুফল ভোগ করে। তার কথা তখন তারা মনেও রাখে না। তুমিও তো রাজনীতি সম্পর্কে আমাকে কোনো সার্বিক সুস্থ ধারণা দিতে পারলে না। আমার এই নির্বিকারত্বকে ঘা দিয়ে জাগানোর জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন সেকি তোমাদের আছে?’

‘আমি আরেকদিন আসব’ ছেলেটি চলে যেতে যেতে বলে। ‘আপনার এখান থেকে বড়ো কষ্ট নিয়ে গেলাম।’

‘আমি দুঃখিত, যদি তোমার স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়ে থাকি। তুমি একটু আরেফিনকে দেখো।’

এতক্ষণ ছেলেটার সঙ্গে কথা বলেও মনের অন্ধকার দূর হয় না। থেকে যাই সেই পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের ঘেরাটোপে। তবে আজই প্রথম অনুভব করি, আরেফিন আমার কাছে ভালো মানুষের এক নিখুঁত মুখোশে আবৃত থাকে। ওকে নিয়ে আমার নিশ্চিন্ত থাকার কোনো কারণ নেই। এরই মধ্যে সে তার চারপাশে শত্রুর মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছে। কী করব ভেবে না পেয়ে অস্বস্তিকর এক দ্বন্দ্বের ঘোরে বসে থাকি।

আরেফিনের এক রুমমেট মারফত অফিস বরাবর একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে পরদিন আমি বাড়ির দিকে রওনা দিই। কেন যেন গতকাল থেকেই বেশ অস্থির লাগছে। প্রাণের সুগভীর শেকড়ে হ্যাঁচকা টান পড়ে যেন। নিজেকে প্রবল খুঁড়ে পাতাল থেকে প্রশ্ন ওঠে, আমি কি শেকড়চ্যুত, অনিকেত কেউ? কেন দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি যাওয়ার টান অনুভব করি না? নিজের এই পলায়নপরতাকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক না। কেননা, আমি যেখানেই যাই এর বিন্দু কণাগুলো আমার রক্তকণিকার সাথে হাঁটছে। সেই ছায়া, যাকে অস্তিত্ব ঝাঁকিয়ে ছুড়ে ফেলতে চাই, আমাকে জাপটে ধরে দ্বিগুণ। তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসছি না কেন যে, যুদ্ধ করব মুখোমুখি, ছায়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ভেতরে প্রবেশ করেই।

ট্রেনের জানালার হাওয়া রীতিমতো মুখে চড় বসাচ্ছে। তারপর যেন বহু পথ হেঁটে, সহস্র বছর পর আমি সেই পুরোনো গলিতে পা রাখি। অতি চেনা প্রাচীন দরজায় পা রাখি। আগে বুঝিনি, এই দরজায় পা রাখলেই আমার পুরো অস্তিত্বে এমন ধস নামবে, কেঁপে কেঁপে উঠবে শরীর, ঘরে ঢুকতেই প্রথমেই বাবার শয্যা। বাইরের রুমের খাটে লাশের মতন পড়ে আছেন তিনি। পাশের ঘরে রানুর কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। এ-ঘরে আর কেউ নেই। একটা বেড়াল মেঝেতে বসে শিশুর মতো হাই তুলছে। দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে। আমি ফাঁপা, শূন্য চোখে বাবার বিছানার দিকে তাকিয়ে থাকি। হারিকেন জ্বালিয়ে মা পাশের ঘর থেকে আসেন। নিঃশব্দে টেবিলে হারিকেনটা রেখে দরজার দিকে তাকান।

'কে?'

'আমি।'

টের পাই মা ঝাপসা দেখছেন। কাছে এগিয়ে আসি। আমার গায়ের লোম শিরশির করছে। ভেতর থেকে অবিশ্রান্ত ঢেউ, গলার কাছে এসে ধাক্কা খাচ্ছে। ব্যাগ কাঁধে অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

কাছে এসে মা ধনুকের ছিলার মতো টান টান হয়ে ওঠেন। একটা পুরোনো সবুজ শাড়ি গায়ের সাথে লেপটে আছে। মুখের চামড়া আরও কুঁচকে গেছে। চুল কেমন জটা ধরা। কাছে আসতেই কাপড়ের উৎকট বিশ্রী গন্ধ নাকে আছড়ে পড়ে। কেমন ঘুলিয়ে যাই। মা এত ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেছেন?

মার সেই কুঁচকানো ক্ষীণ হাত সস্নেহে চেপে ধরি। সেই ঝাঁঝড়া ডালে ভর করেই ভেতরে ঢুকি। ধীরে ধীরে বাবার বিছানার কাছে যাই। দরজায় দাঁড়িয়েছে রানু। পেছন পেছন মন্টুও। এ ক-দিনে সে বেশ জোয়ান হয়ে উঠেছে। কী অদ্ভুত ছায়া সারাটা ঘরে! সেই সাথে ভ্যাপসা গরম। বাবার শরীর চাদর দিয়ে ঢাকা। আমি হতবিহ্বল চোখে সেই ক্ষীণ আকৃতির দিকে চেয়ে থাকি।

তাঁর একটা হাত টেনে নিয়ে অস্ফুটে ডাক দিই, 'বাবা!' একবার, দু-বার।

তিনি ফ্যালফ্যাল তাকান। কিন্তু আশ্চর্য প্রতিক্রিয়াশূন্য সেই দৃষ্টি। 'কেমন আছেন?' মনের গভীর থেকে উচ্চারণ। তিনি হাঁ করেন কিছু বলার জন্য। কিন্তু গলা দিয়ে গোঁ-গোঁ আওয়াজ হয় শুধু। আমার অস্থিমজ্জা নিঃসাড় করে দিয়ে তখন নীল রক্তের কম্পন, বাবার এই অবস্থা হয়েছে? তাঁর হাত আরও সজোরে চেপে ধরি। এত অপরাধী লাগছে নিজেকে। পরক্ষণেই পেছনে কান্নার শব্দ শুনতে পাই। নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত মহিলাটি অবিশ্রান্ত ধাক্কায় কাঁদতে শুরু করেছেন। কী বিচিত্র হারিকেনের আলো—সিলিং স্পর্শ করলে, মেঝে করে না। নানা জায়গায় মাটি ভেসে ওঠায় ভঙ্গুর মেঝেতে ঝাপসা আঁধার। কয়েকটা মাকড়সা দোল খাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর অপরিচিত জড়তা-জড়ানো পায়ে মন্টু এগিয়ে আসে, 'কেমন আছ আপা?' ওর চুলে হাত রাখি, 'ভালো।' মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে রানু, 'কাঁদছেন কেন? কেঁদে কোনো লাভ আছে?'

চিরকাল লাভ-লোকসানের হিসেবটাই বুঝলি—ভাবতে-ভাবতে রানুর দিকে খর দৃষ্টিতে তাকাই। আগের সেই বর্ণাঢ্য সজ্জা নেই ওর। কেমন ম্লান হয়ে এসেছে মুখ, সমস্ত উজ্জ্বলতা থিতিয়ে এসেছে। অবশ্য আমার বিয়ের আগের থেকেই তার এই অবস্থার শুরু। ফ্যামিলি নিয়ে আসার পর ওর জীবন থেকে যখন মজুমদারের ছায়া সরে যেতে থাকে। এখন নাকি রানু কেমন বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠেছে, আরেফিন বলেছিল। অনেক বন্ধুবান্ধব জুটে গেছে তার। বাসাতেই আড্ডা হয়। সে বাইরে বেরোয় না। মেঝে জুড়ে তেলাপোকার হল্লা। একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কুকুরকেও দেখি, গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে ঘরে এসে ঢুকেছে। ছোট্ট বেড়ালটার সাথে তার যুদ্ধ লেগে যায়। 'হেই' মার ক্ষীণ হাত নড়ে ওঠে। এ নিয়ে আর কারও কোনো বিকার দেখি না। 'বাবার এই অবস্থা কবে থেকে? আমাকে জানাসনি কেন?' রানুর কাছে জানতে চাই। ব্যাগের ভেতর থেকে বাবার জন্য আনা আপেলগুলো মন্টুর দিকে এগিয়ে দিই। রানু যেন গুনগুন করে গান করছে এমন ভঙ্গিতে বলে, 'হপ্তাখানেক আগে অবস্থা খুব খারাপ হলে হাসপাতালে নিয়ে যাই। তারপর থেকেই জবান বন্ধ। ডাক্তার বলেছে, আর ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই নিয়ে এসেছি। তোমাকে জানালে কী হত?' রানুর গ্রীবা উচ্চকিত করার ভঙ্গির মধ্যে একটা অদ্ভুত শ্লেষ ফুটে ওঠে।

'তুই এখানে থেকে কোন আসমানটা জয় করছিস?' মুহূর্তে খেপে উঠি। 'তোর বেয়াদবি অসহ্য পর্যায়ে চলে গেছে রানু, একটু সংযত হয়ে কথা বলবি।' মন্টু রানুকে ধাক্কায়—'তুমি চুপ করো তো।'

'ঠিকই তো বলেছি।' রানু ঝাঁঝালো স্বরে বলে, 'উনি তো মেহমান। খবর দিয়ে উনাকে আনতে হবে।' রাগে-দুঃখে ছটফটিয়ে উঠি। দাঁতে দাঁত চেপে বলি, 'আমার যেন কত অবসর। কোথায় কী হচ্ছে সব খবর রাখব। তোর মতো তো বাড়তি যোগ্যতা আমার নেই। রূপ বিক্রি করে ঘরে বসে টাকা কামাতে পারব।' মা এবারে প্রায় লাফিয়েই ওঠেন—'এতদিন পর, এতদূর জার্নি করে এলি, কোথায় হাত-মুখ ধুবি, ভাত খাবি, কীসব বলছিস? পাগল হয়ে গেছিস তুই?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ দেন, রানুকেই সাপোর্ট দেন'—আমার গলায় কান্না আটকে আসে, 'চিরকাল তো তাই দিয়ে এসেছেন।' মন্টু রানুকে টেনে নিয়ে যায় পাশের ঘরে। মা সস্নেহে আমার পিঠে হাত রাখেন। 'সারাজীবন এই ভুলটাই বুঝলি আমাকে, আর জেদ করলি। জেদ করে কী হয়েছে? নিজের সর্বনাশ ছাড়া? এখন একটু বুঝতে শেখ। আমি মা, আমার কাছে সব সন্তানই সমান।'

এভাবেই অস্বস্তিকর একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

রাতে বিছানায় শুয়ে রানু আর আমি অদ্ভুতভাবে সহজ হয়ে উঠি। দীর্ঘদিন পর সেই পুরোনো নস্টালজিক ছাদের নীচে শুয়ে আমরা দুজন কেমন অভিভূত হয়ে পড়ি, ওর প্রতি আমি এক অদ্ভুত মায়া, দূর থেকে অ্যাদ্দিন যা উপলব্ধি করিনি, আর কেমন এক নিগূঢ় টান অনুভব করি। টের পাই চোখে জল উপচে আসছে। রানু অবশ্য দ্রুত সহজ হয়নি। বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁদছিল। এতদিন পর বাড়ি এসে প্রথমেই রানুকে এভাবে আক্রমণ—আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। আমি ওর মর্মবেদনা টের পাই। টের পেয়ে আমার চারগুণ কষ্ট বাড়ে। কিন্তু এমন নাজুক ঘটনার পর ওকে টেনে সহজ হওয়াও হয়ে উঠছিল না।

আরেফিন ফেরে অনেক রাতে। সে ফিরে পরিবেশটাকে আরও যন্ত্রণাময় করে তোলে। আমাকে দেখেই তার সে কী উচ্ছল আনন্দ! তারপর জানতে চায় রানুর কান্নার অন্তর্নিহিত কারণ। মন্টু পুরো ঘটনা চুলচেরা খুলে বলে মাথা নিচু করে বসে থাকে। সব শুনে আরেফিন সোজাসাপটা উত্তর দেয়—'সত্যি কথা সহ্য করতে এত কষ্ট হলে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া কেন? যে পথে রানু চলেছে, সে পথে চলতে হলে দুটো কান ছেঁটে ফেলাই ভালো।'

আরেফিনের কথা কানে গেলে আরও গভীর হয় রানুর কান্না। এক অসহায় বিপন্ন শিশুর মতো ঘরের কোণে বসে নিজেকে উপুড় করে দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে সে। আর বিভক্ত আমি আত্মগ্লানিতে ছটফট করি। আমি রানুকে কেন সহ্য করতে পারছি না? মজুমদারের জন্য? ব্যাপারটার পক্ষে জোরালো কোনো যুক্তি খুঁজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পাই না। তবে কি দায়ী সেই মহিম? মনে পড়ে, একদিন কি গভীর কণ্ঠে বলেছিল, 'নীনা, আমি ঠিক বোঝাতে পারব না, কেন আমি রানুর প্রতি এমন আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। ওর সৌন্দর্যের মধ্যে আছে অদ্ভুত এক নির্জনতা। সমস্ত পৃথিবী ঘুরে, এক জীবন পেরিয়ে গেলেও মানুষ যার দেখা পায় না। তার এসব কথার মুখে আমি নিঃশব্দে, অপ্রতিরোধ্য জল সজোরে ঠেকিয়ে দুটো কলম নিয়ে ঠোকাঠুকি খেলছিলাম।' সে বলেছিল, 'তোমাকে এসব কখনো বলতে চাইনি। কিন্তু আমি কী করব? এত চমৎকার সরল মেয়ে তুমি! তোমাকে ঠকাতে আমার ভীষণ গ্লানি হচ্ছিল।'

তার এইসব কথার স্রোতে আমার ভেতর রানুর অবয়ব ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। তার সেই যন্ত্রণাময় অনুভবে নির্দোষ রানু এমন অসহ্যভাবে আমার অস্তিত্ব থেকে ক্রমশ গভীর গহ্বরে তলিয়ে যেতে থাকে যে, আমি হাত বাড়িয়েও এক সময় তার স্পর্শ পাই না। সেটাই কি তবে মূল কারণ? কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। সবাই শুয়ে পড়ে। বাবা-মা এক বিছানায়। মন্টু, আরেফিন মেঝেতে। অন্য ঘরে গিয়ে নিঃশব্দে আমি আমার আড়ষ্ট হাত রানুর পিঠে রাখি। রানু সেই স্পর্শে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে। সারা ঘরে হারিকেনের টিমটিমে আলোর চিত্র-বিচিত্র ছায়া। সহসা কিছু কথা বলতে পারি না। ওর পাশে বিছানায় শুয়ে পড়ি। হাত তেমনই নিশ্চল পড়ে থাকে ওর কম্পিত দেহের ওপর। হারিকেনের ধোঁয়ায় তামাটে দেয়াল ধরে অনেকগুলো টিকটিকি। কেমন তেলচিটচিটে ভ্যাপসা গন্ধ বিছানায়।

'বালিশের কভারগুলো ধুতে পারিস না?' নিজেকে সহজ করার জন্য প্রশ্ন করি। রানু নিরুত্তর।

'বাসায় অবস্থা এমন হয়েছে, এসে কষ্টই লাগছে। আসলে আমার মা-বাবারা বড়ো দুর্ভাগা, আমরা তাদের জন্যে কিছুই করতে পারলাম না।' গুমোট ঘরের স্তব্ধ ভেঙে চলি এইসব বলে বলে। রানু ক্রমশ স্থির হয়ে আসছে। জড়তা কাটিয়ে এবার অন্যরকম গলায় বলি, 'আমি জানি, তখন এসব বলা আমার উচিত হয়নি, কিন্তু।'

'ঠিক আছে, আর অনুতপ্ত হতে হবে না,' রানু আমার দিকে পাশ ফিরে শোয়।

'কেমন আছিস তুই?'

রানু কেমন ম্লান হাসে। তারপর বলে, 'আমার কথা বাদ দাও। তোমার কথা বলো, তুমি কেমন আছ?'

'আমার কী খবর জানতে চাইছিস?'

'বাহ্, খবর তো সব তোমারই। জানার জন্য আমার জান ফেটে যাচ্ছিল। আর তুমি কী-না এসেই।'... শিশুর মতো চোখের জল মুছে সে সহজ হয়ে আসতে থাকে। 'কী যে হয়,' আমার গলায় জড়তা, 'মাঝে মাঝে মাথা ঠিক থাকে না। তুই সব ভুলে গিয়েছিস, বল?'

'ভুলে গিয়েছি,' রানু শিশুর মতো হেসে ফেলে, 'এখন তোমার কথা বলো।'

এবার আমার কণ্ঠনালিতে সহস্র নখের থাবা। কী বলব ওকে? যে তীক্ষ্ণধার বল্লম নিরন্তর খুঁচিয়ে চলেছে আমাকে, আমার এতদিনের দাম্পত্যজীবন, আমার স্নায়ু-অবশ-করা অধ্যায়, যা ফেলে এসেছি, কেন ফেলে এসেছি, তার কি কোনো সুশৃঙ্খল কারণ আছে? আমি কি বোঝাতে পারব যে-লোকটা সত্যিকার অর্থে তেমনভাবে কোনোদিন হাত তোলেনি আমার গায়ে, গভীর রাতে মদ খেয়ে ফেরেনি, পরনারীতে আসক্ত হয়নি, আমি সেই চরিত্রের কী বিশ্লেষণ করব এবং কতটা সুস্থ যুক্তির পক্ষে দাঁড় করাতে পারব নিজেকে?

বিয়ের রাতে কী অদ্ভুত এক আচ্ছন্নতা থেকে মিলিত হচ্ছিলাম তার সাথে। প্রচলিত হিসেবে আমি তখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কুমারী। আনন্দের সাথে সাথে কী ভয়ানক বিষযন্ত্রণা! সুখ আর কষ্টের স্ববিরোধী প্রতিক্রিয়ায় ছটফট করছিলাম। সেই হিংস্র-হয়ে-ওঠা পুরুষটি সব প্রতিরোধ ঠেলে ক্রমশ এগোচ্ছিল। আমার কণ্ঠ-নির্গত-যন্ত্রণাধ্বনি উপেক্ষা করে এক সময় ঘর্মাক্ত অবসন্ন সে উঠে দাঁড়ায়। আমি নিঃসাড় শুয়েছিলাম মেঝেতে। পুরো চাদর আর মেঝে রক্তের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল।

সেই দৃশ্য দেখে সে যেন চেতনালোকে ফিরে আসে। কী গভীর কুৎসিত বাস্তবতা! আমি কী করে রানুকে বোঝাব? পরমুহূর্তে সেই মানুষের গায়ে কেমন এক দৈবশক্তি ভর করেছিল? আমাকে চ্যাংদোলা করে সে যখন শূন্যে ওঠায়, আমার মনে হয়েছিল, এ হুবহু মজুমদারের হাত। আমার অমন দেহখানা নিয়ে সে ঘরময় চক্কর খায় আর মস্তিষ্ক-বিকৃত লোকের মতো বিড়বিড় করে, 'উফ্ নীনা, কী যে আনন্দ হচ্ছে আমার!'

আমি হতবিহ্বল। রক্ত দেখে লোকটা পাগল হয়ে গেছে? পরক্ষণেই আমার ঠান্ডা করোটিতে তার উচ্ছ্বসিত তীক্ষ্ণধার শব্দগুলো সশব্দে ধাক্কা খায়। 'তুমি সতী! আশ্চর্য! বিশ্বাসই হচ্ছে না আমার।' এরপর ধপাস করে আমাকে নীচে ফেলে দিয়ে সে বানরের মতো হামাগুড়ি দেয় আর সেই রক্তকণা সমানে দু-হাতে মাখতে থাকে, 'আমি তোমার জীবনে প্রথম... হাঃ হাঃ হাঃ... তুমি সেন্ট পারসেন্ট সতী!'

'মানে?' আমার শূন্য ফাঁপা দেহ জলে পতিত হয়, চারপাশে সার সার শ্যাওলা, ক্ষুদে সব কীট, ঝাঁঝাঁ রোদ, দিকচিহ্নহীন নির্জলা ঢেউ, আমি তলাতে থাকি—'তুমি এসব কী বলছ? তুমি কী ভেবেছিলে?'

'এত বন্ধু ছিল তোমার! এর আগে প্রেমও ছিল, মানে'... সে বিরাট কিছু পাওয়ার সুখে কেবল খেই হারাতে থাকে।

আমি কি রানুকে বোঝাতে পারব প্রথম রাত থেকেই কি অপরিসীম ঘৃণা নিয়ে আমার দাম্পত্যজীবন শুরু হয়েছিল? সীতার অগ্নিপরীক্ষার গ্লানিময় বিবমিষায় সে রাতে আমারও ইচ্ছে হয়েছিল ধরণীকে দু-ফাঁক করি? কিন্তু মাটি তো আমার মা নয়, আমাকে ঠাঁই দেবে! এসব কিছুর পর আরও কত দুর্বিষহ দিন আর রাত। এই দুর্বহ-দুর্বিষহতার চূড়ান্ত ফল আমার সন্তানের মৃত্যু। নিজেকে চেপে নিশ্বাস টেনে আমি বলি, 'রানু আমার বাচ্চাটা মরে গেল। কষ্টে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। তোরা কেউ একবারের জন্যও গেলি না।' রানুর শরীর শিথিল হয়ে আসে। সে সহসা কিছু বলতে পারে না। একথা বলার পর নতুন করে স্রোত আমার ভেতর থেকে জেগে উঠছে। হাত-পা কেমন নিঃসাড় হয়ে আসছে আর নতুন করে জন্ম নিচ্ছে ক্ষোভ। গলার কাছে জল জমে দম আটকে আসছে। রানু খুব অস্পষ্ট স্বরে বলে, 'বাবার অবস্থা তো জানো। মা কত কেঁদেছেন, বাবাকে ফেলে কী করে তিনি যাবেন? আর আমি?' বলতে বলতে সে থেমে যায়। আবারও মিনমিন করে, 'আমার মনে হচ্ছিল, আমি গেলে তোমার যন্ত্রণা আরও বাড়বে। তাই, এত কষ্ট হচ্ছিল, তবুও তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না, আরেফিনের কাছ থেকেই তোমার সব খবর নিতাম।' সলতে বেশি কমানো ছিল। চিমনি আঁধার করে হঠাৎ আলো নিভে যায়। পুরো ঘর অন্ধকারে ডুবে গেলে রানুর হাতে পাখা মচমচ শব্দে বাতাস করে। আমি ওর গায়ে সেই পুরোনো ঘ্রাণটা পাই।

আমি এবার প্রসঙ্গ বদলাই। বলি, 'বাইরে থেকে সব কিছুই রংচঙে মনে হয়, রানু এখন তোর ব্যাপারটা তুই আমাকে খুলে বলতো, অবশ্য তোর যদি ইচ্ছে থাকে। মজুমদারের পুরো ব্যাপারটা আসলে কী? তাছাড়া কীসব বন্ধু-বান্ধব, বাসায়, বাবার চোখের সামনে! কার ওপর জেদ করছিস?' রানুর হাতপাখা থেমে যায়। গরমে হাঁসফাঁস করে উঠি। পাশের ঘরে শোনা যাচ্ছে ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করছে মন্টু। এবং তার কিছুক্ষণ পর, টিনের চাল ঝমঝম ভিজিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়। ভেন্টিলেটার উপচে জলের ঝাপটা আসে। মুখ বাড়িয়ে দিই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

আহ্, শান্তি! কাঠের জানালা উপচে জলের অবিরল অবিন্যস্ত ধারা নীচের দিকে নামছে। অন্ধকার সয়ে আসায় সেই ঝাপসা জলের লাইনের দিকে চেয়ে থাকি।

'তোমাকে আমি কী বলব?' রানু এভাবে শুরু করে। 'আমার ব্যাপার-স্যাপার পৃথিবীর কাউকে বোঝানোর মতো না। আমি ছাড়া দ্বিতীয় যে কারো কাছে ব্যাপারটা ভয়ংকর মনে হবে। খুবই স্বাভাবিক সেটা। কিন্তু আপা, আমি বুঝতে শেখার পর থেকে যে মানুষটা আমাকে চারপাশ থেকে গ্রাস করে রেখেছে, সে যত কুৎসিতই হোক, আমাকে যে স্নেহ, যে ভালোবাসা, যে বিচিত্র সব ঘটনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, আমার কাছে সে এখন সৃষ্টিকর্তার মতো। আমি তাকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না।'

'তুই একটি বিচ্ছিরি অবস্থার শিকার রানু', শান্ত স্বরে বলি। 'তোর এখন বয়স হয়েছে, এটুকু তো অন্তত বোঝার ক্ষমতা হয়েছে। কৌশলে সে তোর সব রকমের সর্বনাশ করেছে, তারপরও ওরকম একটা ভণ্ড আর লম্পটকে তুই শ্রদ্ধা করিস? কী করে?'

'আমি কী করে সেটা তোমাকে বোঝাই?' রানু আমার হাত চেপে রেখেছিল। হঠাৎ ওর শরীরের আচমকা শক্ত হয়ে ওঠা টের পাই। 'গুটিকয় ঘটনার কথা বললে তুমিও অবাক হবে। কোনো তল খুঁজে পাবে না। আমি সেসব কথা কাউকে বলতে পারিনি। সবাই ভাববে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি বলছ কৌশলে সে আমার সর্বনাশ করেছে। সবাই তা-ই বলে। পাড়ায় আমাকে নিয়ে ঢি-ঢি পড়ে গেছে। ফলে, আমরা বলতে গেলে পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। আমার কি কম কষ্ট হয়? কিন্তু লোকটাকে দায়ী করি কী করে?'

আমি চুপ করে থাকি। কোনোরকম ক্ষোভ প্রকাশ করতে গেলে তার এই অকপটতার পথে সেটা বাধা হয়ে যাবে। আসলে এ এক বিশাল রহস্য। আমার জানা দরকার। রাত বাড়ছে। বৃষ্টির শব্দের ভেতর আমরা দুজন আরও বেশি সহজ হয়ে আসি।

রানু, যেন তার সামনে কেউ নেই, নিজেকেই শুনিয়ে যাচ্ছে, এমন ম্রিয়মাণ স্বরে বলতে শুরু করে, 'জানো আপা, মজুমদারের প্রধান যন্ত্রণা এবং ক্ষোভ ছিল—আমি তার বিকৃত চেহারা দেখে ভয় পাই কেন। কিন্তু আমার প্রতি তার অদ্ভুত আকর্ষণ কেন, সে নিজেও সেটা জানত না। এই মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় সে প্রায় উন্মাদ হয়ে আমাকে একদিন রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যায় তার ডেরায়। তারপর সমস্ত রাত তুমি তো সব জানোই। অবশ্য একটা রাত পাশাপাশি কাটিয়ে তার প্রতি আমার যে ভয় আর অশ্রদ্ধা ছিল, সেটা কমে আসে।

'এইভাবে দীর্ঘ ছ-মাস কেটে যায়। কিন্তু সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যের বিষয়, এই ছয় মাসে একদিনও সে আমার শরীরের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেনি। সবে প্রাইমারি স্কুল-পেরুতে-যাওয়া এই আমি আর কতটা ছোটো! তবুও তার অনীহার ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারতাম। বুঝতে পেরে তার প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় নুয়ে যেতে থাকতাম। কী কুৎসিত তার চেহারা! সেই বিকৃত চেহারাকেই এক সময় আমার কাছে সুন্দর, মায়াময় মনে হতে থাকে। তখন তার বাসায় যাওয়ায় আমার বাধা ছিল না। অনেক রাত অবদি সেখানে থাকতাম। রাত বাড়ত, ধূপের কুণ্ডুলী জ্বালিয়ে চোখ বুজে বসে থাকত সে, মাঝখানে ধোঁয়া পাকিয়ে উঠত। বলত, তার ঘৃণ্য জীবনের কাহিনি, তার এই কুৎসিত চেহারা আর প্রথম দিককার দরিদ্র-জীবনের জন্য তার প্রতি মানষের প্রচণ্ড ঘৃণার কথা। বলত, আমার ঘৃণাই তার জীবন চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ করে দিচ্ছিল। আর ক-টা মাস যদি আমি একই রকম মনোভাব পোষণ করতাম, তাহলে সে আত্মহত্যা করত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘তুই সে-সব কথা বিশ্বাস করেছিলি?’ আমি এক সময় ভেতরের শ্লেষ ধরে রাখতে পারি না।

‘সেসব প্রসঙ্গে এখন অনেক রকম প্রতিক্রিয়া আছে, কিন্তু তখন আমি সত্যিই অভিভূত হয়েছিলাম।’ রানু বলে, ‘আমি ঠিক বুঝছি না আপা, কেন সেসব নাজুক অধ্যায়গুলো তোমার কাছে মেলে ধরছি। তুমি অ্যাদ্দিন পর এসেছ, আমাদের দুজনের মাঝখানে সময়ের কত দূরত্ব। আচ্ছা, তুমি আমাকে খুব ঘৃণা করো, না?’

‘তোর ব্যাপারে আমার কষ্ট আছে’, বলতে গিয়ে বুকের মধ্যে একটা চাপ অনুভব করি, ‘কিন্তু ঘৃণা নেই।’

‘মহিমের ব্যাপারে কোনো ক্ষোভ?’ জানতে চায় সে, ‘বিশ্বাস করো, লোকটাকে প্রথম ভালোই লাগত। কিন্তু সে তোমার সাথে এত গভীরভাবে মেশার পরও আমাদের বাসায় এসে আমাকে দেখেই—বিশ্বাস করো, আমার ভীষণ ঘেন্না লাগত। জানো, তোমার বিয়ের পরও সে আমাকে দেখলে কেমন... না, না থাক এসব।’

‘তারপরও এসেছে?’ আমার গলা ফুঁড়ে আর্তস্বর বেরিয়ে আসে। এ-পর্যন্ত আসতেই আমি বিবর্ণ, নীল, ব্যাধিঘোর মানুষ যেন, ত্বকের নীচে থর কাঁপুনি শুরু হয়। কী সুবিন্যস্ত, গোছানো কথা শিখেছে রানু। অভিজ্ঞতা ওকে এত পরিপূর্ণ করেছে!

‘হ্যাঁ, তারপরও আসত।’ রানু বলে যায়, ‘একদিন আমার হাত ধরে সে কী কান্না! আমি যত বলি, মা এসে পড়বে, আপনি যান, তত জোরে সে হাত চেপে ধরে আর বলে, আমি দয়া না করলে সে ছবি আঁকা ছেড়ে দেবে। দেশ ছেড়ে চলে যাবে। এসব শুনতে খুব খারাপ লাগছে তোমার, না? কী যে ছেলেমানুষ ছিল লোকটা!’

ছেলেমানুষ ছিল? এমন ব্যক্তিত্ব! পাশাপাশি কত পথ হেঁটেছি। সে সময় অস্থির আর ছেলেমানুষ ছিলাম। কী সব বলতাম, ভাবলে এখনও হাসি পায়। সেই নিঃশব্দ আর্টিস্ট! তার সিগ্রেট টানার ভঙ্গির মধ্যেও ছিল আশ্চর্য নিস্পৃহতা। একটার পর একটা জ্বালাত, আর কীসব ছবি আর রং বিন্যাসের গল্প করত। সে মুখোমুখি দাঁড়ালে মনে হত বিশাল বৃক্ষ—কেবলই আমার ক্ষুদ্র হতে থাকা। সেই তাকে ছেলেমানুষ মনে হত রানুর কাছে! এতটাই বিপন্ন হয়ে উঠছিল তার প্রেম? নিজেকে সে এই রকম জায়গায় নামিয়ে এনেছিল? আমার বুক ঝাঁ ঝাঁ করে।

‘তুই মজুমদারের কথা বল’, আমি অস্থির হয়ে বলি, ‘এ প্রসঙ্গটা এখন থাক।’ প্রচ্ছন্ন আঁধারে রানুর দেহটা যেন পাক খায়। আলতো ভঙ্গিতে সে সোজা পাশ ফিরে শোয়। তারপর এমন কিছু ঘটনার বর্ণনা করে, যা শুনে আমি প্রগাঢ় বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হতে থাকি। তখন ওর পাশাপাশি থাকতাম। রানু ফিরে আসত কখনোও রঙের জৌলুস নিয়ে, কখনও ভীত, অন্যমনস্কতার ভেতর। এসব ব্যাপারে আমাকে গোড়া থেকেই সে এড়াত। ফলে আমাদের দূরত্ব হয়ে ওঠে সীমাহীন। এত কঠিন, আর চাপা স্বভাবের ছিল সে, এত ভয়াবহতা চেপে রাখত নিজের মধ্যে! অথচ আজ, এত বছর পর একটু টোকা দিয়েছি কি দিইনি, সর্বাঙ্গ থেকে খসিয়ে ফেলছে সব। সব কথা, স্মৃতি, গ্লানি, যন্ত্রণাগুলো। রানু বলে—‘ছ-মাস পর একদিন আমিই যেন কেমন হয়ে যাই। ভেবে অবাক লাগে, কত কম ছিল বয়স। কী করে যে ওই বয়সের একটি মেয়ের ভেতর এমন অনুভূতি জন্ম নিতে পারে! আমি শুয়েছিলাম। মজুমদার বরাবরের মতো আমার চুলে হাত বুলোচ্ছিল। একদিন তার হাত আমার চুল ছাড়িয়ে পিঠের দিকে নেমে আসে। বেশ কিছুক্ষণ। তারপরই নিজেকে ছাড়িয়ে সে একটা অদ্ভুত রূপকথার বই নিয়ে আমাকে পড়ে শোনাতে থাকে। কী সব কাহিনি, স্বপ্নের জগতের নারীদের, পুরুষের সাথে তাদের অপরূপ জলকেই। সে রাজ্যের সবাই নগ্ন। একজন পাতা দিয়ে শরীর ঢেকেছে বলে সবাই অশ্লীল, অশ্লীল বলে চিৎকার করে উঠছে। আরও কী কী সব বর্ণনা। শুনে কেমন অবশ হয়ে আসতে থাকি। তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকি।

‘সে বলে, এখনও সময় হয়নি। তার কী সব নিষেধ আছে। ভীষণ অপমানিত হই। কিন্তু তার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

যায় হাজার গুণ। এরও এক হপ্তা পর প্রথম তার সাথে মিলিত হই। প্রথম দিন ভীষণ কষ্ট হয়। সে আমাকে ছুড়ে দেয় ''যাঃ, তুই ভীষণ ছোটো'' বলে। শেষে একদিন বলে, অবশ্য তোর মজাই আলাদা। তারপর কতদিন, কত রাত! আপা, তোমাকে বোঝাতে পারব না, কী অদ্ভুত তার ভঙ্গি। এমন আলতো করে আমাকে তুলে ধরত না, ওরকম হিংস্র একজন লোকের কাছ থেকে অমন কোমলতা কল্পনাও করা যায় না। আমাকে বলত, স্বর্গের দরোজায় ঢুকে পড়েছে। এখন তার মৃত্যু হলেও কোনো কষ্ট নেই। আমাকে পেয়ে তার মৃত্যু ভয় চলে গেছে। হোক ভূমিকম্প, ভেসে যাক সব। আপা বিশ্বাস করো, আমি এখনও, তার বউ-মেয়েরা চলে এসেছে, তারপরও কাঙালের মতো কাছে ছুটে যাই। একটু স্পর্শের জন্য সারাক্ষণ ছটফট করি। কিন্তু এখন কী অদ্ভুত পরিবর্তন তার! আমাকে দেখে কুকুর তাড়া করে দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে। বলে, তার গুরু বলেছে, আমার ওপর শনি ভর করেছে। আমার স্পর্শে তার সব ছাই হয়ে যাবে। তার বাসার সবাই কী নিষ্ঠুর অপমান করে আমাকে। তবুও আমি যাই, বারবার যাই। আমি জেনে গেছি, এছাড়া আমার আর কোনো পথ নেই।'

বৃষ্টি থেমে গেছে। ঘরে ফোঁকর গলিয়ে চাঁদে আলোর ছত্রাক। আমার স্নায়ু, হৃৎপিণ্ড কী এক অবশতায় শিথিল। এসব কোনো উপাখ্যান নয়। আমারই সহোদরা, কী নিপুণ এক ঘটনার শিকার যে, তার আত্মজীবনী।—'একটু বাইরে গিয়ে বসবে?' জানতে চায় সে। 'আপা, তোমার কি ঘেন্না লাগছে এসব শুনতে?'

'না।'

'জানো আপা, এর আগে একবার সে আমাকে তার গ্রামের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, যেখানে তার স্ত্রী-সন্তানেরা থাকে। তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, গ্রামে তার কেমন প্রভাব! সব লোক তাকে সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আগত অলৌকিক পুরুষ মনে করে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, তার পরিবারের সবাই আমাকে বেশ সম্মানের সঙ্গেই গ্রহণ করে। সে তার স্ত্রীকে বলে, এ আমার ভবিষ্যৎ পুত্রসন্তানের মা! এর যেন কোনো অনাদর না হয়। আমি তখন নিতান্তই ছোট্টমোট্ট মেয়ে। কিন্তু মজুমদারের কথাকে তারা বেদবাক্য মনে করত। আমাকে তারা বলল, মজুমদার স্বপ্নে দেখেছে, কয়েক বছর পর আমি তার পুত্রসন্তানের মা হব।

'আমি আদর-খাতিরের মধ্যে বেশ সময় কাটাতে থাকলাম। একদিন গাছে দড়ি দিয়ে দোলনা বেঁধে দোল খাচ্ছি, কেমন যেন ভেজা মনে হল নিজেকে। চুপচাপ গোয়াল ঘরে গিয়ে দেখি রক্ত! মেয়েদের এরকম কিছু যে হয়, সেটা জানতাম না। বারবার পরীক্ষা করি। নাহ্ কোথাও কাটেনি। আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, এটা একটা অপরাধ। গোপন করার বিষয়। আমি মুছে ফেললেই এ চলে যাবে।

'আমি উদ্ভ্রান্তের মতো মুছছি, যাচ্ছে না। হঠাৎ দেখি, দরজায় মজুমদার। আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল। সে ব্যাপারটা দেখে সে-কী খুশি! গোপনে বউকে গিয়ে ব্যাপারটা বলল। তার বউ বাড়ির অন্য বউ-ঝিদের নিয়ে আমার সারা গায়ে হলুদ মেখে বলল, ''পুকুরে এক ডুব দিয়ে আয়।'' আমি তাদের কথামতো ডুব দিয়ে এসে উঠোনের পিঁড়িতে বসলাম। তারা আমার সামনে পেতলের বদনাভর্তি পানি রেখে বলল, আমি যেন সেই জলের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সুন্দর দেখি, আর বিড়বিড় করে বলি, আমার এরকম সুন্দর এক পুত্রসন্তান হোক।

'লজ্জায়, কাঁপুনিতে নুয়ে পড়তে পড়তে আমি তা-ই বললাম। তুমি জানো না আপা, কী মধুর স্মৃতি সেটা। হায়! কোথায় সেই পুত্র! কোথায় স্বপ্ন! এখন সেই শরীর খারাপের দিনগুলোকে সৃষ্টিকর্তার পাঠানো অভিশাপ বলে মনে হয়''... বলতে বলতে রানু দম নেওয়ার জন্যে থামে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘তারপরের কাহিনি আরও ভয়ংকর। জানি, তুমি বিশ্বাস করবে না। তবুও বলছি, আমি এর কোনো তল খুঁজে পাই না। জানি না কোন নেশায় অবশ করিয়ে আমাকে সে এসব দৃশ্যের মুখোমুখি করত। একদিন তার বাসায় গিয়ে দেখি, একটি ছেলে হাউমাউ করে কাঁদছে। ছেলেটি বেশ সুন্দর। ফর্সা, লম্বা গড়ন। এমন দৃশ্য প্রায়ই দেখতাম। সব টাকার সমস্যা। ততদিনে এসব আমার গা-সহা হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ছেলেটি বলছিল, এইমাত্র তার মা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। সড়ক-দুর্ঘটনায় তার একটা পা চলে গেছে। হাসপাতালে মাকে রেখেই সে ছুটে এসেছে। কিছু টাকা তার দরকার। মজুমদার তখন কী কঠিন আর ঠান্ডা গলায় বলে, ‘‘আগের পাওনার টাকা আগে ফেরত দাও।’’

‘তারপর ছেলেটি বহুক্ষণ সেই পাথরে মাথা কুটল। এক সময় কাঁদতে-কাঁদতে ওখান থেকে চলে গেল। আমি এবার প্রায় হামলে পড়ি তার ওপর, ‘‘এত নিষ্ঠুর আপনি?’’

‘মন্তব্যটার উত্তরে সে শুধু নিঃশব্দে হেসেছিল। প্রশ্ন করেছিল, ‘‘তুমি তো এর আগেও এ রকম দৃশ্য দেখেছ। কোনো প্রতিক্রিয়া তো প্রকাশ করোনি?’’

‘‘করিনি।’’

‘‘আজ কেন করছ? ছেলেটি সুন্দর, সে জন্য?’’

আমি চুপ করে থাকি।

‘‘তোমার সুন্দরের সংজ্ঞা এখনও পালটায়নি? সুন্দর বলতে তুমি এ-ই বোঝ?’’

আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি, ‘‘ছেলেটির মা।’’

‘‘বাহ্, বেশ মায়াও আছে দেখছি!’’

‘যা হোক। এই ঘটনার পর থেকে সে আমাকে নিয়ে নতুন খেলায় মেতে ওঠে। আমি যেন কাদামাটি, স্রেফ পুতুল, নতুন করে তৈরি করে আমাকে। প্রতিদিন বোঝায়—মানুষের বুকের ভেতর মায়া থাকাটা জীবনের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর। এই মায়ার জন্য জীবন যন্ত্রণাময় হয়ে ওঠে। তার টানকে উপেক্ষা করা যায় না। জীবন থেকে সবার আগে এইসব বিষয়গুলো ঝেড়ে ফেলতে হবে। তারপর আমাকে শেখায়, পৃথিবী জুড়ে অনন্তকাল ধরে এক ধরনের সৌন্দর্যের জয় চলে আসছে। আমি যদি কুৎসিতকে সুন্দর জেনে সুন্দরকে কুৎসিত ভেবে চলতে পারি, তবে আমার জীবন সহজ হয়ে আসবে, যেহেতু প্রচলিত সুন্দরের নাগাল এই জীবনে মানুষ পায় না। তারপর চলল আজব নিরীক্ষা। যেমন একটা চমৎকার টিয়েপাখি। ডানা পুড়িয়ে সে তাকে খাঁচার মধ্যে ভরে রাখল। পাখিটার সে-কী আর্ত চিৎকার! আমি অবাক চোখে চেয়ে থাকতাম। আমার চোখ ভিজে আসত।

‘এই চিৎকার, বাঁচার জন্য—সে বলত, চমৎকার নয়? ফড়িঙের পা ছিঁড়ে উড়িয়ে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরত, আদর করত, আমাকে ক্রমাগত বোঝাত, এইসব কঠিন পরীক্ষায় আমাকে ওতরাতে হবে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ছিল তার স্বপ্ন বর্ণনা। বিভিন্ন মানুষ তার কাছে আসত স্বপ্ন-সমস্যা নিয়ে। সে তাদেরকে স্বপ্নের অর্থ বলে দিয়ে পয়সা উপার্জন করত। একদিন আমিও, স্বপ্নে দেখি, রাশি রাশি স্বর্ণ কুড়োচ্ছি। বৃত্তান্ত শুনে সে ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়ল, বলল, কয়েক দিনের মধ্যেই আমি কঠিন বিপদের মধ্যে পড়ব। বিশ্বাস করো আপা, হলও তা-ই, কুয়োর মধ্যে পড়ে আমার ঠ্যাং ভেঙে গেল। অনেকদিন সোজা হয়ে হাঁটতে পারিনি। আমার কাছে তখন থেকে লোকটা সৃষ্টিকর্তার মতো। আমি তাকে অস্বীকার করতে পারিনি। ধীরে ধীরে তার জীবনযাপনের সাথে আমিও অভ্যস্ত হয়ে উঠি। রক্ত দেখে গায়ে রোমাঞ্চ অনুভব করি। বাঁধা একটা বেড়াল, তার গায়ের সব লোম পুড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ফেলা হল। শেকল-বাঁধা অবস্থায় তখন সে লাফাচ্ছে। কষ্টের মধ্যেও কী যেন এক উত্তেজনা টের পেতাম। যেন অনেক একঘেয়েমি কেটে গেল। কষে চড় লাগাল কিশোর-বয়েসী একটা ছেলের গালে। চিৎকার করে উঠল ছেলেটা। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই অসম্ভব গতিময়, মজাদার মনে হত।' রানু থামে। চরম উৎকণ্ঠিত আমি গলায় নিশ্বাস আটকে শুনি। কোনো মন্তব্য করি না। রানু লম্বা এক দীর্ঘশ্বাস টেনে ফের শুরু করে—'তারপর অনেকদিন পেরিয়ে গেছে। এভাবেই তার ছায়ায় বড়ো হয়ে উঠেছি আমি। বাবা-মার নিষেধ উপেক্ষা করে চলে যেতাম তার ওখানে। আমার প্রতিদিনের সাথে তখন সে ভীষণভাবে জড়িয়ে গেছে।

'জানো আপা, কী আজব কাণ্ড, এর মধ্যে একদিন ভূমিকম্প হল। আমি তখন মেঝেতে শুয়ে ছিলাম। যখন পুরো বাড়িটা দুলতে শুরু করল, আমাকে টেনে নিয়ে সে খাটের নীচে ঢুকে গেল। থরথর করে কাঁপছিল। ভয়ে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, কী করে বোঝাব তোমাকে আপা, কী প্রবল মায়ায় সে তার শরীর দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখছিল যাতে ছাদ ভেঙে আমার ওপর না পড়ে। কতক্ষণ পর ভূমিকম্প থেমে গেলে সে আমাকে টেনে মেঝেতে বসাল। কী নিষ্ঠুর চেহারা! তাড়াতাড়ি কয়লাভর্তি মাটির পাত্র নিয়ে এল। তারপর তাতে ধূপ ছিটিয়ে আগুন জ্বালাল। রক্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ''সাবধান, নড়বি না।''

'তারপর ধোঁয়ার ওপর উন্মাদের মতো হাত ঘুরিয়ে বলতে লাগল, ''আয়, আয়, অশুভ আত্মা, আয়। যে আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস—আয়।'' তার ঘরে পরে তো আর যাওনি। গেলে দেখতে কী ভয়াবহ পরিস্থিতি। পুরো ঘরে কাঠ খড় পড়ে থাকত। দেয়ালে শ্যাওলার আস্তর। ঘরের ভেতরও ইটের খাঁজে খাঁজে বুনো লতাপাতা। সারাক্ষণ সে পর্দা টেনে ঘর ছায়া করে রাখত। বাইরের দেয়াল ফুঁড়েও বেরিয়েছে জংলি লতানো ডগা। একটা আস্ত ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে বাড়িটা। এরই মধ্যে হঠাৎ দেখি, একটা কঙ্কালের মাথা ছিটকে এসে পড়ল। আর তাই দেখে ভয়ে সাদা হয়ে এল তার চোখ... ''এই তো, এই তো সেই মাথা। এত বছর পর! কোত্থেকে এল!'' সেটা হাতে নিয়ে বিকারগ্রস্ত মানুষের মতো বিড়বিড় করতে থাকল মজুমদার, ''শালা টাকা নিয়ে টাকাও দিবি না, জমিও দিবি না, কী করে বেঁচে থাকবি তুই?''

'ততক্ষণে আমার রক্ত পানি হয়ে গেছে। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি! কী দেখছি এসব! এ-কী! রক্তাক্ত, ল্যাংড়া বেড়াল হেঁটে আসছে। তারপর হঠাৎ কুকুর। তার শরীরও রক্তে চোবানো। মজুমদারকে মাঝখানে রেখে ধূপদানির চারপাশ ঘিরে হাঁটছে তারা। ডানা-ঝলসানো টিয়ে আর ময়না তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছে। হঠাৎ কঙ্কালের মাথা এবং অদ্ভুত শব্দ। রক্ত পতনের চিড়চিড় শব্দ। চোখ লাল করে টানা চিৎকার করে যাচ্ছে মজুমদার... ''কোথায় পালাবি? আয়... শনি... আয়।'' তারপর অন্ধকারে কী দেখে সে বিশাল জিভ বের করে—''এ—কী! কী চাস তুই? আমাকে হত্যা করবি? হাঃ হাঃ, আমার মৃত্যু হবে ভূমিকম্পে। তোকে আমি ডরাই না... আয়, আবার তোকে হত্যা করব, এই, এই ধোঁয়া ছাড়লাম।'' গল্প করতে করতে রানু অশরীরী ভঙ্গিতে সেই পরিবেশের প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ে, আমি যে তার পাশে, সেটা বেমালুম ভুলে চেতনাহীনের মতো টান হয়ে বসে শূন্যের দিকে তাকায় এবং বলতে থাকে, 'তারপর মজুমদারের মুখ থেকে গড়গড় করে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। তারপর যেন স্পষ্ট দেখি, ছায়ার মতো সাদা একটা মানুষ অন্ধকার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। মাগো, এসব আমি কী দেখছি? ধোঁয়ার স্রোতের তলায় মজুমদারের মুখ ঢেকে যাচ্ছে! হে আল্লাহ্, আমাকে বাঁচাও... চিৎকার করতে করতে আমি একসময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

'পরদিন ভোরে নিজেকে আমি আবিষ্কার করি রাস্তায়। মজুমদার আমাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আমার চারপাশে তখন মানুষের ভিড়। তারপর...।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘অসম্ভব...’ আমি চিৎকার করে উঠি। ‘পুরোটাই জাদু। অথবা কিছু দিয়ে অবশ করে স্বপ্ন দেখিয়েছে। তোকে তাড়ানোর ফন্দি।’

‘পরদিন দিনের বেলা দেখি’ রানু কী-এক ঘোরে বলে যায়, ‘ভূমিকম্পে তার দোতলার দিকে উঠতে থাকা বিল্দিং-এর একটা অংশ গুঁড়ো হয়ে ছাদে পড়ে আছে।’

‘ঠিক আছে, সত্যি’—আমি কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি, ‘তবে সেটা কাকতালীয় ব্যাপার। ভূমিকম্প এমনিতেও হতে পারে। পুরোটাই তার ভোজবাজি। নিশ্চয়ই এর পর-পরই সে তোকে তাড়িয়েছে?’

‘হ্যাঁ!’

‘তুই তার পরও ওর কাছে ছুটে যাস? ছিঃ রানু, এত বয়স হয়েছে তোর। ওরকম একটা লোকের জন্য নিজের জীবনটা নষ্ট করে দিচ্ছিস? ওর চালাকিটা বুঝছিস না?’

‘কী করব আমি?’ উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে রানু। ‘সবকিছু ভোলার জন্য নিজেকে কত নীচে নামিয়েছি। ছেলেদের সাথে আড্ডা দিই, সিগ্রেট টানি। ওরা আমাকে ফাঁকফোঁকরে স্পর্শও করে। সব ক-টা ছেলেকে মনে হয় ম্যাড়ম্যাড়ে। ওদের চেহারা, কী শিশুর মতো! কী মেয়েলি ওদের হাত! এসবের ভেতরেই আমি প্রাণপণে সেই লাল বিশাল দুটি চোখ, লোমশ হাত আর কোমল থাবা খুঁজি। সব শিশু। হুবহু শিশু, বমি লাগে, ঘেন্না ধরে যায়। এত বছরের অভ্যেস! থালার পর থালায় সুস্বাদু সব খাবার সাজিয়ে আমাকে মুখে তুলে খাওয়ানো... আমি কোথায় পাব আপা? তার বলা বিচিত্র কাহিনি, যা না শুনে এক রাতেও আমার ঘুম হয় না। কে আমাকে এসব দেবে? তবুও আড্ডা দিই। নিজের মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকি। তৃষ্ণা বেড়ে বুক খাঁ খাঁ করে। বারবার পাগলের মতো ছুটে যাই, তার বাসায়। সে এখন বড়ো কারবারি হয়ে উঠেছে। ভীষণ ব্যস্ততা দেখায়। আমাকে বলে, ‘ভাগ্ ভাগ্ অপয়া, নারকেলের ছোবড়া।’

‘রানু, তুই এসব বলছিস আমাকে?’ ওর শীতল হাত চেপে ধরে কেঁপে উঠি। ‘এইভাবে তোর জীবন যাবে?’

‘একদিন নিশ্চয়ই সে নিজের ভুল বুঝবে’... এই রকম ভয়ংকর আশাবাদ ব্যক্ত করে নির্জীব হয়ে যায় রানু।

আর আমি? ইস্পাতের তীক্ষ্ণ আঁকশি বুকে নিয়ে দাঁড়াই। দরজা খুলে বাইরে বেরোই। বাইরে অদ্ভুত জ্যোৎস্না। ঝিঁঝি ডাকছে একটানা। ধবল আলোর স্রোতে প্রকৃতি নিমজ্জিত। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকি। কী বিশুদ্ধ হাওয়া! বিমূর্ত আলোছায়ায় মোড়ানো। নিজেকে ছেড়ে দিই শূন্যে। উড়ে যাও, তোমার ডানায় লাগুক তুমুল বাতাস, আর মহাশূন্যের রোদ্দুর তার আশ্চর্য রং দিয়ে ঢেকে দিক তোমার পেছনের পৃথিবী।

কিন্তু তাতেই কি আমাকে সহজ-সাপটা ছেড়ে দেয় সব কিছু? কোনোকালে এক মুহূর্তের জন্যও সব ছেড়ে উড়াল দিতে পেরেছিল? ওই যে মহিম, দাঁড়িয়েছে, খোলা দরজা আড়াল করে। যে আমাকে বলত, ভেতর থেকে অস্থিরতা খসিয়ে শুদ্ধ সুন্দর মানুষ হও, আমি তাকে কেন গ্রহণ করতে পারছি না? আমার ব্যক্তিত্ব তৈরিতে যার ছিল বিন্দু-বিন্দু ভূমিকা, সেই তার কাছেই আমাকে ছাপিয়ে যখন রানু প্রধান হয়ে ওঠে, তখন আমার কাছেও তার অস্তিত্ব কেন স্বীকৃতিশূন্য হয়ে পড়ে? আমি যে অসাধারণ কেউ নই, সেটাকেই স্পষ্ট করে তোলে না আমার এই মনোভাব? আমি একদিন যার হৃদয়ের কেন্দ্র জুড়ে ছিলাম, তার সেই মনের কেন্দ্র অন্য কেউ অধিকার করতেই পারে। আমি এই সত্যকে, এই হয়ে-ওঠা হঠাৎ মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে অনাচার মনে করছি, আমার স্বার্থ আর একান্ত গভীর অনুভবকে আঘাত করেছে বলেই! সে-ই তো মনের দিক থেকে ক্ষুদ্র মানুষ, যে মানবিক সম্পর্কের উত্থান-পতনের অ-আ বোঝে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কী অদ্ভুত শুক্লবর্ণ রাত! জ্যোৎস্নায় ঘেমে উঠেছে ভেজা মাটি। মজুমদার সেই অপার্থিব আলো ফুঁড়ে নিষ্পলক চেয়ে থাকে। দুর্মর যন্ত্রণায় হাঁসফাঁস করি। পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে চকিতে মাথা ঘোরাই। রানু এসে দাঁড়িয়েছে। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অপরূপ রানুর করুণ বিপন্ন চেহারা। ওকে চিরকাল বর্ণাঢ্য সাজে দেখে আমি অভ্যস্ত। আজ ওর পরনে কী ম্লান, রঙ জ্বলে-যাওয়া ধূসর কামিজ। গলায় লটপট করছে ওড়না। সবচেয়ে নিষ্প্রভ ওর চোখজোড়া। এত কালো হয়ে গেছে সে। একদম বেমানান।

দু-জন পাশাপাশি বারান্দায় বসি।

'আপা, তোমার মনে আছে', রানু কেমন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সিনেমা হলের পোস্টার দেখতে গিয়ে হলের ভেতর ঢুকে পড়তে চেয়েছিলাম বলে দারোয়ানের সে-কী ঠ্যাঙানি!'

কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠি আমিও, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারপর দুজনের সে-কী দৌড়।'

'এক ময়রার দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, তুমি টানছিলে আমাকে'... রানু ওড়না দিয়ে হাসি চাপে। তারপর রাস্তায় পড়ে থাকা আখের ছোবড়া চিবিয়েছিলাম বলে তুমি আমার গালে কষে থাপ্পড় বসিয়েছিলে।

'তোর যা খিদে ছিল' হাসতে হাসতে বলি। কিন্তু হঠাৎ করেই বুকের সুতোয় টান পড়ে। প্রগাঢ় যন্ত্রণায় স্থির হয়ে যাই দুজনই। আঁধার মৌনতার ভূত আবারও চেপে ধরে রানু আর আমাকে।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে দেখি, রানু শব্দহীন মূর্তি, মেঝেতে বসে আছে। উসকো চুল। চোখে সারারাত না-ঘুমোনোর রক্তাভা। ঘুমিয়েছিলাম এক পৃথিবীর জটিলতা মগজে পুরে। অস্থিরতা ডুব দিয়েছিল চোরাবালির মধ্যে। হঠাৎ জেগে উঠতেই এরকম দৃশ্য! মনে পড়ে ঘুমোনোর আগের গভীর রাত পর্যন্ত কী সব যন্ত্রণাদায়ক, আজগুবি, কুৎসিত অধ্যায়গুলো। জেগে অনুভব করি আমার স্নায়ুগ্রন্থিগুলো অবশ, অসুস্থ হয়ে আছে। দৃষ্টি প্রসারিত করি। দরজা খোলা। ভেতরে নানা তরঙ্গে সাদা আলো প্রবেশ করেছে। সেই আলোর ধবলতার ভেতরে রানুর স্কেচ। স্কেচ দেখেই টুক করে অন্য বেদনা উঁকি দেয়। আশ্চর্য! এখনও আঁকা শুরু করা হয়নি! ইজেলটা বাসায় রেখে এসেছি দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে, মনে পড়ে।—'রাতে ঘুম হয়নি?' হাই তুলে প্রশ্ন করি।

রানু বলে, 'আমার প্রায়ই এমন হয়। এত অসম্ভব ছটফটানি। মনে হয় দম আটকে মরে যাই।'

নাহ্, মনে মনে ভাবি, কোনো কিছুর গভীরে প্রবেশ করব না। এই একঘেয়ে, জরাজীর্ণ জঘন্য পৃথিবীর কোনো আঁচড় লাগতে দেব না নিজের অস্তিত্বের কোথাও। টাল সামলে মেঝেতে দাঁড়াই। আমি মৃত্যুবরণ করলেও পৃথিবী বেঁচে থাকবে তার মেরুদণ্ড সোজা রেখে। আমার হৃৎপিণ্ডের থর কাঁপুনি, দুঃসহ যন্ত্রণার শাস্তি, আমি একাই অনুভব করব। কাতরাব, ছটফট করব, এক সময় স্থির হয়ে যাব। কী প্রয়োজন এইসব বিষাক্ত, ক্লিশিত কষ্ট বিভিন্ন জায়গা থেকে বিন্দু বিন্দু তুলে নিজের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলার? নিজেকে এক যন্ত্রণাময় অসহ্য মানুষে রূপান্তরিত করে কী লাভ? তাতেই কি আমার ভেতর থেকে এই আনন্দময়, বীভৎস পৃথিবীর স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে? মেঝে ছেড়ে নিঃশব্দে হেঁটে যায় রানু।

কাঠের চেয়ারে ক্লান্তিতে ঢলে পড়ি। ব্যাগ গুছিয়ে আরেফিন আসে, 'আমি ঢাকায় যাচ্ছি, তুমি কবে আসছ?'

'আগামীকাল। তুই আজকেই যাচ্ছিস কেন? হল তো বন্ধ। দু-তিনদিন পর শুনেছি ঢাকায় হরতাল, ঝুঁকি নিয়ে না গেলেই কী চলে না?'

'আমি এক বন্ধুর বাসায় উঠব। বিশেষ প্রয়োজন আছে। ওর এই কথার পর আমার মনে পড়ে, হল তল্লাশি আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

খাটের নীচে অস্ত্র পাওয়ার কথা। আবারও সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসতে থাকে। নাহ্, বাঁচব না বেশিদিন।

'তোমার অফিসের খবর কী?' মশারি সরিয়ে বিছানায় বসে আরেফিন।

'কোন খবর জানতে চাইছিস?'

'মাঝখানে হেভি গণ্ডগোল শুনলাম। চাকরিটা চলে যায়নি তো?'

'না, সবকিছু ঝিমিয়ে গেছে'—আমি বলি, 'শেষ দিকে মালিকপক্ষ সোজা ছাঁটাই করার প্ল্যান নিয়েছিল। তারপর আর কী, মহা গ্যাঞ্জাম। সবকিছু আপনাআপনিই ঠিক হয়ে গেছে।'

'এ-ও দেখি আমাদের রাজনীতির মতোই', আরেফিন হাসে, 'যখন হয় খুব জোরে-সোরে। সারা বছর ঝিমিয়ে থাকে। এ যেন সিজোনাল উৎসব।'

'তুই বুঝিস সেটা? সব বুঝেও ভাবছিস এভাবে পরিবর্তন আনবি?'

'আসলে পুরো বিষয়টা ধরা খাচ্ছে সংঘবদ্ধতার অভাবে। যারা ক্ষমতায় আছে, যারা আন্দোলন করছে, প্রায় সবাই ধান্দাবাজ, চরিত্রহীন, দেশকে কেউ ভালোবাসে না। সবাই নিজের স্বার্থের বিষয়ে অন্ধ! আসলে আমিও ফ্রাস্টেটেড হয়ে পড়ছি।' কেমন অন্যরকম গলায় আরেফিন বলে, 'আমাদের পার্টির একজন লিডার, যে এই পথে আমাকে এনেছে, যার আদর্শের আমি ছিলাম অন্ধ অনুসারী, পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে ক-দিন আগে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জানো, তাকে ধরিয়ে দিয়েছে আমাদের পার্টির চেয়ারম্যান।'

'কেন?'

'সে ফ্রাস্টেটেড হয়ে পড়েছিল। সরকারের সাথে আঁতাত করে ভিন্ন একটা দল করার পরিকল্পনা করছিল, পার্টিতে তার প্রচুর প্রভাব, তাতে করে পার্টি আরও বিভক্ত হয়ে পড়ত। বিশ্বাস করো, আমি এই দেশের কোনো নেতা, কোনো দলকে আর শ্রদ্ধা করি না। সব এক।'

'সবই বুঝছিস তুই, তারপরও'... আমি অবাক হয়ে বলি, 'আমি আর তোকে কী বোঝাব?'

'তুমি আমার কথা বলছো তো?' আরেফিন হাসে, 'আমরা সবাই সবকিছু বুঝি। সব জানি, তুমি হিসেব করে দেখো ভার্সিটি এলাকার কোন খুনটার বিচার হয়েছে? গুন্ডা-বদমাশ পুষে তবে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হয়। একেকজনের মুখে দেখবে, দেশপ্রেমের কী তুবড়িবাজি! জাতি-জাতি বলে প্রাণ ফাটিয়ে ফেলে। এরকম নষ্ট পৃথিবীতে বাস করতে ইচ্ছে হয় না। বুভুক্ষুর মতন নিজেদের পেট ভরাবার জন্য সবাই সিংহাসন চায়। এইসব হিসেবের কাছে আমি তো একটা চুনোপুঁটি। তুমি সাদ্দামকে দেখো, মার্কিনের মতো সাক্ষাৎ বাঘ দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে, নিজের শক্তি তার সম্পর্কে আন্দাজ নেই? তারপরও তার হম্বিতম্বি কমছে? পারলে তাকে বোঝাওতো? একজন লোকের স্বেচ্ছাচারী খেয়ালের কাছে লাখ লাখ মানষের মৃত্যু... বুঝেছ, রাজনীতি জিনিসটাই এমন। তোমার আমার চিন্তামতো সহজ-সাপটা পথে চলে না।'

'তুই কি মনে করছিস স্রেফ কুয়েতের উপকারের জন্য যুক্তরাষ্ট্র আটঘাট বেঁধে নেমেছে?' আমি বলি, 'এখানে মার্কিনেরও সাদ্দামের মতো স্বেচ্ছাচারী লোভ নেই?'

'হ্যাঁ, সে নিশ্চয়ই আছে। আরেফিন বলে, 'ওইতো বললাম রাজনীতির রকমই এই। বিরোধী পার্টি ঘনঘন হরতাল ডেকে এই যে দেশের ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতিকে একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলছে, সে কি দেশকে এই স্বৈরাচারী সরকারের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ভালোবেসে করছে? গদিতে বসলে ধীরে ধীরে তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

নিজেরাও কি ও রকমই স্বৈরাচারী হয়ে উঠবে না? কিন্তু ওসব ভেবে জনগণ তো চোখের সামনে ঘটতে-থাকা-অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারে না। তারা বিশ্বাস করে, সুসময় আসবে এবং সেই অন্ধ স্বপ্নের জন্য প্রাণ দেয়। আর এদিকে সরকারকে দেখো, সারাক্ষণ এ-দলে ও-দলে কোন্দল লাগিয়ে, ধর্ম নিয়ে মানুষের সাধারণ সেন্টিমেন্টকে উসকে দিয়ে, দেশের মধ্যে একটা হজফজ বাধিয়ে দিয়ে নিজেদের কায়েমি স্বার্থের ঘাঁটি মজবুত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এইরকম অস্থিরতা থাকলে তাদের ওপর থেকে মানুষের চোখ সরে যাবে অন্যদিকে। তারা কেবলই চায় সবাই নিজেদের মধ্যে কোন্দলে লিপ্ত থাকুক। তখন তারা ফাঁকতালে তাদের সুবিধাগুলো যথাসাধ্য আদায় করে নেবে। এই যে, যে-কোনো মূল্যেই এদের গদিতে বসে থাকার প্রবণতা, জনগণ না চাইলেও, এ-কী দেশকে ভালোবেসে বলতে চাও?' বলেই আরেফিন ঝেড়ে হাসে, 'দিব্যি নেতাদের মতো লেকচার দিয়ে দিলাম। বুঝলে, সবাই ধান্দাবাজ। শুধুই ধান্দা ছাড়া কারো মধ্যে আর কিছু নেই।'

'এই যদি হয় অবস্থা, তবে সব বুঝেও তুই এই অস্তিত্ব-বিপন্ন-করা রাজনীতি আঁকড়ে থাকবি?' আমি ভীত কণ্ঠে বলি। 'তুই আমাকে যতই গাল দিস—আমি মূর্খ, পিঠ-বাঁচানো-মানুষ, একদম খাঁটি নিম্ন মধ্যবিত্ত; কিন্তু সবকিছু জেনে-শুনে নীতিহীন কোন লক্ষ্যের জন্য প্রাণ দেব কেন?'

আরেফিন প্রতিবাদ করে, 'এটা একটা স্বপ্ন, নীতিহীন জেনেও কী স্বপ্ন দেখি জানো? এইসব ঠেলেঠুলে একদিন সুদিন আনব, এখন পর্যন্ত আমরা যারা ইনোসেন্ট আছি, ক্যাডারভুক্ত হয়েও নষ্ট হয়ে যাইনি, এই স্বপ্নই তাদেরকে রাজনীতিতে টিকিয়ে রেখেছে।' কথা বলতে বলতে দুজনই একসময় ঝিম মেরে যাই। কিছুক্ষণ পর শঙ্কিত গলায় বলি, 'বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাবে নাতো আরেফিন?'

'বিশ্বযুদ্ধ?' আরেফিন অবাক হয়। 'অতবড়ো যুদ্ধে মরতে পারলেতো ভাগ্যবানই হতাম। আমরা তো মরব বাজার দরের চাপে, বেকারত্ব ঘোচাবার যুদ্ধে'... ওর সাথে এই রকম কথা চলতে থাকে। অসংলগ্ন, পারম্পর্যহীন। কিন্তু এসবের ফাঁকেই একসময় নিজেকে আর চেপে রাখতে পারি না, সটান প্রশ্ন করে বসি, 'তোর খাটের নীচেও নাকি কী সব অস্ত্র পাওয়া গেছে? বিষয়টা কী আরেফিন, তুই এত রিস্কি জীবনযাপন করিস?'

'বিশ্বাস করো, ওসব অস্ত্র আমার না। আমাদের বিপক্ষ দলের কাজ। আমি ওদের দেখে নেব।'

'তুই এসব ছেড়ে চলে আয়', আমি আকুল স্বরে বলি, 'বাসার এই পরিস্থিতি। আমাদের এসব মানায় না। তুইও কিছু দায়িত্ব নে আরেফিন। আমি একা আর পারছি না।'

'বিষয়টা আমার রক্তের মধ্যে ঢুকে গেছে', কাঁধে ব্যাগ নিয়ে আরেফিন সিরিয়াস হয়ে ওঠে। 'এ এক অদ্ভুত নেশা, ভার্সিটিতে জুনিয়র ছেলেদের সম্মান, প্রতিবাদী সভা, পুলিশের অন্যায় লাঠির সাথে যুদ্ধ—আমি এসব থেকে বেরোতে পারব না। এক-এক সময় মনে হয়, আমি একাই এক ঘুষিতে সব অপক্ষমতা গুঁড়িয়ে দিই। এখন নিজের ওপরই রাগ লাগে। নিজেদের মধ্যেই প্রেম নেই, সংঘবদ্ধতা নেই। নিজেরা কামড়াকামড়ি করে স্বৈরাচারকে আরও ক্ষমতাশালী করে তুলি। বিচ্ছিরি লাগে, যখন দেখি, কেউ দেশকে এক ফোঁটা ভালোবাসছে না, সরকারকে অক্ষম প্রমাণ করার জন্য সামান্য কারণে হরতাল ডাকে, তবুও সব জেনেও এর থেকে বের হওয়ার পথ পাচ্ছি না।'

'তোদের এসব আমি বুঝি না', আমি বলি, 'তুই বলছিস এর মধ্যে তোর প্রাণ আছে, আবেগ আছে। রাজনীতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

সম্পর্কে আমার ধারণা, শ্রদ্ধা কোনোটাই নেই। অথচ ঘৃণাও কম নেই, দুটো পাশাপাশি চলে কী করে? আমি শুধু এর ঝুঁকিটা অনুভব করতে পারি। তাই ভয় পাই।'

'সব বঙ্গ ললনারাই তাই পায়'—সে বলে, 'তুমি তার ব্যতিক্রম হবে কেন? বাদ দাও, এসব ফালতু প্রসঙ্গ। আমি টিউশানি পেয়েছি। চারজনের একটা গ্রুপ। সে জন্যই আদাজল খেয়ে ছুটছি। পেটে দানা না পড়লে সব ভোকাট্টা।'

'তোর কাছে তো টাকা নেই, আমার কাছে চাইছিস না যে?'

'তুমি দেবে কোত্থেকে? এখানে থেকেই দেখো, খরচ কাহাকে বলে। যে গ্রুপটাকে পড়াচ্ছি, বেশ ভালো ওরা। পকেট কাটার কথা শুনে কিছু অ্যাডভান্স দিল। বাকিটা ম্যানেজ করে নেব।'

'আমি সম্ভবত কালই যাচ্ছি, অফিসের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে একটু টেনশনে পড়ে গেলাম।'

আরেফিন চলে গেলে আমি বাবার কাছে আসি। এখনও ঘুমিয়ে আছেন। নিশ্বাস টানছেন অস্বাভাবিক শব্দে ধাক্কা দিতে-দিতে। মা মেঝেতে বসে তরকারি কুটছেন। সেই চিরন্তন ভঙ্গি। শুধু শিরদাঁড়ার দিকটা একটু বেশি বাঁকানো, ফলে উবু হয়ে মাথাটা দায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে একটু বেশি। স্থির চোখে চেয়ে থাকি সেদিকে, কিন্তু মগজে টাল খাচ্ছে মজুমদারের মাথা। কিছুতেই থামছে না। কী নিষ্ঠুর, কুটিল শৈল্পিক হত্যা! রানুকে ক্রমশ সে খুন করেছে। আর মা? নিঃশব্দে তরকারি কুটছেন। ভীষণ একাগ্র তিনি তাঁর কাজে। কিন্তু কী এক বিশাল উই ঢুকেছে ঘরে, সব ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে। মহিলা প্লাস্টার করছেন, বার্নিশ লাগাচ্ছেন... একবারের জন্যও কি দেখার চেষ্টা করছেন, কীসের ওপর এই প্রলেপ? এর ভেতরে কী? তিনি কি জানেন না? দেখলেই আয়ু কমে যায়, না দেখে যতক্ষণ থাকা যায় ততই মঙ্গল, ততই প্রশান্তি! অক্ষমতায় হোক, বাঁচার তাগিদেই হোক, উই ঢোকার পথ যে তাঁরা নিজেরাই করে দিয়েছেন।

পিঁড়ি টেনে মার পাশে বসি—'আচ্ছা মা, আপনার কোনো হাতের কাজ আমাদের ঘরে আছে? কোনো সেলাই, নকশা... এইসব?'

মা তরকারি কোটায় নিমগ্ন, তবু সচকিত জানতে চান—'তোর হঠাৎ করে এসবের কী দরকার পড়ল?'

'আমি তখন আপনার করা কাজগুলো অত খেয়াল করিনি কিনা', আমি বলি, 'এখন ইচ্ছে হচ্ছে, দেখি, সেগুলো কেমন ছিল।' মার হাত থেমে যায়। কাঁপা কাঁপা হাতে দা পাশে রেখে তরকারির পাতিলসহ তিনি আশ্চর্য নিস্পৃহ ভঙ্গিতে দাঁড়ান—'সেসব কি আর আছে! কবেই তো বিক্রি হয়ে গেছে!' মা রান্নাঘরে গেলে আমি কেমন নিভে গিয়ে বাবার খাটের পাশে এসে দাঁড়াই। পেশাব করার জন্য লুঙ্গির তলা থেকে প্লাস্টিকের বালতি অবদি একটা নল লাগানো হয়েছে। তিনি এমনভাবে তাকিয়ে আছেন, মনে হচ্ছে, গর্ত থেকে ঠিকরে চোখদুটো বেরিয়ে পড়বে। এবার নিশ্বাসের মৃদু উত্থান টের পাওয়া যাচ্ছে। ফিসফিসে গলায় জানতে চাই—'খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা?' উত্তরে বিকৃত মুখ করে তিনি গোঁ গোঁ শব্দ করেন শুধু। অবিশ্রান্ত লালায় তাঁর দাড়ি ভিজে যায়। আমার বুকের ভেতরটা হুহু করে ওঠে। মুখ সরিয়ে বসে থাকি। সমস্ত দেয়াল পলেস্তরা ওঠা। মাকড়সার জালের ছড়াছড়ি বাঁশের সিলিং জুড়ে। আমাদের চিরকালের দম রুদ্ধ-করা, ঘামে-ভেজা ঘর।

শিস দিতে দিতে মন্টু ঢোকে। আমি জানতে চাই—'ফিজিওথেরাপি করা হচ্ছিল, কিছু হয়নি?'

'সে তো ম্যালা আগে। পাঁচদিন করেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। দিনে পাক্কা ষাট টাকা করে লাগে।'

'এমন একজন পেশেন্টকে হাসপাতাল ছেড়ে দিল?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘তারা ছাড়েনি। মোটামুটি শেষ জবাব শুনে আমরাই ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছি। কিছু হলে নিজের বাড়িতে হওয়াই ভালো। মৃত্যুর আবার ভালো-মন্দ।’ এবার আমার বুক জুড়ে শুরু হয় ভিন্ন বোধের ঢেউয়ের খেলা। সবকিছু কী সহজ এদের কাছে! জীবনের রূঢ় বাস্তব এরা কত অবলীলায় মেনে নিচ্ছে। সেই মতো প্ল্যান করছে। রাস্তা তৈরি করছে। জীবনকে এভাবে নিতে পারলেই নির্বাধ হয় পরমায়ু।

‘তুই যে দুটো রিকশা নামিয়েছিলি, তার থেকে কিছু আসছে?’

‘আসছে, তবে ম্যালা গ্যাঞ্জাম। দু-দিন পরপর এরা নাটবল্টু চেন-ফেন সব নষ্ট করে ফেলে। ওদের সাথে চিৎকার করতে-করতে আমি নিজেই এখন রিকশাওয়ালা বনে গেছি।’

‘তুই টাকা পেয়েছিলি কোথায়?’

‘কীসের টাকা? রিকশা কেনার? সেটা ম্যানেজ হয়ে গিয়েছিল।’

‘ম্যানেজ হয়ে গিয়েছিল মানে? কীভাবে?’

‘মা দিয়েছিল দু-হাজার, কী সব সোনাদানা বেচে। বড়ো চাচার হাত-পা ধরে এক হাজার, বাকিটা ম্যানেজ করেছি।’

‘বাকিটাইতো পুরোটা’—কী এক যন্ত্রণা থেকে বিন্দু বিন্দু হিসেব নিতে শুরু করি, ‘সেটা কোত্থেকে এল?’

‘তোমার কাছে তো চাইনি’, মন্টুর গলায় এবার ঝাঁঝ ফুটে ওঠে, ‘তুমি এত গোয়েন্দাগিরি করছ কেন?’

‘সে তো আমি জানি। তাহলে তো আর এত প্রশ্ন করতাম না।’

‘চাঁদা তুলে’, মন্টু এইবার মরিয়া হয়ে উদ্ধত মাথা তোলে। ‘একটা সমিতি গড়ার কথা বলে আমরা চার-পাঁচজন নেমে পড়েছিলাম। একটানা সাতমাস। অনেক জমেছিল। ভাগাভাগি করে নিয়েছি।’

‘সাথে পিস্তল ছিল?’

‘তার দরকার পড়েনি। রিকশা দুটো না কিনলে সংসারের যা অবস্থা, বাবার পেনশনের টাকা দিয়ে শুধু এই বাজারে একটা মিসকিনেরও চলে না। তুমি তো গিয়ে বেঁচেছ। পুরো ফ্যামিলি রক্ত বেঁচেও রক্ষা পেত না।’

কথা আর এগোনো যায় না। এসব ব্যাপারে যত পাশ দিয়ে হাঁটা যায়, ততই ভালো। আমি ভাবি, মন্টুকে এভাবে প্রশ্ন করা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু মাঝে মাঝে কী হয়, একরোখা একগুঁয়েমিতে পেয়ে বসে। আমি কি জানি না এসবের উৎস? ভাঙা গাড়িটা কোন ধাক্কায় চলছে? কোনো মানে হয় আগ বাড়িয়ে এসবের মুখোমুখি হওয়ার? বাড়ি এসে একটা জিনিস স্পষ্ট অনুভব করছি। ঘর থেকে নড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। আমার এত অসম্ভব স্মৃতিময় পথঘাট, আমার আজন্মের প্রতিবেশ, দূরে থাকলে এসবই এমন সর্বগ্রাসী হয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরে, এমন যন্ত্রণাকর ভাবে, চোখে জল এসে যাওয়ার মতন করে আমাকে আক্রান্ত করে রাখে। এত সুদূর, এত স্পর্শাতীত মনে হয় এই শহরকে অথচ এখানে এসে মনে হচ্ছে, এদের কাছ থেকে যত পালিয়ে থাকা যায়, যতই লুকিয়ে রাখা যায় নিজেকে, ততই প্রশান্তিদায়ক। স্মৃতির পথ দূরবর্তী হওয়াই ভালো। তার নিকটবর্তিতা বড়ো মর্মপীড়ক।

এক দুপুরে বাসার সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়েই এর স্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাই। লুঙ্গি মালকোঁচা করে রাস্তার টিউবওয়েলের পানি নিতে এসেছে পাশের বাসার আনাম চাচা। আমাকে দেখে অদ্ভুতভাবে দৃষ্টি প্রসারিত করে বলেন, ‘ক্যাডা গো?’ আড়ষ্ট স্বরে বলি, ‘আমি নীনা। ভালো আছেন চাচা?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘ভালো আছ তো, এতদিন পর আইলা! আমাগোরে ভুইল্যা গেছো?’

‘না, একদম সময় পাই না, চাকরির পেছনেই দিন চলে যায় তো।’

‘এদিকে সারাক্ষণ মুসলমানের ব্যাটা সাদ্দামের লাইগা চিন্তায় অস্থির হয়া আছি, মনে অয় বিশ্বযুদ্ধ লাইগ্যাই যাইবো, যাই হোক তুমার স্বামী আসে নাই? একলাই আইছো?’

‘একলাই’, বলতে শরীরে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে। কী ভান! যেন জানেন না কিছুই। এখনই ধীরে ধীরে প্রশ্নের তীক্ষ্ণতা শেকড় স্পর্শ করবে। ঘরে ফিরব বলে পাশ ফিরেছি, বলেন, ‘রানুরে একটু ঠ্যাকাও। পাড়ায়তো আর থাকা যায় না।’

‘রানু আপনার কী করেছে?’

‘আমার কী করবে? শুধু নিজের ক্ষতি করলেই ক্ষতি? পাড়ার পরিবেশটা দেখবা না? তা তোমারে কী বলবো। তোমারও নাকি ডাইভোর্স হইয়া গেছে? আমাদের ঘরে মেয়ে আছে, চিন্তা তো এইসব কারণেই হয় মা, কী বাপের কী সন্তান! কোন পাপ যে করছিল তুমার বাপ—বাদ দেও এই সব। এখন কও ঢাকায় কুয়েতের পক্ষে রিয়েকশান কী?’

আর সহ্য হয় না! আমার পরিচিত পৃথিবীর মৃত্যু ঘটেছে। সম্ভবত আমরাই এর হত্যাকারী। অথবা শিকার। জানি না! কেবল শরীরে অসহ্য জ্বালা অনুভব করি। অস্তিত্ব বিষাক্ত করা এইসব প্রসঙ্গ! যার বিষযন্ত্রণায় প্রতিনিয়ত বিক্ষত হচ্ছি। এখন প্রকাশ্যে এর জবাবদিহি করতে হচ্ছে। আমার অতীতের নগ্ন প্রকাশ শুরু হচ্ছে।... সহ্য হয় না। কথা বলারও রুচি হয় না।

ঘরে ফিরে দেখি, একটা প্রমাণ সাইজ কাঠের ওপর নিজেকে সঁপে দিয়ে স্থির পড়ে আছেন বাবা। কিন্তু তাঁর গলা চিরে বিচিত্র শব্দ বেরোচ্ছে এবং চোখ জোড়া ভয়াল লাল! পুরো শরীর লোহার মতন টান টান! অসম্ভব যন্ত্রণায় মাথা ঝাঁকানোর চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি কিছু দেখে ভয়ার্ত চোখে ওপর দিকে তাকাচ্ছেন। নীলচে হয়ে উঠছে মুখ, চোখ রক্তবর্ণ।

আমি এক দৌড়ে মার ঘরে যাই। মা প্রথমে আমল দেন না। বলেন, প্রায়ই এমন হয়। কিন্তু আমি আমার মনের চোখ দিয়ে দেখছি, মানুষটা স্থির কোনো মহাশক্তির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। আমি মাকে টেনে নিয়ে আসি। সেই মুখ দেখে মাও কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েন। তাড়াতাড়ি তিনি বাবার শিয়রে বসে যান। বালিশ থেকে মাথাটা উঁচু করে ধরেন, যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধে হয়। বোঝা যাচ্ছে দম টানতে তাঁর অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। আমিও তাঁর পিঠের কাছটায় যাই। টান দিয়ে ওঠাব—উফ্ আল্লাহ্! সমস্ত পিঠে পচন ধরেছে। অয়েলক্লথের সাথে সেই ঘায়ের আঠালো পুঁজ লেগে সেটা পিঠের সাথে আটকে গেছে। কি বিশ্রী গন্ধ! আমি কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। মা বলেন, ‘অয়েলক্লথ সহই ওঠা।’ তাই করি। অবশ্য বাবার দেহ খুব একটা ভারী না। অসুস্থতায়-অসুস্থতায় হাড্ডিসার বলতে যা বোঝায়, তাই। তবুও, সেই দেহটাকেই তুলতে গিয়ে মা আর আমি রীতিমতো ঘেমে উঠি। দুজন দু-মাথায় ধরে তাকে টেনেটুনে বিছানায় বসাই। অয়েলক্লথ আর বাবার পিঠের পুঁজে পুঁজে আমার দু-হাত একাকার। এই সময় হঠাৎ বাবার গলা চিরে বেরুনো গর্জনে আমি আর মা একসঙ্গে চমকে উঠি। তিনি চোখ উলটে উলটে ওপরমুখী দম টানতে শুরু করেন। ঠিকরানো চোখে বাঁ হাত তুলে দরজার দিকে কী যেন দেখতে থাকেন।

তাই দেখে মা চিৎকার করে ওঠেন, ‘মন্টু... মন্টু।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

মন্টু কোথাও নেই। রানু এগিয়ে আসে। সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে তার আচরণ। মা চিৎকার করে বলেন, 'রানু, জানালা খুলে দে। তোর বাবার নিশ্বাস আটকে আসছে।' রানু ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। এবং নির্লিপ্ত চোখে দেখতে থাকে বাবার মুখের উত্থান-পতন।

এবার আমি চেঁচিয়ে উঠি, 'রানু, শুনছিস না মা কী বলছেন?'

আমার এ কথার পর আমি রানুর ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠতে থাকা মুখে মৃদু কাঁপন লক্ষ করি। কিন্তু তার অবস্থানের কোনো পরিবর্তন দেখি না। বাবাকে মার ওপর ছেড়ে দিয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে আমি জানালার কাছে ছুটে যাই। দরজা খুলে দিই। মা বলেন, 'বাবা মরলে ওরতো সুবিধে হয়, ও নড়বে কেন?' জানালা খুলতে অন্ধকার কিছুটা হালকা হয়ে আসে। এক ফোঁটা হাওয়া আসে। কিন্তু তারপরও বাবার যন্ত্রণাকর অভিব্যক্তির কোনো পরিবর্তন ঘটে না। উদ্বিগ্ন হয়ে ফের রানুকেই বলি, 'একটু ডাক্তারকে খবর দে রানু, দেখ না মন্টু কোথায়?'

কিন্তু রানু কাঠ হয়ে আছে। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাবার ওপর বিদ্ধ। প্রথমে ভাবি, সম্ভবত বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছে, তাই মাথায় কিছু ঢুকছে না। কিন্তু বাবা এক হাত ওপরে তুলে যখনই বীভৎস মুখ করে আ-আ শব্দে চিৎকার দিয়ে উঠলেন, আমি স্পষ্ট দেখি, রানু কেমন উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। পলক পড়ছে না চোখের। সেখানে যেন এক ফিকে উজ্জ্বল আলো খেলে যায়। আমার বুক থেকে স্ট্র দিয়ে জল শুষে নেয় কেউ। কেমন হতবাক হয়ে পড়ি। এবং তেমনই মিশ্র অবস্থায় দাঁতে দাঁত চেপে ছুটে যাই রাস্তায়। ভাগ্য ভালো, মন্টু রাস্তায় কিছু উদ্ভটগোছের ছেলের সাথে আড্ডা দিচ্ছিল। আমি দূর থেকে তাকে ডাকি, এবং বাবার অবস্থার কথা বলে তাড়াতাড়ি ডাক্তার আনতে পাঠাই।

বাবার অবস্থার পরিবর্তন নেই। মা তাকে উঁচু বালিশে শুইয়ে দিয়ে তার নিথর ডান হাত ধরে ক্রমাগত ব্যায়াম করাচ্ছেন। আমি তার নাকের কাছে পাখা এনে রুদ্ধশ্বাসে বাতাস করি। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করি, 'বাবা... বাবা।'

কিন্তু তাঁর বিস্ফারিত চোখ শূন্যে। অবশ হওয়ায় স্থির ঠোঁটের একপাশ নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। বাকি অংশে থর-কাঁপুনি।

একবার একটা ছবি দেখেছিলাম। একটা খোঁড়া জীবন্ত হরিণকে টেনে-হিঁচড়ে তার প্রায় গলা অবদি খেয়ে ফেলল একটা নেউল। গোঙাতে গোঙাতে একপর্যায়ে এসে মারা গেল হরিণটা। ছবিতে দেখা সেই হরিণটার সাথে বাবার মিল খুঁজে পাই আমি। একই দশা যেন দুজনার। ক্ষতাক্ত হরিণ—ক্ষতাক্ত পিঠের বাবা। দুজনই কী অসহায় তাদের শারীরিক অক্ষমতার জন্য।

মা ভেজা তুলো ঘষে ঘষে এদিকের ঘা পরিষ্কার করেন তো, আরেকদিকের মাংস খসে পড়ে। আর সেই সঙ্গে খলবলে রক্ত আর পুঁজের স্রোত শরীরের এপাশ-ওপাশ থেকে বেয়ে বেয়ে নামে। আর তার মধ্যে বাবার চোখজোড়া কেমন বুজে বুজে আসতে থাকে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসে পুরো ঘরকে তামাটে আর বিবর্ণ করে। সারা মেঝে জুড়ে কাদাজল লেপটে আছে। দেয়ালে টিকটিকির মুণ্ডু নিয়ে নামছে লাল পিঁপড়ের দল। রানু সেই একই ভঙ্গিতে বসে আছে। কখনও বাবার বিকৃত কণ্ঠস্বর উচ্চস্বরে বাজলে ত্বরিত গতিতে মুখ বাড়িয়ে দেখছে, কিন্তু সেই চেহারায় না কোনো ঢেউ, না কোনো তরঙ্গ, না বেদনা, কিচ্ছু নেই। বাবাকে ফেলে আমি মরিয়া হয়ে এবার রানুকে দেখি। বাবার কষ্ট বাড়লে অদ্ভুত হয়ে ওঠে ওর মুখ। যে মুখ নিয়ে সে আগে মেলার জিনিস দেখত, একটা বিশাল হাতি হেঁটে যাচ্ছে দেখত কিংবা বিশাল বিয়ের আয়োজন, চোখের বিস্ময়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

অনেকটা তারই ছাপ।

নাহ্, আমার এখন রানুকে দেখার সময় নেই। ডাক্তার এসে গেছে। বাবার শারীরিক অবস্থার খবর পেয়ে প্রতিবেশীদেরও অনেকেই এসে যান। দীর্ঘদিন পর কিছু প্রতিবেশীর মুখোমুখি হয়ে আমি তীব্র অস্বস্তি নিয়ে একটু দূরত্বে গিয়ে দাঁড়াই। ঘর জুড়ে তাদের ব্যগ্র, ব্যস্তসমস্ত ছোটাছুটি, উদ্বেগ-মেশানো মন্তব্য আর কাথাবার্তায় গুমোট ভাবটা কেটে যায়।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ডাক্তার আসার পর মুহূর্তেই শীতার্ত মানুষের মতো কাঁপতে কাঁপতে খিঁচুনি দিয়ে বাবা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আমার রক্তের মধ্যে চিড়িক দিয়ে ওঠে ঢেউ। ডাক্তারের নির্দেশে হন্তদন্ত মন্টু স্যালাইন আনতে ছোটে। সাথে কিছু ঔষধ। এবং এইসব জোগাড়যন্ত্র করতে গিয়ে আমার ক্ষীণ অর্থের জমাট বাণ্ডিলে ততক্ষণে ভাঙন শুরু হয়ে গেছে।

সন্ধে নাগাদ সব প্রস্তুতি শেষ হয়। খাটের স্ট্যান্ডের সাথে স্যালাইন ঝোলানো হয়েছে। মলমূত্রে পুরো বিছানা ভেজা। দীর্ঘদিন ধরে মা এই কাজের সেবাদাসী। কিছু পরামর্শ দিয়ে চড়া ভিজিট নিয়ে ডাক্তার চলে গেলে আমার অর্থনৈতিক অবস্থা দস্তুর মতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যা হোক, এখন সেটা নিয়ে চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। আমি একটা জিনিস স্পষ্ট টের পাই, বাবা সম্ভবত রওনা দিয়েছেন। অবশ্য মন্টু ব্যাপারটাকে আমলই দেয় না। দীর্ঘ বছর ও মাসের ব্যবধানে সে বাবার এমন বহু উত্থান-পতন দেখেছে। মার মুখ দেখে তাঁর প্রতিক্রিয়া বোঝার উপায় নেই। তবুও কিছুটা হতাশাগ্রস্ত দেখায় তাঁকেও।

সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলে ভিড় কমে আসে। কিছু নিকট আত্মীয় তখনও রয়ে যায়। আমার দূর সম্পর্কের এক চাচি এসে পাশের বাসার আনাম চাচার স্ত্রীর সাথে ইনানোবিনানো গল্প ফাঁদে। কাঠের বিছানায় বাবার শীর্ণ দেহ তেমনি মিশে আছে। স্পষ্টভাবে তার বুকের ওঠানামা টের পাওয়া যাচ্ছে। কী বিদঘুটে গন্ধ! অসম্ভব নিপুণ হাতে মা বাবার শরীরে নীচ থেকে গু-মুত সমেত ওয়েলক্লথ ধরে টান দেন। এবং রানুর শরণাপন্ন হন—'তোর বাবার পা দুটো ওঠা তো!' আমাকে আবারও স্তম্ভিত করে দিয়ে এইবার রানু টান টান দাঁড়ায়। এবং ক্ষিপ্রগতিতে বাবার ঠ্যাং ওপরে তুলে মাকে ওয়েলক্লথ বের করতে সাহায্য করে। ওয়েলক্লথ বের করে মা যখন সেসব নিয়ে কলতলায়, রানু তখন ভেজা ন্যাকড়া এনে বাবার পায়ে লেগে থাকা এক গাদা মল মোছায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভোটকা গন্ধে আমার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। অথচ সেই ঘিনঘিনে পাঁকে ঝুঁকে থাকা অবস্থায় রানুর মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। হ্যারিকেন জ্বেলে টেবিলে রাখে মন্টু। এক চিলতে বিচ্ছুরিত আলো বাবার শরীরে আড়াআড়ি ছায়া ফেলে।

ঘরে প্রতিবেশী আরও দু-চারজন এসে জোটে। সেই সম্মিলিত জোটের সামনেই আয়েশে গালের মধ্যে খিলি পোরেন আমার সেই চাচি এবং বর্ণনা করে চলেন তার মৃত্যুপথযাত্রী ভাসুর ছিলেন আস্ত ফেরেশতা। যখন সবে চাকরিতে ঢুকেছেন, তখন তাঁদের বাড়িতে কত কমলা, মুরগি এইসব নিয়ে যেতেন। কোনোদিন কারো মনে চোট দিয়ে কিছু বলেননি। সর্বদা আল্লাহর বন্দেগিতে মগ্ন ছিলেন। তাঁর মতো লোকের কপালে যদি হাবিয়া লেখা হয়, তবে তা হবে তাঁর সন্তানদের কুকীর্তির জন্য। এ কথা বলে তিনি আমার দিকে সরাসরি তাকান। নিজের বক্তব্যকে স্বস্তিকর আর জোরালো করার জন্য এবার অভিনব কায়দায় তিনি তর্জনী নাড়ান, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকেই বলতাছি মেয়ে, আমি আর কী বলব। আরেফিনটাও বড়ো চাচার বাসায় ছিল বইল্যা কিছুটা মানুষ হইছে। আত্মীয় লাগো, বছরেও একবার আসি না, বুঝো না কীসের লজ্জায়?' এরকম পরিস্থিতিতে যন্ত্রণাকর অবস্থায় পড়া ছাড়া কোনো পথ থাকে না। রানু গম্ভীর মুখে তখনো জলচৌকির ওপর বসে আছে। চাচির কথা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

চালাচালির মধ্যে তার বিন্দুমাত্র ভাবান্তর নেই। আমি বাবার মাথার কাছে বসে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করে চলি একটানা। পুরো ঘরে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। আমি হাঁসফাঁস করে উঠি। চাচির প্রসঙ্গের সূত্র ধরে প্রতিবেশীরাও টুকটাক মন্তব্য করতে পেছপা হন না। কিছু নৈতিক দায়িত্ব তাদেরও আছে। আমাদের নিশ্চুপতার সুযোগে দ্বিগুণ উৎসাহে আনাম চাচার স্ত্রী আবারও গলা চড়ান—'বাড়িতে যে একটা মা আছে, তা বোঝার কোনো গতি নেই। আপনি তো দূরে থাকেন, দেখেন না। ছিঃ ছিঃ কি অশ্লীল কাণ্ড! বিশেষ কইরা রানুর কারণে আমরা নিজেদের মেয়ে লইয়া ডরে থাকি, তুই যখন দুধের শিশু, নাক টিপলে দুধ বাইর অয়, তহন তুই করলি বুইড়া মজুমদারের লগে লটরপটর। তুই খবিস না অইলে ওই ব্যাটা তরে লইয়া অমন মামদোবাজি করে! আর মন্টু? হেয় তো মাস্তান হয়া উঠতাছে। ফ্যামিলিটা ধ্বংস হয়া গেল। আপনাদেরকে নতুন করে আর কী বলব,' ঘরের বদ্ধতা চিরে এবার চাচির গলা ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে ওঠে, 'ফ্যামিলি-ধ্বংসের দেখছেন কী? আরও দেখবেন। শুরুতো করছে হের চাচায়। নিজের আত্মীয়, বলতেও লজ্জা লাগে। বড়ো ভাই দানাপানি দিয়া বড়ো করল, লেখাপড়া শিখাইল, তুই কী করলি? একটা চাকরি পাইলি। চইল্যা গেলি কুমিল্লায়, তারপরে?' অসীম স্তব্ধতা নেমে আসে তার এই 'তারপরের' ওপর। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। এবার ভেতরে-ভেতরে এ-গল্প শোনার ব্যাপারে আমিও আগ্রহী হয়ে উঠি। দীর্ঘদিন পর সেই ভয়াবহ নাজুক বিষয় আমাকে কৌতূহলী করে তোলে। শরীরের মধ্যে কেমন কাঁপুনি অনুভব করি এবং সেই ভয়ংকর দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠায়, ভয়ও।

'তারপর তুই চাকরি ছাইড়া আইলি', চাচি ফের শুরু করেন—'কয়দিন ভূতের মতন ঘরে বইসা রইলি। একদিন রাইতে গলায় দড়ি দিলি। ক্ষতিডা কার হইল? তোর ভাইয়ের ? না তর? পরে শুনছি, কোন ম্যারেড মহিলার সাথে ব্যভিচারী সম্পর্ক গইড়া উঠছিল, এইসব কথা কি চাপা থাকে? পাপ! পাপ! এই গুলারে ঝাঁটায়া পাড়া থাইক্যা বিদায় করন উচিত। নাইলে কেয়ামতের আর দেরি নাই কইলাম।'

এই পর্যন্ত হলে ইস্তফা দেন চাচি। এরপর প্রতিবেশীদের পালা। কিন্তু আমি ওদের সেই অম্লমধুর কথার ক্ষেত্র পেরিয়ে ডুবে গেছি অন্য অসীম তলায়, আমার কাছে এসবই নতুন তথ্য। সত্যিকার অর্থে ব্যভিচারী সম্পর্কের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আমার জানা নেই। সেই সম্পর্কটি যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তার সাথে প্রাণের যোগ ছিল। তা না হলে আত্মহত্যার প্রশ্ন আসত না। আর প্রাণেরই যদি সংযোগ থাকবে, একটি সম্পর্কে যতই দেহ থাকুক, আমি কোন যুক্তিতে একে ব্যভিচার বলি? আর আমার সেই কাঠের মতো শক্ত চাচা, কোনোদিন যে হেসে কথা বলেনি, সকালে বেরিয়ে রাতে কঠিন মুখে এসে বিছানায় শুয়ে পড়া ছাড়া যার সাথে আমাদের বাসার কোনো সম্পর্ক ছিল না, হিসেবের বাইরে নড়ত না একবিন্দু, সে কিনা চাকরি ছেড়ে দিল! এত দুর্লভ চাকরি। কুমিল্লা থেকে এসে নিশ্চুপ বসে রইল। একদিন রাতে আমাকে ডেকে বলল, 'তুই ছবি আঁকছিস এখনও? না ছেড়ে দিয়েছিস?'

আমি ছবি আঁকি, চাচা সেটা জানে, আমার রীতিমতো ভিরমি খাওয়ার অবস্থা। আমাকে দ্বিগুণ হতভম্ব করে দিয়ে জীবনের প্রথম সেদিন সে আমার দিকে পঞ্চাশটি টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'তোর ছবি আঁকার কিছু সরঞ্জাম কিনে নিস।'

পরদিন খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙে। বাথরুমে যাওয়ার জন্য দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়েছি, ও আল্লাহ! এই বাইরের ঘরেই, বাবা যেখানে শুয়ে, তার মাথার ওপরেই জং-পড়া পুরোনো সিলিং ফ্যানটা ছিল, তার সাথে গামছায় বাঁধা চাচার নিথর দেহটা দুলছে। বিকৃত মুখ থেকে জিভ বেরিয়ে পড়েছে। গালে এক চিলতে শুকনো রক্তের রেখা। অস্পষ্ট মনে পড়ে, বনভূমি ফাটিয়ে একটা আর্তস্বর, নিজের আর্তস্বরে নিজেই ছিন্নভিন্ন, কম্পিত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

মেঝেটা টাল খেয়ে সটান ছাদে উঠে গেল, আর সিলিং ফ্যানসহ চাচার দেহটা যেন মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল! সশব্দে পলেস্তরা ওঠা দেয়াল এগিয়ে আসছে এবং ভয়ংকর ঘূর্ণি... তারপর কিছু মনে নেই। আর আজ চাচি বলছে সেই মৃত্যুর একটা জটিলতম সূত্রের কথা। সেই দৃশ্য দর্শনের পর আমি দীর্ঘদিন স্বাভাবিক হতে পারিনি। তারপর কত রাত, কতদিন... ভেবে ভেবে... কেন? কী সেই অন্তর্নিহিত কারণ? কোনো তল পাইনি। তারপর বাবা সেই ফ্যানটা বিক্রি করে দিয়েছিলেন। সেই ঘটনার পর থেকেই বাবা মূলত ভয়ংকর রকমের নীরব হয়ে যান। চরিত্রের মধ্যে জাগতিক সংসারের যা-ও কিছু ছিঁটেফোঁটা উপকরণ ছিল, সবকিছু ধুয়েমুছে সেখানে এককভাবে জায়গা করে নেয় সৃষ্টিকর্তা আর পরকালের শান্তির ধ্যান। আজ সেই ঘটনার অন্তর্নিহিত কারণ শুনে আমার সারা শরীর জ্বরে তপ্ত হয়ে ওঠে। কী অসম্ভব প্রলাপ বকছে সবাই। আমাদের ঘরে এসে আমাদের কাসুন্দিই ঘেঁটে যাচ্ছে। কোনো শালার পাঁচ পয়সার কাছেও আমাদের জীবন জিম্মি নেই। তবুও চুপ করে আছি, প্রতিবাদ করছি না। এই জরাজীর্ণ ঘর, একটি অপমৃত্যুর বদ্ধ বাতাস যেখানে, সেখানে আজ বাবার সাদা হয়ে ওঠা পাণ্ডুর মুখ রক্তাক্ত, বিক্ষত দেহ, আমার রক্ততরঙ্গকে হিম জমাট করে দিচ্ছে। আমাদের বিপন্ন, নিঃশব্দ ভদ্রতার কি অবাধ সুযোগ নিচ্ছে এরা!... রানু, মন্টু, মা—একের পর এক সবাই প্রসঙ্গ হয়ে আসছে। বিভিন্ন কোণ থেকে তার বিশ্লেষণ হচ্ছে। সব শুনেও কি ভয়ংকর ভাবলেশহীন রানু। ওরতো তো দু-কানই কাটা। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারে না সবাইকে? কিন্তু কথার আঁচড় গায়ে লাগলে তবে না প্রতিবাদের প্রশ্ন। বিকৃতিকে ভালোবাসে রানু, ভালোবাসে যন্ত্রণাকে, রানু শেষ হয়ে গেছে।

প্রতিবেশীরা চলে যায় এক সময়। দেয়ালে ঠেস দিয়ে প্রাণহীন বসে থাকেন মা। মন্টু দাঁড়িয়ে আছে স্যালাইন স্ট্যান্ডের পাশে। হ্যারিকেন জ্বলছে বদ্ধ অন্ধকারের নাভি চিরে চিরে। নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে মার মৃদু কান্নার শব্দ শুনতে পাই।

ঘুণধরা চেয়ারের পায়া থেকে অসংখ্য গুঁড়োকাঠ মাটিতে। রানু সেই চেয়ারে বসে নিজের গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছে। এর মধ্যে মার বিপন্ন কণ্ঠস্বর মৃত্যুর মতো শোনায়—'বাঁচবে তো?' তারপর খোলা দরজায় ছায়া। ক্ষিপ্রগতিতে মুখ ঘোরাই। আমার শরীরের আগুন মুহূর্তে ঠান্ডা ফোসকায় পরিণত হয়। যেন দৈত্য, শূন্য থেকে মাটিতে নেমে এল। কঠিন ক্রূর চোখে তার দিকে তাকাই—মজুমদার।

ধীর পায়ে হেঁটে বাবার শয্যার পাশে যায়। এবং তাকে দেখে ধনুকের ছিলার মতন খাড়া হয়ে ওঠে রানু। এত অদ্ভুত তার আনন্দ, এত অশ্লীল তার প্রকাশ যে, ঘৃণায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে থাকে আমার। দ্রুত উঠে রানু বাবার মাথার কাছে চেয়ারটি পেতে দেয়। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতা । মজুমদার এক সময় গম্ভীর কণ্ঠে বলে, 'সময় শেষ হয়ে গেছে।'

এবং তার এই গায়েবি আওয়াজে আপ্লুত রানু উদ্ভাসিত মুখে বলে, 'আপনার পক্ষেই সেটা জানা সম্ভব। আপনার সেই শক্তি আছে। আমি আপনাকে খবর দিতে চাইছিলাম।' বাবার বর্তমান যে অবস্থা, তাতে এই মন্তব্য যে-কোনো শিশুও করতে পারে। সেটা রানুকে বোঝানো সম্ভব না। এই রূপকথার ভয়াল দৈত্যটি ঘরে ঢোকার পর আমার হাড়-মাংস এক হয়ে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আমার বিক্ষত দেহে যেন ঝাঁকে ঝাঁকে লাফিয়ে পড়েছে জলবিছুটি। মাকড়সার জালের ঝুলকালি হালকা বাতাসে কাঁপছে। কঠিন মুখে বসে আছে মজুমদার। রাত দীর্ঘতর হয়। দেয়ালে ঠেস দিয়ে অপলক চেয়ে আছি। স্যালাইনের ব্যাগ বদলে দিচ্ছে মন্টু। ভীষণ স্পন্দনহীন বাবার দেহ। দুটো টিকটিকি লেজ নাড়ছে অনেকক্ষণ ধরে। একটি নাড়ছে, থেমে গেলে লেজ তোলে অন্যটি। অসীম ধৈর্য এদের। কঠিন চোখে পর্যবেক্ষণ করি। জেগে উঠেও এত সময় নেয়! মরার মতো পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

আছে স্থির। মাঝে মাঝে লেজের উত্থান-পতনে অশ্লীল ইঙ্গিত। দীর্ঘসময় পর একটি খেপে যায়। অন্যটিকে দ্রুত কামড় দিয়ে ছুট লাগায়। অনেক দূর। সেখানে বেশি অন্ধকার। দৃষ্টি প্রসারিত করি। পেছনে অন্যটি। সেখানেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। লেজ নাড়ার ক্রীড়া-কৌশল অব্যাহত। হাঁপিয়ে উঠি। ভয়ংকর কুটিল মুখের মজুমদার বাবার মাথার কাছে স্থির। কেবল অস্থির রানু। হাঁটছে ঘরময়। এক সময় আমার চোখ আবারও ওপর দিকে চলে যায়। অসম্ভব সুসংলগ্ন হওয়ার পরও মেয়ে-টিকটিকিটা পুনরায় ছুট লাগিয়ে, দূরে। বাবা শুয়ে আছেন জীবন-মৃত্যুর মাঝখানের শয্যায়। হারিকেন নয়, চারপাশে জ্বলছে পঞ্চপ্রদীপের শিখা। বল্গাহীন অশ্বের মতো আমার বিপরীত ভাবনা ছোটে। আমার কপালে সিঁদুরের রেখা... কাঁধে রুদ্রাগ্নিবীণা... কন্যা তুমি কে? কলাবতী কন্যা আমি, মেঘবরণ কেশ/তোমার পুত্র পাঠাও যদি কলাবতীর দেশ।

পঞ্চপ্রদীপের ভাঁজ খুলে নীচে নেমে আসি। চারপাশে দাউদাউ মরুবালির ঝড় কিন্তু এ-কী, সমুখে বানর কেন? কোথায় সেই সুপুত্র রাজকুমার? মহিম একাগ্রচিত্তে কার মুখ আঁকছে? আমার চরণের আলতা স্পর্শ করে যে পুরুষ... তার সারা দেহে সুচ কেন? পরনের লুঙ্গি খুলে ঝাঁপ দেয় রেজাউল। কুড়মুড় করে খাই অজিতের মুন্ডু, কুড়মুড় করে খাই কুসুমের পিণ্ডি।... এ-কী! কুসুমের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে মানবশিশু। হায়! ডিম ভেবে আমি তাকে খেয়ে ফেলেছি! ছিদ্র দিয়ে উঁকি দেয় কে? মাগো কী বিশাল শঙ্খচূড়। দৃষ্টি প্রসারিত করি। নখরামো শেষ! এখন দেয়ালে একটা টিকটিকি অন্যটির সাথে সঙ্গমে লিপ্ত। মার সাদা মুখ জলহীন। অন্ধকার ফুঁড়ে ডাইনির মতো মজুমদার দাঁড়িয়েছেন। স্বল্প তেলের বদ্ধতায় পড়ে ছটফট করছে প্রদীপ শিখা। দপ! দপ! দপ! মধ্যরাতে বাবার মৃত্যু ঘটে।

এরপর আরও দু-মাস পেরিয়ে যায়। এই দু-মাসেও আমার জীবনে সেই সাবেকি দারিদ্র্য, ঘিনঘিনে বাস্তবতা নিরন্তর আমাকে খুঁড়ে গেছে। মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলি। কোনো কিছুর তল খুঁজে পাই না। এতদিন বলতে গেলে একাই ছিলাম। আমাদের পরিবারটা ছিল আমার মুমূর্ষু স্মৃতির মধ্যে। কিন্তু বাড়ি থেকে ফেরার পর তাদের সমস্ত চাপ এখন বাস্তবিক অর্থে আমার গভীর এক দায়িত্ববোধের আওতায়। নিজেকেই প্রশ্ন করি, আর কত পারা যায়? তবুও, এড়ানো তো যায় না। আমার মধ্যে জীবনযুদ্ধ ছাড়াও ছিল একচিলতে নিজস্ব একটা পৃথিবী। কিন্তু সেই পৃথিবীর সবকিছু খসে পড়তে থাকে ক্রমশ। এখন সারাক্ষণ কেবল এক দিকেই কেন্দ্রীভূত সমস্ত চিন্তার জট—অর্থ। এই দু-মাস বেতন পেয়ে প্রথম হপ্তায়ই এক হাজার টাকা করে পাঠিয়ে দিয়েছি বাড়িতে। তারপর বাড়ি ভাড়া দিয়ে ঝাড়া হাত-পা। শানুর কাছ থেকে কিছু নিয়ে, সংকোচ কাটিয়ে বড়ুয়াবাবুর কাছেও হাত পেতেছি। আমার বিয়ের আংটিতে এতদিন হাত পড়েনি। গতকাল সেটাও বিক্রি করে দিয়েছি। আমার বৈবাহিক সম্পর্কের শেষ চিহ্নটাও ধুয়েমুছে গেল। কিছু লোন শোধ করে বাকি টাকা দিয়ে পাঁচ কেজি চাল, এক কেজি ডাল, একটা সাবান, এক কেজি আলু, এক কেজি চিনি, ব্যাস, টাকা শেষ। শানুকে অনুরোধ করি, 'তোমাদের সাথে এক সাথে খেয়ে পোষাবে না আমার, কয়েকটা মাস আমার রান্না আমিই করব। তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই।'

শানু বিস্ময় প্রকাশ করে, 'আমি বুঝছি না, তাতে করে তোমার লাভ কী হবে! একা খেলে খরচ হবে না?'

'সে হিসেব তুমি বুঝবে না। প্লিজ, ক-টা মাস আমি আমার মতো করেই চলি। কিছু মনে কোরো না লক্ষ্মীটি।'

আসলে গতমাসে বলতে গেলে তাদেরকে খাওয়ার টাকা দেওয়াই হয়নি। যা দিয়েছি তাতে করে মাসের সাত কি দশদিন মাত্র খাওয়া চলে। তারপর খুচরোখাচরা কিছু দিয়েছি। এই নিয়ে আমার অস্বস্তি আর গ্লানির সীমা নেই। এমনিতেই বেচারি নিজেই থাকে হাজারো সংকট আর টানাটানির মধ্যে। ইদানীং কামালভাইও কেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বোহেমিয়ান হয়ে উঠছে। আজকাল মাঝে-মধ্যেই রাতে বাড়ি ফেরে না। বলে, অন্য কাজের ধান্দা করছে। যদি একটা মুদির দোকান দেওয়া যায়। এর সাথে রাতে বাইরে থাকার কী সম্পর্ক, চোখ আর নাকের জল এক করেও শানু এর তল খুঁজে পায় না। এত কিছুর পরেও নিজের স্বামীর চরিত্র যে নির্দোষ-নির্মল, সে কথা বলে ও সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চায়। বলে, বাচ্চা না থাকলে পুরুষদের কোনো ঘরের টান থাকে? তারই-বা কী দোষ! সে তো এসব না করে আর একটা বিয়েও তো করে ফেলতে পারত। আসলে মানুষের নিজেকে বাঁচানোর কী অদ্ভুত সব কায়দা! বিশ্লেষণ করতে গেলে অবাক হতে হয়। জানালার একটা পাট বন্ধ হয়ে গেলে কী দ্রুত সে অন্য পাট খুলতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়ে! এ নিজেকে স্বস্তির মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার ফাঁকিভরা কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। নিজেকে নিজের কাছ থেকে, অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার সহজতম পথ। এসবের মধ্যে আমিও তাদের কাছে একটা বোঝা হয়ে উঠছি। এতদিনের আন্তরিকতা, মায়া, এখনও তাই ভাগাভাগি করে আছি। কিন্তু ক-দিন? আমারও তো আর এভাবে চলে না।

পুরো ঢাকা শহর জুড়ে এখন এক উত্তেজনা, এক ভয়, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি আসন্ন? পত্রিকার কাটা কাটা হেড লাইন বুক হিম করে দেয়... 'পরিস্থিতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও... বুশ'। 'ট্রিগারে আঙুল। যুদ্ধের জন্য দুই পক্ষ মুখোমুখি'।

এছাড়াও কিছুদিন আগে থেকে শুরু হওয়া লাগাতার হরতালের খিতানো জের এখনও চলছে। বাড়ি থেকে হরতাল জেনেও ঝুঁকি নিয়ে ফিরে এসে কি বিপর্যস্ত অবস্থাতেই না পড়েছিলাম! একদিকে বাবার মৃত্যুজনিত কারণে বাড়ি থাকতে হল ক-দিন, অন্য দিকে অফিসের টেনশন। আরেফিন সাহস দিল, স্টেশনে নেমে গেলে অন্তত একটা রিকশাতো পাবই। সকাল-সন্ধ্যা হরতাল। স্টেশনে নেমে দুজন বোকা বনে গেলাম। ধু ধু ঢাকা শহর। রিকশাগুলো সব সার বেঁধে ঘুমুচ্ছে। কী আর করা, লাগেজপত্তর নিয়ে দুজন হাঁটতে শুরু করি... হাঁটতে হাঁটতে... এ এক মজা, শূন্য নগরীর এ রাস্তার আমেজই আলাদা। তবে আমি বেশ হাঁপিয়ে উঠছিলাম। বড়ো ব্যাগটা আরেফিন নিজে নিয়ে তাড়া দিয়ে আমাকে টেনে নিচ্ছিল। হঠাৎ লক্ষ করি, একটি বিশাল মিছিল এগিয়ে আসছে। মিছিলের সামনে পুলিশের কর্ডন। স্পষ্ট টের পাই, আরেফিন উত্তেজিত হয়ে উঠছে। আমি ওর হাত চেপে ধরি। স্লোগানের শব্দ বাড়ছে। সার সার পুলিশ। মিছিলটাকে কাছে দেখে আমার ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। এত বিশাল। আমি হাঁ হয়ে ফুটপাতের ওপর গিয়ে দাঁড়াই। মুহূর্তে মিছিলের ভেতর থেকে কে একজন বেরিয়ে—'শালা আরেফিন তুই হাওয়া খাচ্ছিস', এই বলে সুটকেসসহ আরেফিনকে ভিড়ের মধ্যে টেনে নেয়। তখনই ঘটে ঘটনাটা। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। সাথে সাথে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ঝাঁঝের মধ্যে পড়ে যাই। হতবিহ্বল হয়ে আরেফিনকে খুঁজি। কিন্তু পুলিশ ততক্ষণে গ্যাস শেল ছুঁড়ছে। তারপরও মিছিলকে ঠেকাতে পারছে না। ধোঁয়া, চিৎকার, দু-চোখে টিয়ারগ্যাসের ঝাঁঝালো ঝাল! খেই হারিয়ে দিগবিদিক ছুটতে থাকি। এর মধ্যে হঠাৎ একটা গুলির শব্দ যেন আমার হৃৎপিণ্ডের ওপরে এসে পড়ল। পাগলের মতো দৌড়ে এক জায়গায় এসে দেখি, রক্তমাখা দুজন যুবককে পুলিশ দিব্যি তাদের গাড়িতে ভরে মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল। কিছু দূরেই বিক্ষুব্ধ জনতার রোষের শিকার একটা লাল টয়োটাকে দাউদাউ পুড়তে দেখি। নাক-মুখ প্রচণ্ড যন্ত্রণায় জ্বলছে। সেদিন পায়ে কী ভর করেছিল, চোখে গ্যাসের আঁধার নিয়ে কীভাবে যে দরজায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম, ভাবলে এখনও স্বপ্নে দেখা দৃশ্য মনে হয়। আমার শীতার্ত বুকে পা ফেলে তারও দু-ঘন্টা পর সুটকেস বুকে চেপে ধরে আরেফিন আসে, উশকোখুশকো মুখ, হতচকিত ভঙ্গি, আমাকে দেখে সে যেন প্রাণে জল ফিরে পায়—'সাব্বাশ বালিকা... অক্ষত আছ তাহলে!' এইভাবে ঢাকা শহরের উত্তেজিত বুকের প্রান্তর জুড়ে আমার উদ্ভ্রান্ত দিন কাটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

গত দু-মাসের মধ্যে তিনদিন গিয়েছি ইরফান চাচার বাসায়। একমাত্র ওখানে গেলেই আমার বেঁচে থাকার অর্থ কিছুটা হলেও আবিষ্কার করতে পারি। সামান্য সময়ের জন্য হলেও এইসব জঘন্য হিসেবনিকেশ, হাঁপ-ধরা-বাস্তবতা থেকে মুক্তি পাই। মনে আছে, বাড়ি থেকে ফেরার পর আমি যখন চরম বিপর্যস্ত, বাবার মৃত্যু, রানুর যন্ত্রণা, মন্টুর বখে যেতে থাকা, মার নিষ্পলক ঠান্ডা মুখ... মগজের ভেতরে এইসব দুঃসহ বিষয় দাবড়ে বেড়াচ্ছে, তার মধ্যেই টানা অফিস, টাকাকড়ির চূড়ান্ত টানাটানি, তখন কী এক টানে ছুটে গিয়েছিলাম ও বাড়িতে। সেখানকার নিস্তব্ধতা, ইরফান চাচার চিরকালীন স্থিরতা, আমাকে ঠেসে ধরেছিল ভয়ানকভাবে। বলতে গেলে গিয়েই বাসায় ছুটে আসার জন্য পা বাড়িয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'বোসো।'

বসে উসখুস করছি, জানতে চাইলেন, 'ছবি আঁকা শুরু করেছ?'

'না', আমি রীতিমতো খ্যাপাটে ভঙ্গিতে বলি, 'আমার জীবনে হাজারো কাদার ঘাঁটাঘাঁটি, আমার ওসব হবে না।'

'হলে এর মধ্যেই হবে।' তাঁর ঠান্ডা দৃষ্টি আমার ওপর বিদ্ধ, 'এত ছটফট করছ কেন? সুস্থির হয়ে বোসো।'

'আপনি ভাগ্যবান, সুস্থিরতা কেনার ক্ষমতা রাখেন, গাড্ডায় পড়া মানুষকে রঙ-তুলির রঙিন স্বপ্ন দেখাতে পারেন', কী এক জেদ থেকে একনাগাড়ে বলে যাই, 'ছবি আঁকা আমাকে দিয়ে হবে না। আপনি দয়া করে এ-বিষয়ে আর কিছু বলবেন না।' তিনি ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে আশ্চর্য শিথিল হাতে ওলটাতে থাকেন। আমি হনহন হেঁটে তাঁর বাসা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। তিনি একটি কথাও বলেননি।

রাতে ইজেলে শিট চড়াই। রঙের লিনসিটে তুলি ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি দীর্ঘক্ষণ। একসময় অবসাদে নুয়ে আসতে থাকে শরীর। এভাবে অনেকক্ষণ। ক্রমশ ঝিমিয়ে আসি। ছাদে হা-হা শূন্যতা। সব গুটিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়ি।

তারপর নিজেকে বিন্যস্ত করে আরও দু-দিন তাঁর বাসায় গেছি। গেলে হাজারো তর্ক হয়। মানুষের প্রবণতা, বৃদ্ধি, সামাজিক অস্থিরতা, তাঁর নিজের জীবন নিয়েও বিস্তর আলাপ। কীভাবে সংঘাতে সংঘাতে বেড়ে উঠেছেন, এই সব। কিন্তু ছবি আঁকা বা শিল্পচর্চা নিয়ে কোনো কথা হয় না। আমিও বলি না। আমার পক্ষে সম্ভব হলে আঁকব, নইলে না। কিন্তু এই একটি ব্যাপারে ইরফান চাচা আশ্চর্য নাছোড়। খাওয়া, ঘুমানোর চিন্তা না থাকলে নিজের জন্য আঁকার বিষয় নিয়ে ভাবা যেত। আমার জীবনে সেই আরাম কই?

তিনি বলেন, 'নীনা, কখনো শান্তিনিকেতনে গেলে রামকিংকরের মূর্তিগুলো দেখো। স্কাল্পচারের কী অদ্ভুত ফর্ম... সবগুলো মূর্তি দাঁড়িয়ে, কোনো পেলবতা নেই, নিরেট কালো, মনে হয়, সব হাড় পুড়ে গেছে। মানুষ আকৃতির ছাই দাঁড়িয়ে আছে। নীনা ভাবতে পারবে না'—তাঁর ধৈর্য দেখে এইবার হেসে ফেলা ছাড়া আমার কিছুই করার থাকে না।

সালাহদিন রিলিজড্ হয়েছে শুনেছি। যাওয়ার দায়িত্ব বোধ করছি। কিন্তু ভেতর থেকে তাগিদ অনুভব করছি না। আরেফিন শহরতলির কোনো একটা হাইস্কুলে চাকরি পেতে যাচ্ছে। কথাবার্তা হয়ে গেছে। মাস পয়লা জয়েন করবে। সেখানে নাকি বিস্তর টিউশানির সুযোগ। কিন্তু তাতে করে তার নিজের ক্লাসের ক্ষতি হবে বলে ও নিয়ে আপাতত সে ভাবছে না। পাসের ব্যবস্থা নাকি হয়ে যাবে।

সত্যজিৎ, রঞ্জু কারুর সাথে অনেকদিন ধরে যোগাযোগ নেই। অফিস থেকে বাসায় ফিরে ছাদের দিকে স্থির চোখ রেখে শুয়ে থাকি। শুরু হয় চিরকালীন স্নায়বিক যুদ্ধ—কেন আমার জীবনে সুন্দর কোনো রূপান্তরের ক্ষীণ স্বপ্নটুকুও নেই? তার চেয়ে তলিয়ে যাই না কেন? আমাকে ফেলে দেওয়া হোক ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত কোনো সাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

তলার নীচে। একটা পা ঢুকে আছে পাথরের স্তূপে, টেনে বের করতে পারছি না। মাথায়, চারপাশে সর্বত্রই ভাঙা দেয়াল। এক চিলতে আকাশ নেই। ফিকে রৌদ্রের কণামাত্র নেই। আহার, আলো আর বাতাসবিহীন কাতরে-কাতরে এক সময় ঝিমিয়ে আসব। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে-করতে মরে যাব। এই রকম একটা মাঝামাঝি অবস্থা। ফাঁক-ফোকর দিয়ে এক টুকরো আকাশও দেখবো, ওড়ার বাসনাও বুকের মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে, কিন্তু কিছুতেই সেদিকে হাত পর্যন্ত বাড়াতে পারব না। এর চাইতে সেটা ঢের সুন্দর বাঁচার হবে।

তার চেয়ে দেয়াল তুলে ফুটোটা বন্ধ করে দিই না কেন? কিছু দেখব না। সৃষ্টি হবে না কোনো আকাঙ্ক্ষা, ভুলে যাব আকাশের চেহারা।

কী অসম্ভব প্রত্যাশা নিয়ে সংসার শুরু করেছিলাম। তার ভেতর থেকে আমি নিজেই তো বেরিয়ে এসেছি। কিছুটা আপস করে, নিজেকে সংসারের খাপ মতো তৈরি করে কাটিয়ে দিতে পারতাম একটি জীবন। দেশের বেশির ভাগ মেয়েইতো এর চাইতে ঘিনঘিনে জীবনযাপন করছে। স্বামী লাথি দিয়ে বের করে না দেওয়া পর্যন্ত তার ভেতর থেকে তারা বেরোয় না। আমার পায়ের তলায় বেঁচে থাকার মতো এমন কী ভিত আছে? না পারিবারিক অবস্থা, না পড়াশোনা, কোনো দিকেই আমার পরিচয় দেওয়ার মতন অবস্থা নেই। অনার্সটাও শেষ করতে পারিনি, কোন অহংকারে লম্বা ঠ্যাং ফেলে সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছি? কিন্তু তারপরও আমিই তাকে ডিভোর্স দিয়েছি। কোন সচেতন উপলব্ধি থেকে এর উৎপত্তি? কোত্থেকে পেয়েছি সেই সাহস? বিনিময়ে কি তার দেখা পেয়েছি, সংসারে থাকতে কিছুতেই যাকে স্পর্শ করতে পারছিলাম না? সেই একই জীবনেরই তো পুনরাবৃত্তি। একই যুদ্ধ। তবে?

একই যুদ্ধ কী? এবার আমি অন্য পথ ধরি। আমার সেই অসীম যন্ত্রণাগুলো? পাশাপাশি থেকে জটিল মানসিক পীড়ন? তার থেকে বেরিয়ে আসিনি? রাত এলেই একজন লোক, যার গভীর অর্থে কোনো সুখ কিংবা দুঃখবোধ নেই, বিছানায় এসেই পুরুষত্ব জাহির করার খেলায় খেপে উঠত, জীবনে যার আর কিছুই চাওয়া-পাওয়ার স্বপ্ন ছিল না, দিনমজুরের মতো কাজ শেষে মাংসের একটা দলার ওপর নিজেকে যে নিঃসাড় করে দিতে চাইত। তখন আমি আনন্দে কি কষ্টে আছি তার হুঁশ নেই, আমি যেন স্রেফ মাটির দলা—এমনভাবে ফেলে আছড়ে খেতে চাইত। দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকতাম। তারপরও তৃপ্তি নেই, রাতভর ছটফট করত। কী অসহ্য দৃশ্য! ভাবলে এখনও রক্ত জল হয়ে যায়। বাইরে থেকে প্যান্ট-শার্ট পরা ভদ্র সুস্থ যুবকটির ঘরে ফিরতেই কী ঘিনঘিনে রূপ, যেন সে টয়লেটে ঢুকেছে। এখানে কোনো সৌন্দর্যের প্রয়োজন নেই। প্রথমে পোশাক খুলেই হাঁটুর ওপর অবদি ওঠানো খাটো লুঙ্গিটা পরত। ফ্যানের বাতাসে পোষায় না, ভুঁড়ি মেলে দিয়ে কী বিচিত্র প্রক্রিয়ায় তালপাতার পাখায় বাতাস খেত! এবং কী দুর্বিষহ, রাতে আমি ঘরের দরজা বন্ধ করলেই টান দিয়ে সেই ত্যানাটিও খুলে ফেলে এমন ভঙ্গিতে এগিয়ে আসত, যেন কুস্তিতে নামছে। হাঁ হয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে রাখতাম। কী ভয়ানক, কুৎসিত একটা নগ্ন পশু...। এ নিয়ে কখনও ঝগড়া, খিস্তি, কখনও নিজের মমতাময় দেহটার ওপর সেই পশুটাকে দাবড়াতে দেওয়া। জীবনকে এইভাবেই গ্রহণ করেছিলাম। দাম্পত্যজীবন আমাকে শিখিয়েছে, দুটি নরনারীর দৈহিক সম্পর্ক মানে গলায় বিষ চেপে একটি সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা। ক্রমে আমিও এসব কিছুকে সেভাবেই নিতে শুরু করেছিলাম। তারপরও মাঝে মাঝে হিস হিস করে উঠতাম। 'লজ্জা হয় না তোমার? এই রকম কুৎসিত সব ভঙ্গি! ছিঃ, আমাকে মানুষ মনে করো না!'

'স্ত্রীর কাছে লজ্জা'... হা হা শব্দে হাসত সে। 'তুমি দেখছি একটা মানসিক রোগীতে পরিণত হচ্ছ।'

দীর্ঘদিন এইভাবে গেছে। কী অদ্ভুত বিকারগ্রস্ত লোকটা! কী অদ্ভুত তার স্বভাব! দিনের হিসেবি, ঠান্ডা মেজাজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

মানুষটাই রাত এলে কী দ্রুত পরিবর্তিত! কখনও চুলের গোড়ালি শক্ত হাতে চেপে ধরে, কখনও বিছানা থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে, তারপরও কী অতৃপ্তি! ছটফটানি! আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না এই অতৃপ্তির গূঢ় অর্থ। মাঝে-মধ্যে তুলকালাম সব কাণ্ড বেধে যেত। দাপটে গলা চড়াতাম কখনও, 'স্রেফ পশু, কুত্তা, আমাকে এভাবেই এদিন মেরে ফেলবে তুমি!' কিন্তু তাতেও সে দমে যেত না। এসব কারণে কোনোদিন তার ইচ্ছের মৃত্যু ঘটেনি। বিড়বিড় করত, 'অসুস্থ! নইলে পুরুষের স্পর্শে কোনো মেয়ে এমন নিথর হয়ে থাকে? তুমি দেখছি আমাকে বেশ্যাপাড়ার দিকে ঠেলে দিয়ে ছাড়বে। তুমি নিজে অসুস্থ, তোমাকেই ডাক্তার দেখানো দরকার।' কিন্তু ওই দরকার পর্যন্তই, ডাক্তার দেখানোর সাথে অর্থ নামের যে জটিল বিষয়টি সম্পর্কিত, তার প্রতি তার ছিল অসীম মমতা। বলতে গেলে সংসারের প্রতি আমার চরম বীতশ্রদ্ধ হওয়ার পেছনে তার চরিত্রের সেই দিকটাই প্রধানত দায়ী। অসম্ভব কৃপণ ছিল সে। অর্থের প্রতি প্রবল প্রেম ছিল তার। আবার সেটা উপার্জনের ব্যাপারে ছিল চরম আলসেমি। উপার্জন বাড়ানোর চিন্তা না থাকলেই যে একজন লোক স্ত্রী-সহবাস করবে না, এমন চিন্তাকে কখনোই আমি সুস্থ মনে সায় দিইনি। কিন্তু একজন লোক, তার যা কামাই, সেই অনুপাতে ন্যূনতম খরচটাতো সংসারে করবে? অফিস থেকে ফিরে প্রথমেই আমার দিকে পিঠ দিয়ে পকেটের টাকাগুলো বের করত। এক টাকার গণ্ডগোল হলেও হিসেব করে-করে রাত পার করে দিত। এদিকে আমার হাতে মাত্র বিশটি টাকা ধরিয়ে দিয়ে সকালেই উধাও হয়ে যেত। ঘরে কোনোদিন শুকনো বাজার মজুত থাকেনি। এই বিশ টাকায় চালাও দু-বেলা। সম্ভব? নয়-ছয় করতে-করতে রাতে আমার মাথা খারাপ হওয়ার দশা হত। রাতে তাকে হিসেব করতে দেখে দৈনিক খরচাপাতির ফিরিস্তি দিতেই, তিলমাত্র দেরি না করে সে টানটান হয়ে উঠত, 'দাও হিসেব, কেন চলেনি?' তো পাই পাই করে হিসেব দিতাম। 'ঘরে চাল ছিল। দুপুরে কোয়াটার কেজি আলু কিনেছি দেড় টাকায়। তেল কোয়াটার লিটার আট টাকা। কোয়াটার কেজি ডাল সাত টাকা। চিনি কিনেছি সাড়ে তিন টাকার। তারপরও চা-পাতা পটের তলানিতে, পেঁয়াজ, রসুন, মাছ, তরকারি কিচ্ছু নেই। পেঁয়াজ পাশের বাসা থেকে ধার করেছি। দুপুরে আলু ভর্তা ডাল খেয়েছি, রাতে তাই।'

'একটু মুশকিলই হল'—তখন তাকে চিন্তিত দেখাত। 'একটু সহ্য করে চলো নীনা, যে টাকা পাই তাতে কষ্ট করে না চললে দু-দিন পর তো সংসার ছেড়ে পালানো ছাড়া আমার কোন পথ থাকবে না।' নিজেকে একসময় শান্ত করে আনতাম। তার এই অপারগতার অন্য মানে করে ক্ষিপ্ত হওয়ার কোনো মানে হয় না। কিন্তু বদ্ধ ঘরে একাকী সারাদিন কাটিয়ে বিকেল হলেই এক-একদিন অসম্ভব হাঁপ ধরে যেত। এমন একটি দিনও সেই তখন আসেনি, যেদিন সে তার সামর্থ্যের ওপর ভর করে নিজের থেকেই বলতে পারত, একটু বাইরে যাই চলো। আমি যখুনি বলেছি, তখুনি শুরু হয়ে যেত রিকশা ভাড়ার নয়-ছয় হিসেব। কত মিষ্টি করে কতবার সে হিসেব আমাকে বুঝিয়েছে, 'বিশ্বাস করো নীনা, ঢাকায় রিকশার ভাড়াই সব। এখান থেকে ক্রিসেন্ট লেক পাক্কা আট টাকার রাস্তা। তারপর ফেরার ব্যাপার আছে। গিয়ে কিছু না খেয়ে তো মুখ বুজে বসে থাকবে না। আর বাস? ওটা দিয়ে পাগল ছাড়া কেউ বউকে নিয়ে হাওয়া খাওয়ার প্রোগ্রাম করে?' এই নিয়ে সত্যজিৎ অনেক টিটকারি দিয়েছে। সে গা করেনি। আমার মতন শহর-দাবড়ে-বেড়ানো একটা মেয়ে তখন স্রেফ একজনের আপোসকামী স্ত্রী। স্বামীর সামর্থ্যের দিকে হাঁ করে কাটাও প্রতিটা মুহূর্ত। নিজের ওপরই ঘেন্না ধরে যেত। একদিন সত্যজিৎ প্রস্তাব দিয়ে বসল, 'তুই একটা চাকরি নে না।' এ ব্যাপারে রেজাউলের ছিল সাফ জবাব, 'নারী স্বাধীনতায় আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু চাকরি নেওয়ার আগে অনার্স শেষ করতে হবে। আগে তার চেষ্টা করো।'

অবশ্য আমার কিছু স্বাধীনতার ব্যাপারে তার কোনোরকম গোঁড়ামি আমি দেখিনি, বেশিরভাগ সংসারে যেটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। আমি তো প্রায় সংসারেই দেখেছি বিয়ের পর একজন মেয়ে তার ছেলে ক্লাসমেটকে বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিতেও আড়ষ্টতা বোধ করে। কিন্তু ওর বন্ধুরা আমাকে নাম ধরে তুই-তোকারি করত। তার চরিত্রের এইসব স্ববিরোধিতা আমাকে অবাক করে দিত। অনেকদিন খালি বাসায় সত্যজিৎ আর তার অন্য বন্ধুরা এসেছে। সে এসে দেখেছে আড্ডা দিচ্ছি। পরে সে নিজেও এসে সেই আড্ডায় শামিল হত। কিন্তু স্বাধীনতার বিস্তার কি অত ছোটো জায়গাকে ঘিরে? আমি হয়তো একা কোথাও গেলাম, হেঁটে এলাম অনেক পথ, হয়তো বাসায় এসে রেজাউল দেখল, আমি বাইরে। ফিরে এলে সে এ-নিয়ে বেশি প্যাঁচট্যাচে যেত না। প্রথমেই জানতে চাইত বাইরে যাওয়ার খরচ কোথায় পেলাম। এজন্যই কোথাও যাওয়া হত না আমার। আর অনার্স পড়ার ঝক্কি-ঝামেলার শেষতো আর আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয়। তার সঙ্গে কত রকমের ফ্যাসাদ—ভর্তি হও, তারপর মাসের বেতন, পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ করো—এইসব হেনতেন কত কিছু। রেজাউল তো এসব ব্যাপারে একদম নির্বিকার।

স্বাধীনতা সে দিয়েছিল, কিন্তু তার বিস্তার রোধ করার শেকলও তার হাতেই ছিল। তাই, তখনও একই ঘটনা। চিলতে খিড়কির ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখো মেয়ে, কী সুন্দর আকাশ বাইরে, পারলে ওড়ো।

সেই মানুষ। ঘরে ঢুকে কোনোদিন একটা চুমু না, রোমাঞ্চময় স্পর্শ না, কেবল হিসেব। না হলে পড়ে থাক ভাঙা ফ্যানটি নিয়ে। অথবা খোঁচাও ফিউজ হয়ে যাওয়া বালব। আর বিছানায় এসেই ভয়ংকর দাপট, যেন সারাদিন রাজ্য জয় করে এসেছে। তারপরও বোকার মতো তার প্রশ্ন, 'তোমার ভালো লাগে না?'

'না, না, না। আর কতবার বলব!'

'তুমি একটা গণ্ডার নারী, তোমার মতো একটা বরফের দলাকে বিয়ে করেছি, এ আমার দুর্ভাগ্য। আমার সেক্সের তুখোড় ভূমিকার কোনো মূল্যায়নই হল না। তোমার জায়গায় অন্য মেয়ে হলে সেন্ট পার্সেন্ট বর্তে যেত।'

'তাহলে অন্য মেয়েকে নিয়ে চালাও না কেন সেক্স এক্সপেরিমেন্ট?'

'ওই একটি অভ্যাসই নেই, থাকলে কি এত লাথি খেয়েও অমন ছোঁকছোঁক করি?' তার এমন স্বীকারোক্তিতে আশ্বস্ত হতাম বেশ, বলতাম, 'তুমি একটু নরম হও। বিশ্বাস করো, আমার অসহ্য লাগে। ইচ্ছে করলে স্বাভাবিক উপায়েই ব্যাপারটাকে সুন্দর করা যায়।'

'যে সুন্দর বোঝে, সে এতেই সৌন্দর্য খুঁজে পাবে', রেজাউল বলত। 'এইভাবেই আমার ভালো লাগে। তুমি বলো পশুত্ব, এসবে যত বেশি পশুত্ব, ততই তার মজা। আমার কষ্ট, তুমি সেটা বুঝলে না।'

এরপর আর তর্ক করার স্পৃহা থাকত না। পাশাপাশি লোকটার ঘরের টান, অফিসের বাইরে কোথাও একটু সময় কাটায় না, মদের আড্ডায় যায় না, নারী বলতে সে একমাত্র আমাকেই বোঝে, আমাকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে পারছে না বলে মাঝে মাঝে তার হতাশা—এসব বুঝিয়েই নিজেকে সুস্থির রাখার চেষ্টা করতাম।

সংসার যাচ্ছিল এমনই এক ছন্দে। একঘেয়ে একতালে। একদিন তার এইরকম বিকৃতির অন্য এক রূপান্তর আবিষ্কার করি। দেখি, টেবিলে একটা ম্যাগাজিন। পৃষ্ঠা ওলটাতেই কিছু কিশোরের ছবি। নগ্ন। নারীর মতোই তারা কোমল, পেলব। রেজাউলকে প্রশ্ন করায়, বলল, 'তোমাকে দেখানোর জন্যই এনেছি, কেমন এরা? আকর্ষণ ফিল করো?'

'কী বলছ তুমি', আমি খেপে উঠি, 'কী বাচ্চা ছেলে!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘তুমি এদের সৌন্দর্য সম্পর্কে জানোই না—কেমন রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসে সে, ‘তথাকথিত পৌরুষ, এসবে নিশ্চয়ই মুগ্ধ তুমি?’ আমি কেমন কাঁপতে থাকি, আমার চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসে। ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করি, ‘কী বলতে চাইছ তুমি স্পষ্ট করে বলো।’ সে তখন অভিনব কায়দায় প্রসঙ্গ পালটায়, ‘কিছুই না। কী সুন্দর সব যুবক, এদের তুমি বাচ্চা বলছ! কতটা মুরুবিব হয়েছ, সেটাই লক্ষ করছিলাম।’

সেই থেকে আমার নতুন যন্ত্রণা শুরু। আমি গভীরভাবে তাকে পর্যবেক্ষণ শুরু করি। কেন, আমাকে উলটেপালটেও লোকটা ঠিক তৃপ্ত নয়? সত্যজিৎ রঁদ্যার একটা জীবনী দিয়েছিল আমাকে, যার মধ্যে কিছু ন্যুড স্কাল্পচারের ছবি আছে। বইটি উলটেপালটে উত্তেজিত হয়ে আমাকে বলেছিল, ‘দেখেছ, পুরুষদের ন্যুডগুলো, কী অদ্ভুত এদের কাঠামো, না?’

আমার মাথায় তখন দাবাগ্নি। কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট সূত্র আবিষ্কার করতে না পেরে তাকে জুতমতো আক্রমণও করতে পারছি না। তখনই প্রথম মনে হল, দেখতে হাবাগোবা হলেও অসম্ভব ধূর্ত সে, উত্তেজিত হয়ে আমাকে বলেছিল, ‘এখনও আমি তার চুলের ডগার নাগালও পাইনি।’

প্রচণ্ড অস্থিরতার ভেতর দিয়ে আমার দিনগুলো কাটতে থাকে। একদিন রাতে, দুজনই নিঃশব্দে বিছানায় শুয়েছিলাম। পুরো ঘরে অন্ধকার বিছানো। আমি আমার শিথিল হাত তার ঊরুতে রাখি। নিজেকে বোঝাই, ভুল পুরোটাই। আমার মানসিক অস্থিরতাই এর জন্য দায়ী। কেমন অন্যরকম গলায় জানতে চাই, ‘আচ্ছা, তোমার স্কুল বা কলেজজীবন সম্পর্কে আমার কিছুই জানা হয়নি। আজ তোমার স্কুল জীবন সম্পর্কে বলো না, শুনি।’ রেজাউল অবাক, ‘এতদিন পর তোমার সে সব কথা জানতে ইচ্ছে হল? আশ্চর্য মেয়েতো তুমি!’

‘এটাতো হতেই পারে’, আমি বলি, ‘জীবনের জন্য ওই অধ্যায়টার গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ আমরা কেউই কারুর সেই জীবন সম্পর্কে তেমন করে কিছুই জানি না।’

সে রাতে অনেক গল্প হয়। তার ছেলেবেলা, ধর্মভীরু কুসংস্কারাচ্ছন্ন ফ্যামিলির নিয়মের মধ্যে তার বেড়ে ওঠার বিস্তারিত কাহিনি শোনায় আমাকে। সে রাতেই আমি প্রথম জানি, সে ক্লাস ফাইভের পর থেকে হোস্টেলে ছিল। তার যে রুমমেট, সে ছিল অত্যন্ত বাজে স্বভাবের। অনেক বিকৃতি ছিল তার। যা হোক, হোস্টেলে থেকেই রেজাউল ম্যাট্রিক পাস করে।

‘তোমার সে বন্ধুর কী ধরনের বিকৃতি ছিল?’

‘আমরা ছেলেটাকে পছন্দ করতাম না, এটুকু মনে আছে। ম্যাট্রিক পাস করার পর থেকে শুরু হয় মেসের জীবন। বিএ পাস করা পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম।’

‘তোমার জীবনে তখনও কোনো মেয়ে আসেনি?’

‘মেয়েদের আমি ঘৃণা করতাম’—দৃঢ় কণ্ঠে বলে সে। ‘জানোইতো আমার কোনো বোন ছিল না। মাকে হারিয়েছি ছোটোবেলায়। তারপর হোস্টেল, মেস সব জায়গাতেই আমার চারপাশে ছিল ঝাঁকঝাঁক ছেলে। কেন জানি কৈশোর থেকেই আমার মেয়েদের পুতুপুতু কোমলতা দেখতে বাজে লাগত।

‘আশ্চর্য, এর মধ্যে আমাকে কী করে তোমার ভালো লাগল?’

‘অত গোয়েন্দগিরি কোরো না। তুমি খুব ডেসপারেট ছিলে, নমনীয়তা কম ছিল তোমার মধ্যে, এসবই আমাকে টেনেছিল। দেখো না, কেউ তোমাকে ভাবি ভাবি বলে গলে পড়তে চাইলে কেমন রাগ লাগে আমার? তুমি নীনা, স্ট্রং নারী, গোড়াতে এভাবেই চাইছিলাম, কিন্তু পরে জীবনের বাস্তবতা—যাক গে, এর বেশি কিছু বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পারব না।'

রেজাউল ঘুমিয়ে পড়ে। পুরো রাত আমার নিদ্রাহীন কাটে। কেন আমার মধ্যে এমন ভয় ঢুকল? সে অফিসে যাওয়ার পর দরজা-জানালা সব বন্ধ করে ভূতের মতো বসে থাকি। দিকভ্রান্ত অবস্থায় আরও সূত্র খুঁজতে থাকি। চষতে শুরু করি ভেতরের অলিগলি। তার আগের ও বর্তমান সব আচরণের পারম্পর্যহীনতা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে থাকি। কী অসহনীয় খচখচানি হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। তখনই আরও স্পষ্ট করে টের পাই, সে আমাকে নিয়ে সুখী নয়। আমাকে ছিঁড়ে নিংড়ে একাকার করে সে নিরন্তর সুখ পাবার চেষ্টা করে চলেছে। এই উপলব্ধি হওয়ার পর আমার গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে। আমাকে বিয়ে করা তার একটা স্রেফ নিরীক্ষা! আমি নিরেট গিনিপিগ! অসহ্য ঘৃণায় বিষিয়ে উঠি, রাতে সে হাত বাড়ালে বিদ্যুৎবেগে খাড়া হয়ে যাই। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মেঝেতে বসে থাকি। 'কী হয়েছে তোমার?' ঝাঁঝালো প্রশ্নে সে আমাকে ফের টেনে তোলার চেষ্টা করে। আমি শক্ত হয়ে বসে থাকি। সে মেঝের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে এমন ভঙ্গিতে এগিয়ে আসে, দেখে মনে হয় চারপেয়ে কোনো জন্তু। দাঁতে দাঁত চেপে ধরি। আমার পাশে শুয়ে আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে হঠাৎ সে বলে ওঠে, 'আমি ওসব ছেড়ে দিয়েছি।'

'কোন সব?'

'তুমি যা ধারণা করছ', সহজ স্বরে সে বলে, 'সে জন্যই মেস ছেড়ে দিয়েছিলাম। আসলে অদ্ভুত নেশা হয়ে গিয়েছিল। নেশাটা যে বাজে অনেক পরে সেটা টের পাই।'

'কতদিন আগে থেকে?' আমি কাঁপা গলায় প্রশ্ন করি, 'মানে কোন বয়সে প্রথম?'

'স্কুল জীবন থেকেই।'

'যদি বলি অভ্যাসটা তুমি এখনও ছাড়তে পারোনি?'

'তাহলে আমার কিছুই করার নেই', যেন দায় সারল, এমন ভঙ্গিতে ঠোঁট ওলটায় সে, 'আমি জানি তুমি টের পেয়েছ। আমার বলা দরকার মনে করলাম, বলে দিলাম। কীভাবে নেবে সেটা তোমার ব্যাপার।'

অবিশ্রান্ত কান্নায় মাঝরাতে নরম ঝিমুনি এসেছিল। আমি তখন নিশ্চিত ছিলাম, আমার থাকা-না-থাকায় রেজাউলের কিছু যায় আসে না। কোনো অনুতাপ নেই, গ্লানির কষ্ট নেই। নিরুত্তাপ মুখে ভয়াবহ কথাগুলো বলে দেওয়ার ছুতোয় সে তার সততার আনন্দে নির্ভার। যদি চেপে রাখত, আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করত অন্যভাবে, আমি বুঝতাম আমাকে সে ভয় পাচ্ছে, গুরুত্ব দিচ্ছে। এই বিষয়টাকে ঘিরেই আমি সংসার থেকে বেরিয়েও যেতে পারি। কিন্তু সে জেনে গেছে সেটা সহজ নয় আমার পক্ষে। সম্ভবত গেলেও তার কিছু যায় আসে না। অবশ্য পুরোটাই আমার আশঙ্কা। স্নায়ুর শিথিলতায় আমি ক্রমশ অবশ হয়ে আসতে থাকি। তখন, সেই মাঝরাতে আমাকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিজের দিকে ফেরায় সে, বলে, 'যদি না বলতাম, কী করতি তুই? অত ভড়ং ভালো লাগে না।' বলতে বলতে সেই একই খেলা। আমার শাড়ি ধরে টানতে থাকে এবং ক্রমশ নরম হয়ে এসে বলতে থাকে, 'তুমি বিশ্বাস করো, আমার কাছে এই সংসারটাই এখন বড়ো। কোনো কিছুর বিনিময়ে আমি একে হারাতে পারি না। তোমাকে বোঝাতে পারব না...।'

আমার চারপাশে তখন অপার অন্ধকার। দুর্দান্ত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে সে। আমি হাত দিয়ে হিংস্র ধাক্কায় তাকে ঠেলে দিই। তার এই বিবর্তিত নরম রূপ আমাকে আরও তীব্র ঘৃণার ফেনায় তলিয়ে দিচ্ছে। ব্যথায় টনটন করছে মাথা। অবিশ্রান্ত জলের ধারায় ফুঁপিয়ে উঠি। তেমন অর্থে প্রতিবাদ করার ক্ষমতাও আমার সত্তা থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

মরে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসতে থাকি। সে রাতে আমাকে ধর্ষণ করে অবসন্ন দেহে ঘুমিয়ে পড়ে আমার স্বামী।

সেইসব দুঃসহ স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে উঠতেই মাথার শিরা দপদপ করে।

শানু দরজা লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। আজও তার স্বামী ফেরেনি। মেঝে থেকে টাল সামলে উঠে দাঁড়াই। তারপর কী ঘটেছিল? সন্তান গর্ভে এল। ঢকঢক করে জল ঢালি গলায়। শূন্য ইজেল সটান দাঁড়িয়ে আছে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিই নীচে। নিজেকে ধাতস্থ করার চেষ্টায় তারপর বিছানায় উঠে বসি। তাকে বিয়ে করে যে আমার ভুল হয়েছে, তখন প্রায়ই আমার একথা মনে হত। আর্থিক সংকটের তীব্র যন্ত্রণাতো ছিলই। মেহমান আসলে ঘরে কিছু থাকত না বলে কতদিন অসুখের ভান করে পড়ে থেকেছি। সংসারের অতি প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার প্ল্যান হয়েছে হাজারবার, পরক্ষণেই তা বাতিল হয়ে গেছে। কখন বিপদ আসে এই আশঙ্কায় রেজাউল গোপন সঞ্চয় ঠিক রাখতে মাঝে-মধ্যে একবেলা উপোস দিত। তবু সে সঞ্চয়ে হাত পড়ত না। ভাবতে ভাবতে জেদে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠে পরক্ষণে নিজেকে আক্রমণ করি, এইসবে ঢুকে পড়ে আমি নিজেও কি ম্যাড়মেড়ে হয়ে উঠছিলাম না? লুঙ্গি চাঙ্গে উঠিয়ে বিকট অবস্থায় শুয়ে থাকত সে। আমিও কি উদোম পিঠ পেতে দিয়ে তাকে ঘামাচি খুঁটে দিতে বলতাম না? তবে তো স্বপ্নভঙ্গ তারও হয়েছিল। তার প্রতি আকর্ষণ হারিয়েছিলাম বলে তার স্পর্শ ছিল আমার জন্য যন্ত্রণাকর। ওইরকম অবস্থায় আমাকেও কি তার মনে হয়নি দলাদলা মাংস? তার মনে হয়নি, যে মোহগ্রস্ততায় সে আকৃষ্ট হয়েছিল একটা দাবড়ে-বেড়ানো তুখোড় মেয়ের প্রতি, সে তার স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়েছে?

অবশ্য আমার যে রূপান্তর ঘটেছিল, সে তো তারই অশিল্পিত আচরণের কারণে।

সে যদি বলে, আমি তার পছন্দ বুঝিনি, আমি নিজেও তার কাছে অশিল্পিত? ভাবতে চাই না আর। মাথা চেপে বসে থাকি। অসহ্য পীড়ন ভ্রূর দু-পাশে, কপালে। প্রায়ই এত ব্যথা হয়, রাতেই অধিকাংশ সময়, ফলে কেমন উন্মাদ দশা পেয়ে বসে। পায়চারি করি বিছানা ছেড়ে উঠে, দরজা খুলে শানু বেরিয়ে আসে। প্রশ্ন করে, কীসের শব্দ হল? তারপর সে মেঝের ওপর চিৎপাত ইজেলটাকে পড়ে থাকতে দেখে। ধীর পায়ে চেয়ার টেনে আমার মুখোমুখি বসে। দু-চোখ তার অসম্ভব লাল, বোঝা যায় এতক্ষণ কেঁদেছে সে। আমি কিছু বলি না। সেও বাকস্তব্ধ বসে থাকে, সহসা কিছু বলতে পারে না। এতক্ষণ আমার চারপাশে বৃত্তাকারে আবর্তিত হচ্ছিলাম আমি নিজে। এখন যুক্ত হয় আরেকজন মানুষ। কেমন থিতু হয়ে আসি। হাত-পা আলগা হয়ে ঘুম নামতে থাকে চোখে। জড়ানো মুখে তার দিকে তাকাই।

শানু সস্নেহে আমার পিঠে হাত রাখে, 'তুই আমার ঘরে আজ ঘুমাবি, আয়।'

অফিস থেকে বেরিয়ে রিকশা নিই। টানা রাস্তা ধরে রিকশা চলে। লাল বাতি জ্বলে উঠতেই ট্রাফিক জ্যামে আটকে যাই। তক্ষুনি আমার হুঁশ হয়, ব্যাগে বেতনের টাকা। টাকাগুলো নিয়ে সোজা বাড়ি চলে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু ক-দিন ধরেই সালাহদিনের ওখানে যাব যাব করছিলাম। আজ তাই আগাপাস্তালা চিন্তা করেই বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু এখন চারপাশ থেকে আঁকড়ে ধরেছে ভীতিকর আশঙ্কা। যে হারে ছিনতাইকারীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে, যে-কোনো সময় টাকাগুলো হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যেভাবেই হোক আমি ভালোবাসি গতি। ভয়টয় পেয়ে পিছু হটে যাওয়াও আমার প্রবণতার মধ্যে নেই। ছেড়ে দিলাম নিজেকে ভাগ্যের ওপর। সালাহদিনের খুপরি ঘরের সামনে একসময় আমার রিকশা এসে থামে। ভাড়া চুকিয়ে তার টিনের গেটে নক করি। তার বাসায় যতবার গেছি, তুমুল আড্ডা, তাই কখনো দরজা বন্ধ থাকে না। আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পরিবেশটা বেশ নিস্তরঙ্গ।

দরজা খোলার পর সালাহদিনের চোখে আলোকিত দৃষ্টি।

হাতের প্লাস্টার খোলা হয়নি। মুখে রাজ্যের দাড়ি। ভ্রূর ওপর গভীর ক্ষতের কালচে দাগ। ঘরে ঢুকে মনে হয় বহুকাল এখানে মানুষ থাকেনি। মেঝের ওপর কলার খোসা। পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। টেবিলের উচ্ছৃঙ্খল কাগজপত্রে ধুলোর সর।

ছোটো খিড়কির ওপর বেড়ে উঠেছে মানিপ্লান্টের সরু ডগা। সিগ্রেটের অসংখ্য অবশিষ্টাংশ ঘরময় ছড়ানো। অবিন্যস্ত বিছানার চাদর তেল চিটচিটে।

চেয়ার টেনে নিঃশব্দে বসি। বিছানায় হেলান দিয়েছে সালাহদিন।

'আশ্চর্য, কেউ আসে না?'

'আসে মাঝে মাঝে।' সালাহদিন বলে, 'মা এসে থেকে গেছে কিছুদিন।' তারপর অসীম নীরবতা। কী বলব বুঝে উঠতে পারছি না। সালাহদিন অনুরোধ করে, 'তুমি আমার এই ব্যান্ডেজটা চেঞ্জ করে দিতে পারবে?'

পায়ের গোড়ালির ওপরের অংশে ব্যান্ডেজ, এতক্ষণে আমার চোখে পড়ে। স্বাভাবিক প্রবণতায় উঠে দাঁড়াই। টেবিলের ওপর রাখা প্যাকেট থেকে তুলো আর ব্যান্ডেজ বের করে নরম হাতে তার পা উঁচু করে ধরি।

পুরোটা ব্যান্ডেজ খোলা পর্যন্ত সালাহদিন নিঃশব্দে বসেছিল। এবার ঘরের নীরবতা ভেঙে পৃথিবীর প্রতি অদ্ভুত নিরাসক্ত সালাহদিন বলে, 'আগের মতো আড্ডা আর ভালো লাগে না। কিছুক্ষণ তাল মিলিয়ে কেমন ঝিমিয়ে আসি। বন্ধুরাও অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। কেউ আর খুব একটা আসে না। গত তিনদিনে একজনও আসেনি। ঘর অন্ধকার করে নিঃশব্দে পড়ে থেকেছি। রাস্তায় কোনো ছেলে পেলে তাকে দিয়ে দোকান থেকে পাউরুটি কলা আনাই। এই খেয়েই আছি'—বলতে বলতে বালিশে মাথা কাত করে শুয়ে পড়ে সে।

'দুপুরে কী খেয়েছ?'

'কিছু না, চোখ বুজে থাকে সে। মুখে এমন ভঙ্গি, যেন তার চারপাশ থেকে পৃথিবী খসে পড়েছে। সে শুঁয়োপোকার মতো ঝুলকালির ভেতর শেষ আশ্রয় নিয়েছে। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। কিছুদূর হাঁটার পর একটা হোটেলে এসে ঢুকি। পলিথিনের ব্যাগে করে ভাত-তরকারি নিয়ে ঘরে এসে দেখি, জগে পানি নেই। ছোটো রান্নাঘরের ট্যাপও জলহীন। একটা আধুলি দিয়ে রাস্তায় খেলতে থাকা একটা ছোকরাকে পানি আনতে পাঠাই। ঘোর-লাগা-চোখে চেয়ে থাকে সালাহদিন। রান্নাঘর থেকে থালা এনে পুরো খাবার সাজিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিলে বুভুক্ষু মিসকিনের মতো কেঁদে ফেলে সে। হাত চেপে ধরে তাকে আমি শান্ত হতে বলি।

খাওয়া শেষ হলে সব গুছিয়ে আমি যখন সুস্থির হয়ে বসেছি, তখন বিকেল পালিয়েছে। আমার ভেতরে বেতনের টাকার খচখচানি। বড়ো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেল আজকের যাত্রাটা। কিন্তু এখানে এসে সেই অনুতাপের বেশির ভাগই মন থেকে উবে গেছে।

আমি যখন উঠব, কেমন অভিভূত গলায় সালাহদিন বলে, 'তুমি আমার এখানে চলে আসো না, একদম চিরকালের মতো!'

অতএব, আমাকে আবার বসতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ঘরে গাঢ় ছায়া। সুইচে চাপ দিতেই ধুলোমাখা বালব ধূসর আলো ছড়ায়। ওর বিপন্ন মুখের দিকে চেয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসে উঠি, 'কেন দুর্বল মুহূর্তকে প্রশ্রয় দিচ্ছ? পরে এ নিয়ে অনুতাপ হবে তোমার।'

'আমি চিন্তা করেই বলেছি', সালাহদিন বলে, 'অনুতাপ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'তুমি মোটেই চিন্তা করে বলোনি', আমার ভেতর এইবার কেমন যন্ত্রণা হতে থাকে। 'এটা তোমার ঠিক এই মুহূর্তে আবেগ।'

'তুমি হয়ত ঠিকই বলেছ', সালাহদিন ফের নির্জীব হয়ে আসে। 'বিশ্বাস করো, আগে তোমার সাথে আড্ডা দিতাম ঠিক, কিন্তু তোমার প্রতি আমার তেমন কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। তোমার ডিভোর্সের ব্যাপার নিয়ে তোমাকে রীতিমতো ঘৃণাই করতাম। তোমার উচ্ছৃঙ্খল উচ্চাকাঙ্ক্ষাই এর জন্য দায়ী, তোমার ন্যূনতম মানিয়ে চলার ক্ষমতা নেই আমার এমনটা মনে হত।'

'এত তাড়াতাড়ি কী করে তোমার ধারণা পালটে গেল?'

'কী জানি, হয়তো অনুভবের ব্যাপার। ধারণা হওয়া, পালটানো, কোনোটাই কোনো যুক্তিকে ঘিরে হয়নি।' সালাহদিন লম্বা করে নিঃশ্বাস টানে, 'আমার মনে হত, সত্যজিতের সাথে তোমার সম্পর্কের মধ্যে কিছু একটা অশ্লীলতা আছে। আমি জানি না আজ তোমাকে কেন এসব বলছি।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। তারপর উঠে দাঁড়াই। ভেতরের অসহ্য পীড়ন সামলে নরম গলায় বলি, 'কেন এসব বলে দিচ্ছ? মানুষ না জানলে কোনো কিছুতেই কোনো কষ্ট নেই। কাপড় খুললে তবেই না মানুষ নগ্ন। তুমি হয়তো সত্য বলে সততার আনন্দ পাচ্ছ, কিন্তু যে সত্য মিথ্যের চেয়ে কুৎসিত, সেটা ভেতরে রাখাই ভালো। এতে করে সুখ না পেয়ে আমি অপমানিত হচ্ছি বেশি।'

'নীনা, আমি দুঃখিত'... গেটের কাছে খুঁড়িয়ে এগিয়ে আসে সালাহদিন। ততক্ষণে আমার ভেতরের সব উদ্দীপনা ধুয়ে-মুছে গেছে। বুকের ভেতরে শুরু হয়েছে অসহ্য তোলপাড়। আমি বলি, 'তুমি সুস্থ হলে আমার কাছে তোমার প্রস্তাবটা নিয়ে যেয়ো। তখুনি না হয় তোমার এখানে আসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।'

কথাটার ভেতরে যে চাপা ক্রোধ, সেটা টের পায় না সালাহদিন। কেমন অভিভূত চোখে তাকায়। দরজার বাইরে যেই পা রাখতে যাব, অমনি আমার হাত চেপে ধরে সে। ঘাড় ঘুরিয়ে তার ঘামে-ভেজা এক বিচিত্র মুখ দেখি। ঠোঁটজোড়া অসম্ভব কাঁপছে। দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। বাইরের পৃথিবীতে দস্তুর মতো সন্ধ্যা নেমে গেছে।

কিছুক্ষণ আমার হাতটা তার মুঠোর ভেতরে থাকে। সেই অবস্থায় নরম অথচ শ্লেষ-মেশানো স্বরে বলি, 'চুমু খেতে ইচ্ছে করছে?'

দ্রুত আমার হাত থেকে হাত সরিয়ে হকচকিয়ে ওঠে সালাহদিন।

আমি ঠোঁট বাড়িয়ে দিই, 'তবে খাও।'

যেন বিদ্যুতের শক লাগল, এমন ভঙ্গিতে আমার হাত ছেড়ে দেয় সে, 'ছিঃ নীনা'... এবং আমি মহাপৃথিবীর পথে নেমে আসি।

পুরো পথের অনেকটা সময়ই ভুলে থাকি, আমার ব্যাগে টাকা। কষ্ট, ঘৃণা, ক্রোধ, গ্লানি—সব মিলিয়ে মর্মান্তিক হয়ে উঠছে বোধ। আমি তার সততাকে সহজভাবে নিতে পারছি না কেন? নিজেকে শান্ত করতে করতে ভাবি, কথাগুলো সে না বললে তার কোনো ক্ষতি হত না। কিন্তু বলে দিয়েছে হয়তো কোনো এক নাজুক অনুভূতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

থেকে। তারপরও তাকে অপমান করে এলাম কেন?

কিছুক্ষণ পর টের পাই, যন্ত্রণাটা অন্যখানে। এইসব পুষে রেখে কী চমৎকার আন্তরিকভাবে সে আমার সাথে মিশেছে! আমার এই একলা-একা জীবনযাপনকে স্বাগত জানিয়ে কতদিন বলেছে, 'দারুণ রাডিক্যাল তুমি। অকর্মণ্য, ভোদাই, অবিবেচক আর অত্যাচারী স্বামীর ঘর কামড়ে পড়ে থাকার চেয়ে প্রত্যেক মেয়েরই উচিত লাথি দিয়ে চলে আসা।' তাছাড়া আমার ডিভোর্সের পর তার অসম্ভব সহানুভূতি। সান্ত্বনাসুলভ কত কথা। বলেছে, 'সত্যজিৎকে এজন্যই শ্রদ্ধা করি, সে তোমার স্বামীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে তোমার বন্ধুত্বের অসম্মান করেনি। এত সূক্ষ্ম অভিনয়ের আড়ালে এমন ঘৃণা চেপে রাখার দায় কেউ তো তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়নি? আমি আর কাকে বিশ্বাস করব?

বাসার কাছাকাছি গলির ভেতর রিকশা ঢুকতেই দেখি, ল্যাম্পপোস্টের নীচে মাস্তান গোছের একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে উসকো পোশাক, চোখজোড়া কেমন লাল। গালে ফোসকার মতো ব্রণ।

মুহূর্তেই মাথা থেকে সব জঞ্জাল সাফ! শরীরের ভেতর দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে যায়। ব্যাগটা সজোরে আঁকড়ে ধরি। ছেলেটা বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

রিকশাটা ল্যাম্পপোস্ট অতিক্রম করার সময় আমার শরীর ঠান্ডা লোহার মতো। দমবদ্ধ অবস্থায় আরও কিছুটা পথ! শিরশিরিয়ে উঠছে শিরদাঁড়া!

টানটান মাথা পেছনে ফেরাই না।

বাসার কাছাকাছি রিকশা এসে থামার পর টের পাই আমার পুরো শরীর ভিজে উঠেছে। হাঁপ ছেড়ে অনুভব করি, সালাহদিন, তার কথা, মগজের মধ্যে ঘৃণিত আন্দোলন—কর্পূরের মতো শূন্যে উড়ে গেছে।

ব্যাগটা বুকে চেপে নিশ্চিন্তে একা একাই হাসি।

রিকশা ভাড়া চুকিয়ে ঘরে ঢুকতেই ওম শান্তি! আমার রুমে চুটিয়ে লুডু খেলছে শানু আর কামালভাই। ওদের উচ্ছ্বসিত হাসির তরঙ্গের সাথে আমিও একাত্ম হয়ে যাই।

কী অসম্ভব নির্ভার লাগছে। হাঃ হাঃ—পৃথিবীটা এই এখন আমার দখলে।

অনেকদিন পর রাত নামতেই রং-তুলি আর ক্যানভাসের সহবাসে উন্মাতাল হয়ে উঠি। তুলির ছোপছাপে ক্রমশ ফুটিয়ে তুলতে থাকি মনে ভর করা একটা দৃশ্য। ঘরের বদ্ধ গুমোট, দেয়ালের অশ্লীল দাগ, সব আমার চারপাশ থেকে সরে যেতে থাকে। তুলির আঁচড়ে জেগে উঠছে অন্ধকার একটা ঘর। দপদপ জ্বলছে প্রদীপ। আমি যেন সেই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। ক্যানভাস জুড়ে নিকষ অন্ধকার। আমার তুলির স্পর্শে মাঝখানে জ্বলজ্বল করে ওঠে জ্বলন্ত একটা লম্বা শিখা। তার মধ্যে এক প্রায় নিষ্প্রাণ এক কিশোরী। প্রদীপের শিখা পড়েছে সেই কিশোরীর মুখে। রঙের আলো-আঁধারির খেলার মধ্যে ফুটে উঠেছে তার ভয়ার্ত ফ্যাকাসে দৃষ্টি। ক্যানভাসের একটি অংশে আমি এরকম বিষয় একটা মূর্ত করার চেষ্টায় বলতে গেলে গোটা রাতই পার করে দিলাম।

অসমাপ্ত ছবিটা রেখে যখন ঘুমোতে যাব, টের পাই, সারা শরীর ব্যথায় টনটন করছে। গলা শুকিয়ে খরখরে হয়ে উঠেছে। পানি খেয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি। পুরো শরীর জ্বর জ্বর তপ্ত মনে হয়। একটা অসহ্য চাপা উত্তেজনা আর অত্যন্ত অস্থির বোধ করি। দীর্ঘদিন পর হাত বড়ো অনভ্যস্ত আর আনাড়ি। কী হচ্ছে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। কিন্তু আমি যে আঁকতে চাইছি—এই স্বপ্ন আমাকে ঘোরগ্রস্ত করে রাখে অনেকক্ষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পরদিন অফিসে বসেও একই তাড়না। কাজের দুঃসহ চাপের মধ্যেও আমাকে বিদ্যুতের মতো আকর্ষণ করতে থাকে আমার ঘর। এবং ঘরের মধ্যে জেগে থাকা নাজুক ক্যানভাসটি। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ গুটোচ্ছি, দেখি, আমার টেবিলের সামনে একজন পুরুষের ছায়া। ঘোর কাটিয়ে সরাসরি তাকাই। বিস্ময়ে, বিরক্তিতে আমার ভ্রূ কুঁচকে ওঠে—ওমর।

চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলে, 'বেশ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, অদ্ভুত লাগল। আপনি লক্ষই করলেন না।'

এই রকম উটকো পরিচয়ের সূত্রে ঠিকানা জোগাড় করে সরাসরি অফিসে চলে আসা, ব্যাপারটাকে আমার অসম্ভব বাড়াবাড়ি মনে হয়। আমি রীতিমতো অভদ্র রকমের গম্ভীর হয়ে বসে থাকি। একটা কথাও বলি না। কিন্তু তাতে করে তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর লক্ষ করি না। বলে, 'নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন ঠিকানা ছাড়া কীভাবে এলাম?' পেপার মেলে ধরি চোখের সামনে, 'মেডিক্যাল স্টুডেন্টরা স্ট্রাইক করছে', 'বিনা চিকিৎসায় রোগী মারা যাচ্ছে।' 'আমি মোটেই অবাক হচ্ছি না'—ঠান্ডা গলায় বলি।

'বিরক্ত হচ্ছেন?'

'না।'

'আমি রহস্য-টহস্য করতে পারি না। আপনার যে বন্ধু ছিল হাসপাতালে', ওমর খুব সরলভাবে বলে, 'কী যেন নাম তার? যাকগে, আমি তার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েছি। আশ্চর্য, আপনি আর গেলেন না কেন?'

'নিয়মিত খোঁজ নিয়েছেন?' প্রশ্ন করি। পেপারে চোখ হাঁটছে, 'ওয়াসার পানির পাইপে মরা ইঁদুর।'

'আপনি মনে হয় মাইন্ড করেছেন। অবশ্য তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমার ভাবটাই এমন, আমার কাছে যেটা মূল্যবান, তাকে খুব গুরুত্ব দিই। অন্যের কাছে সেটা বাড়াবাড়ি বা হাস্যকর মনে হতে পারে।'

'নিজের অনুভবকে মনে হয় একটু বেশিই প্রশ্রয় দেন?' আমি আর ভেতরের উষ্মা চেপে রাখতে পারি না। পেপারে মিছিলের ছবি, গণতন্ত্রের দাবিতে ভার্সিটির ছাত্ররা রাস্তায় নেমেছে, 'হতে পারে', সে বলে। 'বললাম তো, এর একটা বাজে দিকও আছে, যার ফলে অন্যের কাছে সেটা অনেক ক্ষেত্রেই বিরক্তিকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমি তাতে দুঃখ পাই না।'

সহকর্মীদের কারো-কারো চোখ আমার টেবিলের দিকে। লোকটার পরনে উদ্ভট পোশাক। যথারীতি উচ্ছৃঙ্খল দাড়ি। চুলে যে তার ক-দিন চিরুনি পড়েনি, সবার কাছে সেটাই দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। মনে হয়, ভেতরে সে কেমন সেঁধিয়ে গেছে। পরিচয়ের সূত্র ধরে একজন লোক আসতেই পারে, অপমানের বোধই যার মধ্যে জন্ম নেয়নি, তার সাথে যুদ্ধ করে কী লাভ? ছুটির ঘন্টা বাজছে। সবাই পাততাড়ি গোটাতে তৎপর। হাই তুলছে কেউ-কেউ। মুখের সামনে থেকে পেপার নামাই না, শিরোনাম—'নগরীতে একদিনের দুর্ঘটনায় মোট ন-জনের মৃত্যু'। এক সময় কাগজ ভাঁজ করে রেখে, আমি প্রশ্ন করি, 'আপনার ভাইকে বাসায় এনেছেন?' সে বেশ উৎসাহিত হয়ে বলে—'ধুর, তর্কে-তর্কে আসল কথাই বলা হয়নি। আসলে এ জন্যই আপনার এখানে আসা। ওকে বাসায় নিয়ে আসার কিছুদিন আগে থেকে তার অদ্ভুত আচরণ আমাদের অবাক করে দিতে থাকে। সব বলে আপনাকে লাভ নেই, শুনলে অবাক হবেন, সে আপনাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে।'

স্রেফ গুল! লোকটা গায়ে পড়ে সম্পর্কটাকে বাসা পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাইছে। কথাটা ভাবার পর ভেতরের বিরক্তি চেপে রাখতে পারি না। গলায় তীক্ষ্ণতা এনে বলি—সে আমাকে দেখেইনি ভালো করে, আমাকে চেনে না, আপনি দয়া করে আপনার আসল উদ্দেশ্যটা খুলে বলুনতো। ভাই দেখতে চেয়েছে, এই রকম ভান-

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ভনিতায় যাওয়ার দরকার কী?'

'আপনি বিশ্বাস করুন, আমি মিথ্যে বলছি না'—তার মুখটা করুণ দেখায়। 'আমি আগেই বলেছি তার সমস্ত ব্যাপার-স্যাপার বেশ অদ্ভুত হয়ে উঠছে। আপনাকে ও দেখেছে। যে কোনো কারণে হোক আপনার মুখটি গেঁথে গেছে ওর মনে। ও এ-ব্যাপারে আমাকে বারবার অনুরোধ করেছে। জানেন, ও দিনে-দিনে কেমন বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠছে। ক্র্যাচে ভর দিয়ে প্রায়ই মাঝরাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মা ওকে চারদিক থেকে পাহারা দিয়ে রেখেছে। কিন্তু রাখলে কী হবে, ফাঁকি দিয়ে কীভাবে সে উঠে যায়। ছিটকিনি খোলে। প্রশ্ন করলে কী সব উলটোপালটা কথা বলে। বলে, আমি মৃত মানুষ, মৃতদের সাথে দেখা করতে যাই।' বলতে বলতে থমথমে হয়ে ওঠে ওমরের মুখ।

কী এক অবশতায় আমি স্থির হয়ে থাকি।

সে বলে চলে, 'সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, গোরস্থানের পাশে শেষ রাত অবদি একদিন বসে থাকলে আমার দাদির সাথে নাকি তার দেখা হয়। মাথায় হাত বুলিয়ে দাদি অনেক গল্প করেন। ছোটোবেলায় কীভাবে বাবা বিয়ে করেছিলেন, কীভাবে সেই বালিকা বধূ জলে ডুবে মারা যায়, এইসব। তারপর বাবা মা-কে বিয়ে করেন। শুনে তো মার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। মা ছাড়া আমাদের পরিবারে কেউ এসব জানে না। ও বলেছে, দাদির কপালে একটা কালচে দাগ আছে। মা স্বীকার করলেন সেটা। আমাদের জন্মের আগেই দাদি মারা যায়। আরও আশ্চর্য, সারাক্ষণ চোখ বুজে কেবলি সে বিড়বিড় করে, ''সেই লাশটা কোথায়? সেই লাশটি কোথায়?'' বলো কার লাশ? বহু প্রশ্ন করেও এর উত্তর পাইনি। জানেন, আমিও প্রায়ই গোরস্থানের পাশে বাসে থাকি।' ওমরের মুখ কালচে হয়ে ওঠে, 'সে অবশ্য অন্য কারণ, থাকগে, তার ব্যাপারটা আমাদের কারো মাথায় ঢুকছে না।'

আমি বলি, 'দেখুন আমি কোনো আজগুবি কথায় বিশ্বাস করি না। দাদি, বাল্য-বিবাহ এসব কথা কোনো-না-কোনোভাবে সে শুনেছে। অসুস্থ অবস্থায় তা-ই বকে যাচ্ছে। মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে এসেছে। লাশ নিয়ে ভাবাটা তাই খুব স্বাভাবিক নয় কি?'

'কিন্তু মধ্যরাতে বাইরে যাওয়া?'

'আমি তো ভাই মনোবিজ্ঞানী নই। ব্যাপারটার সাথে খুনের মোটিভ জড়িত। ভয় থেকে মানুষের অনেক বিকার হতে পারে। সাধারণ বুদ্ধিতে আমি এটাই বুঝি। ওকে কোনো ডাক্তার দেখান।'

'আপনি কী যাবেন?'

'কালতো বন্ধের দিন। আপনি পরশু একবার আসুন। আমি যাব।'

'আজ কি সমস্যা আছে?' ইতস্তত করে সে। আমার সারা মগজ তোলপাড় করছে ইজেলে সাঁটা ক্যানভাস। ছবিটা আমাকে স্রোতের মতো টানছে। রঙের এক নেশাতুর গন্ধ আমার নাকে। যেন কত যুগ পর আমার রক্তে সেই উন্মাদনা। সেই স্বপ্নে পাওয়া পেইন্টিং। আমি বলি—'আজ অসুবিধে আছে। আপনি পরশুই আসুন।'

বাসায় এসে আমার ভেতরের পুরো আন্দোলনটাই ভেস্তে যায়। প্রথম আমি আমার শ্যাওলা-পড়া সিঁড়ির ওপর বাচ্চা কোলে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি বস্তির সেই মহিলাটিকে। মানুষের শরীরের এত দ্রুত পতন আমার আর চোখে পড়েনি। শুধু চামড়ার ফ্রেমে আটকে আছে ভেতরের হাড্ডিগুলো। আর পটকা মাছের মতো ফুলে উঠেছে তার পেট। মহিলাটি আমাকে দেখে ধড়ফড়িয়ে ওঠে। তারপর দ্রুত বস্তির দিকে হাঁটা দেয়। কাল্লু

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কোলে বসে আমার দিকে কাঙালের মতো চেয়ে থাকে। বুকের মধ্যে কষ্ট অনুভব করি। ডাকি, 'এই শোনো, শোনো।' কিন্তু আঁচলে মুখ চেপে মহিলাটি বস্তির মধ্যে ঢুকে যায়। দরজায় ভারী পা রাখি।

ঘরে ঢুকে দ্বিতীয় ধাক্কা। পাগলের মতো একটানা বকে যাচ্ছে শানু। আমাকে দেখে প্রায় হামলে পড়ে, 'এই মাসের বাসা ভাড়া দাও।'

আমি হকচকিয়ে যাই। অবিন্যস্ত শাড়ি। ঘর্মাক্ত মুখ। পুরো ভঙ্গিতে মারকুটে ভাব স্পষ্ট। সে বলে, 'বেতন পেয়েও বাসাভাড়া দিচ্ছ না। আমি তো এতিমখানা খুলে বসিনি। তুমি টাকা জমিয়ি রাখবে, আর আমি গাঁটের পয়সা খরচ করে তোমাকে পুষব?'

'ছিঃ ছিঃ', আমি ছটফটিয়ে উঠি, 'কোন মাসে আমি তোমাকে টাকা দেই না? তুমি একা বাড়িভাড়া দিয়েছ, এমন একটা মাস দেখাতে পারবে? এ-মাসে আরেফিনের নতুন চাকরি, বলল, প্রথম মাসে কিছু চলার জন্য দিতে হবে। তাই ভেবেছিলাম'—বলতে বলতে কেমন কান্না এসে যায়। ব্যাগ রেখে দড়াম করে ড্রয়ার খুলি। টাকাটা তার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলি, আমি কালই বাসা ছেড়ে চলে যাব।

'টাকা ছুড়ে দিচ্ছিস কেন?' খিঁচিয়ে ওঠে সে, 'আমি ভিক্ষা নিচ্ছি? তা যা না, ভয় দেখাচ্ছিস কাকে? তোর মতো মেয়ের অভাব হবে? তোর চরিত্র আমি জানি না?'

আর সহ্য হয় না, এক ধাক্কায় আমি তাকে বিছানার ওপর ফেলে দিই, 'হারামজাদি বদমাইশ কোথাকার। আমি বুঝি না, তুই কীসের ঝাল মেটাচ্ছিস আমার ওপর? কাল্লুর মার পেটের বাচ্চাটা কার? এই করে তুই কলঙ্ক ঢাকবি? সোজা পুলিশে খবর দেব।'

আমার মাথায় দাউদাউ দাবাগ্নি। ঘৃণায়, ক্রোধে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে কোমরে আঁচল জড়াই, 'গলা টিপে মেরেই ফেলব তোকে। নিজের ভাতারকে সামলাতে পারো না, দোষ আমার? আমি ওই বেটিকে না ডাকলেও তোর ভাতার ধোয়া তুলসিপাতা হয়ে থাকত ভেবেছিস? সে ওই বেটির বস্তি চেনে না?'

মুহূর্তেই আগুন জল হয়ে যায়। হাউমাউ কাঁদতে শুরু করে সে। তুমি আমাকে এভাবে অপমান করলে? তুমি তাহলে সব জানো? সবাই আমার শত্রু। চেপে রাখবে, বলবে না। মাতারির কি স্বামী নেই? একদিন আমার স্বামীর সাথে থাকল বলে'... শিশুর মতো হিক্কা তুলতে থাকে শানু। 'দু-পয়সা খসাতে এসেছিল। এগুলোকে চিনি না? ছ্যাঁচড়ের জাত। বলে, স্বামী নাকি লাথি দিয়ে বের করে দিয়েছে। তোর মতো বেটিকে লাথি দেবে নাতো।' আর বলতে পারে না, একদম মাটিতে ঠ্যাং ছড়িয়ে গলা আরও চড়িয়ে কেঁদে ওঠে সে।

পুরো ব্যাপারটার নাটকীয়তায় আমি রীতিমতো থ। সন্তান, কাল্লুর মা, আন্দাজের ওপর এত যথার্থ সূক্ষ্ম ঢিল ছুঁড়তে পারব, এক মুহূর্ত আগেও আমার ধারণায় ছিল না। মাথা ঝিমঝিম করছে। সারাদিন অফিস শেষে এমন পরিস্থিতি। কেমন শিথিল হয়ে আসছে শরীর। মেঝে থেকে শানুকে টেনে ওঠাই, 'এত জোরে চিৎকার করছ কেন? মানুষ শুনলে তোমারই বারোটা বাজবে। তুমি নিজেই তো বেশ দুর্বল দেখছি। মহিলাটা বললেই তো আর তোমার স্বামী তার বাচ্চার বাপ হয়ে যাবে না। তুমি নিজেই তো জানো তার স্বামী আছে। কিন্তু তারপরও তোমার যা অবস্থা এরকমটা দেখলে পাবলিক বেটিকে কামাল ভাইয়ের কোলে বসিয়ে দিয়ে যাবে। এ সময় তোমাকে শক্ত হতে হবে।' এইরকম কিছু মামুলি উপদেশ পেয়ে শানু আচমকা ঠান্ডা হয়ে যায়। আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায় ভেতরে, 'এরা কিন্তু সাংঘাতিক। ব্ল্যাকমেইল করবে নাতো?'

বিরক্তি চেপে বলি, 'তোমাকে দুর্বল দেখলে করবে। আগে নিজেকে ঠিক করো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘না না, তা পারবে না’, স্যাঁৎ করে আঁচল দিয়ে নাক মোছে শানু। ‘তুমি তো দেখোনি, যা দজ্জাল ভঙ্গিতে ঠ্যাঙানি দিয়েছি।’

এসব ঘটনার পর রাতে যখন ক্যানভাসের সামনে দাঁড়াই, মাথার ঘিলু কচলে খায় অন্ধ গেরো। হয় না, এভাবে হবে না। পরক্ষণেই অন্য এক তেতো বোধ আমাকে অসাড় করে তোলে। রাগের মাথায় বাসা ভাড়াটা দিয়ে দিলাম শানুকে। সে-ও নিয়ে নিল। বাড়িতে এ-মাসে টাকা পাঠাইনি। তারপর আছে আরেফিন-সমস্যা। ভেবেছিলাম এ মাসে ভাড়াটা না দিয়ে, আগামী মাসে যে ভাবেই হোক ম্যানেজ করে একবারে দু-মাসেরটা একসঙ্গে দেব। তখন আরেফিনও কিছু সাহায্য করতে পারত। দুৎ! দু-দিন বেশ ভুলেছিলাম এসব। আজ আবার কাঁকড়ার মতো সব ছেঁকে ধরেছে। ধৈর্যের সীমা ধসে পড়তে চায়। নিজেকে আবার আঁটোসাটো করে বাঁধি নিজের ভেতরেই। সামনে খাড়া করাই আধাআধি শেষ করা ছবিটাকে। ক্রমশ বিদঘুটে জটগুলো আলগা হয়ে আসে। এক সময় কোমল নরমতা বুকের মধ্যে অদ্ভুত এক ঠান্ডা এনে দেয়। কালো রঙের কৌটোয় তুলি ডোবাই। এবার অন্ধকার ক্যানভাসের একপাশে প্রদীপ। প্রদীপের অপরদিকে রাক্ষসের মতো একটা মুখ, যেন আরব্য রজনীর আফ্রিদি দৈত্য। তার দৃষ্টি ভয়াল শূন্যতায়। আরও খণ্ড খণ্ড মস্তক। আলোছায়ার মধ্যে ঝাপসা ভাসতে থাকে বেড়ালের, কুকুরের। রাত তিনটার ঘন্টা বাজে কোথাও। আচমকা সংবিৎ ফিরে পাই। পুরো পৃথিবীর স্থবিরতা এই ঘরে। অসম্ভব স্নায়বিক চাপে অবশ হতে থাকি, ক্যানভাস জুড়ে অদ্ভুত প্রেতপুরী। কীসব হিজিবিজি আঁচড়। ঝাঁকাল রঙের মাঝখানে যখন একটি হাত মূর্ত হয়ে ওঠে, অন্য রঙে তা ঢেকে যায়, কখনও গালের একপাশ... মানুষকে যেভাবে আমরা কখনও ভিন্ন ভিন্ন অংশে দেখি, রঙের আনাড়ি বিন্যাসে একরৈখিক হয়ে সেইসব চিত্র আমার মনশ্চক্ষুর মধ্যে একটা কাহিনি এনে দেয়। সেই আঁধার রাতে ক্যানভাসটিকে আমার হিংস্র নিষ্ঠুর বীভৎস সুন্দরের এক বহুমাত্রিক জীবন মনে হতে থাকে। যেন ছবি নয়, তুলি দিয়ে কোপ দিয়ে দিয়ে আমি সেইসব দৃশ্য থেকে রক্ত বের করে আনছি, সেই মৃত্যুতে যে চিড়িক দিয়ে ওঠা রক্ত, যে আর্তনাদ... এর মধ্যে হিমহিম করে বয়ে যায় সন্তুরের মিড়ের সুর... একসময় আমি ছবির মধ্যে থেকে জীবনের ঘোর কাটিয়ে বেরিয়ে আসি। আর তারপর শেষ বারের মতো তাকিয়ে ভেতরটা ফাঁপা হয়ে যায়। কিচ্ছু হয়নি, এই বোধের তীব্রতায় কেমন নিস্তেজ হয়ে আসি। ঠোঁট শুকিয়ে চড়চড়ে। দু-পায়ে কোনো অনুভূতি অনুভব করছি না। ব্যথায় টনটন করছে হাত। টলতে টলতে বিছানায় আছড়ে পড়ি। ছিঁড়ে ফেলব এটাকে। ফিনিশিং টাচফাচ দেব না। আবার শুরু করব। অন্য কোনো ভাবনা দিয়ে।

রাতে বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখি। আমাকে কবর দিয়ে চলে গেছে সবাই। হিম নিস্তব্ধতা পুরো কবর জুড়ে। এবং কালো মোষের মতো অন্ধকার। হঠাৎ দেখি সামনে একটা রেললাইন। এর মাথা কীভাবে কবরের সাথে জুড়ে গেল, ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। উদ্ভ্রান্তের মতো দৌড়ুতে থাকি কাঠের স্লিপার ধরে। কুয়াশার মতো সাদা অন্ধকার চারপাশে।

দেখি, একটা ট্রেন আসছে হুইসেল বাজিয়ে। হঠাৎ ট্রেনের গতি থেমে যায়। প্রত্যেক বগিতে মানুষের খণ্ডিত মস্তক। ইঞ্জিনের মধ্যে ডাঁই করে রাখা হয়েছে মানুষের মৃতদেহ। ভয়াল, আতঙ্কে আমি বিবর্ণ। তারপরই দেখি তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে হলুদ শিশু। আখের ছোবড়া চিবুচ্ছে ও। এ যেন আমার সন্তান! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করি। এত ক্ষুদ্র তার আদল, অথচ দাঁতগুলো কত বড়ো বড়ো! দিব্যি হাঁটছে ও। আমি পাগলের মতো বুকে চেপে ধরি ওকে। কিন্তু নিজেকে ছাড়িয়ে অদ্ভুত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে সে অনেকটা এগিয়ে যায়। আমাকে আলতো করে আহ্বান জানায়, এসো। আমি সেই ক্ষুদ্র ন্যাংটো অবয়বটির পেছন ধরে হাঁটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বিস্তৃত পথ—কী বিশাল, হাঁপিয়ে উঠি। অবসন্ন শরীর লুটিয়ে পড়তে চায়, তবুও সে থামে না। হঠাৎ একটি প্রতিধ্বনিময় শব্দ শুনি—'তুমি কি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো?'

'করি। করি।' কাঁপা কাঁপা গলায় বলে চারপাশে তাকাই।

একজন কিশোর। গায়ের চামড়া এত সাদা যেন সুচ ফোটালেই ভেতর থেকে নিশ্চিত দুধ রক্ত বেরোবে। পরনে পাদ্রিদের মতো পোশাক। আমার শিশুকে কোলে তুলে হুংকার দেয় সে, 'মিথ্যে বলছ তুমি!' আমি দেখি, ভীষণ চেনা কিশোরটির মুখ। কোথায় দেখেছি, কুয়াশার মধ্যে প্রাণপণে হাতড়াতে থাকি। নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে সে। তার কোলে শিশুটি হাসছে! আমার বিস্ময় চরমে ওঠে, হাসপাতালে দেখেছিলাম। স্ট্যাব খেয়ে ভর্তি হয়েছিল। কার যেন ভাই, উফ্ মনে করতে পারছি না। ঠকঠক করে কাঁপছি, কার ভাই?

আচমকা ঘুম ভেঙে যায়। ধড়ফড়িয়ে তাকাই চারপাশে। এ কী, আমার চোখ জলে ভিজে গেছে কেন? বালিশের কভার নোনা জলে চোবানো। স্বপ্নে তো আমি কাঁদিনি? অথবা কেঁদেছি, মনে করতে পারি না। বুকের মধ্যে কষ্টের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। চারপাশে আশ্চর্য নির্জনতা। দরজার ফাঁকফোঁকড় দিয়ে ভোর ঢুকছে। কিন্তু এত কেঁদেছি কেন? বুকের মধ্যে শূন্যতারই বা এত ঘূর্ণি কেন? ভাবতে থাকি। অস্তিত্ব অবশ করে আবিষ্কৃত হয়, দীর্ঘদিন পর আমি আমার সন্তানের মুখোমুখি হয়েছি। কতদিন ভুলে ছিলাম এসব। যন্ত্রণার ঘায়েও আস্তর পড়ছিল ক্রমশ। স্বপ্নে এসে খোঁচা দিচ্ছে, সেই মুখ, আবারও রক্তাক্ত করে তুলছে দুর্বল জায়গাটা। আমি সেই অধ্যায় নিয়ে ভাবতে চাই না। ছটফটিয়ে বসি। সামনে ক্যানভাসের প্রেতপুরী। ঝাঁঝালো রঙের কারসাজিই সার —কিছুই হয়নি। ছুড়ে ফেলার জন্য দাঁড়াতে চাই কিন্তু অবশ শরীর নেতিয়ে পড়ে বিছানায়। কোনোদিন আমি শিশুটির হাসি দেখিনি। শুধু অবিশ্রান্ত কান্না। আজ দেখেছি ওইটুকুন শিশুর কী বড়ো দাঁত! কী কোমল মিষ্টি হাসি। আমি চেয়ে থাকি সেই দিকে।

আমি ঢুকে যাই সেই শিশুটির জন্মলগ্নের মর্মস্পর্শী স্মৃতির মধ্যে। ভ্রূণ থেকে ক্রমশ পেটের মধ্যে ওর বেড়ে ওঠা, পুরোটা বছরই আমার গেছে দুর্দান্ত অস্থিরতার মধ্যে। ইউরিন টেস্ট করিয়ে যেদিন প্রথম জানলাম ভেতরে ভ্রূণের অস্তিত্ব, রেজাউলের উচ্ছ্বাস ছিল তুঙ্গে। কিন্তু আমি ততদিনে তার ওপর থেকে সব শ্রদ্ধা, সব মোহ হারিয়ে ফেলেছি। আমার সমস্ত স্বপ্ন কেন্দ্রীভূত হয় সেই ভ্রূণটিকে ঘিরে। প্রথম তিন-চার মাস আমার মরার দশা হয়! ক্রমাগত বমি। মেঝে, বাথরুম ওগরানো বমির স্রোতে ভেসে যেত। সবকিছু দুর্গন্ধময়—মাছ, তরকারি, ভাজি, মিষ্টি। নিদ্রাহীন কুৎসিত রাত অতিবাহিত হত অসহ্য ছটফটানির ভেতর দিয়ে। সবচেয়ে যন্ত্রণাকর ছিল আমার পাশে শুয়ে থাকা রেজাউল। তার পুরো গায়ে বোয়াল মাছের গন্ধ। পেট ঘুলিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসত। ওকে এড়াতে একসময় বালিশ নিয়ে নীচে বিছানা পাতি। কিন্তু সে ছিল রক্তে-মাংসে প্রতিটা মুহূর্ত উগ্র ও উষ্ণ। নেমে আসত নীচেই, জোর না খাটিয়ে কাকুতি-মিনতি করত। তার সাথে সে-ই আপসটাও ছিল আমার জন্য প্রচণ্ড স্নায়বিক চাপের। কিন্তু ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করলে তো দাম্পত্য সম্পর্কটাই ঝুঁকিময় হয়ে ওঠে, তাই শরীর-মনের সেই নাজুকবস্থায় আপস না করে পারতাম না।

আমার আরেকটা ভয়ানক অসুবিধে ছিল। এমন সব খাবারের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছিল যার অধিকাংশই কেনার সামর্থ্য থাকত না। মুরগির রোস্ট, পাঙাস মাছ, ঘি, হালিম। এই সময় রেজাউল প্রায়ই বাজারে এসব পাওয়া যাচ্ছে না, অথবা পকেট শূন্য—এইসব বলেটলে পাশ কাটিয়ে যেত, আবার হপ্তা কি দু-হপ্তার মাথায় দুর্লভ কোনো উপহারের মতো হাতে তুলে দিত আমার প্রিয় এইসব খাবার। বলতে গেলে, নিয়মিত পুষ্টিকর অথবা পছন্দসই খাবারের অভাব আমাকে প্রতিদিনই দুর্বল আর ক্ষীণ করে তুলছিল। সারাক্ষণ তাই মেজাজ খিঁচিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

থাকত। এসব কিনে না দিতে পারার জন্য তেমন কোনো কষ্ট বা অনুতাপ রেজাউলের মধ্যে ছিল বলে মনে হত না। এবং প্রায়ই আমার মনে হত, এরকম অবস্থায় থাকতে পেরে লোকটা সুখী। আসলে আরেকটু ভালো থাকার কোনো চেষ্টা তার মধ্যে কোনোদিনই দেখিনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ ব্যাপারে তাকে হয় হতাশ, নয়তো নির্জীব থাকতে দেখেছি। এবং যতদিন যাচ্ছিল পারিপার্শ্বিক বদ্ধতার জন্যই হয়তো আমার ভেতরে কিছু বিকারগ্রস্ততা ভর করছিল। আমার মনে হত, জন্ম-নেওয়া শিশুটা বিকলাঙ্গ হবে। আমার এইরকম আলোহীন জীবনে তার পক্ষে কখনোই সুস্থ হওয়া সম্ভব নয়।

এক অবিনাশী ভয় আমার বুক খামচে ধরত। মনে হত, সন্তান নিয়ে আমি নিরন্তর নিমজ্জিত হচ্ছি মিশমিশে কালো অন্ধকারে। কাঙাল-হাত বাড়িয়ে রেজাউলকে স্পর্শ করতে চাইতাম। কিন্তু এত নির্বিকার চরিত্র ছিল তার যে, আমার সে সব আশঙ্কার ব্যাপার-স্যাপার কঠোর ধমকে এড়াতে চাইত, কোনো সহানুভূতি পর্যন্ত দেখাত না। বলতো, 'বড়ো দুর্বল মেয়ে তুমি! সহ্য ক্ষমতা বাড়াও। তোমার ভাব দেখে বুঝতে কষ্ট হয়, গরিবের ঘরে যুদ্ধ করে করে বড়ো হয়েছ।'

এইভাবে ভয়ে ভয়ে এক সময় পেটের মধ্যে শিশুর প্রায় পূর্ণতাপ্রাপ্তিকে টের পাই। একসময় রাতে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করি তাকে। ডানের শিশু হামা দিয়ে বামে আসে। উঁচু পেটে হাত রেখে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে রেজাউল। সেই রোমাঞ্চ ক্রমশ তাকে শারীরিকভাবে উত্তেজিত করে তোলে। যথারীতি কঠিন অনড় আমি। একদিন, দু-দিন—ধীরে ধীরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকে সে। প্রতিদিন রাত অতিবাহিত হত কুৎসিত ঝগড়ার ভেতর দিয়ে! কী ভয়ানক চাপ! ঘরে বসে বসে দম আটকে আসত।

সেই ঝগড়াই চূড়ান্ত আকার ধারণ করে একদিন। এক সুদর্শন কিশোরসহ অফিস থেকে বাসায় ফেরে সে। বলে, 'আমরা এক মেসেই থাকতাম। তখন সে নিতান্ত শিশু ছিল। ঢাকায় এসেছে, হপ্তাখানেক এখানে থাকবে। তুমি কল্পনা করতে পারবে না নীনা, ও কেমন লাজুক ছেলে।' মেসের কথা শুনেই আমার ভেতরটা হিম হয়ে আসে। সে-রাতের বিস্তারিত কথা আমার সামনে জট পাকিয়ে দাঁড়ায়। রেজাউলের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বর্ণনা। মেসের এক ছেলের সাথে জীবনের প্রথম কীভাবে অদ্ভুত অভিজ্ঞতায় সে জড়াল। মেসের ওপারেই ছিল বিস্তৃত চর, তার পর নদী। ওখানকার দু-তিনজন বন্ধুর একজন রেজাউলকে জ্যোৎস্নার কিছু অলৌকিকতা আছে—এই প্রলোভনে সেই চরে একদিন নিয়ে যায়। সেদিন আসলেই ভাসা চোখের মতো টলটল করছিল চাঁদ। শূন্য খাড়া চরাচরে কেবল কুমড়ো খেতে শেয়ালের কান্নার শব্দ। হু হু বাতাসে সেই লোকটা তাকে বালুর মধ্যে চেপে ধরল... সেই প্রথম অভিজ্ঞতা... রেজাউল ম্লান কণ্ঠে বলছিল, 'এরপর মেসের অন্য ছেলেরাও এ খেলায় মত্ত হয়ে পড়ে। জানো, তখন পর্যন্ত আমি অ্যাকটিভ ছিলাম না। প্যাসিভ হিসেবে ব্যবহৃত হতাম, কিন্তু একদিন সেই বন্ধুদের সাথে আমার মেথরপট্টি যাওয়ার সুযোগ ঘটে। সারারাত সেখানে ঢোল করতাল, নাচগানের আসর চলত। আসরের মধ্যে চলত বোতল বোতল 'বাংলা'র চর্চা। সারারাত মত্ততার পর দু-একজন মেথর মেয়ে দেহ-ব্যাবসার কাজে নেমে পড়ত। যা হোক, আমি তখন মদ গিলে অজ্ঞান। একটি মেয়ের সাথে ধবল আলো ফুটবার সময় জীবনের প্রথম দৈহিক সম্পর্ক হয়, সে অবশ্য আমাকে তেমন আনন্দ দিতে পারে না। আমি অনুভব করি একজন পুরুষই অনেক চৌকশ, এবং রোমাঞ্চকর। তারপর থেকে ধীরে ধীরে আমিও অ্যাকটিভ হয়ে উঠতে থাকি', কী প্রয়োজন ছিল এইসব গল্প আমাকে বলার? আমি ওর সততাকে সম্মান করব, সেই জন্যে? না-কি আমাকে অবলীলায় সব বলে দিল বলে ব্যাপারটাকে আমার প্রতি তার অবজ্ঞা হিসেবে নেব বলে? আমি প্রচণ্ড বাধায় ওকে থামিয়ে দিয়েছিলাম—থামো, আর শুনতে চাই না।...

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ফলে, মেসের কথা শুনেই আমার মাথায় দাবাগ্নি। তাছাড়া তখন আমি এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করি না রেজাউলকে। রান্নাঘরে এসে চাপা ক্রোধে ফেটে পড়ি।

'একটু কষ্ট করো না কিছুদিন'—রেজাউলের স্বরে মিনতি। 'আমার ভীষণ স্নেহের ছিল সে। তুমি বিছানায় থাকলে, আমরা দুজন না হয় ফ্লোরিং করব?'

'চালাচ্ছিলে বাইরেই চালাতে', হিসহিসে গলায় বলি, 'ঘরে টেনে আনার কী দরকার ছিল?'

'তুমি কী বলতে চাইছ?' পাথরের মতো মুখ হয়ে ওঠে রেজাউলের।

'কী বলতে চাই বোঝ না?' আমি তেমনিই ক্ষিপ্ত, 'একসাথে নীচে থাকার আনন্দে তুমি ভুলে যেতে পারো দুজন পুরুষসহ একটি ঘরে একজন মহিলার ঘুমানোটা কতখানি অশ্লীল। তা-ও এই অবস্থায়, গরমে আমি গায়ে কাপড় রাখতে পারি না। কিন্তু আমিতো সেটা ভুলতে পারি না।'

কিছুক্ষণ রক্তচোখ করে সে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আচমকা আমাকে টেনে ঘরে নিয়ে আসে। ছেলেটি ম্যাগাজিন পড়ছিল। আমাকে হতবাক করে দিয়ে টেনে তাকে বিছানায় ফেলে রেজাউল এলোপাতাড়ি চুম্বন করতে থাকে। তার হাত দ্রুত চলমান ছেলেটির সর্বাঙ্গে। বিস্ময়ে বিমূঢ় আমি। হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকি। এক সময় সে হাঁপাতে থাকে। লজ্জায় অস্বস্তিতে মৃতপ্রায় ছেলেটি আমার দিকে তাকিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। প্রায় চৈতন্যহীন অবস্থায় আমি মেঝেতে বসে পড়ি। গলা শুকিয়ে এসেছে। অসম্ভব কাঁপুনি শরীর জুড়ে। ঘৃণায়, ভয়ে, কান্নায় রেজাউলের দিকে তাকাতে পারি না।

এ-ঘটনার পাঁচদিন পর আমি হাসপাতালে ভর্তি হই। সেদিন অল্প ব্যথা অনুভব করছি সকাল থেকেই। দুপুরের পর সেটা আরেকটু বাড়তির দিকে। এর আগে দু-একবার এরকম ব্যথা হয়েছে। নিজেকে টেনে হাসপাতালের আউটডোরে গিয়েছি, ডাক্তার বলেছে, ফলস্ পেইন। কিন্তু সেদিনকার ব্যথাটা সত্যিই অন্য রকম। এইভাবে একসময় রাত আসে গুটিগুটি পায়ে। কী অপার শূন্যতা! ধাপে-ধাপে ব্যথা বাড়ছে। আমার মুখের ওপর রেজাউলের উদ্বিগ্ন মুখ। চোখ বন্ধ করি, আহ্, অসহ্য যন্ত্রণা। নিরন্তর বেড়ে চলেছে। যত গভীর হচ্ছে রাত, ততই বল্লমের ধার। ঘা দিচ্ছে পেছন থেকে। শিশুর মতো চিৎকার করি। নার্স এসে দেখছে বারবার, ঘেমে ভিজে উঠছি। আমার শরীর বাঁকা, ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এক সময় আমার বিষময় দেহ ট্রলিতে ওঠানো হল। এর আগে ডাক্তার বারবার চেক করেছে, দেখেছে, সেই মহান শিশুটি যে পথে আসবে তার দরজা খুলছে না। অথচ জল ভাঙতে শুরু করেছে। উদ্বিগ্ন হয়ে ডাক্তার বলেছে, 'চাপ দিন, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চাপ দিন।' সেই শক্তি কি আমার আছে? এক ফোঁটা চাপ দিতে গেলেই বল্লমের ধার বিষাক্ত হয়ে ওঠে। এর মধ্যে আমাকে অসাড় করে দিয়ে পেটের মধ্যে শিশুটি যেন চুপ হয়ে গেল। আশ্চর্য, মরে গেল কি? গলা ফাটিয়ে কাঁদছিলাম, 'মরে যাক! ডাক্তার আমার পেট কেটে ফেলুন! রেজাউল, শুয়োরের বাচ্চা, এ-কী দিলি তুই আমার পেটে?'

কোথায় যাচ্ছি? যাচ্ছি কি আগুনের বিশাল হাঁ-এর দিকে ক্রমাগত? ঘাম স্রোতের মধ্যেও ঝলসে যাচ্ছি, পুড়ে যাচ্ছি।

তারপর শিশুর প্রচণ্ড চিৎকার। জল ভেঙে প্রবল বেগে বেরিয়ে আসার দরুন বাচ্চাটা প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে পড়েছিল। ও বেরিয়ে আসার পর অন্য সমস্যা, ফুল বেরোচ্ছে না। আমি তখন অতসব প্রবল বাধার কতটুকু বুঝি? নিঃসঙ্গ আমার সব সমাধান কী করে ডাক্তার করেছিলেন, কে জানে? নির্ভার শরীর তখন নেতিয়ে এসেছে। শিশুটিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ধুইয়ে-মুছিয়ে যখন শোয়ানো হল আমার পাশে, দৌড়ে আসে রেজাউল। আর আমি সেই মুখ দেখে সব কিছুর পর নিজের বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পাই। তারপর তার অসুস্থতা, মৃত্যু। এজন্য আমি অনেকটাই দায়ী করি রেজাউলকে। তখন নিরন্তর হতাশায়-যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি আমি। শিশুর চিৎকারে কেঁপে উঠছে আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। টাকা, স্যালাইন-ঔষধ—আমি আঁকড়ে ধরি রেজাউলের শার্ট—জোগাড় করো।

'কোথায় পাব?' তার এই জবাব শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি কাঁপা কাঁপা হাতে তার জামার কলার চেপে ধরি। 'কোনো প্রচেষ্টা নেই। সারাদিন বাইরে থেকেও একজন লোক মৃত্যুমুখী নবজাতকের চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে পারে না?'

সারাদিন সে ছুটে বেড়ায়। সন্ধ্যায় হাসপাতালে ফিরে দেখে আমার বিকারগ্রস্ততা। একদিন চিৎকার করে বলি, 'ভিক্ষে করতে পারো না? অথবা তুমিই থাকো ওর পাশে, আমি শরীর বেচে নিয়ে আসি।'

'পাগল হয়েছ তুমি?' চিৎকার করত সে। 'যা পারছি, তাতো আনছিই।'

ও যা আনে, তাতে করে একটা স্যালাইনের দামও হয় না, পাগলের মতো কাঁদতে থাকি। 'ওকে তুমি বাঁচাও, প্লিজ।' ফলে রেজাউলের পালিয়ে থাকা বেড়ে যায়। সে হতাশ হয়ে, সত্যজিৎদের আড্ডায় পড়ে থাকে।

একদিন স্তব্ধ হয়ে যায় সব।

ভাবতে-ভাবতে আবার বুক শূন্য হয়ে আসে। শিশুটি হাসছে। ওইতো টেবিলের ওপর বসে, মেঝেতে শুয়ে, চেয়ারে পা ঝুলিয়ে, কখনো শূন্যে ভেসে। কী অভিনব বিচিত্র সেই হাসি! তৃষ্ণার্ত চোখে চেয়ে থাকি। নিজের ভেতরে ক্রমাগত বিশ্লেষণ চলে। কেন রেজাউলকে দায়ী করছি ওর মৃত্যুর জন্য? রেজাউলের দারিদ্র্যের জন্য কি তাকে দায়ী করা চলে? একটি শিশুর জন্য কি পিতার আকুতি কম থাকে? কিন্তু আকুতিরও তো রকমফের আছে। কেউ বুক পেতে শিশুকে আগলায়, কেউ সন্তানপালনের অক্ষমতায় রাস্তায় ফেলে যায়। দুটোরই উদ্ভব মায়া থেকে। নিজের সন্তানের ক্রমান্বয় পতন সহ্য করতে না পেরে শূন্যের হাতে তাকে ছেড়ে দেওয়া। আমার স্পষ্ট মনে আছে, সেই উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় আমি তাকে বলেছিলাম, তার বাড়িতে তার নামে যেটুকু জমি আছে, সেটা বিক্রি করে দিতে। কিন্তু এব্যাপারে রেজাউল ছিল অনড়। বলেছিল, তবে তো চিরদিন শূন্যতায় বসবাস করার জীবনকে বেছে নিতে হয়? আমি হাজার যুক্তি দাঁড় করিয়েও এর উত্তর খুঁজে পাই না। কেননা রেজাউলকে আমি ছেড়ে এসেছিলাম নিজস্ব অনুভূতির এক ঘৃণিত বিষাক্ত বোধ থেকে।

দরজায় নক হচ্ছে। কামাল ভাই বেরিয়ে যাওয়ার পর ভোরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে শানু। অনেক রাত অবদি দুজনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হওয়ার ব্যাপারটা টের পাওয়া গেছে। আমি তখন পেইন্টিং-এর গভীরে। এদের এসব এখন বড্ড গা সয়ে গেছে। অবিন্যস্ত শাড়ি ঠিক করে উশকো চুলেই দরজা খুলি। খুলেই মহা প্রাণখোলা হাসি হাসতে-হাসতে দরজায় ইরফান চাচা। প্রশ্ন করেন, 'আসবে?'

'সে কী!' আমার বিস্ময় কখনও কাটে না। 'এত সকালে? আজব মানুষ আপনি! আসুন', সাদর আহ্বান জানিয়ে পরিচ্ছন্ন কাপড় নিয়ে বাথরুমে চলে যাই। কিছুটা পরিপাটি হয়ে বেরিয়ে দেখি, তিনি আমার পেইন্টিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। কী অস্বস্তিকর অবস্থা! ছবিটা এখনও পুরো অবয়ব পায়নি। আরও কিছু কাজ বাকি, আর এইরকম আনাড়ি অবস্থায় ভদ্রলোকের আগমন। কেমন মিইয়ে যেতে থাকি। ভেতরের চাপা উত্তেজনায় ঘেমে উঠি। আমি ছবি আঁকা শুরু করেছি, ভেবেছি, তিনি বিস্ময়ে আনন্দ প্রকাশ করবেন। কিন্তু তা-না করে খুব গম্ভীর গলায় শুধু বললেন, 'তোমার পেইন্টিং-এর মজাটাই এখানে। কোনো নিপুণতার ধার ধারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

আনাড়িপনার মধ্যেও চিন্তা দিয়ে তাকে তুমি সুন্দর করে তোলো। সম্ভবত আমিও আনাড়ি সমঝদার।'

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না খুশি, না দুঃখিত হব। চেয়ারে বসে শার্টের হাতা গোটাতে থাকেন তিনি। আমি বিছানায়। তিনি বললেন, 'পুরো ক্যানভাস জুড়ে বীভৎসতা। একটি কিশোরী, মরার মতো মুখ, চেয়ে আছে আলোর শিখার দিকে। অন্ধকার মৃত্যু তাকে গ্রাস করছে। বেড়াল, কুকুরের খণ্ডিত মাথা। দৈত্যের মতো একটি মুখ, ঝাপসা দেখা যাচ্ছে, দু-হাত ওপর দিকে ওঠানো। সম্ভবত মেয়েটিকে সে উঠিয়ে নিতে চাইছে। ভীষণ জটিল।'

'না না উঠিয়ে নিতে চাইছে না', আমি বলি, 'অবশ্য কেউ সেভাবে ভাবলেও ছবির কোনো ক্ষতি হবে না। পুরো আইডিয়াটা একটা সত্য ঘটনাকে ঘিরে। মেয়েটি আমার ছোটো বোন রানু। তখন সে কিশোরী। আসলে দক্ষতার অভাবে সেই আইডিয়ার কিছুই ফুটিয়ে আনতে পারিনি এখানে।'

'দৈত্য, খণ্ডিত মস্তক'—কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করেন তিনি—'এর মধ্যে রানু, এটা কি তার কোনো স্বপ্নকে ঘিরে?'

'না', আমি অস্থির স্বরে বলি, পুরো ব্যাপারটা মনে পড়ায় কেমন এলোমেলো লাগে, বলি, 'আসলে ও এক অদ্ভুত শিকার। ওই দৈত্যের মতো লোকটার নাম আবদুল আলী মজুমদার।'

ইরফান চাচা চুপ হয়ে যান। আশ্চর্য, কৌতূহল প্রকাশ না করাটা এদের এক অভিনব ভব্যতা। কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলি না। তিনি বলেন, 'তুমি শুরু করেছ, আমি আনন্দিত হয়েছি। আমার অনুরোধ একটাই, নিজের ওপর আস্থা হারিয়ো না।'

কিছুক্ষণ থেমে তিনি বললেন, 'জানো নীনা, একসময় আমি প্রচুর ভ্রমণ করেছি। বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতে। যে জাত শিল্পী, কোনোরকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও যে তার শিল্পকর্ম অভিনব হয়ে উঠতে পারে, সেটা আমি প্রথম পর্যবেক্ষণ করি কোনারকের সূর্যমন্দির দর্শনের পর। ঘোড়া, রথ, হাতি, রমণীর নৃত্যরতভঙ্গি... কী অসাধারণ সব শিল্পকর্ম! পাথর কেটে কেটে তৈরি করা ভাস্কর্য—মৈথুনরত নারী ও পুরুষ। ও রকম জীবন্ত, ও রকম প্রেমময় উষ্ণ অভিব্যক্তি—সারাজীবন ধরে দেখলেও চোখ ও মনের তৃষ্ণা মিটবে না। অথচ এসবের স্রষ্টা যেসব শিল্পী, তাদের হাতে-কলমের কোনো শিক্ষা ছিল না। তাদের পরামর্শটুকু দেওয়ার মতো কোনো শিক্ষকও ছিল না। কিন্তু কী করে যে তখনকার সামন্তপ্রভু বা রাজরাজড়াদের আদেশকে শিরোধার্য করে এত নিখুঁত মুর্তি গড়ত ওরা... নেপালের ওল্ড সিটির মূর্তিগুলোর কথাই ধরো, ওখানকার কৃষ্ণা টেম্পল, ষোলোশো গোপীর মাটির চেহারা, কারা করেছে ওসব? নীনা, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভার তুলনা হয় না। জ্ঞান তাকে সমৃদ্ধ করে মাত্র। কিন্তু প্রতিভাহীন জ্ঞান? সে দিয়ে কেবল পণ্ডিত হওয়া সম্ভব। তাজমহলের ভাঁজে ভাঁজে যে সৌন্দর্য তার নির্মাতা কি শাহজাহান ছিলেন? এর পেছনে ছিল কারিগর শিল্পীদের প্রতিভা, তুমি রিকশার পেছনে অনেক ছবি দেখো না? কারা আঁকে ওসব!'

আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনি। এই একজন নির্জন লোককেই কেবল উপসাগরীয় যুদ্ধ, হরতাল, সন্ত্রাস, কোনো কিছুই স্পর্শ করে না। তাই এর জলে ডুব দিতেই আমার সুখ। পালাতে সুখ। আমার দেয়ালের ক্যালেন্ডারে রমণীর সুন্দর মুখ ঝুলছিল। তিনি হাসেন, 'ক্যালেন্ডারের একটা নিয়ম বড়ো নির্মম, একটি সুন্দর ছবি তোমার সামনে ঝুলছে, কিন্তু হয়তো তার দর্শনের সময়ও মাত্র দু-মাস। মাস পেরুলেই সে বলে উঠবে, ওলটাও, অতিক্রম করো, ভেতরে আরও সুন্দর ছবি আছে।' সঙ্গে সঙ্গে সহজ তর্কে লিপ্ত হই,' কিন্তু ক্যালেন্ডারের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু ছবি নয়, তারিখ, সেহেতু আমি এতে নির্মমতার কিছু দেখি না... সময় বয়ে যায়, এটাতো মানতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

হবে।' তিনি হাসেন, 'তা-কী আর মানছি না? এই পাতা উলটে উলটে তো নিজেকে বুড়ো বানিয়ে ফেলছি। এখন আসল কথায় আসি, তোমার কি আজ কোনো ব্যস্ততা আছে?'

আমি মাথা নাড়ি, 'না।'

'চলো তাহলে বেরিয়ে পড়ি, জীবনটা একদিনের জন্য একটু পালটানো যাক, কী বলো?'

'কোথায়?' চাপা আনন্দের সাথে সাথে আমার ভেতরে বিস্ময়ের ঝিলিক।

'সে প্রশ্ন কোরো না, বেরিয়ে পড়াটাই আসল। কোথায়, সে চিন্তা পরে হবে।' এ লোক দেখি অদ্ভুত বোহেমিয়ান। আমার চুপসে যাওয়া স্বপ্নের আরেক রূপান্তর। কতদিন ভেতর থেকে ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠি—বেরিয়ে পড়ো নীনা, বেরিয়ে পড়ো... হয় না। কী হিসেব প্রতিটি পদক্ষেপে! দারুণ রোমাঞ্চ অনুভব করি। সেই চোখে চেয়ে থাকি, সেই সৌম্য, বাইরে স্থির অথচ ভেতরে অস্থির মানুষটির দিকে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি পরক্ষণেই আমার ক্যানভাসের দিকে। পুরো ছবিটার ময়নাতদন্ত করছেন যেন। হঠাৎ আমার চোখে ভর করে সেই কিশোর। পাদ্রিদের পোশাক পরা। ওমরের ভাই। স্বপ্ন দেখার পর সত্যি সত্যি দেখার বাড়তি টান অনুভব করছি এখন। ভেতরে আবারও জমা হয় বিষাদ। এখন হাসি নয়, শিশুর কান্না ভেসে আসছে। আমাকে বিবরবাসী করে দিয়ে সেই কান্না নিরন্তর বেজেই চলে। আমি স্থবির দাঁড়িয়ে থাকি। একটু পরেই নিজেকে ঝেড়ে ফেলি। ভেতরের দিকে দৌড়াই।

আক্রান্ত হই অজানার পথে পা বাড়ানোর অন্যরকম রোমাঞ্চে।

এবং বেরিয়ে পড়ি। রায়ের বাজারের ঘুপচি, ময়লা গলি থেকে বেরিয়ে রিকশা মহাশূন্যে। তিনি বলেন, 'জানো, এক সময় আমার একটা গাড়ি ছিল। তখন মনে হত এ ছাড়া কোনোদিন চলতে পারব না। এক সময় চরম সংকটে পড়ে সেটি বিক্রি করে দিই। সংকট কেটে যাওয়ার পর আর কেনা হয়ে ওঠেনি। বুঝলে নীনা, আমি হলাম গিয়ে সেই রাজা, যার প্রাসাদ আছে, সিংহাসন নেই'—বলতে বলতে নিজেই হাসতে শুরু করেন, 'বুঝলে, ভাবনার মজাটাই এখানে, নিজেকে রাজার নীচে নামানো যায় না।' তাঁর এইসব কথায় আমি নিঃশব্দে শুধু হাসি, কিছু বলি না।

উদ্দাম হাওয়া। ট্রাক, বাস, লরি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। চুল ওড়ার ফলে ইরফান চাচার প্রশস্ত কপালের অনেকটা উন্মোচিত।

এরপর নিঃশব্দে শুধু চারপাশ দেখে যাওয়া। কিন্তু খোলামেলা এই পরিবেশে আমি এখন অন্য মানুষ। ইচ্ছে হয়, সব উগড়ে দিই। ভেতরের সব জঞ্জাল, চাপা ক্ষোভ। সূর্য মেঘের পেটে, চারপাশে অদ্ভুত বৃষ্টিময় পরিবেশ।

'নীনা, তুমি আরব্য রজনী পড়েছ?'

আমি হেসে ফেলি—'সব না, কিছু।' আশ্চর্য, ক্যানভাসে মজুমদারের মুখ আঁকতে গিয়ে আমার আফ্রিদি দৈত্যের কথা মনে হচ্ছিল।

'তোমার যা প্রবণতা', তিনি বললেন, 'সেখান থেকে তুমি অনেক ছবি আঁকার উপাদান পেতে পারো। ওসব কাহিনির প্রায় গুলোতেই দেখবে, সুন্দর রমণীরা সুদর্শন স্বামী ফেলে নিগ্রোদের সাথে আনন্দ লীলায় মত্ত হচ্ছে। এবং স্বামী টের পেয়ে আর কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে সটান দ্বিখণ্ডিত করে ফেলছে স্ত্রীসহ নিগ্রো প্রেমিককে। তখন হত্যা আর শরীর—দুটোরই খুব গুরুত্ব ছিল। আরও বিচিত্র সব কাহিনি। পেইন্টিংয়ের ক্ষেত্রে এসব বৈচিত্র্য খুবই চমৎকার। অবশ্য আমি এসব বলছি পুরাণের প্রতি আমার আলাদা এক ধরনের মোহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

থেকে।'

'আমার আসলে আর্টের আদ্যোপান্ত জানা দরকার', আমি বলি। 'বলতে গেলে এ সম্পর্কে কোনো পড়াশোনাই আমার নেই।'

'আচ্ছা, আবদুল আলী মজুমদার কে?' তিনি প্রশ্ন করেন, 'অবশ্য তোমার অসুবিধে থাকলে বলার দরকার নেই।'

'এ ব্যাপারে আপনার নিস্পৃহতা আমাকে পীড়া দিচ্ছিল, আমি বলি, 'বড়ো কৃত্রিম বোধ হচ্ছিল। অত মেপে মেপে সভ্য হওয়া আমার প্রবণতার মধ্যে নেই।'

'আমার একটা বিশেষ স্বভাবকে তুমি কী করে মনে করছ এটা আমার তৈরি করা?' তিনি বলেন, 'আমি এভাবেই বেড়ে উঠেছি। আমি মনে করি, কেউ কিছু বলতে চাইলে সাগ্রহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলবে। তুমিই-বা মেয়ে অকপট হও না কেন? কিছু বলতে হলে অন্যের আগ্রহের দিকে চেয়ে থাকার ভান-ভনিতায় না গেলেই তো পারো।'

'বা-রে, শ্রোতার আগ্রহ না বুঝেই বকবক করব?'

'তোমার বলা তুমি বলবে। শ্রোতার দিকে তাকিয়ে নিজের স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট করবে কেন? আর নিশ্চয়ই যাকে নিজের নাজুক অধ্যায়গুলো বলা যায়, তার সম্পর্কে তোমার একটা ধারণা থাকবে। তুমি তো তা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছ না। এই রকম ভূমিকা শেষে অতঃপর শুরু হয় মূল গল্প। রিকশা-ঢাকা কলেজের সামনে দিয়ে এগোচ্ছে। কিছুক্ষণ পর প্রচণ্ড ভিড়ের গাউছিয়া।

এক দেশে ছিল এক মজুমদার। তাহার ছিল সুদের ব্যবসা। রানু নামের এক কিশোরী জন্মকাল হইতে তাহার বিকট চেহারাকে ভয় পাইত... মোটামুটি এই কায়দায়, যেন কাহিনিটা আমার থেকে কত দূরের। কোন কালে, কার আমলে এসব ঘটনা ঘটেছিল, সেসব বিষয়ের অন্তস্তলের বেদনা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে নির্বিকার বলে যাই, এইরকম খোলাপথে বেদনা নয়, কষ্ট নয়, বিস্মৃত হও নীনা, তোমার গতকালকার পৃথিবীর কথা।

রিকশা কখন ইডেন কলেজ পেরিয়ে পুরোনো ঢাকার ঘিঞ্জির মধ্যে প্রবেশ করেছে বলতে পারি না। ভীষণ সরু রাস্তা। দু-পাশে ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীন বাড়িগুলোর ভেতর দিয়ে যেতে যেতে অদ্ভুত এক ধরনের মজা অনুভব করি। যদিও সীমাহীন বদ্ধতা, কিন্তু প্রাচীনতার মধ্যে এক ধরনের রোমাঞ্চ আছে, যা পুলকিত করে। এদিকে আমার আসা হয় না কোনোদিন। বড়ো আশ্চর্য লাগে, জানালা আর এক চিলতে আকাশ ছাড়া ভেতরের মানুষগুলো বেড়ে ওঠে কীভাবে?

সব শুনে ইরফান চাচার স্বরে অকপট বিস্ময়—নৃশংস! এরচেয়ে হত্যাকাণ্ড অনেক পবিত্র। লোকটি, মানে মজুমদারও এক ধরনের নিপুণ হত্যাকারী। অভিনব তার পন্থা। খুব গম্ভীর দেখায় ইরফান চাচার মুখ। ঘটনাটা গভীরভাবে তাঁকে নাড়া দিয়েছে বোঝ যায়।

তিনি বলেন, 'এ প্রসঙ্গে আমার একটি তুলনা মনে আসছে। দস্তয়েভস্কির সময়কার এক ধরনের হত্যাকাণ্ডের কথা। একদল হত্যাকারী ঘিরে রেখেছে শিশুসহ মাকে। তারা শিশুটিকে মারার এক বিচিত্র কৌশল বের করেছে। প্রথমে আদর করে শিশুটিকে তারা হাসাতে চেষ্টা করে, শিশুটি হাসে। ঠিক সেই মুহূর্তে হত্যাকারী শিশুর মুখের খুব কাছে পিস্তল তুলে ধরে। তারপর পিস্তলটা যথারীতি নেওয়ার জন্য হাসতে হাসতে শিশুটা হাত বাড়ায়। ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয়। একে বলা হয় পাশবিক নিষ্ঠুরতা। কিন্তু সেই যুগে এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বিশ্লেষণ ছিল অন্যরকম। পশুরা এমন শিল্পকৌশলমণ্ডিত হত্যা করতে পারে না। অমন ভয়ানক নিষ্ঠুরতা কেবল মানুষের পক্ষেই সম্ভব।' বলতে বলতে ঝিম মেরে যান তিনি এবং আমিও কেমন থিতিয়ে আসতে থাকি। কোনো মানে ছিল না আজ এই প্রসঙ্গ তোলার। আজ বেহিসেবি বেরিয়ে পড়েছি। অসহনীয় হয়ে উঠেছে জীবনের রূঢ়তা। প্রতিদিনকার শ্বাসরুদ্ধকর বন্দিত্ব।

তিনি বলেন, 'ঠিক আজকে এমন উন্মুক্ত একটা অবসরের দিনে এসব প্রসঙ্গ ওঠায় তোমার খারাপ লাগছে হয়তো এবং একজন মানুষ হঠাৎ একটা দিনকে আনন্দময় করে তুলতে চাইলে সাধারণত এমনটা মনে হতেই পারে। কিন্তু নীনা, আমি অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছি, নিজের কাছ থেকে পালিয়ে একটি মুহূর্তের জন্যও মানুষের পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব নয়। যদি সুখী হতে চাও, তাহলে দুঃখকে মাঝে মাঝে বুক থেকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নাও। তারপর তাকে সেই হাতের মধ্যে নেড়েচেড়ে পাশাপাশি বুকের মধ্যে জায়গা করে দাও আনন্দকে। তাতে করে আনন্দের গভীরতা বাড়ে। কিন্তু একদিনের জন্য দুঃখকে সমূলে সরাতে চেয়েছ তো আনন্দের ভানই হবে সার। সত্যিকার আনন্দ কিছুতেই পাওয়া পাওয়া যাবে না।'

'আমি যদি বলি, আপনি নিজেই তো সে কাজটি করছেন, আনন্দের ভান করে নিজের কাছ থেকে সারাক্ষণ পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাহলে?' আচমকা এমন ধারণা তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আমি অস্বস্তি এড়াতে সরু গলিগুলো দেখতে থাকি। ডানে-বাঁয়ে মানুষের প্রচণ্ড ভিড়ের ফাঁকফোঁকড় দিয়ে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে রিকশা। সামনেই একটা বিশাল ভঙ্গুর বাড়ি। জায়গায় জায়গায় ইট ঝুলে পড়েছে। দেয়াল ফুঁড়ে উঠেছে অসংখ্য বটের চারা। নিশ্চিত মনে হয় ইটের স্তূপ আকাশ ছুঁয়েছে। এবং এ বাড়িতে কোনো সিঁড়ি নেই। মাথা কাত করে অবাক হই। প্রায় চুড়োয় একটা জানালা এবং তাতে পর্দা টাঙানো। ওখানেও মানুষ থাকে? আসলে মানুষের পক্ষেই সব সম্ভব, কথাটা নতুন করে মনে হয়। লাইটার দিয়ে সিগ্রেট ধরিয়েছেন তিনি। ধোঁয়া উড়িয়ে বলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই আমার সংসার আর স্ত্রীর সাথে আমার সম্পর্কের ব্যাপারটাকেই আকারে-ইশারায় বোঝাতে চেয়েছ?'

এবার আমার মুখে তালা। আরেক প্রস্থ ধোঁয়া ছেড়ে তিনি বলেন, 'কিছু ব্যাপার আছে যা কিছুতেই কাউকে বলে বোঝানো যায় না। আমি আমার কোনো ব্যাপার কারও কাছে তুলে ধরায় অভ্যস্ত নই। আমার শুভাকাঙ্ক্ষী প্রচুর। কিন্তু তারা কেউ কোনোদিন আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারের একাংশও জানতে পারেনি। আমি দাবি করছি না আমার এই অভ্যাসটা খুব ভালো, সব জায়গায় গ্রহণযোগ্য।'

'দুঃখিত', আমি বলি। 'আমার কৌতূহল সম্ভবত অভদ্র রকমের।'

'অত ভদ্রতা কোরো না'—তিনি বলেন, 'বিনয় তোমার মধ্যেও কম নেই।' রিকশা এসে থামে সোওয়ারি ঘাটের কাদা-জলে থিকথিকে রাস্তার মধ্যে। সামনেই সুবিশাল বুড়িগঙ্গা। ঢাকার এত কাছে একটা নদী। কোনোদিন এদিকে আসা হয়নি। মেঘ ফুঁড়ে রোদ উঠেছে। বড়ো তেজহীন, মায়াময়। ভাড়া চোকানোর পর সেই থিকথিকে রাস্তা পেরিয়ে ঘাটের কাছে দাঁড়াই। অসংখ্য নৌকা, গিজগিজ করছে মানুষজন। এত মানুষ, এত নৌকার ভিড়ে এই জায়গাটায় এসে নদী তার রহস্য হারিয়েছে।

এত প্রবল ঢেউ! ছোটো নৌকাগুলো উত্থান-পতনের মধ্যে আন্দোলিত হচ্ছে বেশ। পাশাপাশি উদ্দাম হাওয়া। আমি বেশ চমৎকৃত হই। কিন্তু মগ্ন মুডটাকে নষ্ট করে দেন ইরফান চাচাই। বলেন, 'অত স্রোতের মধ্যে নৌকায় ওঠাটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। চলো, অন্য কোথাও যাই।' আমার ঠোঁটে উত্তর তৈরিই ছিল। সামনে এমন বিস্তৃত জল। তাতে অবগাহন না হোক, তার বুকে নৌকোয় চেপে একটু বিহারও করতে না পারার অতৃপ্তি নিয়ে ফিরে যাব, কোনো মানে হয়? বলি, 'এই প্রথম বোঝা গেল আপনার বয়স হয়েছে। এ বয়সে কারও পক্ষে কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হয় না।'

কেমন তেতে ওঠেন তিনি, 'তুমি কি আমাকে বালক ভাবতে শুরু করেছিলে? তা ছাড়া বোকার মতো হঠাৎ কোনো কিছুতে ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া, তারুণ্যের এরকম ধর্মকে কোনো ম্যাচিয়র্ড লোক সাপোর্ট দেবে?'

'সাপোর্টের ধারতো তরুণরা ধারে না', তাঁর ক্রোধ আমাকে রোমাঞ্চিত করে, বলি, 'অবশ্য সব তরুণের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য বলে আমি মনে করছি না। কিছু তরুণ আবার জীবনের সবটাতেই অত্যন্ত হিসেবি। অবশ্য প্রেমের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় হিসেবকে জলের তোড়ে ভাসিয়ে দিলেও হিসেবটা তাদের নির্ভুল থাকে বিয়ের ক্ষেত্রে।'

'তুমি কি তোমার নিজের জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে কথাগুলো বলছ?' তিনি রহস্যময় ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেন।

'না', আমি এবার স্বরে দৃঢ়তা এনে বলি, 'কেন না বোঝার ভান করছেন?'

একটা ডিঙি নৌকা কাছে এগিয়ে এলে আমাকে ওঠার জন্য ইশারা করেন তিনি। লাফ দিয়ে উঠে পড়ি তাতে। তারপর তিনিও। সার সার নৌকার ভিড় ঠেলে এক সময় সেটা মুক্ত জলের ওপর গিয়ে পড়ে। জলের ঠান্ডা স্পর্শ... টের পাচ্ছি এবং বাতাস... আহ্ কী চমৎকার দোলা!

'তোমাদের ডিভোর্সটা কার পক্ষ থেকে হয়েছিল?' খুব সন্তর্পণে তিনি এই প্রশ্নটা করেন। মূল প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছেন দেখে ভেতরে ভেতরে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠি। যাকগে, কেউ এমন অপমানজনকভাবে কিছু এড়াতে চাইলে আমিই-বা কেন গায়ে পড়ে আগ্রহী হয়ে উঠব?

কিন্তু এই প্রথম এতদিন পরে তিনি আমার দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলেন। আমি টের পাই, বড়ো নাজুক বিষয়। বিশেষ করে কাউকে এসব বলা। কোনো মানে হয় না। কিন্তু এই খোলা আকাশ, অবিশ্রান্ত ঢেউ... ইচ্ছে হচ্ছে খুলে ধরি, সব, বেরিয়ে যাক, সব পাপ, সব গ্লানি, তিতকুটে বোধ, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে না পারি, অনুভব দিয়ে যদি সম্ভব হয়? কাঁধে একটা ব্যাগ ছিল। তার ভেতর থেকে চিপসের প্যাকেট বের করে তিনি বলেন, 'খাও'।

'আপনি ব্যাগে এসব রাখেন? ভারী মজার তো।' প্যাকেট খুলে দাঁতের নীচে পাঠিয়ে দিই এক টুকরো। নির্লিপ্ত গলায় বলি, 'ডিভোর্স আমিই দিয়েছি।'

'কেন দিয়েছিলে?'

'সে সব আপনাকে বোঝানো যাবে না।'

'বিয়েটা কি প্রেমের ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'সংসার কতদিন করেছ?'

'জেরা করছেন কেন? দু-বছরের মতো।'

'এত তাড়াতাড়ি একটা মানুষকে চিনে ফেলেছিলে? যদি বলি, তুমি দাম্পত্য জীবন কী, তা না জেনে যেমন জীবন শুরু করেছ, তেমনই না জেনেই সেটা পায়ে মাড়িয়ে এসেছ? বিয়েটাকে নিছক ইয়ার্কি মনে করে...।'

'আপনি এসবের কতটুকু জানেন?' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি আমি, 'কিছু না জেনে আপনাকে অমন মন্তব্য করার অধিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কে দিয়েছে?'

তিনি খুব নরম স্বরে হাসেন, 'তোমার বয়স খুব কম নীনা। সে জন্যেই খুব দ্রুত উত্তেজিত হয়ে ওঠো। তুমি নিজেই চিন্তা করে দ্যাখো, কোনো ঘটনার অনেক দূরে দাঁড়িয়ে থেকে মন্তব্য করাটা কতটা বোকামির। হতে পারে ভেতরটা নোংরা, কিংবা সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, কিন্তু তার জন্য সবচেয়ে আগে দরকার মূল অবস্থাটি ভেতর থেকে পর্যবেক্ষণ করা। প্রেম এবং বিয়ের ক্ষেত্রে হিসেবের যে ফিরিস্তি তুমি দিয়েছ, খুবই সস্তা সেই দৃষ্টিকোণ, আমি তোমার কাছে তেমন বিশ্লেষণ আশা করিনি।'

প্রচণ্ড শব্দ তুলে একটা লঞ্চ এগিয়ে যায়, ফলে ঢেউয়ের আঘাতে প্রচণ্ডভাবে দুলে ওঠে নৌকাটা। টাল সামলে কাত হয়ে পড়ি দুজনই।

'আসলে খোঁচাখুঁচি বন্ধ করলে আমাদের সম্পর্কটা আরও অপকট, সরল হতে পারে'—আমি এবার সহজ পথে আসি, 'চালাকির খেলায় বড়ো ক্লান্ত বোধ করছিলাম। সেটা আমাদের দুজনের জন্যই মনে হয় ভালো হবে। মানুষের প্রাণভরে কান্নার মতো অন্তত একটা জায়গাতো থাকতে হয়।'

'শোনো', তিনি হঠাৎ শুরু করেন, 'আমাদের দাম্পত্য জীবন কখনও সুখের ছিল না, সহজ করে বলতে গেলে প্রথমে এটাই বলতে হয়। এবং জটিলতায় না গিয়ে আরেকটা কথাও খুব সরল করে বলা যায়, তোমার মার সাথে আমি, সাদা অর্থে যাকে প্রতারণা বলি, তাই করেছি। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের অ-সুখতার সাথে সেই ঘটনার তেমন অর্থে কোনো সম্পর্ক নেই।'

চিপস চিবুচ্ছি। জলের চঞ্চলতা দেখছি। বাতাস এড়িয়ে কৌশলে সিগ্রেট ধরান তিনি—'কিন্তু সে ঘটনা নিয়ে আগেও বলেছি, আমার কোনো অনুতাপ নেই। তার সাথে আমার সম্পর্ক অনেক গভীর ছিল এবং পুরোটাই ছিল বয়সের একটা মায়া বা মোহ যা-ই বলো। এক সময় তার থেকে বেরিয়ে নিজেকে বিশ্লেষণ করি। তোমার মার স্বপ্ন ছিল একটা ঘর, বারান্দা আর বাগানের মধ্যে সীমিত। পৃথিবীর আর কোনো বিশালতা, সৌন্দর্য সম্পর্কে তার জ্ঞান বা আগ্রহ কোনোটাই ছিল না। ছোটো ওই বৃত্তের বাইরে কখনোই তার চিন্তা পাখা মেলতো না। আমার কোনো শৌখিন জিনিস কেনা, দুর্লভ জিনিস সংগ্রহ করা, ভ্রমণের নেশা—এ সবকিছুই তার কাছে বাজে খরচ বলে মনে হত। তিক্ততা কিংবা অনীহা প্রেম নষ্ট করে দেয়। আমি, বুঝলে, এক সময় হাঁপিয়ে উঠতে শুরু করি, বুঝতে পারি, স্ত্রীকে আসলে আমি বন্ধু হিসেবে পেতে চাই। শুধু সামাজিকতার কথা চিন্তা করে তাকে যদি আমি বিয়ে করি, তবে সেটা তাকে করা হবে করুণা করে। আমি অন্তত তার ভালোবাসার প্রতি অশ্রদ্ধাশীল হতে পারি না। জানো, তখন এ নিয়ে নিজের সাথে অনেক যুদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধ হয়েছে নিজের বিবেকের সাথে, অনুভবের সাথে, এক সময় এমন একটা সময় আসে, যখন আর পেরে উঠি না। পালিয়েই আসি বলতে গেলে। তার ওপর অদ্ভুত একটা মায়া জন্মেছিল। ঢাকায় এসে তাই ছটফট করতাম। তারও বেশ কিছুদিন পর একটা আর্ট একজিবিশনে আমার স্ত্রীর সাথে আমার পরিচয় হয়। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় ওরকম প্রদর্শনীতে মেয়েরা যেত না বললেই চলে। ওর চালচলন, প্রখর রুচিজ্ঞান—এসবের প্রতি আমি বেশ আগ্রহী হয়ে উঠি'—বলতে বলতে ইরফান চাচা থেমে যান। আধপোড়া সিগারেটটা স্রোতের মধ্যে ছুঁড়ে দেন। খুব বিমর্ষ দেখায় তাঁকে। ফের শুরু করেন, 'এক সময় আমাদের বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের পর আমি ওর ভেতর এক ধরনের অসুস্থতা লক্ষ্য করি। ওকে বন্ধুদের আড্ডায়, খোলামেলা কোনো জায়গায় বা পার্কে নিতে চাইলে ওর মনে হত ও সুন্দর বলে ওকে আমি সব জায়গায় প্রদর্শন করতে নিয়ে যেতে চাই। ফলে ও আমার সান্নিধ্য এড়াতে শুরু করল। আলাদা বিছানা পাতল। আমার সাথে কোথাও যাওয়া, আমার বন্ধুরা এলে তাদের সামনে আসা, সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বন্ধ করে দিল। আমি ওকে ঘন্টার পর ঘন্টা বোঝাতাম এটা ওর একটা মনগড়া ভাবনা মাত্র। একে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক না, কিন্তু ও নিজের জেদ অনড় আঁকড়ে থাকল। এক সময় মনে হল, আমাকে হয়তো তার পছন্দ নয়, অথবা অন্য কিছু আছে, যা আমি জানি না। তন্ন তন্ন করে এর ভেতরের কারণ খুঁজতে শুরু করি। ও ছিল ওর বাবার একমাত্র মেয়ে। বিয়ের পর ও সেই সূত্রে বেশ সম্পত্তির অধিকারী হয়। এবং বিশ্বেস করো, এই সম্পত্তির ঘটনাকে ঘিরেই ওর মধ্যে একদিন লক্ষ্য করি তীব্র আত্মঅহংকার, সেই সাথে শ্লেষের বিষ-মাখানো কথার বাণ, যা ও সোজা ছুঁড়ে দিয়েছিল আমার দিকে। বলেছিল, 'তুমি শুধু আমার জন্য আমাকে বিয়ে করোনি। আমার যদি সম্পত্তি না থাকত, আমি যদি নিঃস্ব হতাম, নিশ্চয়ই তুমি আমাকে বিয়ে করতে না। এসব নিয়ে কতদিন কত দুর্বহ তর্কবিতর্ক!

'নীনা, তোমাকে কী বলব, তখন কী দুঃসহ দিন যে গেছে! অনেক পরে ও আমাকে বলেছিল, আমি যাকে খুশি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। যার সাথে ইচ্ছে থাকতে পারি, শুধু যেন স্ত্রী হিসেবে ওকে এ বাড়িতে থাকার মর্যাদা দিই। নইলে বাবার বাড়িতে ওর মুখ থাকবে না।

''তবে বিয়ে করেছিলে কেন?'' ক্রুদ্ধ গলায় জানতে চেয়েছি।

''বিয়েটা সামাজিকভাবে অপরিহার্য তাই।'' তারপর ওর সে কী কান্না! কান্নার গমক বুকে চেপে রেখেই বলে চলে, ও যখন কিশোরী, তখন থেকেই একজনকে ভালোবাসতো। আমার সঙ্গে বিয়ে হবার আগ পর্যন্তও সেই সম্পর্কটা অক্ষুণ্ণ ছিল। তাকে ও স্বামী বলেই মনে করত। ওদের বাড়িতে যখন কেই থাকত না, ছেলেটার সঙ্গে ও দৈহিকভাবেও মিলিত হত। এই রকম উদ্দাম সম্পর্কের মুখে তাদের দুজনার বিয়ের দিন-তারিখও পারিবারিকভাবে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু ছেলেটা তার আগেই চুপচাপ দেশ ছেড়ে চলে যায় অস্ট্রেলিয়ায়। এবং সেখানে গিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই বিয়ের কাজটি সেরে ফেলে। তারপরও ও তার সেই সাবেক প্রেমিকের জায়গায় অন্য কাউকে এখনো কল্পনা করতে পারে না, ঠাঁই দেওয়াতো দূরের কথা। আসলে কী জানো নীনা, প্রতিটা মানুষের জীবনই নায়ক কিংবা নায়িকার মতোই ঘটনাবহুল, কোনোটা পাথরচাপা, কোনোটা প্রকাশ্য।'

ইরফান চাচার মনের অর্গল যেন আজ খুলে গেছে। মনের এতদিনকার পাষাণ ভার যেন কমিয়ে ফেলতে চাইছেন পল কয়েকের ভেতরে। তাই বলে চলেন, 'এর মধ্যে আমাদের একটি সন্তান হয়। আমাদের সেই অসহ্য অস্বস্তিকর পরিবেশে কেমন অসহায়ের মতো সে বেড়ে উঠতে থাকে। তাই তার বয়স যখন সাত, আমি তাকে আমেরিকায় তার চাচার কাছে পাঠিয়ে দিই। তারপর থেকে আর কী, ঠেলাগাড়ির এই জীবন, ঠেলে যাও। অবশ্য, এসবের ফলে আমার লাভও হয়েছিল', এবার তার গলার স্বরে নিস্পৃহ অথচ একটা উৎসাহিত ভঙ্গি। 'মানুষ যেমন একদিকে বঞ্চনার শিকার হলে, অন্যকিছুতে আত্মসমর্পণ করে সেই বঞ্চনার ব্যাপারটা পুষিয়ে নেয়, আমার বেলাতেও তাই ঘটল। আমাকে পেয়ে বসল শিল্পকর্ম আর প্রাচীন কিছু সংগ্রহ করার পাশাপাশি ছুটিছাটায় কোথাও ভ্রমণের প্রবল নেশা। কিন্তু জানো নীনা, সত্যি বলতে কী, ওরকম অবস্থাতেও তোমার মার সঙ্গে আমার সম্পর্কের ব্যাপারটা নিয়ে আমার কখনোই কোনোরকম আপশোস বা অনুতাপ হয়নি। আমি একটিকে আরেকটি ব্যাপারের পরিপূরক ভাবতে পারি না। আমার জীবনের জন্য দুজনের কেউই প্রযোজ্য ছিল না। কেননা এই মহিলাকে বিয়ে না করে যদি তোমার মাকে করতাম, তখনও তো জানতাম না আমার পরিণতি এই হবে, ফলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াত, তার সঙ্গে আমার জীবনের যে সূচনা হত, দু-দিন না যেতেই তাকেও একঘেয়ে, ক্লান্তিকর আর বস্তাপচা মনে হত। মাঝখান থেকে তোমার মার জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠত। ভালোই হয়েছে, তাকে ঘেঁটে নষ্ট করিনি। তার অকৃত্রিম ভালোবাসা, অদ্ভুত সারল্য—এগুলোকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

আমার নিজের জীবনের পরম সঞ্চয় বলে মনে হয়।''

কেমন কষ্ট লাগছে। বুকের ভেতরটা খচখচ করছে। স্থির চেয়ে থাকি নদীর দিকে। হঠাৎ তিনি ঘোর থেকে যেন জেগে ওঠেন, ছোপ ছোপ প্রসঙ্গের ভেতর থেকে ঘাই দিয়ে তোলেন তর্জনী, 'নীনা, ওই দেখো নবাব বাড়ি।' আমি তল থেকে উঠি, দেখি, গোলাপি, পুরোনো অভিজাত নবাব বাড়ি। নদীর পাশ ঘেঁষেই। কানে বেজে ওঠে ঘুঙুরের শব্দ। শরাবের বোতলের টুংটাং। হেঁটে আসছেন নবাব, শব্দ পাই। গোলাপি ঘোরে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করি 'চমৎকার'! ইরফান চাচা হাসেন, 'চমৎকার বলছ তো। এরাই মানুষকে মানুষ মনে করত না। গর্ভবতী মায়ের পেটের সন্তান ছেলে কি মেয়ে, এমন বাজি ধরে জমিদারেরা তার পেট কেটে নিজেদের কথার সত্যতা যাচাই করেছে... আরও কত যে নিষ্ঠুরতা! অথচ আজ বলছি চমৎকার।' আমি সমস্ত ছায়াছিন্ন করে ঘোর থেকে বেরিয়ে আসি, 'বাদ দিনতো এসব।'

'এক জীবনের গল্প বিশ মিনিটে সেরে ফেললাম'—ইতস্তত করে আবার তিনি আগের প্রসঙ্গে, 'ঠিক এজন্যই বলতে চাই না। বড়ো ওপর দিয়ে যায় সবকিছু। পুরো ব্যাপারটা নিছক গল্পে পরিণত হয়। শ্রোতার মন যত নাজুকই হোক, প্রতিদিনের সূক্ষ্ম জীবনপাত, অনুভূতির গাঢ়তা কিছুতেই তাকে স্পর্শ করানো যায় না।'

আমি ফিরে আসি মূল প্রসঙ্গে, 'কিন্তু আমি যেদিন প্রথম আপনার বাড়িতে যাই, চাচির কাছে আমার পরিচয় দিই, জানেন, মার কথা শোনার পর সেদিন অদ্ভুত এক ভাবান্তর লক্ষ করেছিলাম তাঁর মুখে। এটাও তো হতে পারে যে, তাঁর সম্পর্কে আপনি যা ভাবছেন, সেটা ঠিক তা নয়। আপনার ব্যাপারে নির্বিকার হলে তিনি মাকে ঈর্ষা করতেন না।'

তিনি বলেন, 'সেটা তোমার দেখার ভুল হতে পারে। নিশ্চয়ই তোমার মন তৈরি ছিল ওই প্রসঙ্গটি এলে আমার স্ত্রী কিছুটা বিচলিত হবে, এই রকম ভাবনায়।'

আমি প্রতিবাদ করি, 'আপনি কেন ভাবছেন সেই ত্রিশ বছর আগের একজন মহিলার এত বছর পরও কোনো রকম রূপান্তর হয়নি? হতে পারে দীর্ঘ বছরের ব্যবধানে তিনি সব বিষয়ে সহজ হয়ে এসেছিলেন। আপনিও-বা কেন জেদ ধরে পড়ে থাকলেন? তাঁর পরবর্তী অবস্থার কোনো খোঁজ নিলেন না কেন? আমি বলতে চাইছি, আপনার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো চেষ্টা ছিল না কেন?'

'দেখো'—তিনি বলতে থাকেন, 'সে আমাকে তার সব কথা জানিয়েছিল বলেই যে তার সাথে আমার সব সম্পর্ক চুকেবুকে গিয়েছিল, সেটা কেন ভাবছ? আমরা প্রতিদিন এক টেবিলে খেতে বসি। এই দীর্ঘ জীবনে তার ঘরে বেশ কয়েকবার রাত যাপন করেছি, কিন্তু সেটা ছিল নিতান্তই সাদামাটা জৈবিক চাহিদা থেকে। সঠিক অর্থে, ঘৃণা ছাড়া তার মধ্যে প্রাণ ছিল খুবই কম।'

'আপনি কী করে ভাবছেন এই দীর্ঘ বছরেও তাঁর মধ্যে কেবল ঘৃণাই সঞ্চিত ছিল? হতে পারে সেটা আপনার ভাবনা। তার ভেতরকার পরিবর্তনের কোনো খোঁজ নিয়েছেন কখনোও? হতে পারে আপনাকে তিনি যা কিছু বলেছেন, সে জন্য আজীবন তাঁর ভেতরে জড়তা থেকে গিয়েছিল, যেটাকে আপনি ঘৃণা বলে মনে করছেন?' বলে আমি তাকাই মহাশূন্যের দিকে। তরঙ্গিত নদীর ওপর আকাশ নেমে এসেছে। দুপুর গড়াচ্ছে। বরিশাল টু ঢাকার বিশাল লঞ্চগুলো অনড়, এক ঠায় দাঁড়িয়ে। ইরফান চাচার আঙুলের নির্দেশে ঘাটে নৌকা ভেড়ে। আমি দেখি, গোলাপি নবাব বাড়ি ডুবে আছে জলে।

'নীনা', তিনি আবার শুরু করেন, 'আসলে যুক্তি আর তর্ক দিয়ে মানুষের অনুভূতি কিংবা বিশ্বাস এসব কিছুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বোঝানো যায় না। আমি এর মধ্যে আছি, দেখছি প্রতিদিন, তোমার কথা হয়তো ঠিক, ওর ভেতরকার পরিবর্তনের কোনো খোঁজ হয়তো আমি নিইনি। কিন্তু পরিবর্তন হলে, তাকে স্পর্শ করে তা টের পাব না, আমার ইন্দ্রিয়কে আমি অত দুর্বল মনে করি কী করে?'

কাদা থকথকে ঘাট। সামনে ঘিঞ্জি নৌকার সারি। মাছের আঁশটে-পচা ঘ্রাণ! ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামতে শুরু করেছে। দু-তিনটে নৌকায় পা রেখে রেখে লাফিয়ে ঘাটে উঠি। কাদা, জল আর আবর্জনার স্তূপে পুরো ঘাট ঠেসে আছে। দুটো বাঁশ কাদা থেকে এক ফুট ওপরে আড়াআড়ি শোয়ানো। শুকনো জায়গায় গিয়ে তার মাথা ঠেকেছে। ভীষণ সাবধানে ধীরে পা ফেলে পার হই। এত বিচিত্র মানুষের সমাবেশ। ঘামের ভ্যাপসা বদ্ধতা। জায়গাটা পার হয়ে রিকশার কাছে এসে তিনি প্রশ্ন করেন, 'এবার মনে হয়, আমাদের খিদে লাগা উচিত, এখানকারই কোনো হোটেলে বসি, কী বলো?'

'এ হল গিয়ে জা-গ-তি-ক কিংবা মৌলিক চাহিদা, এর কাছে এসে বাঘের মতো মনও ইঁদুর হয়ে যায়, চলুন'... বলতে বলতে রিকশায় চেপে বসি। আবারও ঘুপচি গলিঘুঁজি। মৃদু বৃষ্টিপাতের ফলে মাথার ওপর হুড তুলে দিয়ে দু-জোড়া পা থেকে বুক পর্যন্ত অয়েলক্লথে ঢেকে নিতে হয়। বৃষ্টিতে রিকশার সাইজ কি ছোটো হয়ে গেছে? বড্ড অস্বস্তির এই ঠাসাঠাসি। নিঃশব্দে অনেক পথ—লক্ষ্মীবাজার, পাতলাখান লেন... হাজারো বাঁকের পাক কষে এক সময় রিকশা এসে দাঁড়ায় স্টার হোটেলের সামনে। বিস্তৃত হোটেল, টানা প্যাসেজ ধরে হেঁটে এক সময় কেবিনে। তিনি সাদামাটা ভাত-মাছের অর্ডার দেন। আমাকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি?' চিন্তা না করেই বলি, 'মোরগ পোলাও।' বলেই মনে পড়ে, আ-হা কতদিন খাইনি এবং এই বোধ মুহূর্তে আমাকে বিমর্ষ করে তোলে। বাসায় এসব হয় না। অফিস থেকে ফিরে সবজি কোটো, ভাত চড়াও... কী যে অসহ্য লাগে! ডিম ভাজি কিংবা ভর্তা দিয়েই চলে বেশিরভাগ সময়।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। এক সময় ব্যাগ থেকে তিনি সোনালি রঙের ফটোফ্রেম বের করে আনেন, তাতে ঝাপসা সাদাকালো একটা ছবি। বলেন, 'এই যে এটা দেখছ, অনেক দিন ধরে আমার কাছে পড়ে আছে। আমার সেই বয়সের আবেগের ফসল, যখন তোমার মার সঙ্গে আমার উথালপাথাল করা প্রেম চলছে। ঠিক সে সময় তোমার মার একটি ছবিটা তুলেছিলাম। পরে ফ্রেমে সোনার পাত বসিয়ে বাঁধিয়েছিলাম। ঘাঁটতে ঘাঁটতে সেদিন বেরিয়ে পড়ল। তুমি কিছু মনে না করলে এটা তুমি তাকে দিয়ে দিতে পারো।'

এবার আমি উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বিশাল এক বরফ-স্তূপের নীচে চাপা পড়ে যাই। সেই অবস্থায় কানে আসে পর্দার ওপারে মহা-আড্ডাটা। কাপ পিরিচের টুংটাং। বলি, 'বুড়ো বয়সের আবেগ, বলতে লজ্জা পাচ্ছেন কেন?' আমার কথায় ভীষণ অবাক চোখে তিনি আমার দিকে তাকান, তার পুরো অবয়বে স্পষ্ট আহত ভাব। ফ্রেম হাতে নিয়ে উলটেপালটে দেখি। কেমন ফাঁকা হয়ে আসছে বুক। কী চমৎকার ভঙ্গি, বেণি ধরে হাসছে। আমার মা! এত মিষ্টি ছিল! কই, আমার স্মৃতির মধ্যে তো সেই মুখ নেই? তবে কি বিয়ের পরপরই তিনি ভাঙতে শুরু করেছিলেন?

তিনি বলেন, 'আমি যতদূর জানি তুমি অত রক্ষণশীল মেয়ে নও। মার সাথে তোমার সহজ সম্পর্ক। আমি কি কোনো ভুল করছি?'

হাসতে হাসতে বলি, 'ভুল একটা আপনার হয়েছে। আপনি যদি এখন আমার এই বয়স্ক ক্ষয়িষ্ণু মাকে দেখেন, তবেই বুঝবেন। আমি নিশ্চিত এখন তিনি ছবিটা ফেলে দিয়ে, ফ্রেমটা বিক্রি করে দেবেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

তাঁর মুখ নীলবর্ণ হয়ে ওঠে। স্থির বসেন থাকেন কিছুক্ষণ। এই ফাঁকে খাবার আসে। স্পষ্ট দেখছি, মরাটে আঙুলের নীচে জল হয়ে গেছে ভাতের দানাগুলো। চেয়ে থাকি। পুরো ঘটনার একটা বিশ্রী প্রতিক্রিয়া চলছে আমার ভেতরে। মার প্রতি ঈর্ষায়, নাকি ক্ষোভে... ভেবে পাই না, ভেতরটা বিষিয়ে উঠছে।

খাওয়া শেষে রুমাল দিয়ে হাত মুছতে মুছতে শান্ত স্বরে তিনি বলেন, 'নীনা, আক্রমণ করার অস্ত্র ভেতরে মজুত থাকলেই সব অস্ত্র ব্যবহার করতে নেই।'

'সবইতো স্পষ্ট করে বোঝেন', আমি কেমন কঠিন হয়ে উঠি, 'তাহলে আর অল্প বয়সের আবেগ বলছেন কেন? বলুন এখনো আপনি মাকে ভালোবাসেন?'

'আমি বুঝছি না তুমি খেপে উঠছ কেন?' তাঁর এই কথার ধাক্কায় যেন সংবিৎ ফিরে পাই। নিজেকে সহজ করে হাসি, 'খেপে উঠলাম কোথায়? আপনাকে একটি সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাইলাম। দুঃখিত, আমার প্রকাশটা হয়তো খুব রূঢ় হয়ে গেছে।'

'নীনা, দিন ফুরিয়ে এসেছে। এখন আর কিছুই ঘাঁটতে ভালো লাগে না। এছাড়া আমার কিছু বলার নেই', বলে গম্ভীর হয়ে যান তিনি।

মাথামুন্ডু না বুঝে আবার রিকশায় চেপে বসি। দীর্ঘপথ জুড়ে কী নিঃশব্দ অস্বস্তি! সেটা দূর হলে বড়ো মর্মান্তিক হয়ে উঠতে থাকে একটা দুর্মর লজ্জাবোধ। এক সময় তিনি বলেন, 'বড়ো ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। শোনো, একটা ছোটো গল্প বলি—প্রাচীন দুই ঋষির মধ্যে তর্ক হচ্ছিল। একজন প্রশ্ন করেন, পৃথিবীতে কোন নারী সবচেয়ে সুন্দর? অন্য ঋষি উত্তর দিয়েছিলেন, যে নারীর মুখ পথশ্রমে ক্লান্ত নয়, সে কখনোই সুন্দর নয়।'

শুনে কেমন আপ্লুত হয়ে পড়ি! 'অদ্ভুত, আপনি জানেনও বটে।'

'এই তো হাসি ফুটেছে'... বলে হা-হা শব্দে তিনি হাসতে থাকেন। মুহূর্তেই তাঁর কাছে আমি শিশুতে রূপান্তরিত। আমার জীবনের একটা অদ্ভুত কষ্টময়, আনন্দময়, যন্ত্রণাময়, স্মৃতিময় দিনের অবসান ঘটে।

এরপর থেকে শুরু হয় আমার চূড়ান্ত অর্থকষ্টে দিনযাপনের পালা। বেশ কিছুদিন পালিয়ে বেড়ানোর পর আবারও হলে ফিরে এসেছে আরেফিন। তার হাইস্কুল এয়ারপোর্ট পেরিয়ে সেই কোন আজমপুরে। টেম্পো, বাস শেষে পায়ে হেঁটে সেখানে যেতে প্রতিদিন বেশ ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে তাকে। আমার কাছে এলে আমি পাঁচশো টাকা দিয়ে আর দিতে না পারার অপারগতা প্রকাশ করি। সে বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। এদিকে বাড়িতে টাকা পাঠাতে না পারা একটা ভয়ংকর চাপতো আছেই। বাড়িভাড়া, আরেফিন, সুলতানার দুশো টাকার লোন শোধ—এই করে করে আমার এখন প্রায় ঝাড়া হাত-পা অবস্থা। অফিসে সারাক্ষণ কেমন থিতিয়ে থাকি। অফিসে আবারও চাপা উত্তেজনা শুরু হয়েছে। কেউ ঠিকমতো কাজ করছে না। পুরোনো বিদ্রোহ চাগিয়ে উঠেছে। বস মহাক্ষিপ্ত। আমিও তা-ই চাই। একটা কিছু হসফসের পর যদি কিছু টাকা বাড়ে। কিন্তু উলটোটা যদি হয়? কারও মধ্যে কোনো একতা নেই। আবার ভাবি, যদি সমূলে উৎপাটন করে সবাইকে! কত লোক দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। স্রেফ অফিসের খরচ বাদে যদি তিনশো টাকাও থাকে, তবুও একটা চাকরি চাই। চেয়ার ভরতে এক ঘন্টা সময়ও লাগবে না। ভাবলেই কেমন জ্বর-জ্বর লাগে। মুখ-কান বুজে উবু হয়ে থাকি টেবিলে।

টেবিলে মুখ গুঁজলেই আমি আন্তর্জাতিক মানুষ। অফিসে কুয়েত দখল, বুশ, সাদ্দাম প্রসঙ্গ এখন ডাল-ভাতের মতো ব্যাপার। কিন্তু প্রতিদিনের অসংলগ্ন হেডলাইন আমাকে হিম করে তোলে : 'মার্কিনের বোমা বর্ষণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

মসজিদ, নার্সারি, হাসপাতাল ধ্বংস' তারও আগে 'বুশ গোর্ভাচেভের ব্যর্থ শীর্ষ বৈঠক', 'সৌদি মরুতে রক্তের নহর বইবে—ইরাক'। বিশাল পৃথিবীর এক প্রান্তের এই যুদ্ধে আমি সক্রিয় অংশীদার না হলেও, আমি যে তার বাইরেরও কেউ নই, তার প্রমাণ কুয়েত দখলের এই যুদ্ধের আলোড়নে আমি নিজের মধ্যে অস্থিরতা টের পাই।

এর মধ্যে রেজাউল আর এক দিন অফিসে এসেছে। বহু ভান-ভনিতার পর একই প্রসঙ্গ। আমি আমার স্থির সিদ্ধান্ত থেকে যাতে নড়ি, তার জন্য প্রচুর আকুতি। বলে, ভেবে দেখলাম, ফুটো পয়সার মায়া করে জীবনটাকে জঘন্য করে তোলার কোনো মানে নেই। চাকরির পর আরও কিছু চেষ্টা করতে হবে, পার্টটাইম যদি কিছু করা যায়। এবং নিজেদের বিনোদনের জন্যও কিছু খরচের বাজেট রাখা দরকার।'

'লোভ দেখাচ্ছ?' বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করি, 'তুমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছ?'

সে বলে, 'কোনোদিনই তোমার কিছু সহজ করে দেখার অভ্যাস নেই। তুমি জেদ ছেড়ে দিয়ে একবারের জন্য একটু সহজ হয়ে দেখো, আমাদের ভুলগুলো আমরা শোধরাতে পারি কী-না।'

'আমাদের কারো কোনো ভুল ছিল না', আমি বলি, 'আমি কোনো ভুলের কারণে সংসার ছেড়ে আসিনি। তুমি এমন লেগেছ কেন আমার পেছনে? একা রান্না করে খেতে কষ্ট বলে? আমি তো এখন চাকরি করছি, রান্নাবান্না করা তো এখন সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'দেখো', একটু কঠিন শোনায় রেজাউলের স্বর, 'রান্না করার জন্য শহরে অনেক ঝি-চাকর আছে। পয়সা ছিটালেই আসে।'

'ওই পয়সা ছিটানোতেই তো তোমার সমস্যা। দেখো রেজাউল, আমি এইসব স্থূল ব্যাপার নিয়ে তোমার সাথে বুলি কপচাতে চাই না। একটা সহজ সিদ্ধান্ত শুনে নাও, তুমি আমার সাথে পরিচয় রাখতে পারো, যোগাযোগ রাখতে পারো যত খুশি, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছি, তাতে আমি আর ঢুকছি না।'

এর পর পরই শুরু হয় তার চাপা গজগজ—আমার এই মনোভারে জন্যই নাকি তার এই পতন, বাইরের দুনিয়ার মজা টের পেয়ে গেছি, আমার আসল স্বভাবই এই, সংসারে থাকতে ভড়ং করেছি। শেষে প্রখর গলায় যখন তাকে শাসাই, এটা অফিস, এটুকু সচেতনতা তার থাকা উচিত, তখন সে নির্লজ্জের মতো দাঁড়িয়ে বলে, একদিন বাসায় যাবে। সব ব্যাপারে খোলামেলা কথা হওয়া দরকার। সংসারটাকে খাঁচা মনে করলেই বন্দিত্বের প্রশ্ন। এরকমের চক্র থেকে আমার বেরোনো দরকার। সে তো অন্য একটা বিয়ে করেও ফেলতে পারত, তা-না করে আমার কাছেই আবার ফিরে আসতে চাইছে, আমার বোঝা উচিত এইসব বলেটলে সে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়। একবার পেছন ফিরে আমাকে দেখে। তারপর সত্যিই চলে যেতে থাকে। তার অপসৃয়মাণ ছায়ার দিকে তাকাতেই আমার দৃষ্টির সামনে এগিয়ে আসে নগ্ন রেজাউল..., গা ঘুলিয়ে সেই বিচিত্র চিন্তাগুলো আসে... মানুষের শয্যার আচরণ হুবহু পশুদের মতো। আমি রাস্তায় নেড়ি কুকুরদের দেখেছি... হুবহু সেই আচরণ... ফাইলে প্রাণপণে মুখ ঢোকাতেই নিজেকে উদ্ভাসিত করে পালটা যুক্তি তৈরি হয়, এমনও তো ভাবা যায়, পশুদের আচরণ একদম মানুষের মতো। এ আর এক ফ্যাসাদ। হাজারো কাসুন্দির চক্রাবর্তে বেশ অসহ্য ঠেকে। সে চলে গেলে আমার পেছনের সংসার সামনে এসে খাড়া হয়। খুঁটে-খুঁটে পরখ করি, কোথায় কতটুকু মায়া, কতটুকু ঘৃণা, সব মিলিয়ে আমার ভেতরে বেশ জবরজং অবস্থা তৈরি হয়। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে শুয়ে থাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বিছানায়। দুপুরে রুটি ভাজি গিলেছি। রাতে রান্না করে খাওয়ার কথা মনে হলেই শরীরের গ্রন্থিগুলো আলগা হয়ে আসে। তারপরও নিজেকে টেনেহেঁচড়ে ভাতের হাঁড়িতে আলু ছেড়ে দাও। তারপর আছে তেল-নুন। মাঝে মাঝেই হাত পাততে হয় শানুর কাছে, সে আমাকে সহজ পথ বাতলে দেয়, 'একটা বিয়ে বসে ফেলো। মেয়েমানুষের একা জীবন যায়?'

'ছেলেতো আমার জন্য গলির মোড়েই দাঁড়িয়ে আছে'—এইরকম হেঁয়ালি করে তাকে পাশ কাটাই। কী করে, কোন পথে জানি না, কিছুদিন ধরে কামাল-ভাইয়ের আয়-উপার্জন বেশ একটু বেড়েছে। শানুও ইদানীং নিজেকে নিয়ে বেশ মশগুল থাকে। তার সংসারের চিৎকার-চ্যাঁচামেচি কমেছে। মাঝেসাঝে দুটো-একটা শাড়ি-কাপড় উপহার দিয়ে, বাহারি রান্নাবান্নার আয়োজনে ব্যস্ত রেখে কামালভাইয়ের বাইরে রাত কাটানোর ব্যাপারটা বেড়েছে। আমি সেদিন কী যেন টুকটাক কিছু একটা করছি, এমন সময় শানু সন্তর্পণে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। তারপর বলে, 'শোনো, কামালের এক বয়স্ক চাচা, ম্যালা টাকার মালিক, বউ মারা গেছে সেই কবে, তোমাকে বলছি, ঝুলে গেলে কেমন হয়? পুরুষের আবার বয়স! তা ছাড়া, তোমার জীবন তো আর দাগহীন শুদ্ধ তুলসী পাতা নয়। ভেবে দেখো।' ভেতরে প্রচণ্ড রাগ হয়। ইচ্ছে করে ওর চুলের মুঠি ধরে ওকে আছড়ে মেঝেতে ফেলে দিই। কিন্তু সে ক্রোধ দমন করে আমি ওর কথার জবাব না দিয়ে নিজের কাজে মন দিই।

সেদিনের পর ইরফান চাচার সাথে আর যোগাযোগ নেই। আমিও যাচ্ছি না কী এক যন্ত্রণা থেকে। মানুষটার ব্যক্তিত্ব, শৌখিনতা, বয়স, স্বাচ্ছন্দ্য—সব মিলিয়ে আমার জন্য অদ্ভুত এক যন্ত্রণা। যার মূল উৎস আমি খুঁজে পাই না। ফটোফ্রেম এনেছি ঠিকই, কিন্তু মার জীবনের এই পড়ন্ত বিবর্ণ বেলায় সেটা তাঁকে দেওয়ার কোনো উৎসাহ খুঁজে পাই না। তাহলে পুরো ব্যাপারটাই অসম্ভব রূঢ় আর হাস্যকর হয়ে যাবে। এর মধ্যে দেখা দিয়েছে নতুন একটা উপসর্গ, পেটের বাঁ পাশে প্রায়ই ব্যথা হয়। সম্ভবত আলসারের, সহ্য করি। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সাহস হয় না, অফিসে যাই। সবার প্রতিবাদ, অথবা নিঃশব্দতার ভেতর বড্ড নিশ্চুপ বসে থাকি। আমার সহকর্মীরা, সবাই যার যার আসনে, সামনের টেবিলের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই বুঝি সেই গলার ওপরে সেঁটে থাকা মুখখানা হতাশায় ঝুলে পড়ল। তাদের কণ্ঠস্বর, অতি ব্যবহারে কিংবা আর্থিক কষ্টের বিবরণে যা সর্বদা নিয়োজিত, এই বুঝি ঝনঝন করে বেজে উঠল। অথবা নিজের ব্যর্থতা, একঘেয়ে যন্ত্রণাকাতর জীবন ঢাকার প্রয়াসে এমন ঠাট্টায় মেতে উঠল, যা সেই বদ্ধ হাওয়াকে আরও গুমোট, অশ্লীল করে তুলল। সারাক্ষণ তাই ভয়ে ভয়ে থাকি।

তবুও আসে ওরা। বড়ুয়াবাবু, সুলতানা, কিবরিয়া সাহেব। মুখোমুখি বসে অফিসের অবস্থা পর্যালোচনা করে। আমাকে আবছায়া টোকা দেন, 'বস দেখি আপনাকে বেশি ডাকে না, কিছু হয়েছে?'

ব্যাপারটা আমার সত্যিই লক্ষের মধ্যে নেই। ভদ্রলোক এমনিতে বেশি প্রয়োজন ছাড়া কাউকে সচরাচর ডাকেন না। আমি তাদের প্রশ্নের উত্তরে, 'কিছু হয় নি'—বলে চুপ করে থাকি। তারা তখন এমন সব প্রসঙ্গে চলে যায়, যা কানে যাওয়া মাত্র আমি স্ট্রেইট স্ট্যাচু—। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যানহোলে পড়ে গিয়েছিল, আমার চাচাতো ভাই, রাত করে বাড়ি ফিরছিল, বাসার সামনেই, ল্যাম্পপোস্টের বালব ফিউজ দীর্ঘদিন ধরে, ঘুটঘুটে অন্ধকারে সোজা খোলা ম্যানহোলে।'

সে-কী! ক্রমশ আমার ভেতর উত্তেজনা বাড়ে, 'মারা গিয়েছে?'—'মৃত্যুটাকেই শুধু দেখলেন', বক্তা বেশ হতাশ হয়। 'হাত-পা ভেঙে শরীরে আছে কিছু? জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেল। সামনের একপাটি দাঁতও থেঁতলে গিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

উঠে গেছে। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম, এর চেয়ে মৃত্যু ভালো ছিল।' এরপর প্রসঙ্গটা আমার টেবিল থেকে রুমের সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। চোর-ছ্যাঁচড়ের উৎপাত, সরকারি ল্যাম্পপোস্টের বালব এই রকম বিভিন্ন ধ্বনি-প্রতিধ্বনি চারপাশে রেখে আমি আমার ফাইলে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই বড়ুয়াবাবু আসেন। এসেই টিপ্পনি কেটে বলেন, 'কিবরিয়াসাহেবের চোখ ভালো না, একটু আঁচল টেনে থাকবেন। মাথার ওপর কারও স্বামী নেই জানলেই ওর লালা ঝরতে থাকে!' অসহ্য! ক্রোধে ঘৃণায় আমি নিশ্বাস আটকে বসে থাকি।

একসময় ঠিকই বসের রুমে ডাক পড়ে। পরিপাটি চুল, ধবধবে শার্ট, ক্লিনসেভড বসের মুখ ভীষণ নির্বিকার। অপজিটের টেবিলে বসে আমি ভাষা হারিয়ে ফেলি। একসময় তিনি বলেন, 'আপনার টেবিলের পাশে প্রায়ই ভিড় লক্ষ্য করি। বেশ চাপা গুঞ্জন। আপনিও কি দল পাকাচ্ছেন নাকি?' ভেতরটা ধড়াস করে ওঠে। কিন্তু ঘটনায় সত্যতা না থাকলে আপনা থেকেই সাহস বেড়ে যায়। মাথা খাড়া রেখে তাই বলি, 'জি, না স্যার, তারা এলে কথা না বলে যতটুকু সম্ভব অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি, এরপরও তারা আসে। আমি তো তাদের মুখ চেপে ধরতে পারি না।'

'তারা কী বলে, তা আমি জানতে চাইব না', বসের নিরুত্তাপ গলা। 'এরপর থেকে কথা বললে অ্যাভয়েড করবেন। কাজ ফেলে জটলা করা আমি সহ্য করব না।'

তার রুম থেকে বেরোলে হামলে পড়ে সবাই, 'কী ব্যাপার, পার্সোনালি আপনাকে ডেনে নিল, কিছু হিল্লে হল?'

টেবিলে বসে মাথা ঢুকিয়ে দিই ফাইলের মধ্যে। কিন্তু তাদের কৌতূহল অসহ্য রকমের। আমার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েছে কেউ কেউ, 'কী, কথা বলছেন না যে!' 'আমার টেবিলের সামনে ভিড় করবেন না'... আমি বলি, 'স্যার পছন্দ করেন না।' একথার পর রুমের পুরো পরিবেশ থমথমে হয়ে ওঠে। সুড়সুড়িয়ে সবাই চলে যায় যার যার আসনে। এবং ধীরতালে শুরু হয় টিপ্পনির বিভিন্ন রূপান্তর, চাকরিটাই কি সব? সম্মানী লোকের সম্মান না থাকলে চাকরি ধুয়ে জল খাবে? বসের চরিত্র জানি না? আমরা মরি আমাশা, কলেরায়, মালিক তাকে এয়ারকুলার গাড়ি দিয়েছে। ঠান্ডা খেতে খেতে অফিসে আসো, ঠান্ডা ঘরে বসে কী ছাইভস্ম করো, বুঝি না? মালিকের দালাল। আর তার সাথে যদি মেয়েছেলে যোগ দেয়... কী আর বলব ভাই... মেয়েলোকের স্বামী মাথায় থাকলে তার থাকে এক ভাতার, স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলে—দশ ভাতার! এইরকম চলতে চলতে তার মাত্রা যখন চরমে, তখন কোনোদিকে না তাকিয়ে অফিস ছুটির পর সোজা ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসি।

মতিঝিল বাসস্ট্যান্ড থেকে গাদাগাদি করে বাসে উঠি। তারপর কনুইয়ের অশ্লীল গুঁতো, চুলে টান—এসবের মধ্যেই বাসের হাতল ধরে ওপরমুখী হয়ে সহ্যাতীত দাঁড়িয়ে থাকা। রোজকার ঘটনা এসব। এই এতদিনেও গা সওয়া হয়নি। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। চারপাশে বাসের গর্জন, মানুষের কোরাস... দীর্ঘপথ। শাহবাগের মোড়ে জলের ফোয়ারা, খরখরে। থামতেই কিছু লোক নেমে গেলে হুমড়ি খেয়ে সামনের সিটের একাংশ দখল করি। প্রসারিত রাস্তা। অসংখ্য রিকশা, গাড়ি সামনে। নীলখেতের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় আরেফিনের কথা মনে পড়ে, টিউশানির টাকায় হলচার্জ দিয়ে কী সব তোশক-বালিশ, চাদর কিনেছে। এ মাসে অতদূরে গিয়ে ক্লাস করানো, পাঁচশোয় যে কতটুকু রফা হবে, কে জানে! সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়, উদ্ভ্রান্ত মানুষ উঠছে, নামছে। ঝিমিয়ে-পড়া বিকেল। গাড়ির ঢুলুনিতে চোখ বুজে আসে। ঝক্কর ঝক্কর... এরকম ঝাপসা আবেষ্টনের মধ্যে এক সময় শংকরের মোড়।

চারপাশে ঘিঞ্জি দোকান। ডানে মোড় নিতেই মসজিদ। তাকাতেই সেই স্বপ্নের কথা মনে হয়। পাদ্রিপ্রবর, প্রশ্ন করছেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস করো? এবং তারপরই এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে মনে পড়ে, একদিন পর আসার কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ছিল ওমরের, আজ প্রায় এক হপ্তা ধরে তার পাত্তা নেই। আজব লোক! জাহান্নামে যাক, এমন ভাবনার পর আরও কিছু পথ। বাঁয়ে অদ্ভুত খোলা মাঠে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে কিছু ছেলে। একজনের লুজ ইলাস্টিক হাফপ্যান্ট বারবারই কোমর গড়িয়ে নিম্নগামী। বাঁ হাতে টানছে, ডান হাতে নাটাই। ওপরে খোলা আকাশে উড়ন্ত সবুজ ঘুড্ডি। দাঁড়িয়ে থাকি। বেশ ফুরফুরে, সহজ হয়ে আসছে সবকিছু। ধীরে ধীরে শীত আসছে, খুব আলতোভাবে চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে টের পাওয়া যায়।

পরদিন ছুটির আগমুহূর্তে দুর্মর ভঙ্গিতে ওমর এসে ঢোকে। পোশাকআশাকে আগের চেয়েও কিম্ভূতকিমাকার। শার্টের এক কোনায় তেলতেলে কালির স্পষ্ট ছোপ। এসেই বেশ সিরিয়াস গলায় বলে, 'উফ ক-দিন কি রাম খাটাই না খাটলাম। বুঝলেন, নিশ্বাস নেওয়ার সময় পাইনি। প্রতিদিনই ভেবেছি। আপনি না জানি কত কিছু ভেবেছেন। মরমে মরেই যাচ্ছিলাম। সেই কবে আসব বলেছিলাম!'

লোকটাকে অপমান করার জন্য সচেতনভাবে বলি, 'টেনশানের কোনো কারণ নেই। ব্যাপারটা আমি বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম।' তার চেহারায় দমে যাওয়া স্পষ্ট ভাব। নিঃশব্দে চেয়ার টেনে বসে। প্রশ্ন করি, 'ছোটোভাই কেমন আছে?'

'কোনো চেঞ্জ নেই' বলে আবার সোৎসাহে শুরু করে, 'কী বলব তাকে দেখার সুযোগ পেয়েছি আমি? গার্মেন্টস, প্রেস, বাসা এই করে করে...।'

'আপনি কি গার্মেন্টসে চাকরি করেন?'

'না, বিএ পাস করে কয়েক বছর ফ্যা ফ্যা করে ঘুরেছি। হপ্তাখানেক আগে আমার ছোটোবেলার এক বন্ধুর সাথে দেখা। মহাধনী সে। গার্মেন্টসের মালিক, দেখা হতেই অনেক কথা। আমাকে বলল, ও তার গার্মেন্টসের প্যাড, ভিজিটিং কার্ড, টাইম কার্ড—এসব বাইরে থেকে ছাপায়। আমি তাদের সেসব কাজ প্রেস থেকে করিয়ে তার থেকে টু পাইস উপার্জন করতে পারি। ব্যাস, পরদিন থেকেই লেগে গেলাম। সাহস করেছি পুরোনো ঢাকায় একটি প্রেসের সাথে আমার দীর্ঘদিনের ভালো সম্পর্ক থাকায়।'

'লাভের কিছু টের পাচ্ছেন?'

'অত তাড়াতাড়িই কি সব হয়? সময় লাগে সময়! তবে কাগজ কেনার সময় বেশ কিছু লাভ হয়েছে—এই আর কি! বন্ধুর গার্মেন্টস না হলে কাগজের টাকা আপাতত আমাকেই বহন করতে হত। সে খুব ভালো। আমার দুরবস্থা দেখে আমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছে।'

অফিস শেষে বেরিয়ে পড়ি তার সাথে। মাথায় হঠাৎ করে কড়কড়ে নোটের তাড়া ঘাই মারতে শুরু করে। অবশ্য ব্যাপারটা বাস্তবত হাস্যকর হলেও, একটা অদম্য কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসে। তাই রিকশায় বসে ওমরকে জিজ্ঞেস করি, 'কাগজে কত প্রফিট হয়েছে?' সে বলে, 'প্রথম অবস্থায় বেশি কাগজ কেনার অর্ডার পাইনি। বেশি কিনতে পারলে প্রফিট বেশি হত, যেমন ধরুন—বারো রিম কাগজ যদি কিনি, তাহলে প্রতি রিমে পঁচিশ টাকার মতো রাখতে পারলে পাঁচশো টাকার মতো লাভ হবে। অর্ডার বেশি হলে প্রফিটও বেশি। পুরোটাই নির্ভর করছে আপনার দক্ষতার ওপর। তাছাড়া আপনাকে পার্টি কতটুকু বিশ্বাস করছে, তার ওপরও। আপনাকে কি আমি কিছু বোঝাতে পারছি?'

আমার মগজে হঠাৎ অন্য খেলা শুরু হয়। এটাই আমার সহজাত প্রবণতা, মনে হয়, মৃত্যুর সময়ও রাতের বাজার করেছি কী-না মনে পড়বে, উলটোটাও, লটারিতে দশ লাখ টাকা পেয়ে ভাবতে বসে গেলাম, জীবনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

প্রথম যে ছবি এঁকেছিলাম, সেটা কে নিয়েছিল? তেমনই পারম্পর্যহীনভাবে প্রশ্ন করি, 'উপসাগর যুদ্ধ সম্পর্কে আপনার কী মনে হচ্ছে?'

ওমর কোনো ভাবনা ছাড়াই নির্লিপ্ত জবাব দেয়, 'সাদ্দাম না হটলে বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য। আর হটে গেলে মার্কিনকে আর কেউ কোনোদিন হটাতে পারবে না। আরে ধুৎ! কোথায় কোন ইরাকে যুদ্ধ চলছে, জাহাজের সংবাদে আমাদের কাজ কী? আমরা চলেন ডোবার কথা ভাবি। চুনোপুঁটি।'

'জীবন তো আমাদের একটাই। কী মানে এই রক্তক্ষয়ের?' আমি বলি, 'আর যদি বিশ্বযুদ্ধ লাগে? তখন এই চাল-ডাল রেশনের বিশাল হিসাবগুলো কি হাস্যকর তুচ্ছ হয়ে যাবে না?'

হা হা হাসে ওমর, 'বিশ্বযুদ্ধে মরলে তো নিজেকে ভাগ্যবানই মনে করতাম। মহা প্লাবনে পিঁপড়ের মৃত্যু। ভেবে দেখুন? এতবড় মৃত্যুর কত আগেই ওই যে দেখছেন, লক্কর-ঝক্কর স্কুটারটা আসছে... ওর পায়ের তলাতেই পিষে মরবেন। আজকের কথা ভাবুন। কী খেয়ে দুপুরে নিজেকে বাঁচাবেন। সেটাই ভাবুন।'

ওমর মন্দ বলেনি কথাগুলো। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করি তাই নিয়ে। তারপর খুব স্বাভাবিকভাবেই উপসাগর থেকে একসময় প্রেসে ফিরে আসি, 'কেমন সময় ব্যয় হয় এসব কাজে?'

ধাক্কা খেতে খেতে রিকশা একটা ভাঙা গলির ওপর দিয়ে এগোয়। সে প্রশ্ন করে, 'আপনি এ কাজের ব্যাপারে বেশ ইন্টারেস্টেড মনে হচ্ছে?'

আমি সহজসাপটা বলি, 'দেখুন, এ-চাকরির বেতনে আমার একদম পোষাচ্ছে না। হঠাৎই আমার মনে হল, বলতে গেলে আপনার কথা শুনেই, চাকরির বাইরেও আমি একটা কিছু করার চেষ্টা করে দেখতে পারি। ওমর সোৎসাহে লাফিয়ে ওঠে প্রায়, 'তাহলে আমার সাথে নেমে পড়ুন, দুজন মিললে কাজ আরও বেশি এগোবে।'

লোকটা খুব সরল—এই এখন সেটা মনে হল। তার নিজের কাজেরই কোনো শেকড় নেই। সবেমাত্র বন্ধুর বদৌলতে ফুটো শূন্য শুরু করেছে, এর মধ্যে ভাগীদার জুটে যাওয়ায় প্রবল উৎসাহ। হেসে বলি, 'আমি দু-একদিন আপনার সাথে ঘুরব। চাকরির বাইরেও পৃথিবীর কিছু পথঘাট চেনা দরকার। সুবিধেজনক মনে হলে তারপর না হয় চিন্তা করব কোন পথে এগুব।'

'আপনি আমার চেয়ে প্র্যাকটিক্যাল', এইবার ওমর গম্ভীর হয়ে ওঠে।

'আপনার চেয়ে বেশি হয়তোবা', আমি বলি, 'সত্যিকার কারো তুলনায় নিশ্চয়ই নয়। জীবনের তাগিদে ধাক্কা খেয়ে যতটুকু না হলেই নয়, ঠিক ততটুকু।' তারপর নিঃশব্দ পথ। দাঁতে নখ খুঁটতে খুঁটতে সে হঠাৎ প্রশ্ন করে, ওহ্ হো, আপনার সম্পর্কে কিন্তু কিছুই জানা হল না। এখানে কি বাবা-মার সাথে আছেন?'

একটা গলিতে ঢুকেছে রিকশা। বৃষ্টির ছিটেফোঁটা নেই, তবুও পাশের ড্রেন ওপচানো কাদা-পাঁকে-ভরা জলে রাস্তা ডুবে আছে। দুর্গন্ধে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরার উপক্রম। ক্ষতবিক্ষত এই পথে জীবন হাতে করে চলতে হয়। এঁটো খাবারের স্তূপও চারপাশে। ডানে-বাঁয়ে ধাক্কা খেয়ে রিকশা এগোচ্ছে। হাঁ করে আছে ম্যানহোলের মুখ, মনে পড়ে অফিস সহকর্মীর কথা। তার বর্ণনা করা পঙ্গু লোকটার কথা। গভীর রাতে এর ভেতর কেউ পড়ে গেলে কে তার খবর জানবে? পচেগলে কি মিশে যাবে এই দুর্গন্ধ-ভরা জলের সাথে? এ এক নির্মম অপঘাত! অপঘাতের কথা মনে হতেই চাচার চেহারা ভেসে ওঠে। ফ্যানের সাথে দোল খাচ্ছে। চিড়িক দিয়ে ওঠে রক্ত। নিজেকে সামলে সহজ হওয়ার চেষ্টা করি, 'এখানেই একটা ফ্যামিলির সাথে সাবলেট থাকি। মা বাড়িতে থাকেন। বাবা মারা গেছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

তারপর আবারও কিছুক্ষণ নিঃশব্দ পথ। এক সময় ওমরের উৎসাহকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্যই বলি, 'আরও বিস্তারিত যদি শুনতে চান, তবে বলি, আমার বিয়ে হয়েছিল। চার-পাঁচ বছর আগে। দু-বছর আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে। তারপর থেকে চাকরি করছি, বলতে গেলে আমার ঘাড়ের ওপর এখন পুরো একটা পরিবারের ভার।'

'আমি জানি', খুব নির্বিকারভাবে ওমর বলে, 'ওই যে আপনার বন্ধুটি ছিল হাসপাতালে, তার কাছে শুনেছি।'

'বাইরেও আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছেন?' বলি, 'তবে যে ভান করলেন, আমি বাবা-মার সাথে থাকি কী-না জানতে চাইলেন?' রিকশা টিনের একটা আস্তর পড়া বাড়ির সামনে থামে। আমি ব্যাগে হাত দেওয়ার আগেই সে দ্রুত মানিব্যাগ খুলে ভাড়া মেটায়। তার এই একটি মাত্র ভঙ্গিতেই এতক্ষণে তাকে আমার ভালো লাগে। টাকার জন্য ফ্যা ফ্যা করা একটা লোক যে আমার ব্যাগের দিকে তাকিয়ে থাকেনি, সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট।

রিকশা চলে গেলে সে কেমন অন্যরকম দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। তার চরিত্রের সাথে পুরো বেমানান স্বরে বলে, 'কারো খুব বেশি শুভাকাঙ্ক্ষী থাকলে তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার দরকার হয় না। খবর এমনিই জানা হয়ে যায়। আমি যেদিন আপনার বন্ধুকে দেখতে যাই, তখন, তার ওখানে আপনার আর-একজন বন্ধু উপস্থিত ছিল, নাম মনে নেই, তার সম্ভবত একটা বেকারি আছে। সাহিত্যের প্রতি অসম্ভব ঝোঁক, মনে হল। যা হোক, কথা সেটা নয়। দুজনের মধ্যে আপনাকে নিয়ে বেশ কথা হচ্ছিল। আপনি, আপনার স্বভাব, ডিভোর্স, এইসব নিয়ে বেশ তর্ক। আমি যে তৃতীয় একজন বান্দা সেখানে উপস্থিত, সেটা তারা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। আমি তাদের তর্কের বিষয়বস্তু আপনার কাছে বিশ্লেষণ করব না, তবে এটুকু টের পেয়েছি, তাদের একজন আপনার জবর শুভাকাঙ্ক্ষী!'

'টিটকারি দিচ্ছেন?' আমার গা জ্বলে ওঠে, 'আপনি কিন্তু এক জায়গার কথা অন্য জায়গায় লাগানোর মতো নিন্দনীয় কাজটি করলেন।'

'আপনার ভেতরে দুর্বলতা, তাই এমন করে ভাবছেন।' ওমর বলে, 'আমি মোটেই তাদের নিন্দা করিনি। আমি তাদের সম্পর্কে খারাপ ভালো কোনো মন্তব্য করিনি, আপনি কেন ভাবছেন সেসব তর্কের বিষয়বস্তু আপনার বিপক্ষে ছিল? অবশ্য কিছুই বলতাম না। বাইরেও আপনার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছি। কিছুটা হলেও তো আপনাকে এরই মধ্যে জেনেছি। আপনি আমাকে দোষারোপ করলেন, তাই আমি চুপ থাকতে পারলাম না।'

সরু গলির ভেতর দিয়ে তখন ট্যাংরা মাছের মতো একটা পুঁচকে সরকার-বিরোধী মিছিল যাচ্ছে। ক-দিন আগের রমরমা হরতাল, গোলা-বারুদ আর নেই। ক্রমেই সবকিছু ঝিমিয়ে আসছে। স্রেফ রুটিন পালনের জন্য যেন এই হাস্যকর মিছিল। কোনো মানে হয়!

ওমর সেই ভাঙাচোরা টিনের দরজায় নক করতে থাকে। কথার প্যাঁচ জানে বটে লোকটা। তাকে অতটা স্থূল, মোটা মাথার একজন ভাবাটা আমার ঠিক হয়নি। কিন্তু একটু আগে করা তার মন্তব্যের ফলে আমার ভেতরে শুরু হয় আলতো এক আলোড়ন! ফলে কেমন অবসন্ন, নিস্তেজ মনে হয় নিজেকে। আমার চারপাশের এত আপন পৃথিবী, যখন অদ্ভুত অন্তরঙ্গতা নিয়ে ওদের সাথে হাঁটছি, তখন কী মায়া, কী হৃদ্যতা, যখনই হাঁটা শেষ করে মোড় ঘুরেছি, তাদের দিকে পিঠ, তখনই কুৎসিত মন্তব্য, তখনই তাদের স্বর পালটে যাওয়া, কষ্ট লাগে!

দরজা খুলে যায়। একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। কী ভয়ংকর ভঙ্গুর চেহারা! লম্বা গলা, ঘাড় থেকে অনেক ওপরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

চামড়ায় ভাঁজ পড়া মুখ। চোখদুটো কোটরে। সরু দেহের ওপর লটপট করছে ঢোলা কামিজ। যেন বিন্দুবিন্দু করে শুষে নিচ্ছে তার সবকিছু উইপোকা। বিহ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে দ্রুত দরজা থেকে সরে দাঁড়ায়।

তোশকের ওপর পাটি বিছানো। তার ওপর শুয়ে আছে সেই কিশোর। মেঝে, মাটির কি সিমেন্টের বোঝা মুশকিল, এমনই এবড়োখেবড়ো। তার ওপর বসে সেই বৃদ্ধা, হাসপাতালে দেখেছিলাম, আনারস কাটছেন, যে শাড়ি তার পরনে, কাঁথা বানানোর উপযুক্তও নয়। আর একটি ন্যাংটো শিশু, বয়স ছ-সাত হবে, পাশে বসে আনারসের খোসা চিবুচ্ছে। সমস্ত ঘরে আসবাব বলতে দুটো মরচে ধরা ট্রাংক, একটা ছ্যাতলা পড়া আলনা, চুনকালি মাখা একটা টেবিল-চেয়ার। বাড়ি জুড়ে ঝুলকালির ছড়াছড়ি। আনারস কাটা থামিয়ে বৃদ্ধা ভাবলেশহীন চোখে আমার দিকে তাকান। স্যান্ডেল টেনে কিশোরের পাশে তার বিছানায় বসি। বিশ্রী ঘামের গন্ধে পেট ঘুলিয়ে ওঠে। সেই কিশোর, স্বপ্নে দেখা তার মুখ, তার কোলে ছিল আমার শিশুসন্তান। ফলে তার প্রতি কেমন এক মায়া, টান অনুভব করছি। আমার সব ইচ্ছে ছাপিয়ে এই কিশোর বড়ো আপন, বড়ো কাছের। স্বপ্নের অনুভূতি সম্ভবত এমন মায়ার, এমনই বিচিত্র। ছেলেটা আমার দিকে নিস্পৃহ চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সেই দৃষ্টিতে সমস্ত পৃথিবীর প্রতি চরম অনীহা। শাড়ি কাটা ওড়নায় যৌবন ঢেকে সেই ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটি এখন মুখ বাড়িয়েছে।

'আমার বোন', পরিচয় দেয় ওমর। দা ফেলে দাঁড়িয়েছেন সেই বৃদ্ধা। এক পৃথিবীর কর্কশতা তার মুখে। ছেলেটা কিছু যেন বলতে চাইছে। বৃদ্ধা এগিয়ে যান, খুব কাছে। ছেলেটা এবার মুখ খোলে, বড় অমসৃণ, ভাঙা কণ্ঠ... বৃদ্ধা কান পাতেন। তার কণ্ঠে ভয়ংকর অস্পষ্টতা। সেই মুহূর্তে মনে হয়, ছেলেটি মৃত্যুপুরীর মানুষ। কীভাবে ঠিকরে বেরোচ্ছে তার চোখ। আমি স্বপ্নেও তাই দেখেছি। ভয়ার্ত চোখে চারপাশে তাকাচ্ছে। আঙুল তুলে দরজার দিকে দেখায় সে—'ওই যে।'

আমরা সবাই তাকাই। বাইরে সন্ধ্যা নামছে। ছেলেটার চোখ বিস্ফারিত—'ওই যে, আসছে।' আবারও তাকাই। মৃত্যুর মতো নিঃশব্দ পরিবেশ। সমস্ত ঘরে ছায়া। উদগ্রীব বোনটি এগিয়ে আসে। হাতে চা, মনে হল জন্ডিস আক্রান্ত রোগীর পেশাব। কী যে হয়, ছিটকে বেরিয়ে আসি।

পেছন পেছন ওমর। রাস্তায় নেমে ঠান্ডা গলায় বলি, 'আপনি মিথ্যে কথা বলেছেন। ও আমাকে মোটেই দেখতে চায়নি'—বলে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকি। ধীরে ধীরে আত্মার গ্রন্থিগুলো আলগা হয়ে আসতে থাকে। সহজ বোধ করছি কিছুটা। ওমর বলে, 'সব মিথ্যে বলিনি। শুধু ওইটুকু, আপনাকে দেখতে চাওয়ার ব্যাপারটা।'

'আপনার মিথ্যে বড়ো দুর্বল ছিল', আমি বলি, 'কিন্তু আমি বুঝছি না আপনি আপনার বাসায় আমাকে কেন নিতে চাইলেন? এবং তার জন্য এত ভান-ভনিতারই বা কী দরকার ছিল?'

'আমি দেখতে চাইছিলাম, আমার বাসার পরিবেশে আমাকে দেখে আপনি আমাকে কতটা তাচ্ছিল্য করতে পারেন, সেটা।

'আশ্চর্য! হঠাৎ করে আপনি আমার চোখে আপনাকে আবিষ্কার করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠলেন কেন? আমি বুঝতে পারছি আমার ব্যাপারে আপনি বেশ আগ্রহী, কিন্তু এসব হাস্যকর পরীক্ষায় ফেলে আমাকে যাচাই করতে চাওয়া, আমার কাছে রীতিমতো অপমানজনক ঠেকছে।' ভারী পদক্ষেপে হাঁটছে ওমর। আমি রিকশা ডেকে দরদাম করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। রাস্তার মাঝখানের গর্তগুলোয় থকথকে কাদা। শাড়ি বাঁচিয়ে দুটো ইটের

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ওপর এসে দাঁড়াই।

ওমর বলে, 'আমি কি আপনার বাসা পর্যন্ত যেতে পারি?'

'আপনি কিন্তু আমার কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন।'

'দেখুন, আমার মান-অপমানের বোধটা বড়োই ভোঁতা। আপনি বুঝতে পারছেন না, কেন আমি আপনাকে ওরকম পরিবেশে টেনে নিয়ে গেলাম। আপনি আমাকে এরপর কীভাবে বিবেচনা করেন তা দেখার জন্য। খুব বাজে লাগছে আপনার, না?'

'আমার নিজের পরিবেশ এর চেয়ে সুন্দর কিছু না', আমি বলি। 'আসলে জন্মের পর থেকে এরকম পরিবেশ দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠেছি। এ জন্যই এসব আর ভালো লাগে না। এর মানে এই নয় যে, আপনার দারিদ্রকে আমি ঘৃণা করছি। আসলে এই পুরো ব্যাপারটারই কোনো মানে ছিল না।'

রিকশায় উঠে বসলে ওমর বলে, 'বললেন না, আপনার সাথে আসব কী না?'

'বাসা চিনলে তো আমার জন্য মুশকিল হয়ে যাবে। আপনার যা চরিত্র, দু-দিন পরপরই এসে হামলা করবেন।'

লাফ দিয়ে রিকশায় উঠে আমার পাশে বসে হা হা শব্দে হাসে ওমর, 'বাহ্ আমাকে তো বেশ চিনে ফেলেছেন।'

পরদিন অফিস শেষে ওমরের সাথে বেরিয়ে পড়ি। সেই পুরোনো ঢাকার ঘুপচি গলি। মনে পড়ে নদীভ্রমণের কথা। কতদিন হল যোগাযোগ নেই ইরফান চাচার সাথে। হঠাৎ চাগিয়ে ওঠা ছবি আঁকার নেশাটাও ক্রমশ নিভে এসেছে। চাকরির বাইরেও কিছু পথঘাট চেনা দরকার। আর চাকরির যা অবস্থা, কোনদিন যে কী হয়, কে জানে! আজকে লিফট বন্ধ ছিল। এরপর পা টেনে টেনে চুড়োয় ওঠা! অফিসে ঢুকেই দেখি, কেউ নিজস্ব আসনে নেই। কিছু কর্মী ছাঁটাই হয়েছে। সবাই উত্তেজিত হয়ে জটলা করছে। ফোর্থক্লাস এমপ্লয়িরা গেটের সামনে সিগ্রেট টানছে, টেবিলে বসে বুক কাঁপছিল। এরকম পরিস্থিতিতে আমি খুব অল্পতেই ঘাবড়ে যাই। এর কিছুক্ষণ পর বসের রুমে ডাক পড়লে আমার উত্তেজনা চরমে উঠে যায়। কাঁপা কাঁপা পায়ে এগোই। কাচের পার্টিশানের ওপারে বসের শীতল মুখ। রুমে ঢুকে অনাবিল ঠান্ডায়ও ঘেমে উঠি। টেবিলের গ্লাসের নীচে অনেক ছবি, ভিজিটিং কার্ড। সেদিকেই চেয়ে থাকি। তিনি বলেন, 'আপনার সিনসিয়ারিটির কারণে অফিস আপনার ওপর প্লিজড। আপনি খুব তাড়াতাড়িই এর রেজাল্ট পাবেন। শুধু একটু হিসেব করে চলবেন। পুরো পরিস্থিতি কীভাবে ম্যানেজ করতে হয়, সে ব্যবস্থা আমরা করছি।'

ভেতরে ভেতরে বেশ অভিভূত হয়ে পড়ি। কম্পন আরও বেড়ে যায়। 'ধন্যবাদ', বলে দাঁড়াতে যাব, তখন বলেন, 'একটুখানি মানসিক প্রস্তুতি রাখবেন, একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য লাগতে পারে। আমাদের মেহজাবিন তিনদিন ধরে আসছে না। জানেন তো, আগামীকাল ন্যুইয়র্ক থেকে আমাদের একটা পার্টির আসার কথা। যদিও এই দায়িত্ব আপনার না। বরাবর মেহজাবিনই এই কাজটা করে আসছে, কিন্তু পরশু থেকে সে অসুস্থ। বাইচান্স কাল সে মিস করলে...আমি কেমন ফ্যাকাসে হয়ে উঠি। বসের কণ্ঠ নিস্পৃহ। আমার গলা শুকিয়ে আসে। মেহজাবিন, অফিসের বিতর্কিত বাউন্ডুলে মেয়েটা। যার অফিসে কোনো সিট নেই, অফিসের যাবতীয় ফ্লায়িং কাজের দায়িত্ব তার ওপর। কী উদ্ভট তার পোশাক! কথায় কথায় মুখে খিস্তি। একদিন, মনে হলে এখনও শিউরে উঠি, অফিসের লিফট ধরে নামছি, পুরো লিফট খালি। আমি আর মেহজাবিন। ফস করে সে লাইটার জ্বালায়। এবং মাতাল ভঙ্গি আর ক্রুদ্ধ চেহারা নিয়ে আমার বেণির ডগায় আগুনের শিখা ছুঁইয়ে দেয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

প্রায়। আমি ধড়ফড়িয়ে আর্তনাদ করে উঠতেই ফুঁ দিয়ে শিখাটা নিভিয়ে হি হি হাসিতে ফেটে পড়ে সে। তার কাজের দায়িত্ব পড়েছে কি না আমার ওপর? এতদিন ভাবতাম বস খুব সম্মান করেন আমাকে। ভেতরটা কেমন গুঁড়িয়ে যেতে থাকে। তিনি আমার বিচলিত চেহারা দেখে বলেন, 'দেখুন, এয়ারপোর্টে কোনো পার্টিকে রিসিভ করতে যাওয়ার মধ্যে কোনো অসম্মান নেই। অফিসের পক্ষ থেকে এটা ভদ্রতা মাত্র।'

আমি জানি অফিসের অর্ডার, এই কাজটাও আমাকেই করতে হবে। কিন্তু এসব কাজের সত্যিকার ধরনটা আমার জানা নেই। তবে বাইরে থেকে দেখলে এসব কাজকে খুবই ন্যক্কারজনক মনে হতে পারে। অফিসের সহকারীদের টিপ্পনির মুখোমুখি হতে হবে। আমি যেন কেমন মরিয়া হয়ে উঠি, 'স্যার, এখানে আমার কী প্রয়োজন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' বলেই টের পাই প্রশ্নটা একজন অফিসকর্মীর পক্ষে শিশুর মতো হয়ে গেছে। নিজেকে শুধরে নিয়ে বলি, 'ঠিক আছে স্যার, আমি যাব।'

সেই থেকেই ভেতরটা খচখচ করছে, ওমর কখন থেকে অনর্গল বকে যাচ্ছে তার কাজের ধরন, কী করে, কতটুকু বুদ্ধি খাটিয়ে সে তার কাজে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে, কোন পথে এগোলে কতটুকু লাভ, প্রথম চার-পাঁচটা দিন সে ধরতেই পারেনি হেনতেন এইসব। রীতিমতো বিরক্তিকর ঠেকছিল। তবুও আমি তো একটা খড়কুটো আগলে ধরে বাঁচতে পারি না। হাত ফসকে গেলেই অতল জলে তলিয়ে যাওয়া। এই চাকরিটা আমাকে অসহায় ব্যক্তিত্বহীনে পরিণত করেছে। আমি কি জানি না আমার দৌড় কোন পর্যন্ত? বস এয়ারপোর্টে যাওয়া কেন, যদি আমাকে নিয়ে এক হপ্তার জন্য সমুদ্রের হাওয়া খেতেও যেতে চান, এখন যত সহজে ভাবছি রেজিগনেশন লেটার বসের মুখের ওপর ছুড়ে দেব, সত্যি সত্যি সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে আমি নিজের মধ্যে সেঁধিয়ে যাব না? আমার ফ্যামিলি, যুদ্ধের জীবন, অস্তিত্বের চরম সংকট আমার হাড়-মাংস এক করে একসময় এমন একটা চিন্তায় আমাকে কেন্দ্রীভূত করে দেবে না—সমুদ্রের হাওয়াই তো, গেলামই না হয়, অন্য কোনো দুর্গন্ধযুক্ত নর্দমা তো নয়। কী সব ভাবছি! ওমরের কথা কানে আসছে না। বুঝতে পারছি না, আগামীকালকের পরিস্থিতির মুখোমুখি কীভাবে হব? যদি কাল যাই, এবং আমার স্মার্টনেসে অফিস মুগ্ধ হয়, তারপর থেকে এরকম আরও পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে আমাকে। আমি মেহজাবিনের পরিপূরকে দাঁড়িয়ে যাব। এবং যদি আনাড়িপনার পরিচয় দিই, তবে? এই পার্টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কে জানে? শেষে নোনা জলে ডুবে মরতে হবে নাতো! একটা ঘুপচি প্রেসের সামনে এসে রিকশা থামে। সার সার বিল্ডিং দু-পাশে। রিকশা, ঠেলাগাড়ি, আবর্জনা আর নর্দমার গন্ধে বড়ো ভয়াবহ চারপাশের পরিবেশ। এই ঢাকা শহরে আমি কি একদিনের জন্যও এক চিলতে সুন্দর দেখব না?

ভেতরে ঢুকে আর এক জগৎ। ওইটুকুন ঘুপচি রুম। তার মধ্যে মেশিনপত্র এবং কালিঝুলি মাখা কর্মচারীতে ঠাসা। মালিকের চেহারাও কর্মচারীদের মতোই। সামনে চাপাচাপি টেবিল। তিনি দেয়ালে চেপে থাকা চেয়ারে বসে আছেন। ওমরের সাথে বেশ খাতির বোঝা গেল, 'আরে আসেন... আসেন'... এই আহ্বানের পর ভদ্রলোকের সাথে তার খাতিরের গভীরতা আমাকে বোঝাতেই যেন ওমর অহেতুক তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, 'আজ গেস্ট নিয়ে এসেছি।' উত্তরে লোকটি সরাসরি বিস্ময় প্রকাশ করেন, 'তোমার সাথে মহিলা গেস্ট! বড়ো অবাক করলা তো!'

এবার ওমরকে বেশ গর্বিত দেখায়। আমার দিকে তাকায় এমন দৃষ্টিতে যেন বলতে চাইছে, তুমি ভেব না, তোমার সাথে অত গায়ে পড়ে মিশছি বলে আমার মূল স্বভাবটা এই। অবশ্য আমার ভেতরও একটা মৃদু অহংকার কাজ করে। এই মহিলা-বর্জিত লোকটা এমন করে আমার পেছনে লেগেছে, ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

উপভোগ্য!

প্রেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওমর তার বিদ্যা অনুযায়ী মাস্টারিটা শুরু করে—'এই প্রেসেই আমি ইন্ডাস্ট্রির লেজার, ভিজিটিং কার্ড, টাইম কার্ড, প্যাড এইসবের ডিজাইন নিয়ে মাপসহ ছাপতে দিই। অবশ্য কাশেম ভাই না থাকলে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না', বলে সে মালিকের দিকে ইশারা করে। মালিক ওমরের এই স্তুতিতে না গলে কী সব হিসেবনিকেশে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এরপর ওমর আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'সবচেয়ে আগে আপনাকে পরিচিত হতে হবে প্রেসের সাথে। ওই যে ওটা হচ্ছে ট্রেডেল মেশিন', বলে আঙুল তুলে মেশিনগুলো দেখায়, 'কাজ শিখতে হলে আগে এসবের সাথে আপনার পরিচিত হওয়া দরকার। অফসেটে ছাপার জন্যও মেশিন আছে, অটোমেটিক মেশিন এবং ওই যে দেখুন কাগজ কাটার কাটিং মেশিন।'

পেটের বাঁ দিকে ঘা দিচ্ছে। নাহ্ ডাক্তার না দেখালেই নয়। আলসারটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যাচ্ছে নাতো? কেমন হাঁপিয়ে উঠি, বলি, 'এসব পরে চিনব। আগে বলুন, আমি কাজ পাব কী করে?'

'কাজ পেতে হলে কোনো এনজিও বা গার্মেন্টস ইন্ডাসট্রির সাথে আগে পরিচিত হতে হবে।' ওমর বিজ্ঞের মতো বলে। 'কোনো আর্টিস্ট বন্ধু থাকলেও অনেক সাহায্য পাবেন। যেমন ধরুন, এনজিওর কাজ পেয়ে আপনি প্রেসে ছাপতে দিলেন। ছাপার আগে ডিজাইন করে, কখনো ব্লক করে, কখনো পজেটিভ নেগেটিভ করে তারপর প্লেট বানিয়ে অফসেটে ছাপতে হবে। ব্লক করলে অবশ্য অন্য মেশিন। তো আপনি ডিজাইন পাচ্ছেন কোথায়? আর্টিস্ট বন্ধু থাকলে আপনি বিনে পয়সায় তার কাছ থেকে কাজটা করিয়ে নিতে পারেন।'

'দেখুন', ভেতরে এতক্ষণে আমি মিইয়ে আসতে শুরু করেছি। বলি, 'অতসব ঝক্কির সময় কই?'

ওমর বেশ দমে যায়। গম্ভীর গলায় বলে, 'নিজের ওপর অত বিশ্বাস কম থাকলে তো হবে না। কাজে পসার হলে দরকার মতো চাকরি ছেড়ে দিয়ে সময় বের করবেন। রিসক না নিলে কি শাইন করা যায়? প্রেসময় ছড়ানো কালি, মবিল, ছেঁড়া ন্যাকড়া। কেরোসিনের গন্ধে পেট ঘুলিয়ে ওঠে। এছাড়া অসম্ভব বদ্ধতা। এক সময় মালিকের কাছ থেকে ভদ্রতার বিদায় নিয়ে বাইরে এসে বলি, 'আমি ভাবছিলাম গাছে কাঁঠাল... মানে বলতে চাইছি, কাজ কোথায় পাব তার খবর নেই, আগেই প্রেসের সাথে আবোলতাবোল পরিচয়।' ওমর কিছুক্ষণ আমার পাশাপাশি নিঃশব্দে হাঁটে। এক সময় সে বলে ওঠে, 'আপনি তো ইচ্ছে করলে টিউশানিও করতে পারেন। আমার নিজেরই দু-তিনটি টিউশানি আছে। বলতে গেলে এর ওপরই কয়েক বছর ধরে টিকে আছি। নইলে বাবার যে ছাপোষা চাকরি...।'

'এ নিয়ে আমিও বিস্তর ভেবেছি', বলি, 'কিন্তু পাঁচটা পর্যন্ত অফিস করার পর টিউশানি করলে ঘরে ফিরতে ফিরতে তো রাত হয়ে যাবে। সন্ধের পরের ঢাকাকে আমি ভীষণ ভয় পাই।'

'এই ভয়টাই একটু কমাতে হবে', ওমর বলে, 'জীবনে একা চলতে চাইবেন, আবার ভয়ও পাবেন। তবে তো অন্য প্রস্তাব রাখতে হয়, কারও ঘাড়ে ঝুলে পড়েন।'

'তেমন ঘাড় পেলে তো ঝুলতামই'... আমি হেসে ফেলি। 'জীবনভরই তো ঘাড়ে ঝুলতে চেয়েছি। দেখি, হাড় নেই। ঘাড়ে শুধু পিচ্ছিল মাংস।'

'এই ঝুলে পড়ার অভ্যাসটা ছেড়ে দিন, দেখবেন সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে', ওমর উপদেশ দেয়। 'এই ঝোলাঝুলির জন্যই আমাদের মেয়েদের কিছু হল না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ওরে বাবা! এরপর আর কথা চলে না। আজ দ্রুত সন্ধ্যা এসে যায়। কী ঠান্ডা বাতাস! রাজপথে এসে লম্বা করে শ্বাস টানি।

পরদিন অফিসে এসে আমার এক রাতের ভয়ংকর চাপ থেকে অনাবিল মুক্তি ঘটে। মেহজাবিন এসেছে। গতকাল অনেক রাত অবদি ভেতরে ভেতরে কী দুঃসহ দ্বন্দ্ব! স্বপ্নে দেখেছি, বসের মুখের ওপর চাকরি ছাড়ার কাগজ ছুঁড়ে মেরেছি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে বুকের মধ্যে থরকাঁপুনি, কেন এত সহজ একটা ব্যাপারকে আমি নিজের মধ্যে জটিল করে তুলছি? স্রেফ কিছু গেস্টকে এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করে আনা। আমাকে তো এর বেশি কিছু করার নির্দেশ অফিস দেয়নি। মানসম্মানের ব্যাপারটা অতই যদি নাজুক হবে, তবে আর চাকরি করা কেন? সবাই কি আমার জন্য পথঘাট ঘষেমেজে মসৃণ করে রাখবে? এসব ভাবনার পরও আর দুশ্চিন্তা কাটেনি, কী অসহ্য পীড়ন! নিশ্চয়ই এ-ই আমার শুরু। এই পথ ধরেই আমাকে একটু একটু করে অন্ধকারের পথে পা রাখতে হবে।

সকালে সেজেগুজে চোখ মুখ লাল করে অফিসে এসেছি। এবং তারপরই মেহজাবিন। কী অপার শান্তি! জীবনে প্রথম মেয়েটাকে টেনে আমার টেবিলের সামনে বসাই। সে চোখ টিপে বলে, 'কী হে, বস নাকি তোমার ওপর টোপ ফেলেছিল?'

'তিনি তোমাকে তাই বলেছেন বুঝি?' আমার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা রক্ত নামে।

'আমাকে এভাবে বলেননি', চেয়ারে বসে রুমালে ঠোঁটের চারপাশ সন্তর্পণে মোছে মেহজাবিন। বলেছেন, 'তুমি না এলে মিস নীনা তরফদারকে পাঠাতে হত। তুমি নাকি বেশ নার্ভাস ফিল করছিলে?'

'তুমি একে টোপ বলছ কেন?' শীতার্ত চোখে তাকাই তার দিকে।

'এভাবেই শুরু হয়। যা হোক, আমি এসে গেছি', মেহজাবিন দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। অপূর্ব পারফিউমের ঘ্রাণ তার চারপাশে। নেশা ধরে যায়। মিস নীনা তরফদার, তুমি যে জায়গায় আছ আপাতত তোমাকে নড়তে হল না, 'বাহ্! তোমার শাড়িটা কিন্তু অদ্ভুত, যেন ডিমের কুসুম, তোমাকে কিন্তু সুন্দর দেখাচ্ছে! তুমি এত সিম্পল থাকো কেন? রং মাখলে তো বেশ দেখায়, কেউ বলেনি?' জুতোয় টুকটুক শব্দ তুলে বাইরে বেরিয়ে যায় মেহজাবিন। এবং তারপর থেকে আমার ভেতর নতুন প্রতিক্রিয়া, মেহজাবিন এসেছে বলে আমার আনন্দেরই-বা কী ছিল? বস যে প্রস্তাব রেখেছেন, আমার সার্ভিস লেটারে এমন কোনো কাজের উল্লেখ ছিল না। মেহজাবিন আসায় ব্যাপারটার একটা অস্থায়ী সমাধান হয়েছে মাত্র। সে না এলে এই কাজটা আমাকেই করতে হত। আমার যতটুকু অপমানিত হওয়ার তাতো আমি হয়েই গেছি। আমার তো আর নিশ্চিত থাকা চলবে না। কী জানি, আমিই হয়তো সবকিছু বেশি বেশি করে ভাবছি!

বাস, রিকশা এসব করে বিকেলে ইরফান চাচার বাসায় যাই। ড্রয়িংরুমে বসেছিলেন তিনি। দরজা খোলা। ইরফান চাচা এলানো সোফায় চোখ বুজে আছেন। শোকেসের ওপর রাখা ক্যাসেটে সন্তুর বাজছে। সদ্য রেখে যাওয়া কাপের চা থেকে পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। সমস্ত দৃশ্যে এমনই ঘোর, এমনই অনির্বচনীয় মোহ, আমি তার পায়ের কাছে নিঃশব্দে হাঁটুমুড়ে বসি। চায়ের ধোঁয়ার কাঁপন এবং সন্তুরের মিহি তরঙ্গ এক সমান্তরালে চলছে। এর মধ্যে ইরফান চাচার ধ্যানমগ্ন ঋষিতুল্য মুখ প্রবলভাবে মনে হয়, এই পুরুষ ছাড়া আমার পৃথিবীতে আর কোনো ছায়া নেই। একমাত্র এর মধ্যেই নিজের আত্মা, শরীর, হাড়, মাংস উপুড় করে ঢেলে দেওয়া যায়। আমি তাঁর হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরি। এবং কাঁদতে থাকি। তিনি চোখ মেললে দ্রুত নিজেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

সামলে দাঁড়াই। সোজা হেঁটে যাই টানা বারান্দা ধরে। খুব অল্প সময়ের জন্য আমি তাঁর চোখে অসহ্য নির্লিপ্ততা দেখি। চাচির ঘরে ঢুকে দেখি অবেলায় শুয়ে আছেন তিনি। কোঁকড়ানো চুল নীচের দিকে ছড়ানো, বুয়া বিলি কাটছে। আমাকে দেখে বিস্ময়-জাগা চোখ মেলে উঠে বসেন।

আমি নিঃশব্দে চেয়ার টেনে বসি। কী এক আলো তার মুখে, বহুবর্ণ রঙের এক অদ্ভুত মিশ্রণ। মহিলার মধ্যে কী যেন আছে। অহংকার তাঁকে মানায় বেশ। এলো চুলের ভাঁজেও শিল্পিত কারুকাজ। আর তার ভেতরাত্মা কিনা ছুঁতে পারেননি ইরফান চাচা, ভেবে বেশ পুলকিত হই। ক্ষমতা আছে বটে তাঁর!

তিনি প্রশ্ন করেন, 'কী ব্যাপার? চাচার সাথে ঝগড়া হয়েছে?' এত সহজ তার গলার স্বর! এই বাড়িতে আসার ঘটনাকে ঘিরে আমার এতদিনকার জড়তা, মুহূর্তে ধুয়েমুছে যায়। সলজ্জ বলি, 'না, আজ আমি আপনার কাছে এসেছি।'

'বুড়ো বয়সে আমাদের দুজনের মধ্যে সমঝোতা করতে চাও?' হাসতে হাসতেই তিনি বলেন, জীবনতো ফুরিয়েই এসেছে। তোমাকে তো আমি বেশ বুদ্ধিমান বলেই জানি। এসব নিয়ে কাদাজল নাই বা ঘাঁটলে?'

'দেখুন, আমি কোনো সমঝোতা করতে আসিনি, একটু গল্প করব শুধু।'

'সেটা আমি বিশেষ পারি না', তিনি বলেন। 'খুব সোজা করে বলতে গেলে কারো সাথে গল্প করাটা রীতিমতো বিরক্তিকর আমার কাছে। তোমার চাচা ওটা বেশ পারেন। নিশ্চয়ই সেদিন সারাদিন তোমাকে বেশ জ্বালিয়ে মেরেছেন?'

'কোনদিনের কথা বলছেন?' এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। তিনি বলেন, 'ওই যে, যেদিন নদীতে গেলে। আমাকে বলেছেন, তোমার কাছে নাকি আমাদের সাত জীবনের গান গেয়েছেন। এত কথা বলতে পারে মানুষটা! কীভাবে যে সহ্য করো।'

খুব অভদ্রভাবেই আমি ছুটে তাঁর ঘরে থেকে বেরিয়ে আসি। কী অদ্ভুত মানষের চরিত্র! আমি আসলে পৃথিবীর কিছুই চিনি না। অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে আমি এখনও যেন মায়ের পেটেই রয়ে গেছি।

ড্রয়িংরুমে এসে ঠান্ডা হয়ে বসে থাকি। ম্যাগাজিন রেখে চাচা প্রশ্ন করেন, 'নতুন কিছু আঁকলে?'

আমার ভেতরটা জ্বলছে। সবকিছু এত তরল এই ভদ্রলোকের কাছে? কী জটিল দাম্পত্যজীবনের বর্ণনা করেছেন আমার কাছে। সেই দিনটাকে আমি অপরিসীম গুরুত্বের সঙ্গে নিজের ভেতরে ঠাঁই দিয়েছি। আর তিনি কি না এই বিশ্লেষণ হাজির করেছেন তার স্ত্রীর কাছে? তাছাড়া দুজনের ভেতরে প্রকৃত যে সম্পর্ক, তার সঙ্গে ইরফান চাচার বক্তব্যের কিছুই যে মিলছে না।

'গ্রিক মিথ নিয়ে নতুন কিছু ভাবলে?' তিনি প্রশ্ন করেন। 'নতুন কিছু এঁকেছ?'

'দেখুন', কেমন খেপে উঠি আমি। 'আপনি অভিজ্ঞ মানুষ স্বীকার করছি। আঁকিয়ে হিসেবে আমি এখনও শিশু, সেটাও অস্বীকার করছি না। আপনি সব বোঝেন। কিন্তু একজন শিল্পী, সে যত দুর্বলই হোক, অন্য কেউ কোনো চিন্তা, কোনো সাবজেক্ট তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে দিয়ে আর যাই হোক স্বতঃস্ফূর্ত সুন্দর কোনা ছবি আঁকাতে পারে না। আপনি কেন ভাবছেন, যেসব সাবজেক্টের ব্যাপারে আপনি দুর্বল, সেসব ব্যাপারে আমার ভেতরও দুর্বলতা কাজ করবে?'

কেমন নিষ্প্রভ, সাদাটে হয়ে ওঠেন তিনি। চামড়ার ভাঁজে দুধের সরের মতো খাঁজকাটা তরঙ্গ খেলছে। কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বিশাল নিঃশব্দতা চারপাশে। আমি তার মধ্যে থরো থরো কম্পমান। বাঁদিকের পাঁজরের তলায় ঘা, হাত দিয়ে চেপে ধরি। তিনি বলেন, 'আমি দুঃখিত। আসলে প্রতিদিন মানুষ কিছু কিছু করে শেখে মানুষের কাছ থেকেই, সে যেই হোক, মানুষের ঋণ এভাবেই বেড়ে ওঠে।' কী হয়, ব্যাগ থেকে টেনে একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজ বের করি। সাইন পেনে আঁকা নগ্ন নারীদেহ। অফিসে বসে আঁকিবুকি করেছিলাম। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও ওটা তাঁকে দেখানোর বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার মধ্যে ছিল না। এখন মেলে ধরি টেবিলের ওপর। ঠান্ডা চোখে তাকাই তার দিকে। কী এক ছায়াচক্র ঘোরে চারদিকে।

একটু ঝুঁকে পড়ে ছবিটার দিকে নিঃশব্দে চেয়ে থাকেন তিনি। তারপর মৃদু স্বরে বলেন, 'তোমার কি রাগ কমেছে? আমি কি কিছু বলতে পারি?'

'আমি মোটেই রাগ করিনি', ঠান্ডা গলায় বলি। 'আমার আচরণকে অত সহজভাবে নিলে আমি অপমানিতই হব বেশি।'

'তাহলে নিজেকে খুলে ধরছ না কেন?' তিনি প্রশ্ন করেন। 'আসার পর থেকে, তুমি চিন্তা করে দেখো, দুর্বোধ্যতার একটা ছেলেমানুষি খেলায় লিপ্ত হয়েছ কি না?'

'সেটা আপনার খেলা', আমি বলি, 'নিজেকে দুর্বোধ্য করে তুলে মজা পাওয়া। ভেতরে ভেতরে ভীষণ সাধারণ আপনি। কিন্তু তার সত্যিকার প্রকাশ হলে তার সৌন্দর্য অন্যরকম হত।

'কী বলতে চাইছ তুমি?'

'আগে বলুন, আমি কি একটা শিশু? গিনিপিগ? সারাদিন স্রেফ লোফালুফি খেলে ঘরে এসে স্ত্রীর কাছে এই বলে নিজেকে মেলে ধরলেন, বেশ মজাদার দুঃখময় আনন্দময় খেলা খেলে এসেছেন। আমাদের কথাবার্তা, ক্রোধ, মেধা এতই স্থূল?' বলে, প্রায় জলভরা চোখে তাকাই তার দিকে। ফ্যানের বাতাসে কাগজের নগ্নদেহ দুলে ওঠে। সন্ধ্যা নেমেছে বাইরে। মৃদু মন্থর শীত চারপাশে। ইরফান চাচার মুখে কী ভীষণ শূন্যতা! তাঁর এত গভীর করুণ মুখ আমি আর দেখিনি। তিনি ফাঁপা, ভঙ্গুর কণ্ঠে বলেন, 'আমি ভীষণ নিঃসঙ্গ নীনা। যতক্ষণ তাঁর সাথে থাকি, সারাদিনের খুঁটিনাটি রুটিন চারণ করা ছাড়া আর কিছুই করা হয় না। তার মধ্যে প্রাণ থাকে না। এটি আমার অভ্যাস। বিশ্বাস করো, সেখানে কাউকে আমি ছোটো করি না।'

এই বিপন্নতার পর আমি দীর্ঘক্ষণ অসাড় বসে থাকি। সহসা আমি কথা খুঁজে পাই না। পরিস্থিতি চূড়ান্ত রকমের অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। আমি ঝুঁকে চোখ মুছে বলি, 'আমার স্কেচটা নিয়ে কিছু বলুন।' এবার আমাদের আলাপচারিতা ভিন্ন পথ ধরে। আমারই হেলাফেলায় আঁকা ছবি নিয়ে বিস্তর কথা হয়। এ-প্রসঙ্গে তিনি ভেনাসের উদাহরণ তুলে ধরেন। এশিয়া মাইনরের মাঝামাঝি একটা দ্বীপে তার অবস্থান। স্পন্দমান স্থির দেবী। নগ্ন, সুন্দর, শুভ্র। এত জীবন্ত এবং নগ্নতার ভেতর এত শিল্পিত সুন্দর, তাকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে হয়, প্রচণ্ড ঘোর লাগে, মনে হয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে খুঁড়ে এক করতে পারলে হয়তো তৃপ্ত হওয়া যাবে, কিন্তু না, কিছুতেই সেই সুন্দরের ভেতর পৌঁছোনো যায় না। ভেনাসের সেই মূর্তির একটি ছবিও তিনি আমাকে দেখালেন। গভীর মনোযোগে চেয়ে দেখি। সুন্দরের ভেতর এত নিটোলতা আমার পছন্দ নয়, আমি তাঁকে বলি, 'ভারতীয় স্কাল্পচারের অমসৃণ সুন্দর আমার বেশি পছন্দ।'

এ নিয়ে বিস্তর তর্ক। শিল্প নিয়ে নানারকম কথা, যুদ্ধই শিল্পের প্রধান অস্ত্র। শিল্পীকে পৃথিবীর কোনো কিছুই রুদ্ধ করতে পারে না। তিনি বলেন, 'একসময় আরবদের সমাজে প্রাণীর ছবির আঁকা নিষিদ্ধ হল। তুমি লক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

করেছ নীনা, সে সময়ের মসজিদে, পোস্টারে যে আরবি হরফ দেখা যায়, তার বিভিন্ন টানের মধ্যে অদ্ভুতভাবে কিছু প্রাণী, ধরো, পাখির ডানা, উটের মুখ, হরিণের লেজ—এইসব অস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে কী না?' এক পর্যায়ে প্রসঙ্গ অন্যপথে মোড় নেয়। ঘুরে আসে ফের সেটা আমার দাম্পত্য জীবনে, তার ভাঙন, এবং সেই পুরোনো কাসুন্দি—শতকরা নিরানব্বইজন মেয়ে যেখানে আপস করছে, আমি কেন তা করিনি, কতটা অসহিষ্ণু আমি, কতটা অপমানিত, কতটা রাডিক্যাল, আরও কিছুদিন আমি অপেক্ষা করতে পারতাম কিনা, এ সম্পর্কে আমার অভিমত, দেয়ালে পিঠ ঠেকার আগেই আমি বেরিয়ে এসেছি... ইত্যাদি এবং ইত্যাদি।

'কী করে জানো তুমি, দেয়ালে পিঠ ঠেকত?' তাঁর প্রশ্ন। 'উলটোটাও হতে পারত। আরও ভালোর দিকে। মানুষই তো পরিবর্তনশীল। নইলে সে এখন তোমার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে কেন?'

'যুক্তি দিয়ে শুধু সুন্দর তর্কই করা চলে', আমি বলি। 'মানুষের অনুভূতি, উপলব্ধির ক্ষমতা অনেক বড়ো। আঙুল কেটে তবে আমাকে বুঝতে হবে ক্ষরণের যন্ত্রণা? আমি তা টের পেয়েছিলাম। আজ তার কাছে আমি দুর্লভ বলে তার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র। কিছু মানুষের স্বভাবই এই, ইচ্ছে করে হারিয়ে ফেলা জিনিস হাতড়ে বেড়ানো।' এ নিয়েও অসংখ্য মতামত। আমার টেবিল চাপড়ানো। উত্তেজিত হয়ে কখনও দাঁড়িয়ে পড়া। তাঁর স্থির গোয়ার্তুমি।

এক সময় ঝিম মেরে বসে থাকি।

কিছুক্ষণ পর তিনি ভেতর থেকে একটা খাম নিয়ে আসেন। এবং গলার স্বরে আজ্ঞার সুর ফুটিয়ে বলেন, 'এতে কিছু টাকা আছে, তোমার শোধ করার সামর্থ্যের হিসেব করেই দিয়েছি। দিচ্ছি লোন হিসেবেই। তুমি অন্যভাবে নিলে আমি কিন্তু এবার আহত হব।'

কেমন জমে যাই। কেবল বলি, 'আমি তো চাইনি। কেন আপনি দিচ্ছেন?'

'দেখো নীনা, তুমি যদি তোমার সাথে আমার সম্পর্কটাকে সব সময় ফর্মাল রাখতে চাও, আমার তাতে কষ্ট পাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। কিন্তু মানুষের মূল সংকটকে মানুষ কখনোই চেপে রাখতে পারে না। অবচেতনের গহন তলদেশ ফুঁড়ে সেটা বেরিয়ে আসবেই। অর্থনৈতিক সংকট সম্পর্কে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে তখন তুমি বললে না, আমার মতো যদি আপনার মানুষের কাছে লোন থাকত, স্রেফ দেড়-দু-হাজার টাকা লোনের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হত... এসব বলে বলে আমাকে কোণঠাসা করলে, ক্ষিপ্ত হলে তো তোমার কিছু মনে থাকে না। আপাতত দু-হাজার লোন শোধ করো। আমারটা সুবিধেমতো দিয়ো।'

তাইতো, এতক্ষণে আমার হুঁশ হয়। এমন একটা তর্কের ব্যাপার বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম? আসলেই আমার আর্থিক সংকট এখন চরমে। মাঝে মাঝে রাতে স্রেফ বিস্কুট আর পানি গিলে পড়ে থাকি। তিনি ওকথা বলায় আমার সামনে আমার জঘন্য জীবন, দু-তিন পয়সার কর্কশ হিসেব, খেই হারিয়ে ফেলা, এসব এসে দাঁড়ায়। আমাকে কেমন বিপন্ন, অসহায় করে তোলে। তাইতো, রঞ্জুর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। সত্যজিতের ওখানে যাই না। আজ মাসের উনিশ পেরোনোর পর আমি ঝাড়া হাত-পা। লোনের টাকাও শেষ। আগামীকাল শানু বাড়ি যাবে, বলল তার টাকাগুলো দিয়ে দিলে তার ভালো হত। কিন্তু যেরকম সংকট, এবং সেই সংকটকে ঘিরে সারাক্ষণ যেরকম মানসিক চাপ, তাতে করে বড্ড ভয় পাই। ঠিক করেছিলাম, বাসায় গিয়ে বলব, 'আমার কাছে টাকা নেই। তুমি এখন আমাকে যেভাবে খুশি নিতে পারো।' কিন্তু তারপরও সারাক্ষণ শরীরের মধ্যে হিমশীতল অস্থিরতা। অফিসেও বেশ কিছু লোন হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ আগে এত তর্কের মধ্যেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ভাবছিলাম, টিউশানি শুরু করব। তাই ইরফান চাচার এই প্রস্তাবে আমার ভেতরে লজ্জা, গ্লানি, আনন্দের এক অদ্ভুত খেলা চলতে থাকে। কেমন অপমানও অনুভব করি। আস্তে করে বলি, 'দেখুন, আমি কি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনার কাছে আমার অবস্থার সামান্য বর্ণনাও দিতে পারব না? আপনি কি ভাবছেন, এইসব বলেকয়ে আমি আপনার কাছ থেকে কিছুমাত্র সুবিধা আদায় করতে চেয়েছি?'

তাঁর মুখ কেমন অন্ধকার হয়ে আসে। নিঃশব্দে খামখানা নিয়ে তিনি একটি ম্যাগাজিনের নীচে চাপা দিয়ে রাখেন। কী করব, দুর্মর সংশয়ের ভারে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ি। আমার সঠিক অবস্থাটা আমি ঠিক এখনই অনুভব করতে পারছি। অর্থনৈতিক অন্তঃসারশূন্যতা আমাকে কদ্দুর টেনে নিয়ে যাবে কে জানে? বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। ঘরে হলুদাভ আলোর বর্ণবিচ্ছুরণ। ইরফান চাচা তখন গম্ভীর, নিশ্চুপ।

ঘোর আলোর অবয়ব ছিঁড়ে দাঁড়াই। অসহায় আর্ত স্বরে তিনি বলেন, 'আমি টাকাগুলো তোমাকে দান করতে চাইনি।'

বুকের মধ্যে ফরফর পাক খায় খরশান রোদ। কুশ্রী জটিলতাগুলো অগ্রাহ্য করে ম্যাগাজিন উঠিয়ে খামখানা নিয়ে ব্যাগে ভরি। দরজার দিকে এগিয়ে যাই ঠোঁটে মৃদু হাসি ঝুলিয়ে। তিনি এগিয়ে আসেন দরজায়, 'তোমার ন্যুড স্কেচটি আমি রেখে দিলাম। মেয়েদের হাতে এসব এত সুন্দরভাবে আসতে পারে, আমার ধারণায় ছিল না। তুমি আঁকো নীনা, এঁকে তোমার নাম করতে হবে না। নিজের জন্যই আঁকো। এর বেশি আমি কিছু বলব না।'

'আমাকে আপনি ভালোবাসেন, তাই খুঁতগুলো আপনার কাছে কম ধরা পড়ে... হাসতে হাসতে চিরদিনের সন্ধ্যার পথে পা বাড়াতে যাব, আচমকা তিনি আমাকে দাঁড়াতে বলেন। তারপর আমি তাঁর চরিত্রের হঠাৎ কিছু করে ফেলার আর এক রহস্যের মধ্যে ঢুকে পড়ি। আমাকে ডেকে নিয়ে যান তিনি তাঁর সেই পুরোনো কারুকাজ-করা কামরায়। যেন জাদুঘর। বহুদিন পর আবার এই ঘরে এসে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ি। সেই পুরোনো গন্ধ। অভিনব সংগ্রহ। আলমিরা খুলে বের করেন এক ফুট লম্বা একটা রঙিন মোমবাতি। সাপের দেহের মতো বাঁকানো, ঠোঁট দিয়ে বেরিয়েছে সুতোর ডগা। ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে ফস করে দেশলাই জ্বালান। স্ট্যান্ডের ওপর রেখে সেটাকে জ্বালিয়ে দেন। বলেন, 'তোমাকে একটা চমৎকার অংশ শোনাব, তাই আটকালাম। সবকিছুর জন্যে একটা পরিবেশ দরকার' বলতে বলতে বইয়ের স্তূপ ঘাঁটতে থাকেন। আমার ভেতরে অবিরাম কাঁপুনি। খসখস কীসব পাতা খুলে বাতি নিভিয়ে তিনি আমার পাশে এসে বসলে আমার সেই কাঁপুনি আর দ্রুততর হয়। রানু, মজুমদার, আর চারপাশের অন্ধকারে মোমবাতির অগণন চক্রের ঘূর্ণি। যে ভয়াবহ ছবি বুকের মধ্যে চিত্রিত, সেই কুশ্রী ছবিগুলো আমার দেহজাল ছিঁড়ে কিছুতেই বের হয় না।

কিন্তু এক অভিনব সৌন্দর্যে কিছুক্ষণ পরই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। বাইবেল খুলে, যেন কোনো পাদ্রি, এমন অনড় গম্ভীর স্বরে পড়তে শুরু করেন। বলেন, সোলেমানের পরমগীতের একটা অংশ তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। কেন যেন হঠাৎ মনে হল, 'তোমাকে এর কিছু অংশ শোনাই। তুমি কি অস্বস্তি বোধ করছ?'

আমি অভিভূত হয়ে মাথা নাড়ি, 'না।' আমার সম্মতি পেয়ে তারপর তিনি পড়তে শুরু করেন—

আমি নিদ্রিতা ছিলাম, কিন্তু আমার হৃদয় জাগিয়া ছিল।
আমার প্রিয়ের স্বর, তিনি দ্বারে আঘাত করিয়া কহিলেন,
আমায় দুয়ার খুলিয়া দেও, অয়ি মম ভগিনী, মম কপোতি! মম শুদ্ধমতী!

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কারণ, আমার মস্তক ভিজিয়া গিয়াছে শিশিরে!
আমার কেশপাশ রাত্রির জলবিন্দুতে।
আমি আমার অঙ্গরঙ্গিনী খুলিয়াছি, কেমন করিয়া পরিধান করিব?
আমি পা দু-খানি ধুইয়াছি, কেমন করিয়া মলিন করিব?
আমার প্রিয় দুয়ারের ছিদ্র দিয়া হস্ত বিস্তার করিলেন।

দপদপ মোমবাতি জ্বলছে। ইরফান চাচার গলায় কী ভীষণ আবেগ, ডোরাকাটা আলো-ছায়ায় কী অদ্ভুত গুঞ্জনধ্বনি! আমার তরঙ্গিত রক্তের খাঁজে খাঁজে কী আশ্চর্য ঘ্রাণ! আমি তার দেবতুল্য চেহারার দিকে চেয়ে আছি। কী চমৎকার ঘ্রাণ! যেন একাকী প্রাচীন গ্রিক নগরীর উঁচু কোণে চত্বরে বসে তিনি পড়ে যাচ্ছেন।

তাহার জন্য আমার চিত্ত উচাটন হইল।
আমি আপন প্রিয়ের জন্য দুয়ার খুলিতে উঠিলাম।
তখন গন্ধরসে আমার হস্ত ভিজিল।
অর্গলের হাতের উপরে।
আমি আপন প্রিয়ের জন্য দুয়ার খুলিয়া দিলাম।
কিন্তু, আমার প্রিয় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কথা কহিলে আমার প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল।
আমি তাহাকে অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু পাইলাম না।
নগরে ভ্রমণকারী প্রহরীরা আমাকে দেখিতে পাইল।
তাহারা আমাকে প্রহার করিল, ক্ষতবিক্ষত করিল।...

এইটুকু পড়েই তিনি থেমে যান। চারপাশে প্রগাঢ় নৈঃশব্দ। তিনি খোলা পাতা বন্ধ করে আমার দিকে তাকান। আমার জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে তখন কী ভীষণ তোলপাড়! আমি নিজেই বুঝতে পারছি না, একটা প্রাচীন কামরা, একটা দীর্ঘ মোমবাতির শিখা, একজন মধ্যবয়সী লোকের সৌম্য কণ্ঠে এমন কী মায়া, যার টানে আমার ঘিনঘিনে জীবন, হিসেবনিকেশ, আমার উৎপীড়িত অতীত সব দ্রুত সরে যাচ্ছে, দূরে বহুদূরে। আমি ম্লান চোখে সেই অপসৃয়মাণ জঘন্য ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি। এক জীবন যদি এই রকম পরিবেশের মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকা যেত! যদি তা-ই হত?

আমি প্রশ্ন করি, 'তারপর?'

ঘোর ছিন্ন করে তিনি পাতা ওলটান, বলেন, 'দেখো, সোলেমান সেসময় আর একটি অংশে কী লিখেছিলেন—

'আমাদের একটি ছোট ভগিনী আছে,
তাহার কুচযুগ নাই;
আমরা নিজ ভগিনীর জন্য সেদিন কী করিব,
যে দিনে তাহার বিষয়ে প্রস্তাব হইবে?
সে যদি ভিত্তি স্বরূপা হয়,
তাহার উপরে রৌপ্যে গম্বোজ নির্মাণ করিব।
সে যদি দ্বার স্বরূপা হয়, এরস কাষ্ঠের কবাট দিয়া তাহা ঘেরিব।'

তিনি বইটা ভাঁজ করে রাখেন। আমি অস্ফুটে প্রশ্ন করি, 'তারপর?'

'থাক', বলে নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে তিনি কী যেন বলতে চান। আমি হকচকিয়ে দাঁড়াই, 'প্লিজ বলবেন না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

আপনি ছেলেমানুষি, কিছু করেছেন। তাহলে পুরো স্বপ্নটার মৃত্যু হবে'—একথা শুনে এমন ভঙ্গিতে তিনি হাসেন, আবারও তার কাছে আমি একজন সরল ছেলেমানুষে রূপান্তরিত হই।

তিনি বাতি জ্বালাতে চাইলে আমি দ্রুত বাধা দিই। কী অদ্ভুত, ছেলেবেলায় আচ্ছন্ন হওয়া, কেঁদে কেঁদে বুক-ভাসানো একটা গল্প হঠাৎ আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে। আমি তাঁকে বলি, 'আপনি সেই রূপকথাটি পড়েছেন? এক মৎস্যকুমারী, সে ভালোবাসত ডাঙার এক রাজকুমারকে, কী দুর্বহ যন্ত্রণা তার। জলে পতিত রাজকুমারকে সে সেবা দিয়ে ভালো করে তোলে। শেষে একদিন এক জাদুবুড়ির কাছ থেকে সে মানুষ হওয়ার জন্য প্রচণ্ড কষ্ট সত্ত্বেও নিজের লেজটা কাটিয়ে ফেলে। যখন প্রাসাদে যায়, দেখে রাজকুমার বিয়ের মঞ্চে বসে আছে। তাকে আর চিনতে পারে না। সেই জাদুবুড়ি বলেছিল, মানুষ হয়ে তুমি যদি এরপর জলে ফিরে আসতে চাও, তোমার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না, তুমি ফেনা হয়ে যাবে। বিশাল সমুদ্র! জাহাজে করে বউ নিয়ে যাচ্ছে রাজকুমার। জাহাজের পাটাতনের কিনার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অঝোর ধারায় কেঁদে চলেছে মৎস্যকুমারী। শেষে বিকট তরঙ্গরাশির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধীরে ধীরে সে ফেনা হয়ে জলের সাথে মিশে যায়।

চেয়ারে স্থির বসে আছেন ইরফান চাচা। তাঁর মুখ উদ্ভাসিত। আমি সমস্ত ঘরে পাক খাই। সেই আলমিরাটির সামনে দাঁড়াই। যেটা অভিনব, সব ছোটো আকারের মূর্তিতে ঠাসা। বলি, 'ধরা যাক এটা একটা জাহাজ, আমি মৎস্যকুমারী। লেজ কেটে গিয়ে নতুন গজানো পা থেকে রক্ত ঝরছে, ধরা যাক, এটা সেই রেলিং।' আমি ঘরের কোণের বিশাল কারুকাজ করা চেয়ারটাকে মাঝখানে নিয়ে আসি। চোখ বুজে বলি, 'অদ্ভুত জলরাশি সামনে, কী ভীষণ স্রোত, হে তরঙ্গ আমাকে গ্রহণ করো। আমি তলিয়ে যাই', ফেনা হয়ে যাই... বলতে বলতে চেয়ার থেকে হাত সরিয়ে উবু হয়ে বসে পড়ি মাটিতে। সেই অবস্থায় বিহ্বল চোখ মেলে ইরফান চাচার মুখ দেখি। তাঁর দৃষ্টি ঋষ্যশৃঙ্গের চোখের মতো নিষ্পাপ। এমনভাবে চেয়ে আছেন, গভীর অরণ্যে তরঙ্গিনীকে দেখে ঋষ্যশৃঙ্গের যে দশা হয়েছিল, তার সমস্ত দৃষ্টিতে ঠিক সেই বিস্ময়। তারপর অন্ধকার। কুয়াশাচ্ছন্ন পথ সামনে। এবং এক ভয়াবহ নীরবতায় ঢেকে যায় আমার চারপাশের পৃথিবী। আমি হাঁটুতে মুখ ডোবাই।

ইরফান চাচা আমাকে টেনে দাঁড় করান। চারপাশে বাতি জ্বলে উঠেছে। আমার চোখ জলে ভিজে গেছে। আজ যে কী হয়েছে আমার! ইরফান চাচা কেন আমাকে বুকের কাছে চেপে ধরছেন না? দীর্ঘ বছর পর আজ আমি ভেসে যেতাম! যন্ত্রণায়, আগুনে পুড়ে আমি খাক হয়ে যাচ্ছি। কেন তিনি আমাকে গ্রহণ করছেন না? তিনি শুধু বলেন, 'চলো, আজ তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।' প্রতিদিনের মতোই তার কণ্ঠস্বর সংহত, অবিচল।

ঘর থেকে বেরোতেই মনে হল একটা ছায়া দ্রুত অপসৃয়মাণ। লক্ষ করে দেখি, পেছনে ছড়ানো চুল, ইরফান চাচার স্ত্রী। যেন পায়চারি করতে করতে টানা বারান্দা ধরে নিজের ঘরে যাচ্ছেন। বুকের ভেতরটা আচমকা ছলকে ওঠে। বিস্মিত চোখে ইরফান চাচার দিকে তাকাই। তিনি ঘরে নিঃশব্দে তালা লাগাচ্ছেন। মহিলা আড়ি পেতে ছিলেন তবে? রাস্তায় এসে এ নিয়ে আর কথা হয় না। আমি অনেক ভেবেও এই ঘটনার মর্মভেদ করতে পারি না। সত্যিই তাঁর স্ত্রী অদ্ভুত চরিত্রের!

রিকশা চলছে হালকা কুয়াশায় আলো-ছায়ার পথ ধরে। আমি আবার আপাদমস্তক ডুবে যেতে থাকি আজকের পুরো ঘটনার জটজটলার মধ্যে, তিনি বলেন, 'জানো, আমিও ঠিক এমন ছিলাম। কোনো ঘটনার কোনো গল্পের মধ্যে এভাবে নিজেকে ঘুলিয়ে ফেলতাম। স্টার সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে নিজেকে মনে হত উইলিয়াম হোল্ডেন কিংবা উত্তমকুমার। রাস্তা ধরে হাঁটতাম। চারপাশে অহংকারী মাথা তুলে তাকাতাম, এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে সেই চরিত্রে বাইরের কেউ মনে হত না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

একদিন তো এই নিয়ে আমার স্ত্রীর সাথে গোলমাল লেগে গেল। দুজনই কী একটা ছবি দেখে ফিরছিলাম। নায়িকা ছিল গ্রেটাগার্বো। ছবির হুবহু দৃশ্যের মতো করে ওর পিঠে মুখ রেখে ফিসফিস করছিলাম, উফ্ গার্বো গার্বো... পরিণতিতো বোঝোই। আশ্চর্য! বয়সের সাথে সাথে কী অদ্ভুতভাবে মানুষের মন থিতিয়ে আসতে থাকে। চারপাশে রাতের মন্থর দৃশ্য। ঠিক এই বিশেষ মুহূর্তে হঠাৎ করে মনে হয়, তিনি তার সময়কার গল্প করছেন, তার পরের প্রজন্মের এক মেয়ের কাছে। মানুষটার বয়স হয়েছে।

'চাচির কাছে গিয়ে কখনো আমার মায়ের কথা মনে হওয়ায় নিজেকে ঘুলিয়ে ফেলেননি?' কী এক বেদনাধূসর গভীরতা থেকে, জেদ থেকে আমি তাঁকে এমন একটা প্রশ্ন করে বসি। করার পর বোধোদয় হয়, কোনো মানে হয় না এসব প্রশ্নের। সোডিয়াম বাতির তামাটে আলোয় নিমজ্জিত চারপাশ। অনেকটা টানা পথে কোনো কথা হয় না। এই প্রথম আমার হাত তিনি তার হাতে টেনে নেন, মৃদু চাপ দিয়ে বলেন, 'এইরকম চিন্তাভাবনাহীন প্রশ্ন তোমাকে মানায় না। তুমি অনেক পরিণত।'

আমাদের গলিতে অসম্ভব বন্ধুরতা আর চিরকালীন পচাগন্ধ। বাসার কাছে এসে তিনি বলেন, 'এই রিকশাতেই ফিরে যাই। আজ আর বাসায় ঢুকব না।'

ধীর পায়ে নেমে আসি। রাতের পাতলা ঠান্ডা বাতাস। আমি হেসে বলি, 'খুব ছেলেমানুষি হয়ে গেল হয়তো।' রিকশা ঘুরলে তিনি জোরে হাসেন, 'দেখেছ, শেষ পর্যন্ত কিন্তু তোমার কাছেই ছেলেমানুষি মনে হল, আমার কাছে নয়।'

বাসায় এসে রীতিমতো চমকে উঠি। গম্ভীর মুখে শানু দরজা খুলে দিয়েছে। রেজাউল বিড়ি ফুঁকছে। আমার বিছানায় পা উঠিয়ে বসেছে সত্যজিৎ। কেমন অবসাদ অনুভব করি। ব্যাগ রেখে 'কেমন আছ' সেরে ভেতরে গেলে শানু গলা তুলে বলে, 'ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দাও। এখন ওর সাথে কথা বললেও তোমার পাপ হবে।' পরিচয়পর্বও হয়ে গেছে তাহলে! বাইরের ঘরে এসে রীতিমতো রুক্ষ মেজাজে টানটান বসে থাকি। অনেকটা নিজেকে সংযত করার জন্যই। নিশ্চয়ই আমার এই রাতে ফেরাফেরি নিয়ে কোনো কঠোর মন্তব্য হজম করতে হবে। কিন্তু বড়ো নিভন্ত রেজাউলের দৃষ্টি। বড়ো আপন মানুষের মতো বলে, 'আজ তোমাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তাছাড়া আমরাও এসেছি অনেকক্ষণ। আজ চলি। অন্য কোনোদিন আসব।'

সত্যজিৎ বলে, 'তুই নীনার সাথে অত ভদ্রতা করছিস কেন?' কী যে অদ্ভুত মানুষের চরিত্র! এক সময়, একসাথে, একঘরে কতদিন ছিলি, আর আজ এমন ভঙ্গিতে কথা বলছিস, যেন আজই প্রথম পরিচয়।' রেজাউল দাঁড়িয়ে স্যান্ডেল পরে। 'নারে, সারাদিন খুব টোটো করতে হয়েছে। শালার পেটের ধান্দা। আমার নিজেরই বড্ড ক্লান্ত লাগছে।'

'তুই যা, আমি নীনার সাথে কিছু কথা বলব।' সত্যজিতের কথায় গেটের কাছে চলে যায় রেজাউল।

'পুরো ব্যাপারটা কি প্ল্যান করে করা হয়েছে?' ঝাঁঝালো স্বরে প্রশ্ন করি। 'আমি এলে সত্যজিৎকে বসিয়ে তুমি চলে যাবে! অত ভনিতার দরকার কী?' দাঁড়িয়ে যায় রেজাউল, 'তোমার পক্ষে সেটা ভাবা খুবই স্বাভাবিক। সহজ করে কিছু দেখার মতো সরলতা তো তোমার মধ্যে নেই।'

সত্যজিৎও দাঁড়ায়—'আমিও চলে যাচ্ছি। নীনা তুই কিন্তু আমাকেও অপমান করলি।'

'অত সেনসেটিভ মন নিয়ে বন্ধুত্ব করিস!' আমি হেসে ফেলি। 'তুমিও বসো না রেজাউল! পেটের ধান্দা তো আমাকেও করতে হয়। রেজাউল তারপরও বড়ো স্নেহার্দ্র স্বরে বলে, 'নারে আজ যাই, শরীরটা সত্যিই ভালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ঠেকছে না। অন্যদিন আসব।'

আমার আহ্বান উপেক্ষা করে তার চলে যাওয়ার ভঙ্গিটিকে বড়ো অকৃত্রিম ঠেকে, যদিও তার সাথে আমার সম্পর্কজনিত কেতাকায়দা আমার কাছে বড়ো অস্বস্তিকর লাগে।

সে চলে যেতেই ঘরে প্রগাঢ় নির্জনতা। আমার সামনে তরঙ্গরাশি... হে সমুদ্র, আমাকে গ্রহণ করো, হে তরঙ্গ, আমাকে ফেনায় রূপান্তরিত করো... তারপর আমাকে অসাড় করে নবজাত শিশু দীর্ঘদিন পর কেঁদে ওঠে, বুকের মধ্যে তাকে ঠেসে ধরি। আমার ছোটো চাচার ঝুলন্ত দেহ সিলিং ফ্যানের মধ্যে পাক খায়। কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ি।

'নীনা, সেদিন লেকের পাড়ের ঘটনার পর থেকে তুই আমাকে এড়িয়ে চলছিস, আমি কি জানতে পারি, কেন?' সত্যজিতের এই প্রশ্নে আমি অতল থেকে ওপরে ভেসে উঠি। ঘুমন্ত চোখে তার দিকে তাকাই। কিছু বলি না।

'তুই সেসব প্রসঙ্গে সম্মতি বা প্রতিবাদ কিছুই করিসনি।' সত্যজিৎ বলে, 'এখানে আমার দোষ কোথায়?'

'তোকে আমি দোষ দিয়েছি? আমি আসলে বড়ো ব্যস্ত। এসব ব্যাপার নিয়ে বুলি কপচাতে বড়ো নোংরা লাগে।'

'তুই রেজাউলের ব্যাপারে কিছু ভেবেছিস?' সে খুব সন্তর্পণে অন্য প্রশ্নের দিকে যায়।

'কোন ব্যাপারে?' আমিও না জানার ভান করি।

'ও তোর সাথে আবার এক হতে চাইছে।'

এবার আমার পালা। চেয়ার টেনে সহজ হয়ে বসি। দু-হাত ওপরে তুলে চুলের রাবার ব্যান্ড খুলতে খুলতে সহজ গলায় বলি, 'আমার না কীসব সেক্সচুয়াল ট্রাবল আছে! এখন কী সে ভাবছে সেসব অসুবিধে কাটিয়ে আমি অন্য নীনা হয়ে উঠেছি!'

'হয়তো এসব এখন তার কাছে বড়ো কোনো ফ্যাক্টর নয়', সত্যজিৎ বলে, 'মানুষেরইতো চেঞ্জ হয়!'

'সে বলেছিল না', কীসব বিকারগ্রস্ততা আছে আমার, দীর্ঘদিন একা থাকার পর আমার সেসব আরও বেড়েছে', খুব ধীরে ধীরে বলি, 'আমি সেই রূপান্তরের এক এক করে বিশ্লেষণ দেব তার কাছে, শুনে সে এক হতে রাজি হলে আমিও রাজি।'

'তুই খুব সহজেই খেপে উঠিস', সত্যজিৎ বলে। 'বিছানায় তুই ওকে সহ্য করতে পারতিস না, একথা ঠিক নয়?'

'একজন ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করেই, লাইট জ্বলছে, দড়াম করে আমার সামনে উদোম হয়ে গেল, তারপর হনুমানের মতো আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকল, তোকে অশ্লীলভাবে বলতে হচ্ছে, তার পাশে শুয়ে আমি তারপরও উষ্ণ হয়ে উঠতে পারি? সবকিছুর মধ্যে ন্যূনতম শিল্প বলেতো কিছু থাকা চাই।'

আমার শরীর থেকে আবারও ক্লেদাক্ত কষ বেরোয়। কেমন কান্না ঠেলে উঠতে থাকে। যেন মাংস, যকৃত, প্লীহা সবকিছু ফুঁড়ে আবারও ঢুকছে সেই শলাকা, যা আমি উপড়ে ফেলেছি। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বিছানায় বসেছে সত্যজিৎ। শানু ভেতরে থাকায় কেমন অস্বস্তি অনুভব করি। এবং স্রেফ রক্ষণশীল মহিলার মতো আপন কারো কাছে নিজের প্রাক্তন স্বামীর এরকম খোলামেলা বদনাম করে মনের গহনে কষ্ট বোধ করতে থাকি। নিজেকে অসম্ভব গতানুগতিক মনে হয়। ডির্ভোস হয়ে গেলেই কেন একজন মানুষ সম্পর্কে ঘৃণা বা বিদ্বেষ-মেশানো কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

উচ্চারণ করতে হবে? কিন্তু প্রসঙ্গের ভেতর ঢুকে পড়েছি, স্ববিরোধী আচরণে বেরিয়ে পড়াটাও এখন একটা সমস্যা।

'এটা তোরই প্রবলেম', সত্যজিৎ বলে। 'হাজারটা দম্পতির খোঁজ নিয়ে দেখ, দুজনের সামনে দুজনের নগ্নতা, তা সে যেরকমেরই হোক, তাদের কাছে নর্মাল, সহজ। এটাতো প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের সম্পর্ক নয়।

'তবে সেই হাজারটা মেয়ে থাকতে আমাকে আবার তার দরকার পড়েছে কেন? চেষ্টা তো সে কম করেনি, আমি সব কিছুর মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজি, কুৎসিত কদাচার পশুত্ব আমার কাছে অসহ্য।'

'তুই তাকে বাজে সন্দেহ করতি', সত্যজিৎ বলে। 'তার কাছে কম বয়সী কোনো ছেলেবন্ধু এলে তুই তাদের সাথে সহজ ব্যবহার করতি না, এটাতো ঠিক। মানুষেরই সন্তান হয়, সন্তানের মৃত্যু হয়। সন্তানের মৃত্যুর পর তুই তাকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলতি। এই করে করে তার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিলি, হাজার হোক সেওতো রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। তুই তার ক্রাইসিসটা দেখবি না?'

'ছেলেবন্ধু এলে কেন সহজ ব্যবহার করতাম না, সে কথা তোকে বলেনি? সেই বিকৃতিও কি আমার?'

'আমি সে কথাও জানি।' সত্যজিৎ বলে, 'ও সেটা অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। অতীতকে সামনে টেনে তুই তার বর্তমানকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারিস না।'

'আমাকে বিয়ের আগে সে তার সেই অতীত বলেনি, একদিক থেকে সে আমাকে ঠকিয়েছে। আমি সন্দেহ করার পর তবেই বলেছে। দেশের নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মেয়ে তাদের স্বামীদের অতীতের কুকীর্তি ক্ষমা করে দেয়, আমি সেও না হয় মানছি। কিন্তু সেই অতীত যদি আমার বর্তমানের সুখ নষ্ট করে দেয়? আমাকে তা-ও সহ্য করতে হবে, মেনে নিতেই হবে, এমন দায় আমাকে কে দিয়েছে? তাছাড়া আমার সন্তানের মৃত্যুর পর—আমি জানি মানুষের সন্তান হয়, মৃত্যু হয়, তুই তৃতীয় ব্যক্তি, তোর পক্ষে এটা বলা আরও সহজ, কিন্তু সন্তানটির জন্ম দিয়েছি আমি, সহ্য ক্ষমতা সবার সমান থাকে না—যেখানে আমি দারুণভাবে বিপর্যস্ত, উন্মাদপ্রায়, তুই বিশ্বাস করবি, পাঁচ দিনের মাথায় সে আমার শরীরের জন্য কাঙাল হয়ে উঠেছিল। আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে সে-কী কাকুতিমিনতি। এরপর থেকে প্রায় প্রতিদিন। কখনো জন্তুর মতো আক্রমণ করতে চাইত। আমি তারপর থেকে তার প্রতি ধীরে ধীরে সব শ্রদ্ধা হারাতে শুরু করেছি। আমাকে সে তখন একবিন্দু মানসিক আশ্রয় দেয়নি। সে কি সন্তানের পিতা ছিল না? আমি কি তার শোককে অস্বীকার করব? বললাম তো, সবার সহ্য ক্ষমতা সমান থাকে না। আমি তবে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের দলে পড়ি না।'

বলতে বলতে কেমন হাঁপিয়ে উঠি। অনুজ্জ্বল আলোর স্রোতে আমার কম্পিত দেহ ক্রমশ থিতু হয়ে আসে। লম্বা মোমবাতির শিখাটি দপ করে জ্বলে ওঠে সামনে। কী সৌম্য মূর্তি, আবৃত্তি করছেন—তাহার জন্য আমার চিত্ত উচাটন হইল... তারপর ভেনাসের সেই স্কাল্পচার, স্পষ্ট ভেসে ওঠে—অসহ্য সুন্দরকে স্পর্শ করা যায় না। একটা স্থির রুপোর নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করে সুন্দর। ঝাঁপিয়ে পড়ি, তছনছ করে দিতে চাই মানুষের সহজাত প্রবণতায়। ফিরে এসে দেখি, ছুঁয়েছি, এই সুখটুকু ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসিনি। সুন্দর তেমনই স্থির অনড়, জ্বলজ্বল করছে।

এই মানুষটার সাথে পরিচয় না হলে আমি জীবনের কতটুকু চিনতাম? এবং তারপর আর একটি কক্ষ। কোমল নরম রানুর দেহ একটা বিশাল দৈত্যের হাতের ওপর। আবিষ্ট রানু চোখ বুজে আছে। কী ভয়াবহ, আশ্চর্য এক ঘ্রাণ! কোত্থেকে আসছে! আগরবাতির! বাবার লাশ বিছানায় শোয়ানো! কী ধোঁয়া চারপাশে! সব অস্পষ্ট,

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ঝাপসা।

'সে অনেক বদলে গেছে', মেঝেতে নেমে সত্যজিৎ বলে, 'আজই আমাকে আসতে আসতে বলছিল, তোর কাছে সে কোনো সৌন্দর্যের ধার ধারত না, এটা তার একটা বড়ো ভুল ছিল। নীনা, তোর কি শরীর খারাপ?'

কেমন ঝিমিঝিম করছে মাথা। রাত অনেক হয়েছে। সত্যজিৎ দরজার কাছে গিয়ে তারপর বলে, 'আমি তোকে জোর করব না। তুই চিন্তা করে দেখতে পারিস। ও ভীষণ নিঃসঙ্গ।'

এবার দুর্বিষহ এক বেদনা আমার বুকে চিৎ হয়ে শোয়। মাঝে মাঝে কাত হলে একটু শ্বাস টানতে পারি। এক রাতে প্রচণ্ড মাথা ব্যথার সময় রেজাউল অনেক রাত অবদি আমার মাথা ম্যাসেজ করে দিয়েছিল। সমস্ত কালিমা ছাপিয়ে হঠাৎ সেই দৃশ্য আমাকে বিহ্বল করে তোলে। সেই রাতের সেই মায়াময় রেজাউল হঠাৎ আমাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে, সত্যজিতের সাথে আমার এসব তর্কে কেমন কান্না পেতে থাকে। শুধু ওর কাসুন্দি ঘাঁটলাম। সহনশীলতার অভাব আমার ভেতরে কি কম ছিল? নিজেকে ছেঁটে কি মনে হতেই দ্রুত ব্যাগ খুলি, 'এই টাকাগুলো রঞ্জুকে দিয়ে দিস। অনেকদিন হয় নিয়েছি।'

'সেদিন সে বলছিল', সত্যজিৎ বলে, 'ভালোই করেছিস। তার অবস্থা বিশেষ সুবিধের না। কী সব পার্টনারশিপ করবে বলে ক-দিন বেশ নাচল। এখন আবার ফুটো বেলুন।'

'ওকে আসতে বলিস'... বলে আবারও অবসাদের কোলে। কেমন ঝিমুতে থাকি। সত্যজিৎ চলে গেলে শুরু হয় শানুর সাথে টাকার হিসেব। কাল ভোরে সে বাড়ি যাচ্ছে, সাথে কামাল ভাই। শেষে আমাকে শানু বলে, 'ছেলেগুলো এভাবে তোমার এখানে আসে, একটু হিসেব করে চলো। আশেপাশে কানাঘুষো শুরু হয়েছে। বাড়িওয়ালা আজও শাসিয়ে গেছে, বলে ডিভোর্সি মেয়ের চরিত্র কী হতে পারে আমি জানি। একবার যে মাংসের স্বাদ পায়—।

'প্লিজ, প্লিজ শানু থামো', আমি ডুকরে কেঁদে উঠি, 'ছিঃ! ছিঃ!'

পরদিন পুরো বাড়িতে আমি একা!

বিকেলে হন্তদন্ত হয়ে অফিসে এসে ওমর বলে, 'আপনার একটা চমৎকার টিউশানির ব্যবস্থা হয়ে গেছে।' তারপর ধপ করে চেয়ার টেনে বসে খোলা ফ্যানের নীচে। সামনের শার্টের বোতাম খুলে দেয়। আজ তার চেহারার অবস্থা আরও দুর্বিষহ। কেমন অসহ্য লাগে। আমার কথার অপেক্ষা না করেই সে বলে চলে, 'কালই তবে জয়েন করছেন?'

'এরকম হনুমানের মতো দাড়ি রেখেছেন কেন?' আমি বলেই ফেলি, 'ইয়াংম্যান, একটু সচেতন যদি না থাকেন। কেউ আপনাকে কিছু বলে না?'

'বলবে না কেন?' হাঃ হাঃ হাসে ওমর। 'এই তো আপনি বললেন। তাতে কী? বুঝলেন, কয়লার চরিত্র।' তার পরপরই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে খুব সহজ গলায় বলে, 'আসার সময় যা একটা দৃশ্য দেখলাম না! বুঝলেন, একটা মিনিবাস একজন কিশোরীকে চেপটে দিয়ে গেল। একদম আমার চোখের সামনে। যা রক্ত!'

'মরে গেছে?' আমি প্রশ্ন করি।

'হেঃ হেঃ অত বড়ো একটা মিনিবাস, ওইরকম পুঁচকে একটা ছুঁড়ি, বেঁচে থাকে কী করে?' তার এই রকম ভাব-ভঙ্গি দেখে হঠাৎ করেই খেপে উঠি আমি। 'মৃত্যুর সংবাদে এত হাসির কী আছে? আশ্চর্য মানুষতো আপনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘তবে কাঁদব নাকি?’ ওমরের কোনো ভাবান্তর হয় না। ‘মৃত্যু কোনো ব্যাপার? আগে-পরে সবাইকে ওই চুলোয় যেতে হবে। এ নিয়ে ভেবে মরার সময়ের আগেই মরি আর কী!’

এ লোকের সাথে এসব প্রসঙ্গে কোনো কথা চলে না। আপাতত কাজের কথাই হোক। প্রশ্ন করি, ‘টিউশানির বিস্তারিত বর্ণনা দিন। টিউশানি এনেছেন বলেই ঝিম মেরে গেলেন যে?’

‘ঝিম মারলাম কই?’

‘আপনি যে বেশি বকবক করেন সেটা বোঝেন?’

‘খুব বেশি করি কি? কানে লাগার মতো?’

‘সেটা নিজে না বুঝলে আপনার যে বয়স হয়েছে, তাতে অন্য কেউ বলে বোঝাতে পারবে না। আপনার বিজনেসের খবর কী?’ ঠাসঠাস প্রসঙ্গ পালটাতে শুরু করি।

‘এখন পর্যন্ত লাভের মুখ দেখছি।’ সে বলে, ‘আরও ক্যাশ টাকা থাকলে ও লাইনে আরও শাইন করতে পারতাম। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে।’

‘সেটা থাকলে অনেকেই অনেক কিছু করতে পারে’, আমি বলি। ‘ওটা ছাড়া দেখুন কতদূর যেতে পারেন।’

‘এখন টিউশনির কথা হোক’, ওমরকে বেশ ব্যস্ত দেখায়, ‘ধনীর একমাত্র মেয়ে, একটু পাগলাটে স্বভাবের। বেতন বেশ ভালো। আপাতত এক হাজার। তাকে ম্যানেজ করতে পারলে আরও বাড়বে। মেয়েটার পড়ায় একদম মন নেই।’

‘আপনার সাথে কী করে যোগাযোগ হল?’

‘আমার সাথে হবে না? আমার কার সাথে যোগযোগ নেই? মেথর থেকে শুরু করে...। যাকগে, শুধু কাজের বেলায় ফ্যা ফ্যা। ভাবছি টিউশানির দালালি ধরলে মন্দ হয় না।’

‘সেটা আবার কেমন?’

‘এই যে আপনাকে একজন এনে দিলাম। এতে আপনার একটা হিল্লে হল। আপনি সেজন্য আমাকে কিছু দিলেন। এরকম যাকে জুটিয়ে দিলাম, সে-ও কিছু দিল। এইভাবে আর কি...।’

ধুর! এ ব্যাটার সাথে কথা বলে মাথাটা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। পত্রিকা মেলে ধরি চোখের সামনে। খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, চাঁদাবাজদের উৎপাত! ভার্সিটির হলে প্রচুর অস্ত্র। সব ছাপিয়ে বড়ুয়ার গলা ঝনঝন বেজে ওঠে, ‘বুঝলেন, ভারতে দাঙ্গা হয় আর এদেশের সরকার নিজের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মোড় ঘোরানোর জন্য গুন্ডাদের দিয়ে মন্দির ভাঙায়। বোঝেন খেলা!’ প্রসঙ্গটার প্যাঁচ থেকে গা বাঁচাবার জন্য আবার আমি ওমরের কাছে ফিরে আসি, ‘দালালি ব্যাবসা আমাকে দিয়েই শুরু করবেন?’

‘দেবেন নাকি?’ সে সিরিয়াস ভাব করে—‘ঠিক আছে, আপনি না হয় এক বেলা চাইনিজ খাইয়ে দেবেন। অনেকদিন শালার ও খাবার খাইনি।’

‘অনেকদিন আগে কে খাইয়েছিল?’

‘এবার কিন্তু ফালতু বকবক আপনি করছেন বেশি’, ওমর খুব গম্ভীরভাবে বলে, ‘আপনি তবে আজকেই যাচ্ছেন?’

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘আজকেই?’ আমি বিস্মিত, ‘সব কিছুতেই আপনার বেশি তাড়া।’

‘এই আগামীকাল করে করেই আমাদের বাঙালির গেল।’

তার এই কথার পর বেরিয়ে পড়ি।

ঝাড়লণ্ঠনের আলো। দামি আসবাবপত্রে ঘর কেয়ারি করা। তার আগেই পেরিয়ে এসেছি সুবিশাল গালিচার মতো লন এবং লোমশ বিদেশি কুত্তা। অভিভূত হয়ে দেখছিলাম, পাথরে বাঁধানো ফায়ারপ্লেস। ঘরের কোণে উন্নত স্তনের রমণী, বড়ো জীবন্ত স্ট্যাচু। সেদিন দেখেছিলাম সাপের মতো প্যাঁচানো মোমবাতি। আগুন ধরানোর পর নিঃশব্দে গলছিল মোমমস্তক। আজ আরও অভিনব ফুলদানি। কাচের একটা অজগর হাঁ করে আছে। তার মুখে অজস্র নার্সিসাস ফুল। আর কী চমৎকার এয়ারফ্রেশনারের গন্ধ! আমি সেই মোহময় ড্রয়িংরুমে অভিভূত বসে থাকি। এইরকম পরিবেশে সবচাইতে বেঢপ লাগছে ওমরকে। সোফার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে তখন নাক খুঁটছে। এক সময় গা-জ্বালানো গলায় বলে ওঠে, ‘ব্যাটা জীবনে কামিয়েছে বেশ। ঘুষ খেয়ে খেয়ে একেবারে পটকা মাছ।’

‘কী করে জানলেন ঘুষ খেয়েই?’ আমি ফুঁসে উঠি।

‘সরকারি আমলা ছিল। যে বেতন পেয়েছে তাতে করে কি এই বেহেস্তপুরী করা চলে?’ ওমর দাঁত বের করে হাসে। ‘চাকরির পাশাপাশি কালো বিজনেসও করত। আপনি এই সমাজের কোনো খোঁজই রাখেন না।’

‘শুনুন, আমি এখানে এসব শুনতে আসিনি’—ঠান্ডা স্বরে বলে নিঃশব্দে বসে থাকি। এই চৌকশ মোহাচ্ছন্ন ছায়া, এই অপার্থিব হিম ঘোর... এর থেকে বজ্জাত লোকটা আমাকে ছিঁড়ে তোলায় বড়ো ম্রিয়মাণ হয়ে উঠি। এই মুহূর্তে এই আলোময় জগৎই সত্য। কী দরকার অন্ধকারের ইতিহাস শুনে?

কিছুক্ষণ পর অপরূপ একটা সুন্দরী মেয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। মৃদু ছন্দে অদ্ভুত মিউজিক বাজছিল। এই চাকচিক্যসর্বস্ব পরিবেশে মেয়েটার আগমন দারুণ ছন্দময়। মোমের সাথে গোলাপি জল মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছে তার মসৃণ ত্বক। অদ্ভুত সিল্কি চুল, চলার ভঙ্গি। আমি একজন পুরুষের তৃষ্ণা নিয়ে হাঁ হয়ে চেয়ে থাকি মেয়েটার দিকে।

মেয়েটা আমাদের দিকে না তাকিয়ে একটা বিশাল পুতুল কোলে নিয়ে নিজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। লাফিয়ে লাফিয়ে অপর পাশের সোফায় বসে। দীর্ঘ একটা সময় অস্বস্তির মধ্যে কেটে যায়। ওমর ফিসফিস করে বলে, ‘সম্ভবত ও-ই আপনার ছাত্রী। ভদ্রলোকের মেয়ে তো একটাই।’

মেয়েটির অযত্নে পরা পোশাকের মধ্যেই কী দারুণ আভিজাত্য! আমি চেয়ে থাকি। এবং আমার বুকের ভেতরটা মরুভূমি হয়ে উঠতে থাকে। কী চমৎকার চমকবাজি! ঢোকার পর থেকে এই বাড়ির প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই দেখছি এক অপার্থিব কারিশমা। নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে নিজেকে কাঙাল বলে বোধ হয়। প্রবল হীনম্মন্যতা চারপাশ থেকে আমাকে ছেঁকে ধরে। ইংলিশ মিউজিকের মেলোডিয়াস সুরে যে এত মাদকতা, আমি কি জানতাম? পাথরে বাঁধানো ফায়ারপ্লেস কাঁপছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তরল ঠান্ডার গড্ডল প্রবাহে গা-ভাসানো অপূর্ব বালিকা, সে-ও দুলছে। পৃথিবীটা তার চটি স্যান্ডেলের তলায়, সেই দোলায় ভীষণ দুর্বিনীত অথচ বিকারহীন ভঙ্গি। এই মিউজিক, ঠিক এই গান যদি আমার ঘরে বাজিয়ে দেয় কেউ? তার রূপ কেমন হবে? ঠিক এই কণ্ঠ আমার চ্যাপটানো খাটে, নড়বড়ে চেয়ারে, পলেস্তরা-উঠে-যাওয়া দেয়ালে, বিকৃত মেঝেতে—মোটকথা সেই বদ্ধ-গুমোটঘরে কতটা অস্বস্তির সাথে বেজে উঠবে? বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ওঠে।

এবং তারপর একজন ভারিক্কি, সৌম্য চেহারার স্লিপিংগাউন পরা ভদ্রলোকের আগমন ঘটে। তাঁকে দেখে ওমর তড়িৎ গতিতে দাঁড়িয়ে চাকরের ভঙ্গিতে একটু বেশি ঝুঁকে কুর্নিশ করে, ওর এই অদ্ভুত কায়দার কারণে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমি আরও ছোটো, আরও বেশি তুচ্ছ এক প্রাণীতে রূপান্তরিত হই।

তিনি হাত উঁচু করে তাকে বসতে বলে নিজেও অন্য একটি সোফায় বসলেন। ওমর বিনীত হাসিতে দাঁত বের করে, 'স্যার, আপনার অফিসের কেরানি কাদের আলী, আমি তার বন্ধু। আমাকে হয়তো আপনি দেখে থাকবেন।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।' ভদ্রলোক পরবর্তী বাক্য শোনার জন্য কিঞ্চিৎ উদগ্রীব হয়ে ওঠেন।

'আপনি বোধহয় আপনার মেয়ের জন্য একজন টিচার চেয়েছিলেন', ওমর উশখুশ করে বলতে থাকে। 'কাদের আলী আমাকে বলেছিল।' তিনি নির্লিপ্ত গলায় বলেন, 'হ্যাঁ। ইনিই কি সেই টিচার?' আমি বিগলিত হয়ে বলি, 'জি। আগে অবশ্য আমি টিউশানি করিনি। এই প্রথম...।' তিনি দাঁড়ান। এতক্ষণে খেয়াল করি, মেয়েটা ঘর থেকে চলে গেছে।

ধীর পায়ে ভেতরে যেতে যেতে তিনি বলেন, 'ওকে কেউ বিশেষ ম্যানেজ করতে পারে না। ব্যাপারটা নিয়ে আমি হতাশ। কাল থেকে আপনি আসুন, দেখুন কিছু করতে পারেন কী-না।'

নিজের অস্তিত্বকে মূল্যবান করতেই যেন মৃদু প্রতিবাদ করে বলি, 'কাল শুক্রবার। আমি পরশু থেকেই আসব।'

'ঠিক আছে, তাই আসুন', একটু এগিয়ে আবার দাঁড়ান, 'চা-নাস্তা খেয়ে যাবেন।' বলে, কী নির্লিপ্তভাবে চলে যান। ঘামেভেজা শরীরে সহজ হয়ে বসেও আমি ব্যাপারটার তল খুঁজে পাই না। ন্যূনতম ইন্টারভিউ নেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনি! অদ্ভুত এদের স্বভাব! ওমর হা-হা করে হাসে, 'দেখলেন! হয়ে গেল!'

বাসায় ফিরে আমার অশান্তি চারগুণ বেড়ে যায়। সেই বিশাল রাজপ্রাসাদ। তার নরম সবুজ নিটোল চাকচিক্য আমাকে চারপাশ থেকে ভয়াবহভাবে আক্রমণ করে। আহা, আমার জন্মটা যদি হত সেই প্রাসাদে? স্রেফ একটি জন্মের তারতম্যের জন্য আজ আমি এখানে। এই একটি জীবন! আমি মাথা কুটে রক্তপাত ঘটালেও কি সেই জীবনে যাওয়া সম্ভব আমার পক্ষে? আমার কাছে যা দূরের আকাশ, সেটা তাদের তর্জনীর নখের ডগায়। আমার পাথর-শক্ত শয্যা, সারাদিন লেগে থাকা দুর্গন্ধময় ঘর, বন্ধ করে রাখা ছোটো খিড়কি, সর্বোপরি, বিশাল নিস্তব্ধ রাত আমাকে ক্রমাগত দগ্ধায়। এই প্রথম একটি ভালো শাড়ির জন্য, একজোড়া চকচকে স্যান্ডেলের জন্য, নিজের দুর্বিষহ দিন-রাতের যুদ্ধের জন্য চোখের তলা ভিজিয়ে ফেলি। পুরো বাড়িতে কবরের নির্জনতা। শুধু দূরে অস্পষ্ট মাইকে পুরোনো দিনের উর্দু গান বাজছে, বড়ো ভেজা, বিচ্ছিন্ন। বাতি জ্বালিয়ে রাখি, ছটফট করি। এই অদ্ভুত হঠকারী যন্ত্রণা তাড়িয়ে নিয়ে নিয়ে এক সময় আমাকে চরম একটা জায়গায় নিয়ে ফেলে। কী অর্থ এই নিঃসঙ্গ ক্ষুধার্ত জীবনের? সতীসাধ্বী বিধবা শরীর? ছোঃ! এই ভাবনা প্রলম্বিত হয়ে আমাকে শারীরিকভাবে তৃষ্ণার্ত করে তোলে। বাড়িওয়ালার কথা মনে পড়ে—যে মাংসের স্বাদ পায়! আহা! কী ন্যাংটো মাংসরে! না, স্বাদ সে আমি পাইনি। তবে পাওয়ার তৃষ্ণা আছে। কেন বঞ্চিত হচ্ছ নীনা? কাল থেকেই কারো সাথে সম্পর্ক করে নাও। ভেসে যাও... ভেসে যাও... তুচ্ছ করে দাও তথাকথিত... ও মাই গড! আমি নখের শক্ত আঁচড়ে বিছানা খামচে ধরি। নাকের ভেতর সেই এয়ারফ্রেশনারের গন্ধ আসছে। সেই মিউজিক, আমি এক অদ্ভুত মাদকতার ভেতর প্রবেশ করছি। আল্লাহ্, মৃত্যুর পর আমি কিছুই চাই না। মৃত্যুর পর থাকুক অসীম

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

শূন্যতা। শুধু ওই প্রাসাদে ওই মোমের বালিকার মতো নির্লিপ্ত অথচ দুর্বিনীত পা রাখতে চাই। বিশাল লনের কেয়ারি করা বাগানে হুবহু ওই বালিকার মতো স্পর্শ করতে চাই ঝাঁকরা চুলের কুকুরটিকে এবং সেই নীল গ্লাসের হিম গাড়িটা, যেটা দাঁড়িয়ে ছিল হেলাফেলায়, তার স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দুর্দান্তভাবে বেরিয়ে পড়তে চাই। তারপর কোথায়?

কী জানি! কেনরে ঘা দিচ্ছিস বুকের তল? কী ক্ষতি করেছি তোর? মেঝেতে নেমে আসি। উবু হয়ে বসে থাকি। ইজেলের পাশে ভাঁজ করে রাখা ছবিটা টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিই শূন্যে। অন্তত এই ক্ষমতাটুকু আমার আছে!

অনেক দেরিতে ঘুম থেকে উঠি। অলস মন্থর ছুটির দিনের সকাল। কতক্ষণ বালিশ চেপে বিছানায় শুয়ে থাকি। ভীষণ চায়ের তৃষ্ণা পেয়েছে। কিন্তু চুলোয় কেটলি চাপানোর আলসেমি বড্ড ভয়াবহ। বস্তির কোনো ছেলেকে দিয়ে ডালপুরি আনিয়ে নাস্তাটা সেরে নেওয়া যাবে। ঠিক এই মুহূর্তে, মনে হয়, পাশাপাশি কোনো সন্তানের দায়িত্ব না থাকাটা নেহাত মন্দ নয়। বড়ো স্বাধীন, জড়তামুক্ত দিন। কিন্তু অর্থনৈতিক সচ্ছলতা থাকলে স্বাধীনতাকে শুষে পান করা যায়। ঘর থেকে বেরোতে গেলেই যখন স্রেফ আধুলি, সিকি পথ আটকে দাঁড়ায়, তখন বড্ড বেশি বিরক্ত লাগে।

বিছানা ছেড়ে উঠব, দরজায় শব্দ। খোলার পর দীর্ঘদিন পর আরেফিনকে দেখি। দাড়িটাড়ি রেখে জবরদস্ত পুরুষ হয়ে উঠেছে। ঠিক আজকের শূন্য দিনে ওর আগমনে আমি খুশি হয়ে উঠি, বলি, 'মাস্টারি নিয়ে এতই ব্যস্ত হয়েছিস যে...।' আমার তির্যক কথার মুখে হন্তদন্ত ভাব দেখায় আরেফিন, 'বেশিক্ষণ বসতে পারব না। পারলে এক কাপ চা দাও। আমি ভীষণ দমে যাই। বাথরুমে গিয়ে মুখে জল ছিটিয়ে চুলোয় কেটলি চাপাই। চা বানানোতে আর অবসাদ নেই। ঘরে এসে এতক্ষণে চোখে পড়ে পেইন্টিং-এর খণ্ডাংশ। কেন যে অত রাত ধরে ছাইপাঁশ সব যন্ত্রণা নিয়ে বিহ্বল ছিলাম। ভেবে এখন হাসি পায়। আরেফিনকে অস্থির দেখাচ্ছে। প্রশ্ন করি, 'কী হয়েছে তোর?'

'হল ছেড়ে দেব ভাবছি।'

'কেন?'

'অত দূরে গিয়ে ক্লাস করানো কষ্টকর। কিছু টিউশনি পেয়ে গেছি সেখানে।'

'পড়াশোনা ছেড়ে দিবি?'

'সেরকমই ইচ্ছে', অকম্পিত স্বরে আরেফিন বলে, 'আর ভালো লাগে না।'

'অন্য কোনো অসুবিধে?' আমি জানতে চাই, 'ইচ্ছে হলে খোলাখুলি বলতে পারিস।'

আসলে আমি খুব সংকটের মধ্যে আছি। এতদিন একটা দল করতাম, বছরের পর বছর তার পেছনে শ্রম-মেধা সব ঢেলেছি। এখন দেখছি, যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি, তার সাথেই হাত মেলাচ্ছে আমাদের লিডারেরা। সব দেখে-শুনে বিশ্বাস, আস্থা হারিয়েও আমি তা থেকে সরতে পারছি না। আমার যারা শিষ্য, যারা আমার প্রলোভনে পড়ে দলে যোগ দিয়েছিল, তারা আমাকে ছাড়বে কেন? এদিকে লিডারেরা উলটো আমাকে থ্রেট দিচ্ছে। আমি যেন বেশি বাড়াবাড়ি না করি।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমি বলি, 'লিডার তো একজন-দুজন মানুষ। সে গুটি -কয়েক মানুষের জন্য তুই তোর পার্টির ওপর বিশ্বাস হারাচ্ছিস কেন? ব্যক্তি আর দল কি এক হল?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘তুমি এসব বলছ?’ আরেফিন অবাক হয়। ‘আমি কি আবার শুরু করব? জানো, ভার্সিটিটা এখন জলদস্যুদের আখড়া। প্রতিদিন হত্যা, সন্ত্রাস।’

‘তুই আবার শুরু করবি কিনা আমি বলে দেব কেন? ব্যক্তি ছাড়া দল হয় না আমি জানি। কিন্তু তুই যদি কোনো আদর্শকে বিশ্বাস করিস, দু-একজন ব্যক্তির দোষে তার থেকে সরে আসারও কোনো কারণ দেখছি না।’

‘বিপক্ষ পার্টি খুব লেগেছে পেছনে’, আরেফিন বলে, ‘থাকা খুব রিস্কি, আমাদের পুরো হল এখন তাদের দখলে।’

‘এক্ষেত্রে তুই হল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারিস। তোর জীবন একটাই আরেফিন, একটু বুঝে চলিস। ভুল কিছুর জন্য আবার না তোর নিজেকে খুইয়ে ফেলতে হয়।’

কেটলি উপচে পড়ার শব্দ হয়। আমি রান্নাঘরে দৌড় দেই। চা ঢেলে এনে কাপটা আরেফিনের হাতে দিয়ে বলি, ‘কামালভাইরা বাড়ি চলে গেছে। একা থাকতে বড্ড বিচ্ছিরি লাগে।’

‘কবে গেছে?’

‘গতকাল।’

‘তুমি রাতেও একা থাকছ?’

‘নয়তো কী? আমি কি আর একটা বিয়ে করেছি নাকি?’

গরম চা গলায় ঢেলে আরেফিন দাঁড়ায়। ‘তুমি অন্তত আমাকে ভুল বুঝো না। এত সংকট চারপাশে। তোমার সাথে কথা বলে আজই প্রথম সবচেয়ে বেশি শান্তি পেলাম। এখন একটু হলে যাব। জিনিসপত্রগুলো সরাতে হবে। রাতে এসে থাকব এখানে।’

‘থাকবি?’ এইবার ফের খুশি হয়ে উঠি, ‘বাঁচালি। ধুমসে আড্ডা দেওয়া যাবে।’

সে চলে যাওয়ার পর আমার সামনে আস্ত একটি নিঃসঙ্গ দিন। সকাল থেকেই বেশ জ্বর-জ্বর বোধ হচ্ছে। ঠান্ডায় নাক বন্ধ হয়ে থাকায় নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না। নাস্তা না খেয়েই গা চুবিয়ে স্নান করি। ভাবি একটু ঝরঝরে বোধ হবে। সেটাই যেন কাল হল। দুপুর আসার আগেই ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসতে থাকি। কিন্তু তারপরও দুর্বিনীত ইচ্ছায় নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়াই। ইজেলটাকে মুছে তকতকে করে খাড়া করাই। তোশকের নীচ থেকে বের করে আনি লম্বাটে শিট। রংগুলো জমে আছে। ফলে এগুলোকে উপড়ে ফেলে দিয়ে ইরফান চাচার দেওয়া টিউব থেকে রং বের করি। সব বিন্যস্ত করে পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই আঁকিবুকি করতে থাকি। একটি ক্লিশে চাঁদ, মাটির থেকে কিছুটা ওপরে একজন রমণী। কাগজের মোড়কে ডুবন্ত দেহ। তার অম্লান হাতের তর্জনী স্পর্শ করতে চাইছে চাঁদের সেই বিবর্ণতাকে। ধীরে ধীরে এমন একটা বিষয় আমার ওপর চেপে বসলে কোনো রকমে লামছাম একটা কিছু তৈরি করতে চাই, শিটে রঙের ছোপ দিতে দিতে কী এক ঘোরে দিন কাবার হয়ে যায়, ব্যথায় টনটন করতে থাকে শরীর। তবুও কিছুতেই সেই চিন্তা একটা আকৃতির রূপ পায় না। বরং টের পাই আমার তুলির আঁচড়ে রমণীর শরীর খণ্ডাংশে পরিণত হচ্ছে। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হাত ওপর দিকে বাড়ানো। আমার ইচ্ছে সেখানে কোনো রূপ পায় না। গোঁয়ারের মতো রঙের ওপর রং চড়াচ্ছি। আমার দৃষ্টি বদ্ধ জলাশয়ের মতো নিস্তরঙ্গ। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। পায়ের তলা থেকে কণ্ঠার হাড় পর্যন্ত ঠকঠক করে কাঁপছে। বমি আসছে। ওগড়ানো বমির ধাক্কায় এক সময় উবু হয়ে বসে পড়ি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

চারদিকে দরজা-জানালা বন্ধ। বাতি নিভিয়ে ভাঙা খিড়কিটা খুলে দিই। পাশের বাড়ির ছায়াছন্ন এক চিলতে ম্লান আলো ক্যানভাসের একাংশকে মায়াময় করে তোলে। নিশ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। কী জানি কেন হঠাৎ করে আমার মধ্যে এমন দুঃসহ ছায়া চেপে বসে। সেই বিশাল রাজহংসের মতো সাদা বাড়ি, গালিচার মতো লন, দোল-খাওয়া কিশোরী আবারও আমাকে গ্রাস করে। নিজের আজন্ম পরিবেশের ওপর আবারও ঘৃণা জন্মায়। আরেফিনকে আজ আমি নিজেই ওই পথে ঠেলে দিলাম কেন? আমি তো কোনোদিন তার এমন ঝুঁকিময় জীবন চাই না? পরিবর্তন এনে কিছু যদি একটা করতে পারে, তার ক্ষীণতম লোভে?

ছোঃ, পরিবর্তন! আমি কি মাথামুণ্ডু চিন্তা করে কিছু বলেছি? শুধু যুক্তির পেছনে যুক্তি সাজিয়েছি। এই হরির লুটের দেশে আসবে পরিবর্তন!টনটন করছে মাথা। জমে আসছে আঙুলের ডগা। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ঘষি। এক সময় প্রায় চেতনাহীন বিছানায় আছড়ে পড়ি। এবং তারপর শুরু হয় আসন্ন শীতের ঘনঘোর, অদ্ভুত বৃষ্টিপাত। জানালা বন্ধ। সারাদিন ধরে এক অদ্ভুত লোহিতাভ ছায়ার মধ্যে ডুবে থাকি। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করে। আজই সত্যিকার অর্থে সালাহদিনের সেদিনকার অবস্থাটা টের পাই। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পতন। কিছুটা ধাতস্ত হয়ে প্রায় টলতে টলতে রান্নাঘরে যাই। চালের ডেকচিতে আলু ছেড়ে বিছানায় ফিরে আসি। কান্না পাচ্ছে। ভীষণ অসহায় বোধ হচ্ছে। কী দুঃসহ প্রকাণ্ড এই দিন।

এক সময় সন্ধ্যা আসে। ভাত খেয়ে, কিছুটা থিতু হয়ে নির্নিমেষ চেয়ে থাকি রং-তুলির যাচ্ছেতাই অপচেষ্টার দিকে। আর ঠিক তখুনি দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। বাইরে এখনও বৃষ্টির ঝিরিঝিরি পতন। শীতে আমার হাড়-হাড্ডিমজ্জা এক হয়ে আসছে। কাঁপা হাতে দরজা খুলে দিই।

দিতেই ঝড়ের বেগে ঘরে ঢোকে রেজাউল। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জলের দাগ। সে কিছু না বলে দ্রুত বাড়িটা একবার প্রদক্ষিণ করে ভীষণ বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। অস্পষ্ট স্বরে বলে, 'ওরা চলে গেছে তাহলে?'

'তা জেনেই তো তুমি এসেছ।'

এর উত্তরে কেমন স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়, আমি কেমন ভীত হয়ে পড়ি। বড়ো অপরিচিত এই চোখ। 'অমন কাঁপছ কেন?' প্রশ্ন করে সে।

'ভীষণ জ্বর' সরল গলায় বলি।

সে আমার কপালে হাত রেখে বেশ চমকে ওঠে। এবং আমাকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দেয়। চারপাশে বাতিনেভানো-সন্ধ্যা। বালিশের নীচ থেকে কাঁথা বের করে এমন মায়াময় ভঙ্গিতে আমার শরীরে জড়িয়ে দেয় যে, আমাকে একটা গভীর ভাবাবেশে পেয়ে বসে। বাথরুম থেকে বালতি আর মগ এনে আমার মাথায় পানি ঢালে আর কপালে জলপট্টি দিয়ে দেয়। আমি অবোধ শিশুর মতন বহুদিন পর কারো সেবার হাতে নিজেকে নিঃসাড় ছেড়ে দিই। গা খুলে ও যখন আমাকে স্পঞ্জ করে দিচ্ছে, তখন সেই আড়ষ্টহীনতার মধ্যে বিচ্ছেদের কাগজটার কথা আর মনে থাকে না। অনেকক্ষণ পর আরাম বোধ করি। এবং তারপরই ঠেলে আসা কান্নার স্রোতে উষ্ণ নিশ্বাস। এই মানুষটাকে আমি চিনি! আমার দীর্ঘদিনের অতৃপ্তি, যন্ত্রণা আজ চূড়ান্ত উষ্ণতায় রূপান্তরিত হচ্ছে! আমি নীনার খোলস খুলে অদ্ভুত আদিমতায় আকাশের নীচে উদোম হই। এই কি প্রথম স্পর্শ আমার জীবনে? কোথায় লুকিয়ে ছিল এই মায়া? এই পুরুষ কি এই প্রথম দাঁড়িয়েছে আকাশের নীচে?

আমার শীতার্ত শরীরের আপ্লুত উষ্ণতা কিছুতেই সেই জটিলতার জট খুলতে পারে না। তার অসীম তৃষ্ণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কোথায় কার কাছে সমর্পিত হয়, সে নিজেই জানে না। আমি দেখতে পাই, সমুদ্রের ওপর ভাসছে আমার লাশ। স্পষ্ট দেখতে পাই সেই দৃশ্য, হিংস্র ফসফরাসে ঢেকে গেল আমার শরীর। সামনে, চাঁদেপোড়া জল আর দিকচক্রবালে আলতো অল্প ঢেউ, ক্রমশ নিস্তেজ রাত বাড়তে থাকে...।

সে রাতের সেই অদ্ভুত বৃষ্টিপাতের পর চারপাশ ঝাঁকিয়ে শীত নামতে শুরু করেছে। এবং আমার জীবনে এরপর থেকেই ক্রমাগত কী অনচ্ছ ছায়া, কী ভাবলেশহীন চড়াই-উতড়াই! ক্রোধ, যন্ত্রণা, বিকার সব যেন কোনো এক অশরীরী স্রোত টেনে নিয়ে গেছে। ধীরে-ধীরে আমি যেন একটা জড় মানুষে পরিণত হচ্ছি। অফিসের ম্যাড়ম্যাড়ে আবহাওয়ায় নির্লিপ্তভাবে কাজ সেরে, বিশাল জনারণ্যে নেমে আসি। রাস্তার বাতি জ্বলে উঠেছে। সেই সুদৃশ্য সবুজ লন পেরিয়ে, যেখানে বেতের চেয়ার পেতে অবসন্ন ভঙ্গিতে চা খাচ্ছে এই বাড়ির কর্তা-কর্ত্রী, উঠে যাই সেই অভিজাত ড্রয়িংরুমে। এখন পর্যন্ত মেয়েটির সাথে সহজ হতে পারছি না। অন্য এক পৃথিবীর খুঁটিনাটি বিষয় তার নখদর্পণে, লেটেস্ট ভিডিও ক্যাসেট, রোমাঞ্চকর বই, আলিশান পার্টির খবরাখবর, অত্যাধুনিক মডেলদের ব্যক্তিগত জীবনাচার... এসব।

খবরের বিষয়ে আমার অজ্ঞতা প্রথমেই আমাকে তার কাছে মুর্খ করে তুলেছে। তার সামনে তাই সারাক্ষণ গাম্ভীর্যের, আদর্শের মুখোশ এঁটে থাকতে হয়। এবং যথারীতি এই দিয়ে তাকে কব্জা করা তো দূরের কথা, তার কনিষ্ঠ আঙুলের স্পর্শও আমি পাই না। তারপরও যাই। চারপাশে এত অর্থকষ্টের বেড়াজাল, যেতেই হয়। আমার সাথে ক্রমাগত ইংরেজি কপচায় সে দক্ষ আমেরিকানদের মতো। এ জায়গাতেই আমি চোপসানো বেলুন। নিজেকে রক্ষা করার জন্যই যেন ক্রমাগত বাংলা ভাষার ওপর জোর দিই। সচেতন করে দিই তাকে, সে এই দেশ এবং ভাষার বাইরের কেউ নয়। উদাহরণ দিতে দিতে এ ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার প্রসঙ্গটাও আসে। কিন্তু এসব বক্তৃতা সেই বালিকার ভালো লাগবে কেন? যথারীতি দুজনই এক সময় হাঁপিয়ে উঠতে থাকি।

মেয়েটার রুমে একজোড়া উলঙ্গ পুরুষ-রমণীর চুম্বন দৃশ্যের বিশাল পোস্টার টানানো। টেবিলের যে পাশে আমার চেয়ার, সেখান থেকে একদম সোজাসুজি চোখে পড়ে। একদিন বলে ফেলি, 'এ ঘরে তোমার বাবা আসেন না?'

পা নাচিয়ে ক্রমাগত বই উলটে চলে সে। পরিচিত ভঙ্গিতে শ্রাগ করে, 'না।'

'চুমুর জন্য দুজনের উলঙ্গ হওয়ার দরকার ছিল কী?'

'যারা পোস্টার বের করেছে, তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তা ছাড়া একটা বিশেষ পর্যায়ে গিয়ে উলঙ্গ অবস্থাতেই মানুষ চুমু খায়...।'

'কিন্তু এই ছবি তুমি ঘরে রেখেছ কেন?'

'আমার ভালো লাগে তাই।'

'পড়াশোনা করতে ভালো লাগে না?'

'না।'

'তবে স্কুলে যাও কেন?'

'যাওয়াটা একটা ফ্যাশন, না গেলে চলছে না, সে জন্যে।' মুখে চুইংগাম। চুষতে চুষতে এক সময় কিশোরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

মেয়েটি তার বিছানার ওপর লাফিয়ে পড়ে। মখমলের নরম শয্যা। রাতের তরঙ্গময় আলো শুয়ে থাকে তার ওপর। তার ভেতরে তলিয়ে গিয়ে খুব তীব্র গলায় উচ্চারণ করে সে, 'আপনাকে আমার ভালো লাগে না। গেঁয়ো ভূত কোথাকার! আপনার কোনো যোগ্যতা নেই এ-বাড়িতে আসার।'

'সিনথি'... প্রায় আর্তনাদ করে উঠি।

'আমাকে ধমক দিলে কষে চড় লাগিয়ে দেব', তার এই কথার মুখে যখন ক্ষিপ্ত এই আমি নিজেকে সামলানোর কষ্টে ব্যস্ত, সে হিঃ হিঃ হাসির হট্টগোলে ভেঙে পড়ে।

মুহূর্তে ভাবি, অন্যপথে এগোতে হবে আমাকে। ভাবি এবং নিজের ধৈর্যের দৌড় দেখে নিজেই অবাক হয় যাই।

বাসায় ফেরার পর মগজে দুঃসহ ঘণ্টাধ্বনি। সেই ঘটনার পরদিনও রেজাউল এসেছিল। সেদিন রাতে আরেফিনের আসার কথা ছিল। ঘোর কাটিয়ে উঠে এক সময় তাই রেজাউলকে ঠেলে বের করে দিয়েছিলাম। নিঃসাড় পড়েছিলাম সারারাত। দুঃসহ গ্লানি, ঘেন্না আমাকে মৃতপ্রায় করে তুলেছিল। আরেফিন আসেনি।

পরদিনও রেজাউল আসে। গতরাতের ঘটনাটা বেমালুম চেপে গিয়ে তার মতো ছেলে আমাকে চা করে খাওয়ায়, দুপুরে বাইরে থেকে ভাত এনে দেয়। আমার আধাআধি শেষ করা ছবিটার প্রশংসা করে। শেষে আমার সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে, 'আমি কিছুদিন সময় চাই, আমাকে আরও ভাবতে হবে' বলি।

সেই থেকেই ভাবছি। আবার কি শুরু করব? একজন মানুষ এমন আমূল বদলে গেল, এর কতটা অকৃত্রিম? মানুষই তো পরিবর্তনশীল... ইরফান চাচার কথামতো নিজেকে ফের দাঁড় করাই। সে আমাকে প্রগাঢ় বন্ধনে বেঁধে এক সময় চলে যায়।

পরদিন আবার আসে। পুরনো মাংসের ঘ্রাণ পেয়ে গেছে কি? আমি স্বাভাবিক স্বরেই তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করি। কিন্তু তার মুখ সর্বদা উদ্ভ্রান্ত, চুল উসকো, চোখজোড়া লাল টকটকে। প্রতিরোধ ভেঙে যাওয়ায় আমাকে গ্রাহ্য করার প্রয়োজনবোধ করে না। আমার সরলতার সুযোগে আমাকে চেপে ধরে বিছানায়। প্রথমে ভীষণ ক্ষুব্ধ এবং অপমান বোধ করলেও একসময় নিজেকে তলিয়ে না দিয়ে পারি না। যে অশিল্পিত মানুষটাকে বিয়ে করেছিলাম তার মধ্যে এতখানি শিল্পের উদ্ভব ঘটল কী করে? কী কোমল, নরম তার আচরণ। এছাড়া আমিও তো দীর্ঘ দিবস-শর্বরী বুভুক্ষু রমণী। তার স্পর্শের প্রতিটি বিন্দুর মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিই সমস্ত বিবেকবোধ এবং বিবেচনার বাইরে। যাওয়ার আগে রেজাউল নীরব, বিষণ্ন স্বরে বলে তার অতীত, জীবনে কিছু না-পাওয়া, কোথাও নিজেকে খাপ খাওয়াতে না-পারার কথা।

আমি মাথা নত করে শুনি। কোনো মন্তব্য করি না। সে চলে যায়। যাওয়ার আগে বলে, 'সব সময় চুল খোলা রাখ কেন? গুছিয়ে বেঁধে রাখতে পারো না?' ওর এই মন্তব্যে ওকে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করি। ও আসলে এখনও সনাতন স্বামীই রয়ে গেছে। প্রেমিক হলে নিশ্চয়ই খোলাচুল পছন্দ করত। জানি! কিন্তু আমার চুলের পরিপাটিত্য সম্পর্কে তার সচেতনতা আগে কি ছিল? এভাবে নিজেকে ওর কাছে খুলে দেওয়া ঠিক হল? আমি এক মর্মান্তিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যাই। আমি কি ওকেই শরীর দিয়েছি? আমার বুভুক্ষু শরীর যুক্তিহীনভাবে কোথায় কার কাছে গিয়ে নত হয়েছে আমি কি জানি? নিজের সাথে, অন্যের সাথে, প্রাণের সাথে, প্রতিপক্ষের সাথে অভিনয় করতে করতে নিজের মৌলিক কষ্টকে পর্যন্ত খোয়াতে বসেছি। নিজেকে চিনতে পারি না আর।

পরদিন শ্লথ ভঙ্গিতে অফিস, একঘেয়ে বাস, ফের নিঃসঙ্গ গুহায়, যেন-বা আদিম মানুষ, ভূতের মতো বসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

থাকি। দরজায় শব্দ। খুলতেই আজও রেজাউল। ওর হাতে আইসক্রিমের কৌটা, বলে, 'তুমি পছন্দ করতে।' ওকে দেখে আমার শরীর স্পন্দিত হয়। নিজের ওপর রাগ জন্মায়। ও জানতে চায়, আমার সিদ্ধান্ত কী? এখনও ওকে ভুল বুঝছি কী না? ওর পরিবর্তন কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য আমার কাছে? ভাবনার গভীর অতলে ডুবেও আমি এসবের কোনো সদুত্তর খুঁজে পাই না। ফলে অবিন্যস্ত নিজেকে আবার খুলে দিই। আজও সুন্দর ভঙ্গিতে সে আমাকে গ্রহণ করে। তারপর দীর্ঘক্ষণ কথা। বিছানায় শুয়ে ও আমার চুলে আঙুলের চিরুনি চালায়। মফসসল হলে এরকম অবস্থায় ঢিঢি পড়ে যেত। ভাগ্যিস ঢাকায়! এখানে পাড়া বলে তেমন কিছু নেই। কেউ কারো হাঁড়ির খোঁজ রাখে না। তবুও বাড়িওয়ালার ভয়ে কেমন আড়ষ্ট হয়ে থাকি। কখনও যদি হঠাৎ এসে পড়ে? রাত গভীর হলে রেজাউল আবার আসবে বলে চলে যায়।

এখন আমার সিদ্ধান্ত কী? ক্রমশ আমার তৃতীয় চোখ যেন খুলে যাচ্ছে। আমি যেন স্পষ্ট টের পাচ্ছি ওর এই কোমল স্পর্শ, নিজেকে শিল্পময় করে তোলা, পুরোটাই ওর কষ্ট করে বানানো। সারাক্ষণ সে সতর্ক, কখন তার আগের বন্য রূপটি প্রকাশ পেয়ে যায়। অত্যন্ত কায়দা করে, সতর্কতার সাথে সে নিজেকে আমার সামনে উপস্থাপন করছে। ফলে কেমন যেন স্বতঃস্ফূর্ততা শূন্য আমাদের সহবাস। ঘোরের মধ্যে ব্যাপারটা আমি আবিষ্কার করতে পারিনি। সেই একই পুরুষ! যতই শিল্পিত হয়ে আসুক, আমি স্পন্দিত হলাম কেন? নিজেকে নিঃসাড় করে দিয়ে একটা সত্য আবিষ্কৃত হয়, ও এখন নিষিদ্ধ, এই বিষয়টাই তখন আমাকে রোমাঞ্চিত করেছে। বানানো সৌন্দর্যের আয়ুতো পদ্মপাতার জল। বাতাসের সামান্য টোকাতেই টুপ করে খসে যায়। নিজের ওপর ঘেন্নায়, আক্রোশে বুক ঠেলে কান্না আসতে থাকে।

পাশের ঘরের দম্পতি ফিরে এসেছে। বয়সী-রাত অদ্ভুত শিশির-আবছায়ায় চোবানো। কম্বলের তলায় কম্পিত শরীর ডুবে থাকে এবং আমার মস্তক যেন হলাহলের চারণভূমি। আমি কার কাছে যেতে চাইছি? তার মানে কি এই নয় প্রতিনিয়ত নিজের ভারে অসহ্য হয়ে উঠছি? কেন এইভাবে প্রতিরাত ওর তলায় নিজেকে বিছিয়ে দিলাম! সেসব রাতে কি আমি একজনের ছায়া অন্যজনের ওপর আরওপ করিনি? কার ছায়া কার ওপর? তাও কি আমি জানি? আমি কি আসলে এলিয়ে পড়তেই চাই। সে যে-কোনো মানুষই হোক? এটাই কি সত্য? কী জানি! শুধু ছায়াম্লান ঘরে দীর্ঘশ্বাস টের পাই। বুকের মধ্যে আঁকশি দিয়ে চেপে ধরেছে কেউ, এমন বোধ হয়।

ইরফান চাচা ক্রমশ গম্ভীর বিষণ্ন মূর্তিতে রূপান্তরিত। শীতে তিনি বেশ কাতর হয়ে পড়েন। চামড়ার ভাঁজে বয়স দাঁত বের করে। খুক খুক কাশেন। রুমাল দিয়ে সন্তর্পণে নাক মোছেন। বিরাট আলখেল্লায় নিজেকে ডুবিয়ে স্থির বসে থাকেন। আমি কী বলি, শোনার জন্য চেয়ে থাকেন।

বলার স্পৃহা যেন তাঁর ভেতর থেকে ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। অস্বস্তি নিয়ে ফিরে আসি বাসায়। বিছানায় পড়ে থাকি। এর মধ্যে চোখও ইদানীং খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে। সারাক্ষণ জল পড়ে। কিছুক্ষণ বই পড়লে সব ঝাপসা হয়ে আসে। টনটন ব্যথা করে মাথা। বুকের ব্যথাটাও উত্তরোত্তর বাড়ছে। আমি একজন ডাক্তারের কাছে যাব? যে চড়া ভিজিট প্রফেসারদের। এরপর অছে ইউরিন, ব্লাড, হাজারো টেস্ট। একদিন বেশ অসহায়ভাবেই ওমরকে নিজের এই দুরবস্থার কথা বলি। ওমর কুছ পরোয়া নেহি বলে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'কালই হাসপাতালে চলুন।'

'প্রফেসারদের টাকা দেওয়ার সাধ্য আমাদের আছে? হাসপাতালে কি চিকিৎসা কিছু হয়? খামোখা পণ্ডশ্রম।'

'আমাদের মতো হাভাতেদের যেটুকু হয় সেইটুকু লাভ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কিন্তু নিজেকে ওই হাভাতেদের দলে ফেলতেও অহংকারে বাধে। কিন্তু অহংকার ধুয়ে কি আমি জল খাব? আগে তো আমাকে বাঁচতে হবে।

পরদিন সকালে অফিস ছুটি নিয়ে বাসে ঝুলতে ঝুলতে ওমরের সঙ্গী হয়ে যাই। আজিমপুর চৌরাস্তার মোড়ে নেমে রিকশা ভাড়া বাঁচাতে দুজন ভিড় ঠেলে হাঁটি। ফড়িঙের মতো উড়তে উড়তে হাঁটে ওমর। মাঝে ভদ্রতাও করে, 'রিকশা নেব?' আমি হাসি, 'না, বেশতো হাঁটছি।' যা হোক, শহিদ মিনারের কাছে এসে কোনো অনুভূতি ছাড়াই আরেফিনকে মনে পড়ে। বলেছিল, 'স্মৃতিসৌধ দেখলে ওর রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। গোটা বায়ান্ন সাল সামনে এসে দাঁড়ায়। আপশোস করে, সে সময়ে জন্মালে সে আন্দোলনে নামার গর্বের অংশীদার হতে পারত। কিন্তু আমার মধ্যে ঠিক ফাল্গুন মাসের প্রবল জোয়ারের সময়টা ছাড়া খাড়া শূন্য শহিদ মিনার অন্য সময় প্রগাঢ় কোনো বোধের জন্ম দেয় না।

এসবের মধ্যে নিজেকে বহুবার উলটেপালটে দেখি, আমি কি স্বার্থপরভাবে আত্মকেন্দ্রিক? রাজনীতির ভণ্ডামি, বিপ্লব, সামাজিক অরাজকতা, মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র—এসবের কোনো কিছু আমাকে তেমনভাবে আন্দোলিত করে না? অথচ আরেফিন দেশে ছড়িয়ে থাকা নানারকম দুর্নীতির কথা বলতে বলতে হতাশায়, ক্রোধে কেঁদে পর্যন্ত ফেলে। ছেলেটা এখনও যথেষ্ট পবিত্র রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির অনেক কলুষতাই ওকে স্পর্শ করতে পারেনি। অথচ তার বোন হয়ে আমার মধ্যে কি না কোনো চেতনার জন্ম হল না? কেবল নুন-ভাত জোগাড়যন্ত্রের গাড্ডার মধ্যে নিজেকে সেঁধিয়ে রাখলাম? নিজেকে বেশ অপরাধী মনে হয়। সেই ভাবনার চক্রে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ওমরকে প্রশ্ন করি, 'রাজনীতিতে কোন দলকে সাপোর্ট করেন?' ওমর আর এক কাঠি সরেস, 'সারাদিন পেটের ধান্দা করেই কূল পাই না। কী পছন্দ করি, কখনও ভেবে দেখিনি।'

'তবুও বিশেষ কাউকে? একটু হলেও?'

'কাউকেই না', ওমরের সহজসাপটা উত্তর, 'সব শালার ক্ষমতায় যাওয়ার ধান্দা। ক্ষমতায় গেলেই সবার এক চেহারা। দেশটাকে লুটেপুটে খাওয়ার... যাকগে লেকচার বেশি হয়ে যাচ্ছে। আমরা মরি নিজেদের ধান্দায়। বেঁচে আছি কী না তাই মাঝে মাঝে টের পাই না... এই যে আউটডোরে এসে পড়েছি। আপনি দাঁড়ান, আমি দেখি, কোথায় রসিদ দিচ্ছে।' আমি তার সাথে হাঁটি। সমস্ত আউটডোর জুড়ে ভিড়। অধিকাংশই গ্রাম থেকে আসা রোগী। অসহ্য মরাটে গন্ধ। আর বিশ্রী নোংরা। হাসপাতাল যদি এত নোংরা হয় রোগী বাঁচে কী করে? বেঞ্চের পাশে টেবিল। তার মধ্যে মাথা গুঁজে একজন টানা লিখে যাচ্ছে। খসখস।

'নাম?'

'নীনা তরফদার।'

'বয়স?'

'ত্রিশ।'

'রোগ?'

কেমন ঘুলিয়ে ফেলি, চোখ ব্যথা। না, না গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা। ওমর বিজ্ঞের মতো বলে, 'এক ডাক্তার তো আর আপনার সব রোগের চিকিৎসা করবেন না।' আগ বাড়িয়ে সে-ই তারপর বলে, 'গ্যাস্ট্রিক। আজ চোখের ডাক্তার আসেনি।'

যা হোক। প্লাটফর্মে গোঙাতে থাকা কেউ মুহূর্তের জন্য থমকে আমার দিকে তাকায়। নিজেকে টেনে নির্দিষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কক্ষের সামনে দাঁড়াতেই... লাইন। ওমর আমাকে পাশে বেছানো বেঞ্চের ছিন্নমূল রোগীদের মাঝখানে নির্বিকার ঠেসে বসিয়ে দেয়... 'আপনি এখানে বসুন। আমি লাইনে দাঁড়াই।'

থুথু, পেশাবের লাইন, পানের পিক, ডেটলের ঘ্রাণ, কারও শাড়ি থেকে উড়ে আসা পাট-ভেজানো গন্ধ, ঘাম, চারপাশের উৎসুক চোখ, সমস্ত আউটডোরে বিভিন্ন কোরাস, দেয়ালে ঠেস দিয়ে থাকা রোগী, ঔষধের শিশি ভাঙার শব্দ, সব মিলিয়ে হাঁপিয়ে উঠতে থাকি। কিছুটা দূর থেকে লক্ষ করি, নিজের সহজ স্বভাবে লাইনের মাথায় গিয়ে দারোয়ানের সাথে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে হা-হা হাসছে ওমর। তার মানে ভজিয়ে ফেলেছে। বিড়ি শেষ করে এক সময় ত্রস্তভাবে সে আমার সামনে আসে, 'আরে আসুন' বলে এবং নিমেষে আমাকে ছোঁ দিয়ে লাইনের সমস্ত রোগীর প্রবল আপত্তির মুখে প্রায় ধাক্কা দিয়েই একটা কক্ষের ভেতরে ঠেলে দেয়।

ভেতরে ঢুকে আমার জবরজং অবস্থা। অসহিষ্ণু ডাক্তার খেঁকিয়ে বিদেয় করছে ভীত-সন্ত্রস্ত এক গেঁয়ো যুবককে, 'যাও, এখানে কানের চিকিৎসা হয় না। নাক কান গলা বিভাগে যাও, যত্তসব!' এর মধ্যে আমি লাফ দিয়ে পড়ায় ডাক্তার রসিদ দেখে মুখ তোলে, 'অসুবিধে কী?'

মাথায় টাক। মুখখানা জীবনানন্দ দাশের মতো। আমাকে দেখে চোখে ভাঁজ পড়ে। সম্ভবত এরকম ভদ্র পোশাকের কোনো রোগী এখানে আসে না। আমি কোথাও জার্নিতে কিংবা ডাক্তারের কাছে গেলে সচেতনভাবে পরিপাটি পোশাক পরেই যাই। চেয়ার টেনে বসে ফিরিস্তি দিতে থাকি। কখন, কীভাবে ব্যথাটা আক্রমণ করে, তার রূপ কী? ধীর গম্ভীরতার সাথে ডাক্তার সব শুনে একসময় ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে আসেন এবং এইসব কথোপকথনে যখন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়, সামনের টানা লাইনের কথা ভেবে আমি অসহিষ্ণু বোধ করি। সব শেষে ডাক্তার জানান, হাসপাতালে ভালো চিকিৎসা হয় না। যাবতীয় টেস্ট-ফেস্টও বাইরে থেকেই করতে হয়। বিকেলে আমি তার চেম্বারে গেলে তিনি যাহোক আমার জন্য কিছু করতে পারেন বলে জানালেন। যেহেতু চেহারা জীবনানন্দের মতো, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলে না। গনগনে মেজাজ নিয়ে একসময় বাইরে বেরিয়ে আসি।

যথারীতি আমার কোনো চিকিৎসা হয় না। পেটের ব্যথা অভ্যাস মতো চলতে চলতে একসময় থিতিয়েও আসে। দিন কাটে সেই পুরোনো একই ছন্দে। ছুটে যাই ইরফান চাচার বাসায় এবং বরাবরের মতো আমি আমার সব খুলে যেতে থাকি। আমার কিশোরকাল, কোন পুরুষ নির্জনতায় জাপটে ধরেছিল, ভয়ে রা পর্যন্ত করতে পারিনি, হঠাৎ একটা বেড়াল-পতনের শব্দ শুনে সে ধড়ফড়িয়ে সরে দাঁড়াতেই আমার দৌড়ে পালিয়ে আসা। এই সময়ের আরও স্মৃতি, সাজানো কনেকে কান্নায় আরও আপ্লুত করার জন্যই যেন সেই সুর—আমরা বৃত্তাকারে সেই বউকে ঘিরে গাইতাম, 'এতদিনে আইলা ভাইজান গো, আমার প্রাণের আম্মা কেমুন আছে, ওহ্ হোরে এ এ...।'

তিনি চেয়ে থাকেন। বিমুগ্ধ শ্রোতার মতো শোনেন। আমার উৎসাহ বাড়ে। রানুর আটামিল থেকে ফিরে আসা, পুজোয় অজয়ের চুমু, প্রথম রক্তপাতের অভিজ্ঞতা পর্যন্ত... আমার একবিন্দু কুণ্ঠা হয় না। তারপর সেই আর্টিস্টের সাথে প্রেম, বলতে বলতে কেমন থিতিয়ে আসতে থাকি। তারপর স্বরে ম্লানিমা ঢেলে বলি, 'সব জায়গাতেই আমার পরাজয়টা বড়ো বেশি।' একসময় ওমরের প্রসঙ্গ আসে। তার চরিত্রের বিস্তারিত বর্ণনা শুনে ইরফান চাচা আগ্রহী হয়ে ওঠেন, 'একদিন ওকে নিয়ে এসো না।'

'আমিতো আর কাজ পাই না', হেসে বলি। 'শেষে আপনার পিছু ধরবে। যখন তখন জ্বালিয়ে মারবে আপনাকে।' কিন্তু একসময় এসব প্রসঙ্গও ভালো লাগে না। তারপর নীনা ঘরময় হাঁটে। আক্রান্ত হয় অন্য এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

অনুভূতির ঘোরে। কিছুতেই সেই রাতের রেজাউলের আবির্ভাবের ব্যাপারটা বলা হচ্ছে না। এই একটি অধ্যায়েই একশো জড়তা তাকে জাপটে ধরে। সে সহজ হতে পারে না। অস্থিরভাবে হেঁটে সে আবারও ভদ্রলোকের মুখোমুখি, 'ওহে, তোমাকে বেশ কাতর মনে হচ্ছে।'

এতে মজা পেয়ে তিনি হাসেন, 'সাহস বাড়ছে দেখছি।' নীনা বলে, 'অত মান্যিগুন্যি আমি করতে পারব না।'... বলে, ঘরে আরেকপ্রস্থ পাক খায়। নীনা গুনগুন গান গায়। নীনা বিড়বিড় করে আওড়ায়, পোকা হাঁটছে রক্তে, মাংসে, মগজে, শিরায়, রোদ পড়েছে অন্ধকারে, কিংবা রোদের মধ্যে লোডশেডিং, কী সব বলছি... নীনা মেঝেতে বসে পড়ে। মাঝখানে খাট, বৃত্তাকারে খেলছে। হি হি হাসছে কিশোরী, একসময় সেই কিশোরী তাকে ধরে ফেলে, খপ। কোনোদিন তার গায়ে হাত তোলেনি যে রেজাউল এই ব্যাপারটাকে ঘিরে সে-ই একদিন তার মাথা ঠুকে দিচ্ছে দেয়ালে। চুল চেপে ধরে ধাক্কা দিচ্ছে। একে কি গায়ে হাত দেওয়া বলে? নাকি চুলে হাত দেওয়া? মাথা ঠুকে দেওয়া? কী বলে? শিশুটি কান্না ভুলে হাসছে তাকে দেখে। মাড়ি উপচে দাঁত উঠছে তার। শিশুটি কোলের মধ্যে বড়ো হচ্ছে। নীনা ক্রমশ সেঁধিয়ে যেতে থাকে নিজের মধ্যে।

আমি তাকে ধোঁয়ার আস্তরণ থেকে টেনে তুলি। খাড়া করাই। আমার মুখোমুখি। সমস্ত ঘর জুড়ে আমি আর নীনা। চেয়ে থাকি স্থির চোখে তার দিকে। একসময় সব জট খুলে লম্বা হয়ে দাঁড়ান ইরফান চাচা। প্রশ্ন করেন, 'তুমি কি অস্বস্তি বোধ করছ?' দৃষ্টি প্রসারিত করি। একজন নির্জন দর্শক তাকিয়ে আছেন। আমি শান্ত পায়ে সোফায় গিয়ে বসি। সর্দিতে খুব মৃদু শব্দে নাক টানছেন। অনেকক্ষণ পেরিয়ে যায়। তিনি আর কিছুই বলেন না। এদিকে আমিও কথা খুঁজে পাই না। আবারও দাঁড়াই। ম্যাগাজিন ওলটাই। পায়চারি করি। কখনও আমার পাগলাটে ছাত্রী সিনথির গল্প করি। টিউশানিটা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলি।

'হেরে যাবে?' স্বভাব-কায়দায় উৎসাহ দেন তিনি। 'জেনেশুনেই তো মেয়েটার দায়িত্ব নিয়েছিলে।' আবার প্রেরণা পাই। আর সেজন্যেই এখানে এসে অপার শান্তি। এক সময় মৃত্যুপ্রসঙ্গ তোলেন তিনি। প্রায়ই নাকি স্বপ্নে দেখেন, মৃত্যু তাঁকে খোলামাঠ ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। কিংবা কালো একটা ছায়া, পেছন থেকে ধাক্কা দিচ্ছে প্রবল ঘূর্ণির মধ্যে, বিশাল জলরাশির মধ্যে পতিত তাঁর দেহ। কিংবা, অন্ধকার একটা ঘরে তাঁকে আটকে রেখেছে কেউ। লম্বা সাঁড়াশি দিয়ে তার চোখ ক্ষতবিক্ষত করা হচ্ছে—উৎকট, রক্তাক্ত ছায়া, কিংবা... শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠি। বারান্দায় কাঁচা রোদের অনচ্ছ ছায়া। একসময় চোখ বুজে অবসন্ন ধীর কণ্ঠে তিনি বলেন, 'এক বয়সে আমার গল্প লেখার অপচেষ্টা ছিল। তার একটা কাহিনি মনে পড়ছে', আমি তাঁর মুখোমুখি মোড়া স্থাপন করি, 'বলুন'। তিনি বলেন, 'একজন সন্ন্যাসী, সব স্পষ্ট মনে নেই, তবুও বলছি', তিনি শুরু করেন, 'তার চুল এলোমেলো নতমুখী। অন্ধকার পথ ধরে হাঁটছে। দীর্ঘ তার যাত্রা। সেই যাত্রায় হাঁটতে হাঁটতে একসময় সে নির্জন একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। উঁকি দিয়ে দেখল, এক অপরূপ রমণী তানপুরা বাজাচ্ছে! তার চোখে জল।

'এ-কী, এ পথ তো আমার নয়!' সন্ন্যাসী ভাবে। এদিকে মেয়েটি দূরে শব্দে বেরিয়ে এসে পলায়মান সন্ন্যাসীকে দেখে। সন্ধ্যার আলোছায়ায় তার দীর্ঘছায়া মিশে যাচ্ছে দূরে।

'এই তো সেই! আমি যাকে চাই... মেয়েটি তার পেছনে উদভ্রান্তের মতো দৌড়ায়... দাঁড়াও। বিরুদ্ধ বাতাসের স্রোত ভেদ করে ক্ষীণ কণ্ঠের আহ্বান সন্ন্যাসীর কানে যায়। মেয়েটিকে দেখে সামান্য দাঁড়িয়ে আবার দৌড়ায় সে, আমি তো মুক্তমানুষ। নিজের পৃথিবীতেই আমার ফিরে যাওয়া উচিত। বিশাল মাঠ। দুজনই দৌড়াতে থাকে। এক সময় ক্লান্তি এসে রোধ করে দুজনের পথ। দুজন মুখোমুখি তখন। মেয়েটি বলে, 'আমি তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

সাথে যাব।'

'সন্ন্যাসী প্রশ্ন করে কোথায়? কেন যেতে চাও?'

'এটা আমার পথ, যার সাধনা আমি এতদিন ধরে করছি।'

'সন্ন্যাসী তাকে অনেক বোঝাল। চারপাশে নত হয় আছে নির্জন রাত। কিছুতেই বোঝে না মেয়ে। জ্যোৎস্নার বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে দুজন এক সাথে এগোয়। সামনে সমুদ্র। সন্ন্যাসী এক সময় বলে, তুমি দাঁড়াও। আমি সমুদ্রের ওপার থেকে ঘুরে আবার তোমার কাছে আসব। স্তব্ধ রাত। ফেনিয়ে উঠছে সমুদ্রের গর্জন। অস্ফুটে বলল, রমণী, তুমি যদি এসে দেখো আমি সমুদ্রের ঢেউ হয়ে গেছি? বিশাল সমুদ্রের স্তিমিত দৃষ্টি মেলে দিয়ে সন্ন্যাসী বলল, তবে তাই হোয়ো।'

বলতে বলতে সোফায় আধশোয়া ইরফান চাচা কেমন ঝিমিয়ে পড়েন। এক সময় অচেতন ঘুমের অসীমে তলিয়ে যেতে থাকেন তিনি। এত ক্লান্তি, এত অবসাদ বেড়েছে তাঁর!

বাসায় এসে ছটফট করি। কেন এই গল্প? সন্ন্যাসীর আড়ালে আসল মানুষটি কে? তিনি কী ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন? তাড়িত-বিভ্রান্ত আমি কঞ্চির মতো টান টান হই। পরদিন ফের ছুটে যাই। 'কে এই সন্ন্যাসী?'

'বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তের মেয়ে, সন্ন্যাসীর পরিচয় চাও?' তিনি হাসেন। 'এ স্রেফ একটা গল্প।'

'কেন শুনিয়েছেন আমাকে?'

'ঠিক আছে, আর শোনাব না।'

'তবুও বলতেই হবে।'

তিনি এবার গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন, 'কোথাও আমি সন্ন্যাসী, আবার কোথাও তুমি। আমাদের দুজনকে কিছুই বেঁধে রাখতে পারে না।' কিন্তু তবুও বিভ্রান্তির জট খোলে না। আমি আবার ধাবিত হই অন্যপথে। বাড়ির অবস্থা করুণ। আরেফিন সামান্য কিছু করে টাকা পাঠালেও আমার পক্ষে বলতে গেলে কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। আমি ঋণের বোঝা একটু একটু করে শূন্যে নামিয়ে আনার ব্যর্থ চেষ্টায় রীতিমতো গলদঘর্ম। মন্টু রীতিমতো মাস্তানে পরিণত হয়েছে। আরেফিন সে রাতে আসতে না পারার জন্য বিস্তর দুঃখপ্রকাশ করে টুকটাক করে বাড়ির এই হালনামা পড়ে যায়। বলে রানুর কথা। ও এই বয়সেই ভঙ্গুর ক্ষয়িষ্ণু এক নারীতে রূপান্তরিত। কোথায় যেন টাইপ শর্টহ্যাণ্ড শিখছে। মাঝে মাঝে সেখানে যাওয়া ছাড়া সারাদিন বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। এবং মা, তাঁর কান্না ছাড়া অন্য কোনো অবলম্বন নেই। এর মধ্যে একদিন রানুর একটা চিঠি আমাকে মৃত্যুর প্রান্তিক সীমায় নিয়ে দাঁড় করায়। নিজের সম্পর্কে কিছু না, একে ঠিক চিঠিও বলা যায় না, যেন কথা বলছে, এ ভাবেই লিখেছে—

> আপা, তোমাকে একটা কথা জানাই। মন্টুর জন্মের পর বাবা নাকি এত ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, আমাদের তিন ভাইবোনকে বেঁধে রাতভর গোরস্থানে শুইয়ে রেখেছিলেন। মা বলেন, এসবই তিনি করেছিলেন রাগের মাথায়, সংসারের অভাবের কারণে। তিনি চাইতেন না, আর কোনো সন্তান হোক। আল্লাহর ওপর মাতব্বরি করতেও তিনি ভয় পেতেন, এই জন্যই মাকে তিনি কন্ট্রোল করতে দিতেন না—রানু।

এটা কোনো চিঠি? কিন্তু তারপরও এমন ধাঁ-ধাঁ করছে কেন বুক? সেই নিস্তব্ধ প্রেত গোরস্থানের অলৌকিক বাতাস আমার দেহের সমস্ত দরোজা রুদ্ধ করে দেয়। নিশ্বাস আটকে আমার মরার উপক্রম হয়। এসব কাউকে বলা যায়? আমাকে বিপর্যস্ত দেখে শানু আমাকে বুদ্ধি দেয়, 'বাড়ি থেকে ঘুরে আসো একবার।' এবং কী হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

সঙ্গে সঙ্গে আমি স্পষ্ট জবাব দিই, 'না, আমি আর সেধে কোনো শ্মশানঘাট দেখতে যাব না।' এইসব ইন্দ্রিয়-শিথিল-করা-প্রসঙ্গ, বড়ো অবসন্ন, শ্লথ করে তোলে আমাকে। বুক ঠেলে কান্না আসে। ওরা কী চায়, আমি আত্মহত্যা করি?

সিনথির সাথেও আমার সম্পর্কের ধরন-ধারন পালটে ফেলেছি। পাঠ্যবই ছাড়া পৃথিবীর যাবতীয় প্রসঙ্গ নিয়ে কথা হয়। অধিকাংশই স্থূল। আমির খানের উত্থান, কিমি কাতকারের যাবতীয় পোজের বিবরণ। শেষে প্রশ্ন করি 'অমিতাভ বচ্চনকে কেমন লাগে?'

'কেমন বুড়ো বুড়ো', বলে সে সোৎসাহে তার গতকালকে পড়া কোনো একটা রোমাঞ্চকর বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ কোনো অধ্যায়ের বর্ণনা দেয়।

একদিন সে আমাকে বিছানায় বসিয়ে তার বিশাল সাজবাক্স নিয়ে আসে। হেয়ার স্প্রে, ব্লেশন, আইশ্যাডো— এসব সম্ভারের মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে আমার লম্বা চুল হেয়ার ড্রায়ারের গরম উষ্ণতায় আয়ত্তে আনার অপচেষ্টা করতে করতে বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, 'চুল ছোটো করে ফেলুন না, কী বিচ্ছিরি লাগে।'

'তাহলে আমাকে ভালো লাগবে?'

'লাগবে না মানে, ভীষণ ভালো লাগবে। মাথায় এক ঝাঁক ঝামেলা রেখে কীভাবে যে ঠিক থাকেন!' এইরকম কথার ফাঁকে একসময় মামুলি প্রশ্নে আসি, 'কে তোমাকে বেশি ভালোবাসে?' জিভ উলটে জবাব দেয়, 'ভেবে দেখার সময় পাইনি। তবে মা-বাবার লাইফটা চার্মিং। সারাক্ষণ পার্টি, হুল্লোড়, ড্রিংকস, দৌড়াও... দৌড়াও, উফ্ লাইফ কি ফার্স্ট। আমি এখনও সেভেনটিন ক্রশ করিনি। সব কিছু এনজয় করার অধিকার নেই।'

ওর ঘরে অনেকগুলো পেপার, বেশির ভাগই সাপ্তাহিক। ডাঁই করে রাখা। ধুলো জমে গেছে ওসবের ওপর। 'তুমি পড়ো?' প্রশ্ন করি। 'ধুর! এসব মানুষ পড়ে? যতসব প্যানপ্যানানি, কে মরল, কে লুটপাট করল, কোথায় ডায়রিয়া হয়েছে... বোগাস...।' সিনথি কথা বলে আর ঘরে জুড়ে তরঙ্গময় পাক খায়। ঠোঁটের ভাঁজে পুরোনো সুর... আই লাভ য়্যু মোর দ্যান আই ক্যান সে। এক সময় উচ্ছ্বসিত প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, ম্যাডোনার লেটেস্ট শো দেখেছেন? উফ্ যা সেক্সি না!' এবং পরক্ষণেই আমার প্রতিক্রিয়ার তোয়াক্কা না করেই হুড়মুড় করে ফিসফিসিয়ে আমার কানের ওপর আছড়ে দেয়, 'জানেন, সেদিন পার্টিতে ড্যান্সের সময় চিন্নাহ চাচা এক ফাঁকে মার ব্লাউজের নীচে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আমি না টুক করে দেখে ফেলেছিলাম। আর বাবা, বাবাতো তো মিসেস আলীকে নিয়েই বিভোর। মার যা হেভি ব্রেস্ট, বুক দিয়েই জিন্নাহ চাচাকে ধাক্কা দিয়েছিল। নিজেকে ব্যালান্সড্ করতে গিয়ে চাচার সে কী হাসি। মা-ও কম পাজি না। আমি জানালা দিয়ে সব দেখেছি।'

মাথা গরম হয়ে ওঠে আমার। শিরা টনটন করছে। এই মেয়েকে কী বলব? এরা কি এই দেশের বাসিন্দা? নিজেকে জড়ো করতেই যেন সমস্ত পত্রিকা বিছানায় ছড়িয়ে দিই। অসংলগ্ন হাজারো হেডলাইন—'বাগদাদ : শেলটারে শত শত লাশ', 'প্রচণ্ড স্থলযুদ্ধ শুরু', 'অসংখ্য মানুষের হতাহতের দাবি', 'সাদ্দামের গোপন অবস্থান জানতে আমেরিকান গোয়েন্দাদের তৎপরতা', 'খুলনার শাহনাজের আর ঢাকা দেখা হল না', 'বাংলাদেশে আন্দোলন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠছে', 'উনিশ বিশ দু-দিন লাগাতার হরতাল', 'ইরাক হামলা প্রতিহত করেছে', 'ইরাক সুইসাইড হামলা শুরু করবে'। 'চাঁদাবাজরা দোকানদারের চোখ উপড়ে নিয়ে গেছে'।

ঘুমন্ত চোখে সিনথির দিকে তাকাই, 'সিনথি, পড়তে তো ভালো লাগে না তোমার, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাব কিছু?'

ভবিষ্যৎ? সিনথির সামনে যেন আজব কোনো দরজা খুলে দিই, মা-বাবার মতো আজ লন্ডন, কাল ফ্রান্স...

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বলতে বলতে হাসে, 'আমার মাওতো স্রেফ ম্যাট্রিক-পাশ মহিলা, তাকে কী কিছু আটকে আছে তার? তাছাড়া, আজ হোক কাল হোক আমি এই দেশ ছাড়বই। কী জঘন্য দেশ! ঘর থেকে বেরুলে গলির মোড়ে গু-মুত, ওহ্ সো হোপলেস। বাইরেই সেটেল্ড হব।' তার এইসব অনুভূতির মুখোমুখি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার 'খরা' শিরোনামের পুরোনো পেপারের চৌচির জমির ওপর দাঁড়ানো ন্যাংটো অবোধ ক্রন্দনময় শিশুটি স্রেফ ফটোগ্রাফি হয়ে যায়। সিনথি হাসে, 'বাবাই আমাকে গাধা ঠাউরে আমার ঘরে এসব পেপার পাঠায়। বাবার যা উদ্ভট মানসিকতা। বাদ দিন, এখন নিজেকে একটু চেঞ্জ করুন তো!' বলেই তার ঢিলে সালোয়ার-কামিজগুলো আমাকে সে পরতে দেয় এবং এইসব জট থেকে বেরিয়ে আমি আবার তার সমান্তরালে, 'এসব করে তোমার বয়সে ফিরে যেতে পারব?' বলতে বলতে সেগুলো গায়ে চড়াতে থাকি।

'আপনি রেগুলার, অন্তত মাসে একবার ব্লিচ করবেন।'

'সেটা আবার কী?' বোকার মতো প্রশ্ন করি।

'এ-ও জানেন না? কোথায় যে বাস করেন আপনি! বিউটি পার্লারে গেলে ডিটেলস জানতে পারবেন—দেখতে ময়দার মতো, লিকুইড, কিন্তু খুব ঝাঁঝ। লাগালে মনে হবে চামড়া পুড়ে যাচ্ছে।' সিনথি বর্ণনা দেয়, 'লাগিয়ে বসে থাকতে হবে, পনেরো থেকে বিশ মিনিট। রেগুলার করলে অনেকদিন ইয়াং থাকতে পারবেন।'

'সবার সামনে ময়দার ওরকম মুখোশ পড়ে বসে থাকলে ভূতের মতো দেখায় না?'

'কী-যে বলেন!' হিঃ হিঃ হাসতে থাকে সিনথি। 'আপনার ফেইসের মধ্যে আশ্চর্য এক বিউটি আছে, কিন্তু কেমন স্লাইড আস্তর পড়ছে তার ওপর, আপনি হারবাল ফেসিয়াল করলেও ভালো রেজাল্ট পাবেন। আশ্চর্য! কাজল ছাড়া আর অন্য কিছু দিয়ে সাজেন না কেন?'

'কেন, লিপস্টিক তো দিই।' তবে খুব হালকা করে।

আমার সাজা শেষ হলে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। যেন কোনোদিন দেখিনি। নিজের আপাদমস্তক নিজের কাছে হঠাৎ এমন বোধ হয়। অদ্ভুত এক ইউরোপিয়ান মেয়েতে রূপান্তরিত আমি। এগিয়ে যাই। কী প্রগাঢ় অস্বস্তি, কী দ্রুত বিবর্তিত আমার অস্তিত্ব! পোশাক! বড়ো আজব চিজ! খোলস ভেঙে বেরিয়েছি, এখন আমি অন্য মানুষ। উদ্ভট লাগছে কি? আরেকটু এগিয়ে যাই। এবার মুখ। চোখের নীচে সামান্য ছায়া জমেছে। চুড়ো করে চুল বাঁধা। ক্রমশ নিজেকে অন্যভাবে দেখি, ইহা একটি নীনা। ইহার দুইটি কান আছে, দুইটি চোখ আছে, চুল, নাক, ঠোঁট আছে। ইহার দুইটি হাত এবং দুইটি পা আছে, মুখও আছে। আরও এগিয়ে যাই, ভ্রূ আছে, ইহা একটি মানুষ।

'আপনার এত চেঞ্জ হয়েছে টিচার'... সিনথির কথায় অনেক ওপর থেকে নীচে নেমে আসি, 'আমাকে তোমার ভালো লাগে?' সিনথি লাফিয়ে ওঠে, 'খুব। আপনি খুব ইন্নোসেন্ট! সরি, আপনাকে আগে আমি চিনতে পারিনি', বলতে বলতে সে-ও ঢলে পড়ে, 'টিচার, আই অ্যাম অ্যালোন!'

এভাবে দিন যায়, বুকের মধ্যে সমাচ্ছন্ন ছায়া নিয়ে। যেখানে যতটুকু সম্ভব নিজের সাথে আপস করে। দীর্ঘ নির্জন রাত নিয়ে। একদিন এই করেই দাঁড়াতে হয় এক গভীর সত্যের সামনে। যার জন্য কয়েকদিন আগেও আমার বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি ছিল না। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি তো হতভম্ব, বিমূঢ় হয়ে পড়ি। ভীষণ ভয়, শিরদাঁড়া-হিম-করা অনুভূতির মধ্যে এক সময় আমি আমার ভেতরে সন্তানের উপস্থিতি টের পাই।

ঘটনাটির আশঙ্কা নিয়ে আমি যতটা না ভাবিত হই, তার চেয়ে বেশি বিস্মিত হই এর আকস্মিকতায়। পুরো

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

মাসে আঙুলে-গোনা দুজনের রাতসম্পর্কের ভেতরে কখনোই কোনো আশঙ্কা মাথা তোলেনি। রেজাউলের সংসারে এমন ঢের ঢের সময় গেছে, প্রতিবন্ধকতাহীন দিন—সন্তান জন্মের আগেই বেশির ভাগ সময়, বেশ ক-মাস। আজ আমার ভেতরে, বিন্দুমাত্র আশঙ্কা, দুশ্চিন্তা, ভাবনা ছায়া না-ফেলা সত্ত্বেও এমন একটা জটিলতার মুখোমুখি হতে হবে, আমি কল্পনাও করতে পারিনি। এই রকম বিচিত্র শঙ্কাময় প্রতিক্রিয়ায় রক্ত হিম হয়ে আসে। হিসেব কষি, তখন মাসের কোন সময় ছিল? কতটা রিস্কি সময়? ভেতর থেকে ঠেলে আসা বমির স্রোত, বাঁধা সময়সীমার পর অনেকদিন পেরিয়ে গেলেও পিরিয়ড না হওয়া, চারপাশের পৃথিবীর ঝিমচক্কর খাওয়া এসবের পরেওতো ঘটনাটা মিথ্যে হতে পারে। আমি কোনোরকম টেস্ট ছাড়া নিশ্চিত হই কী করে? কিন্তু এতকিছুর পরও হৃৎপিণ্ডের পেণ্ডুলামে কিছুমাত্র স্থিরতা আসে না।

উদ্ভ্রান্তের মতো রাত জেগে থাকি। আমি আমার চোখের সামনের পৃথিবীর দ্রুত পরিবর্তন স্পষ্ট দেখতে পাই। অবলুপ্তি ঘটবে কি আমার একছন্দে আর একঘেয়েমির কাঁধে ভর করে চলা মোটামুটি নিরুপদ্রব জীবনের। ম্রিয়মাণ আলোর দিকে মরা চোখে চেয়ে থাকি।

এভাবে দিন যায়। সারারাত অসহ্য ছটফট, কেন এত বোকা আমি? বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ আমি কিনা কোনো কন্ট্রোল ছাড়া নিজেকে ওভাবে ছেড়ে দিলাম, স্রেফ গ্রাম্য মহিলার মতো? আমাকে তখন কোন ভূতে ধরেছিল? ক-দিন ধরে কিছুতেই ঘুম আসে না। তন্দ্রা এসে নিমেষে কেটে যায়। এবং তারপর ধড়ফড়িয়ে ওঠে বুক। সেই ভয়ংকর জাগ্রত অবস্থায় একরাতে চিবিয়ে দুটো ঘুমের বড়ি খাই। আর তখন বেশি করে আমাকে খুঁড়ে খেতে শুরু করে সেই দৃশ্য! বাবা আমাদেরকে নিয়ে নিস্তব্ধ অন্ধকার গোরস্থানে শুইয়ে দিয়ে এসেছেন! স্রেফ একটি জন্মের কারণে! আমার কেন মনে নেই সেই স্মৃতি? অবশ্য আমরা সবাই পিঠোপিঠি, তবুও কত বয়স ছিল আমার? কম্বলের নীচেও তীব্র শীতের হিম। কম্বল ছুঁড়ে ফেলে নিঃশব্দে দরজা খুলি। বস্তির ওপর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। রাতের প্রকৃতি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে সেই অস্পষ্ট গোঙানি কেবল বাড়ছে। বারান্দায় এসে দাঁড়াই। উত্তরের ধোঁয়াশে বাতাস আমার আত্মাকে স্পর্শ করে। ওপর দিকে তাকাই। মরা ছাদের এক চিলতে ফাঁক দিয়ে ফিকে ছায়াচাঁদ দেখা যায়। গাঢ় কুয়াশায় আবৃত যেন। তারই ম্রিয়মাণ আলো এই ল্যাম্পপোস্টহীন এলাকাকে বড়ো করুণ, রহস্যময় করে তুলেছে।

আবার বুক ধড়ফড়িয়ে ওঠে। অন্ধকার বারান্দায় আমার প্রায় পায়ের ওপর দিয়ে একটা বেড়ালকে অন্য একটা বেড়াল তাড়া করে ছুটে গেল। তারপর বিস্তৃত শূন্যতা! কিন্তু বস্তির অবিনাশী কান্নার স্পর্শ দীর্ঘ সময় ধরে আমাকেও গ্রাস রাখে।

গলায় জল ঢেলে বিছানায় আসি। কম্বলের গায়ে প্রবল শীত। টেনে তুলতে কেঁপে ওঠে শরীর। হঠাৎ করে ঠিক যেন নাকের কাছে গোঙানির শব্দ শুনি। ক্ষিপ্রগতিতে উঠে বসি। একদম জানালার কাছে, গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। এবং পরক্ষণেই দুটি বেড়ালের ধস্তাধস্তির শব্দ শুনে নিঃশব্দে শুয়ে পড়ি। সারারাত দুটো শিশিরসিক্ত বেড়ালের চিৎকার আমাকে জাগিয়ে রাখে। খুব ভোরে খবর পাই, সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে বস্তির কাল্লুর মা মারা গেছে।

ওমরের সাথেই অফিস থেকে বেরোই। দাড়ি সেভ করায় আজ তার মুখ বেশ ঝকঝকে হয়ে উঠেছে। কিন্তু পোশাকের অবস্থা তথৈবচ। একদিন উদ্ভট দাড়ি সম্পর্কে বলেছি, সে ওইটুকু পর্যন্ত সচেতন হয়েছে। পোশাক, স্যান্ডেল এইসব সম্পর্কে আবার আলাদা করে বলতে হবে। রামগাধা আর কাকে বলে! ক-দিনে বেশ শুকিয়ে গেছে। বলল, তার ফ্লায়িং বিজনেস পড়তির দিকে। কার কাছ থেকে পাঁচহাজার টাকা এনে ঢুকিয়েছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

সেইটেই বের করতে পারছে না। ওমরের আকৃতির একটা বৈপরীত্য এতদিনে আমার চোখে পড়ে। তার মুখের আদলটি বেশ প্রৌঢ়ের মতো। কিন্তু কোমর থেকে শুরু করে নীচের দিকে স্রেফ বালক। প্যান্টও পরে জবরদস্ত। হাঁটলে লটপট করে। খেয়াল করে দেখলে বাজেলাগা-বোধে আচ্ছন্ন হতে হয়। ভাবি, রেজাউলের সাথে আবার সমঝোতায় যাচ্ছি, এই সিদ্ধান্তটা তাকে জানাব। কথা শুরু করি এভাবে, 'হাসপাতালের পর সেই যে হাওয়া হলেন, আপনার ছোটোভাইয়ের খবরওতো জানা হল না।'

'ও! আপনাকে তো বলাই হয়নি। সে পাগল হয়ে গেছে।'

'সে কী? কবে?'

'তা মাসখানেক হয়ে গেল।'

'আশ্চর্য!' আমি খেপেই উঠি প্রায়। 'আপনার সাথে তো এর মধ্যে দেখা হয়েছে। আপনি বললেন না যে?'

'বললে কী হত? সে ভালো হয়ে যেত?'

'উলটোপালটা কথা ছাড়ুন। এখন সে কোথায় আছে?'

'বাসায় তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে'... বলতে বলতে ওমর হাঃ হাঃ হাসে, 'দড়িবাঁধা অবস্থায় সে যা আজব কায়দায় নাচে, দেখতেন যদি।'

'আপনি রিকশা থেকে নেমে যান।'

'দেখুন, আপনার সাথে গেলে আমার ভাড়াটা বেঁচে যায়। আমাকে যেতেই হবে। ভদ্রলোক আমাকে একটা চাকরির আশ্বাস দিয়েছেন।'

'ডাক্তার দেখিয়েছেন তাকে?'

'হাসপাতালে নিয়েছিলাম। তারা তাকে পাবনায় নিয়ে যেতে রেফার করেছে।'

'সেখানে নিয়ে যাচ্ছেন না কেন?'

'দেখুন, এসব ফালতু প্রসঙ্গ বাদ দিন। যার পাগল হওয়ার হয়েছে, একসময় ভালোও হবে। এসব নিয়ে অন্যের পাগল হয়ে কোনো লাভ আছে?'

'কেন নিচ্ছেন না পাবনা?'

'সোজা কথা, তার চিকিৎসার খরচ বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। হাসপাতালের ফ্রি চিকিৎসা কী হয়, নিজেই তো দেখলেন', বলে ওমর কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর বলে, 'ধান্দা কি করছি না? সিনথির বাবার অফিসে নাছোড়বান্দার মতো ধরনা দিচ্ছি। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। এখন আপনার খবর বলুন?'

এরপর আর নিজের খবর বলার স্পৃহা থাকে না।

আমরা দুজনই নিঃশব্দে সেই রাজপ্রাসাদে ঢুকে যাই। ড্রয়িংরুমের গদি-আঁটা সোফায় তলিয়ে থাকে ওমর। আর আমি সেই স্বর্গের বিস্তৃত সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে থাকি। লম্বা বারান্দা অতিক্রম করার সময় সেই ভারিক্কি সৌম্য চেহারার সিনথির বাবার মুখোমুখি। আড়ষ্টপায়ে দাঁড়াই। তিনি চশমা তুলে আমাকে দেখে যে প্রশ্ন করেন, তাতে আমার শূন্যপতন ঘটে, 'আপনি এখনও আছেন?'

তবে কী মনে করেছেন তিনি? 'জি'... বলে ভীষণ আহত হয়ে এগোব, বলেন, 'প্রয়োজন হলে অ্যাডভান্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

নিতে অস্বস্তি বোধ করবেন না। কী এক জেদ থেকে বলি, 'জি, আপাতত তার দরকার পড়বে না।' সিনথির ঘরে গিয়ে দেখি সে মজাসে সিগ্রেট ফুঁকছে এবং নাইট গাউনের পাতলা আবরণে দেহ ঢেকে নিজেকে আয়নায় দেখছে, কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি, 'আজ সোজা করে বলো, তুমি আমার কাছে পড়বে কিনা?'

সে নির্বিকার উত্তর দেয়, 'না।'

'তবে কি আমি টিউশনিটা ছেড়ে দেব?'

'তা দিতে পারেন' বলে গুনগুন করে গান গায়। পা ঠোকে মেঝেতে। এগিয়ে গিয়ে তার মাথায় সস্নেহে হাত রাখি, 'সিনথি এটা জীবনের পথ নয়, তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা করো।'

'আপনি বেরিয়ে যান', সে সহজ কণ্ঠে আদেশ করে।

এরপর আমার আপসের পালা। যথারীতি চারপাশ ঝাঁকিয়ে রাত নামার পর এক সময় আমি বিশাল সিঁড়ি ধরে নেমে আসি। নেমে ড্রয়িংরুমে, ভীষণ বিস্মিত হয়ে দেখি, ওমর তখনও বসে আছে। কাছে গিয়ে প্রশ্ন করি, 'আপনি এখনও আছেন, কী ব্যাপার?'

সে বলে, 'দু-বার খবর পাঠিয়েছিলাম, সাহেব বলেছেন, তার সময় হবে না। বলেছেন চলে যেতে।'

'তারপরও বসে আছেন?'

'কী করব, আমার যে একটা চাকরির খুব দরকার।'

বিস্তৃত লন পেরিয়ে স্বরে ঝাঁঝ মিশিয়ে প্রশ্ন করি, 'এভাবে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে চাকরি পাবেন?'

'তাহলে কীভাবে পাব?' তার সরল প্রশ্ন। আমি ভদ্রলোকের পেছনে দিনের পর দিন লেগে থাকব। তিনি আমাকে সেদিন অফিসে আশ্বাস দিয়েছেন কেন?'

'কীসের আশ্বাস, জুতো পরিষ্কার করার চাকরি?'

'আপনি মনে হয় খেপে যাচ্ছেন?' ওমর ম্লান কণ্ঠে বলে। 'জুতো পরিষ্কার কি কাজ নয়? আপনি অত ঘেন্না করছেন কেন?'

'অত লেকচার দেবেন না, তাহলে লেখাপড়া শিখেছিলেন কেন?'

'কী আশ্চর্য! লেখাপড়ার চাকরি না পেলে আমি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? আপনি আমাকে ভাত দেবেন?'

সামনে বিস্তৃত রাজপথ। এখান থেকে আমার বাসায় যাওয়ার তেমন কোনো বাসের ব্যবস্থা নেই। তাই প্রতিদিনই বেশকিছু অতিরিক্ত পয়সা গচ্চা যায়। গত মাস এবং এ-মাসে অফিসে বিজ্ঞাপনের বাড়তি কিছু মামুলি ডিজাইন করে দিয়ে হাতে বাড়তি অল্প কিছু পয়সা এসেছিল। ইরফান চাচার লোনটা ছাড়া আমার আর তেমন কোনো লোনও নেই। কিন্তু ওই দু-হাজার টাকাই মাঝে মাঝে আমার দম আটকে দেয়। রিকশায় বসে অনেকক্ষণ কোনো কথা বলি না। ওমর আজ বেশ গম্ভীর, আলোছায়াময় পথ ধরে রিকশা এগোয়। সে হঠাৎ বলে, 'জানেন, আমি একবার পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।'

'আপনি কি এখন নিজেকে সুস্থ মনে করেন?'

'না না, এখন ভালো হয়ে গেছি।' এবার সে সোৎসাহে শুরু করে, 'বাবা ছিল দু-পয়সার কেরানি, সে পালিয়ে বেড়াত। অনেক রাতে ঘরে ফিরে সোজা ঘুমিয়ে পড়ত। সেদিন সারাদিন আমরা ভাইবোন না খেয়েছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

সন্ধ্যায় পাগলের মতো হয়ে উঠলাম। তখন বয়স আর কত, ষোলো-সতেরো। রাস্তায় বেরিয়ে আনাড়ির মতো এক লোকের পকেটে হাত দিলাম, আর যায় কোথায়! বুঝতেই পারছেন পরিণতি! হায়রে, বেদম গণপিটুনি! হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল কয়েকদিন। তারপরই পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের দু-ভাইয়েরই আঘাতজনিত কারণে পাগল হওয়ার পরিণতি... হাঃ হাঃ। কী মজা না?

ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায়, প্রায় কাতরোক্তি করি, 'আপনি হাসছেন? এটা কোনো হাসির ঘটনা?'

'হাসির নয়তো কী?' পাগল হওয়ার পর কী করতাম শুনলে আপনিও হাসবেন।' ওমর তেমনই হাসতে থাকে। 'মা বলেছে, একবার নিজের গু নিজেই খেয়েছিলাম, হাঃ হাঃ।'

'থামুন।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠি। মানুষটা এইসব নিয়ে এত নিশ্চিত জীবনযাপন করে? সব ছাপিয়ে মিশ্র অনুভূতিতে আমার বুক থেকে কান্না ঠেলে ওঠে। আশ্চর্য! ওমরের পরিবারের সাথে কোথায় যেন আমাদেরও একটা গভীর মিল! আমার অসহ্য লাগে। রিকশার বরফ-হাওয়া আত্মা স্পর্শ করে। গায়ে টেনে চাদর চড়াই। ঝাপসা ধোঁয়াটে পথ। সবুজ বাতির পতন, তারপর থেমে যাওয়া।

'জানেন', খুব সরল গলায় ওমর বলে, 'আজ কেন যে আমি আমার সব কথা আপনাকে বলছি! আমার বোনটি গতমাসের শেষ দিকে তার অ্যাবরশন করাতে হয়েছে, কার সাথে কী সম্পর্ক বাঁধিয়েছিল! এখন তার যা শরীরের অবস্থা। তাকানো যায় না। আপনি কি বিরক্ত হচ্ছেন?'

ওমর বিদায় নেবার পর আমার চারপাশে জাঁকিয়ে ভিড় করে নাড়ি তোলপাড় করা সব ঘটনাংশ। কাল্লুর মারও এই একই পরিণতি। অবশ্য তার ঘটনা আলাদা। তার হারামি স্বামীটা নাকি দু-দিন আগে তার পেটে কষে, একটা লাথি মেরেছিল, কিন্তু তারপরও...। এই প্রথম আমি ওমরকে নিয়ে ভাবনায় মগ্ন হই। এই প্রথম তাকে আমার কাছে সরল অথচ রহস্যময় মনে হয়। এবং আরেকটি ব্যাপার, আমাকে কঞ্চির মতো খাড়া করে, তার অবলীলায় বলে যাওয়া বোনের অ্যাবরশনের ঘটনাটা! আমাকে তাড়িতই করে না, এক ধোঁয়াশাময় গহ্বরে নিক্ষেপ করে। একটা কঠিন সত্যের মুখোমুখি আমাকে দাঁড় করিয়ে দেয়। ভাবায়, শঙ্কিত করে, আমার ভেতরও তো সেই বীজ অঙ্কুরিত! আমি কি এর কারণেই রেজাউলের কাছে সমর্পিত হতে চাইছি? সেই কারণেই কি আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, না? কিন্তু সেদিনের পর থেকে রেজাউল কোথায়?

আমাকে অভিভূত করে দিয়ে এর মধ্যে একদিন আরেফিন একটা শাড়ি নিয়ে আসে আমার জন্য। সলজ্জ কণ্ঠে বলে, 'নিজের উপার্জনে!' আমি শাড়িটার ঘ্রাণ শুকতে গিয়ে কেঁদে ফেলি। 'কী হয়েছে তোমার? এমন চেহারা হয়েছে কেন?' আরেফিনকে বিচলিত দেখায়। আমি কুয়াশা ফুঁড়ে উঠি এবং পারম্পর্যহীনভাবে রানুর চিঠির কথা বলি। আরেফিন হেসে ফেলে, 'আমার নিজেরও মনে নেই। তবে বাবা আমাদের বেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন সেটা ঠিক নয়, রানু বাড়িয়ে লিখেছে। আমিও চাচার কাছে শুনেছিলাম, যাকগে রাগের মাথায় কে কী করে...!' আশ্চর্য! এরা সবাই জানে, আর আমি বড়ো মেয়ে হয়ে সেটা জানি না? এইবার আরেফিন বিরক্ত হয়, 'তুমি বিষয়টাকে এত সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন? জীবনে এত সংগ্রামের পরও? আশ্চর্য!'

'তুই বুঝবি না আরেফিন, আমাদের বাবা, যত রাগই হোক তার, ওই রকম শূন্য গোরস্থানে নিয়ে যাবে আমাদের! সারারাত আমরা কজন অবোধ শিশু খাঁ-খাঁ গোরস্থানে... মৃতদেহের সঙ্গে... আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে না। মা এখনও বেঁচে আছেন কোন স্বপ্নে?'

'আপা, তুমি শান্ত হও', আরেফিন বলে, 'যা যাওয়ার তা তো চলে গেছে। এছাড়া সারারাত তোমাকে কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বলেছে?'

আরেফিন চলে যাওয়ার পর বারান্দায় একটা ছায়ার আবির্ভাব। ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। কিছুটা ঝুঁকে লক্ষ করি, অন্ধকারে প্রেতের মতো বসে আছে কাল্লু। আমার কলজের সুতোয় হঠাৎ টান পড়ে। পিঠে হাত রেখে ফিসফিস করি... কাল্লু... হেই কাল্লু... এবং টেনে দাঁড় করাই, ক-দিনে বেশ লম্বা হয়েছে। অন্ধকারে মুখটা দেখা যাচ্ছে না। তবে ওর হিক্কার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কান্নায় কান্নায় চোখজোড়া ভীষণ ফোলা। তাকে ঘরে নিয়ে আসি। কী বিবর্ণ, ক্লিষ্ট মুখ! যথারীতি তাকে দেখেই শানুর সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। ভুরুতে সহস্র ভাঁজ ফেলে দরজা খুলেই ভেতরে চলে যায়।

'খিদে পেয়েছে?' তাকে প্রশ্ন করি।

হাতের উলটো পিঠে নাক মুছে মাথা নাড়ে সে, 'হ্যাঁ।' ছেঁড়া হাফপ্যান্ট নীচ থেকে ঝুলছে, উদোম গা আর মুখ এমন করুণ... আমার ভেতর থেকে উপচে ওঠে মায়া। তাকে বিছানায় বসিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাব, নিস্তব্ধতা ছিন্ন করে বাইরে বিকৃত একটা চিৎকার শোনা যায়... কাল্লু, অ কাল্লু... এবং বিদ্যুৎ বেগে খাড়া হয়ে ওঠে শিশুটির শরীর। 'বাজান'... বলে কম্পিত পায়ে দরজার দিকে দৌড় দেয়। আমি দ্রুত ব্যাগ হাতড়ে দশটা টাকা তার ঝোলা ব্যাগে ঢুকিয়ে দিই... 'কিছু খেয়ে নিস।'

এবং দরজা খোলার পরমুহূর্তেই তার দেহ যেন হাওয়ায় মিশে যায়। বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তার পরপরই আবার যথারীতি শানুর আগমন। নিজেকে তৈরি করেই সে বেরিয়েছে, 'তুমি ওকে ঘরে আনলে কেন?'

'দেখ, ছেলেটার মা মারা গেছে', আমি বলি, 'মায়া বলে তো একটা জিনিস আছে।'

'এসব আদিখ্যেতা করতে হয় তো অন্য জায়গায় গিয়ে করো', সে বলে, 'তুমি ইচ্ছে করেই আমাকে অপমান করার জন্য এসব করো। আমার বাসায় আমি সেটা সহ্য করব না।'

'আমি ওকে তোমার বাসায় আনিনি, দয়া করে আমার সাথে লাগতে এসো না, আমি এখানে বিনে পয়সায় থাকি না।' আমি জানি, এরকম কথা সহ্য করার মতো চরিত্র শানুর না। সে মহা হুলুস্থুল বাঁধিয়ে দেয়, সাথে কান্না। তার দুর্বল জায়গাগুলোতে ঘা দেওয়াই নাকি আমার অভ্যাস। আজকে আবার থাকা-খাওয়ার খোঁটা দিচ্ছি। সে আর এক সাথে থাকবে না, আজই কামালভাইকে...। চুপচাপ বসে থাকি। নিজেদের দুর্বলতা ঢাকার জন্য এত স্বার্থপর হতে পারে এরা? খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় যাওয়ার পর আমি একা। পাশের ঘরে কামাল ভাইয়ের সাথে ফিসফিস করছে শানু। অসহ্য। এদেরকে এড়িয়েই বা আমি চলি কী করে? এই বিশাল রাজধানীতে আমার মতো একজন মেয়ের একা থাকাটা যে কী ভয়াবহ, সে কি আমি জানি না? তবুও মাঝে মাঝে লেগে যায়, নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না।

সারাদিন মাথাটা ঝিম ধরে ছিল। হঠাৎ রাত বাড়ার পর বমির বেগ পায়। ইউরিন টেস্ট করাচ্ছি না ভয়ে। নিশ্চিত সংবাদটা আমার প্রাণ আমূল বিদ্ধ করবে। তার চেয়ে থাক। আশঙ্কা আর অনিশ্চয়তার ভয়ে থাকাই ভালো। কিন্তু বমির বেগ আমার বুক খালি করে দেয়। মনে হয় শুধু এই একটা কারণের জন্যই আমাকে রেজাউলের কথা ভাবতে হবে। আমার সামনে দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা থাকবে না। এবং সেই অসহায়তা আমার জন্য মারাত্মক হবে।

কী ভয়ানক বিপদের মধ্যে যে পড়লাম! দিব্যি চলছিল। কী মানে ছিল এমন জটিলতায় জড়ানোর? তার আগে আমাকে স্পষ্ট করে জানতে হবে, আমি রেজাউলকে কতটুকু অনুভব করছি, 'ওয়াক'... উদ্ভ্রান্তের মতো দৌড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বাথরুমে গিয়ে বমি উগড়ে দিই।

পরদিন বাড়িওয়ালা এসে সরাসরি বাসা ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত জানায়। আমি তাকে স্পষ্ট বলি, বছরের মাঝখানে তার বাড়ি ভাড়া বাড়ানোর কোনো অধিকার নেই। তারপর অধিকার-অনধিকার নিয়ে বিস্তর তর্ক। এক পর্যায়ে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকলে আমি নরম হই। অনেকটা মিনতি করার ভঙ্গিতে তাকে আমাদের দৈন্যদশার বিবরণ দিই। সে নিজেও বর্তমান বাজারদরের ঊর্ধ্বগতির বিবরণ দেয়। মাঝখানে শানু এসে আমাদের আলোচনায় বাগড়া দিয়ে বসে। সে তার সাবেকি ভঙ্গিতে কঠোর হয়, 'এক পয়সাও বাড়াব না, দেখি কী করতে পারেন।' বাড়িওয়ালার ফের রুদ্রমূর্তি। পাঞ্জাবির খুঁটি এক হাতে চেপে ধরে বাইরে পানের পিক ফেলে এসে জোর গলায় ঘোষণা দেয়, আগামী মাসেই বাসা ছাড়তে হবে। নইলে পাড়ার গুন্ডা লেলিয়ে দেবে পেছনে। এবং তারপরেই আসে সেই পিত্তি জ্বালানো প্রসঙ্গ—বাসাটাকে আমরা কী বানিয়েছি, হাজার রকমের লোক আসে, বাসার ইজ্জত বলে তো একটা ব্যাপার আছে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, এইসব প্রসঙ্গের মুখে শানুর কণ্ঠে আজ অন্যরকম সুর। সে বলে, 'এসব কথা যাকে বলার তাকেই বলেন। গণহারে কিছু বললে আমি সহ্য করব কেন?'

আমি বলি, 'দেখুন, আমি অফিসে চাকরি করি। সেই সূত্রে জানাশোনা মানুষ আসতেই পারে। খুব বেশি কেউ তো আসে না। আপনি বাইরে থেকে বেশি বেশি শোনেন।' এই প্রসঙ্গেও বিস্তর তর্ক। শেষে সে জানিয়ে যায়, আগামী মাস থেকে অন্তত দুশো টাকা করে হলেও বেশি দিতেই হবে। তার মানে প্রত্যেক মাসে আমার আরও একশো টাকার মামলা। গজগজ করতে করতে ভেতরে যায় শানু। 'বাড়াবে ভাড়া? এটা হল অতিরিক্ত ট্যাক্স। এক-একজন মেহমানদারি করবেন, তার খেসারত দিতে হবে আমাদেরকে। বুঝি না, বিয়ের কথা বললে কেন গায়ে ফোসকা পড়ে? ডিভোর্সি মেয়ে হল গিয়ে ছোটা গোরু, একবার বাইরের ঘাসের স্বাদ পেলে কেউ কি—!'

এসব ঝগড়া ইচ্ছে করেই পাশ কাটিয়ে যাই। কিছু না বলে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকি। এবং আমার অস্তিত্বে একটি সন্তানের উপস্থিতির মুখোমুখি বাড়িওয়ালার প্রায় মারমুখী মূর্তি কটকট করে ওঠে বিকৃত কায়দায়। কেমন ভীত হয়ে উঠি আমি। এবং তারপর মজুমদারের মুখ। তার খণ্ডখণ্ড মাথা উড়তে থাকে। পুরো ঘর সয়লাব হয়ে যায় তার মস্তকে। রক্ত চোখে চেয়ে থাকে আমার দিকে এবং তারপরই এগিয়ে আসে একটি শুয়োরের মাথা। বিশাল মেথরপট্টির কাদার মধ্যে গড়াগড়ি খেত ওগুলো। কী উৎকট গন্ধ! চন্দনা নামের একটা মেথর যুবতি ছিল, সে ভাত পচিয়ে কী সব মদফদ বানাত। সেদিকে কখনো গেলে দেখা যেত ভদ্র যুবকেরা কী দ্রুত ঢুকে যাচ্ছে তার আখড়ায়। ছোট্টবেলায় কখনো চাচার বাসায় গিয়ে রাত কাটালে এই দৃশ্য দেখতে পেতাম। সারারাত মাইকে কাওয়ালির শব্দে ঘুম আসত না। ঘটাং ঘটাং শব্দে মাঝরাতের ট্রেন যেতে থাকলে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসতাম। জানালায় মুখ বাড়িয়ে দেখতাম টলতে টলতে খিস্তি আউরে লোকজন বেরিয়ে আসছে। ভারী সাজুগুজু হয়ে থাকত চন্দনা। তাকে দেখেই প্রথম আমার যুবতি হওয়ার সাধ হয়। কত বিচিত্র ফিতায় চুল বাঁধা থাকত তার। আর অবিশ্রান্ত হাসি। একদিনই শুধু তাকে কাঁদতে দেখেছিলাম। তার প্রিয় শুয়োরছানাটি ট্রেনে কাটা পড়লে তিরের বেগে সে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রেললাইনের ওপর। সে কী বুক থাপড়ানো বিলাপ! সন্তান হারানোর চিৎকারও বুঝি এত গভীর হয় না। ওইরকম সারাক্ষণ তরল মেজাজে থাকা মেয়ের বুকের মধ্যে এত ভালোবাসা থাকতে পারে? বিস্মিত হয়েছিলাম। সে যদি আমার চাচার ঝুলন্ত লাশ দেখত?

এইরকম নানা চক্রের ভেতর দিয়ে সময় বয়ে যায়। বুকের অতলতায় ক্রমাগত বিক্ষুব্ধ জলের ধারা। পরম গাঢ়তায় তুলোর বালিশে মুখ গুঁজি। বালিশ ভিজে ওঠে ক্রমশ। কী ছায়া চারপাশে! কী ম্রিয়মাণ, দুঃসহ-দুর্বহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

সকাল দুপুর-রাত! এভাবে দিনগুলো অতিক্রম করি এবং সেই অবসন্ন পল-অনুপলের পথ ধরে একদিন রেজাউলও আসে।

এই কি সেই রেজাউল? কিছুদিন আগে যাকে চিনতাম? কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে। চোখ কোটরে, পোশাকে কালসিটে রঙের ছড়াছড়ি। চুলে চিরুনির দাগ নেই। চেয়ারে বসেছে কেমন জবুথবু। আমার দিকে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকায়। এবং সেই দৃষ্টির সামনে আমার হৃদস্পন্দন থেমে যায়। কী গভীর, ক্লান্তিময় মূর্তি! রাতের আলোতে আমার দীর্ঘ ছায়া দেয়ালে, আমি নিজের সেই আকৃতির দিকে চেয়ে ভেতরের দ্বন্দ্ব লুকোই—খবরটা জানাব ওকে? কিছু একটা বলার জন্য উশখুশ করছে সে। আমার কোনো সংবাদ কি আজ তার জন্য সুখকর হবে? অথচ তা-ই তো হওয়ার কথা ছিল। যেকোনো কারণেই হোক তার অপেক্ষায় ছিলাম, কিন্তু তার বিবর্ণ মূর্তি আমাকে ম্রিয়মাণ করে তোলে। কিন্তু এই রেজাউলের পুরো অবয়বে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আমার দাম্পত্য জীবনের রেজাউল। মাঝখানে যে অভিনব পোশাকটা সে তার সমস্ত অস্তিত্বে জড়িয়ে এসেছিল, সেটা যেন আজ সে খুলে এসেছে। না, মৃত্যুর বিনিময়েও এর সান্নিধ্যের কথা ফের ভাবা যায় না। আহ্, পাঁজরের নীচে ঘা দিচ্ছে। আমি কি ডাক্তারের চেম্বারে যাব?

'তোমার কাছে কিছু টাকা হবে?'

'কত?'

'এই ধরো পাঁচশো' বলে ভীষণ বিব্রত বোধ করে সে, আমি ব্যাগে হাত দিলে সে স্বরে মৃদুতা এনে বলে যায়, 'বেশ কয়েক দিন হয় আমার চাকরিটা চলে গেছে। গণ-ছাটাইয়ের মধ্যে আমিও পড়ে গেছি। এ ক-দিন অনেক ধরাধরি করলাম, কিচ্ছু হল না।'

হলদেটে পানসে আলোয় শিথিল আমার হাত ক্রমাগত ব্যাগ হাতড়ায়। শিশিরের অস্পষ্ট পতনের শব্দ অবচেতনে। গায়ে কার্ডিগান জড়িয়ে আমি সেই সংকীর্ণতার ধোঁয়াজাল থেকে বেরোই। সে বলে, 'ভাবছি দেশে ফিরে যাব। মফসসলে গিয়ে যদি কিছু একটা করা যায়।'

আমার ভেতরে কী এক অজানা কারণে ধ্বংস নামতে শুরু করে। সহিষ্ণুতার শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়েছি আজ। নিজেকে এত পতিত লাগছে। তাহলে এতদিন কি আয়ত্ত করেছি? কতটা তৈরি করেছি নিজেকে? ঘোর তলানি থেকে ওপর দিকে উঠে আসি। টাকাগুলো বাড়িয়ে দিলে, সে কেমন মিনমিনে গলায় বলে, 'তুমি কি কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছ?'

আমি হেসে ফেলি।

'কী ব্যাপার, হাসছ কেন?'

'তুমি টাকাগুলো রাখো। ভদ্রতা করতে হবে না।'

'আমি ভদ্রতা করছি?'

'আহ্ রেজাউল'... মৃদু ধমক দিয়ে চেপে বিছানায় বসি। এইভাবে আরও কিছুটা সময় পেরিয়ে যায়। এক সময় সে উঠে দাঁড়ায়।

তার পদক্ষেপে কি ভারহীনতা! লজ্জাময় ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। দরজার কাছে যাই।

নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্য যেন সে কঞ্চির মতো টানটান হয়। এবং বিশাল অন্ধকার পৃথিবীতে পা রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ভোকাট্টা ঘুড্ডির মতো উড়তে থাকি। দীর্ঘদিন পর নিজেকে বিপর্যস্ত অথচ প্রবলভাবে মুক্ত মনে হয়। রেজাউলের বেড়াজাল আমাকে অনেকদিন ধরেই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। অষ্টপ্রহর জুড়ে কেবল পীড়নময় দ্বন্দ্ব, সিদ্ধান্তহীনতার জট, এবং শেষাবধি আমার সুগভীর গর্ভে সন্তানের ভ্রূণের বেড়ে ওঠাকে ঘিরে তার ওপর এলিয়ে পড়তে চাওয়া, কোনো কিছুর মধ্যেই আমার কোনো নিজস্বতা ছিল না। এবার যথার্থই নিজেকে শূন্যে ফেলে আমার একদম একলা-একা সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা, আমি কী করব? আমি কি নষ্ট করে ফেলব ভ্রূণটাকে?

সিনথির রাজপ্রাসাদে বিচিত্র ভিডিওর মগজ-ধোলাই-করা-নাচ দেখতে দেখতে, অফিসের বদ্ধ কাসুন্দির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে, শীতের নির্জন পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমার ভেতর কেবল একটা দ্বন্দ্বেরই চড়াই-উতড়াই, এরপর আমার কী সিদ্ধান্ত হওয়ার উচিত!

কলজে-খামচে-ধরা কম্পিত রাত, আমার একার দুর্বিষহ রাত এখন একটা চিন্তায় পরিব্যাপ্ত... অঙ্কুরটাকে মেরে ফেলব? কিন্তু তার পক্ষে যখন দাঁড়াই, আমাকে তাড়িত, অবসন্ন করে ফেলে আর একটা অনুভূতি। আমার প্রথম সন্তানের বিষণ্ন পরিণতি। চারপাশে সেই হাসপাতাল-শূন্য-করা-চিৎকার আবারও ধ্বনিত হয়। সর্বাঙ্গ শিথিল-করা এই প্রশ্নে আন্দোলিত হতে থাকি, দ্বিতীয় সন্তানের হন্তারক তবে আমিই হতে চাইছি? সোজা হয়ে আর দাঁড়াতে পারি না।

তাছাড়া রেজাউলের জন্য অপেক্ষার সময়টাতে অদ্ভুত দ্বন্দ্বের মধ্যেও এই রকম অনুভবের স্পর্শ-বর্ণ-গন্ধ আমার ভেতর জন্ম দিয়েছে এক বিশাল শক্তি—এর ডালপালা হবে, শালপ্রাংশু হবে সে... ভেতরে নিবিড় এক মায়ার জন্ম দিয়েছে। এর জন্ম আমার কাছে আকস্মিক, অনাহুত। যেদিন টের পেয়েছি তার পরদিন থেকে ক-দিন আমাকে সেই আকস্মিকতা স্থবির করে রাখবে এটাই স্বাভাবিক। সেই আকস্মিক পীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য স্বাভাবিক ছিল সেই অঙ্কুর সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গ থেকে আকস্মিকভাবে ঝেড়ে ফেলা। কিন্তু তখন আমার মনে তৈরি হচ্ছিল সামাজিকভাবে নিজেকে খাড়া করার প্রক্রিয়া এবং এর সামাজিক স্বীকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল রেজাউল। ফলে আমার পায়ের তল থেকে সঙ্গে মাটি সরে যায়নি। কিন্তু রেজাউলের জন্য অপেক্ষার সময়টাতে আমি তার আগমনের আকস্মিকতা কাটিয়ে উঠেছি। তারপর পেরিয়ে গেছে আন্দোলিত অনেক পল-অনুপল। মুহূর্ত ও মাস। এখন আর আমি তাকে অঙ্কুর বলতে পারি না। ক্রমশ টের পাচ্ছি এখন একটা পরম আকৃতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে সে, আমি তাকে হত্যা করব যে কারণে, সেই বিস্ময়ের আশঙ্কা তো থিতিয়ে এসেছে। ধরা যাক, এক ভিখিরি মেয়ে কারো সেরা গয়নাটি চুরি করে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ল, শেষে জানা গেল, সে এর আগে তিনদিন অনাহারে ছিল, চুরি করা জিনিসটার মুল্য জানে না, চুরি করেছে বিক্রি করে ভাত খাবে বলে। যার গয়না চুরি হয়েছে, সে তখন অন্য জেলায় অবস্থিত স্বামীর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। তারপর মেয়েটাকে সাতদিন আটকে রাখার পর তার স্বামী এসে তাকে চুরির ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রবল পিটুনির সিদ্ধান্ত নিল। যার চুরি গেছে সে কি সাতদিন আগের ক্রোধ নিয়ে মেয়েটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে? আমার স্বকীয়তা আমাকে কোন পথে টেনে নিতে চাইছে?

তাছাড়া আমার রক্তের মধ্যে যার উদ্ভাসন, সে তো চোর হয়ে নিভৃতে অনধিকার প্রবেশ করেনি। আমিই তার আসার পথ করে দিয়েছি। হা আল্লাহ! কী বিচিত্র কায়দায় চারপাশের পৃথিবী দুলছে। আস্ত মেঝে গন্ধে ডুবিয়ে বমি... বমি। পাশের ঘর থেকে দৌড়ে আসে শানু। তার বিস্মিত চোখ আমাকে চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরে। তার শরীর জড়িয়ে ধরে দাঁড়াই। হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় চলে আসি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পরদিন ধূসর সন্ধ্যার পথ ধরে সত্যজিতের বেকারিতে যাই। ভেতরে রঞ্জু সালাহদিনদের তুমুল আড্ডা চলছে। আমাকে দেখে সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে তারা, 'শালার দোস্ত তুমি!' অনেকদিন পর ওদের বন্ধু শাহতাবকে দেখি, তার ফর্মাল প্রশ্ন, 'কেমন থাকা হচ্ছে?' বড়ো আন্তরিক আহ্বান। আমিও মিলিত হই। সত্যজিৎ ভেতরে ভেঙেচুরে এরই মধ্যে অনেক বড়ো করেছে তার বেকারি। জায়গা হয়েছে প্রচুর। বেশ ভালোই যাচ্ছে ব্যাবসা, বোঝা গেল। টুল টেনে বসে যাই।

আড্ডায় বিশ্বজগৎ চষে ফেলা হয়। গর্বাচেভের মহান উত্থান, আজকাল নোবেল পুরস্কারেও কারচুপি, ম্যারাডোনার ক্রন্দনময় বিদায়, যা দেখাচ্ছে ম্যাডোনা, জুহি চাওলা কম কীসে? যা বলেছিস, রবীন্দ্র সঙ্গীতে চমৎকার ডাইমেনশান এসেছে, শিবিরের হাতে একুশ ঘন্টা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জিম্মি সরকার-বিরোধী আন্দোলনটা বুঝি থিতিয়েই গেল, খামোখা এখন লাগাতার হরতালের ঝিমন্ত তাল তুলে দেশের অর্থনীতিকে আরও পঙ্গু করার চেষ্টা।

এই সব করে করে এক সময় প্রসঙ্গ ইরাক অভিমুখে যাত্রা করে, সত্যজিৎ চিৎকার করে ওঠে, 'ইরাকের সমস্ত রাসায়নিক ম্যাটেরিয়াল বুশ ধ্বংস করে ফেলছে। যা একটা অবস্থা চলছে না!'

'তা বেশ করছে', শাহতাব বলে, 'তুমি কেন বাপু পরের দেশ দখল করার অনাচারে লিপ্ত হও? লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে ফেলার কোনোই অধিকার সাদ্দামের নেই। এখন অবস্থাটা বোঝ, উপসাগরে ষাট মাইল ব্যাপী তেলের ট্যাংকে আগুন জ্বলছে।'

'আমাদের সরকারও তো লোক পাঠিয়েছে', সত্যজিৎ বলে, 'ওদের অবস্থা কী?'

'ওরা আর ক-জন!' শাহতাব বলে, 'বাংলাদেশি যারা ওখানে আটকা পড়েছে ওদের অবস্থাটা চিন্তা করো? অনাহার, অনিদ্রা... আমার এক খালাতো ভাই কুয়েতে আছে। আধপাগল খালাকে এয়ারপোর্ট থেকে আনাই যাচ্ছে না। সে এয়ারপোর্টকেই ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছে। এরকম অসংখ্য লোক... যা-ই বলিস, সাদ্দাম কাজটা অন্যায় করেছে।' কিন্তু সালাহদিন এই যুক্তি মানতে রাজি না, 'তোমরা তো মার্কিনের পা-চাটা কুত্তা। তোমরা কী করে বুঝবে, এটা সাদ্দামের অনাচার নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ব্যাটার বুকের জোর আছে, সৌদি ভূখণ্ডেও অভিযান চালিয়ে দখল করেছে কয়েকটা ফাঁড়ি। এখন যুক্তরাষ্ট্রকে একটা ঠ্যালা দিলেই হয়। সত্যজিৎ আগের মতোই চিৎকার করে ওঠে, 'ট্যাংরা হয়ে বোয়ালের পেছনে লাগতে আসো? মার্কিনের স্বেচ্ছাচারী অন্যায়ের প্রতিবাদ ইরাক আরেকটা অন্যায় দিয়ে করবে? তোরা এটাকে সাপোর্ট করবি?' ফলে তুমুল হট্টগোল, তর্ক, গলাভাঙা চিৎকার। সেই চিৎকারের কঠিন প্রাচীর ভেদ করে কোনো সুযোগ হয় না আমার ন্যূনতম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার। ঝিম ধরে বসে থাকি। এবং নিজের মধ্যে ধ্যানস্থ হই। হিড় হিড় করে টেনে আমার ঘাতক বাবা আমাদের শুইয়ে দিচ্ছেন গোরস্থানে। পরক্ষণেই চোখ ছাপিয়ে অন্য দৃশ্য, আমরা প্রাণভরে ভাত খাচ্ছি, তাই দেখে বাবার চোখে আবেগে জল এসে যাচ্ছে। সেই ছবিও মুছে যায়। এবার দেখি বাবা বিছানায় শুয়ে। তারপর সেই কটাক্ষরত রমণীরা। আমি উন্নত পেটে দাঁড়িয়েছি তাদের সামনে।

ব্যভিচারিণী, পিশাচিনী, ছিঃ! ওরা দলা দলা থুতু ছুঁড়ে দেয়। এরপর রেজাউল... মহিমের চির প্রেমে নিমজ্জিত আমি কি তাকে ঠকাইনি? কেবল অস্তিত্ব-সংকটের দায়ে তাকে বিয়ে করেছিলাম। ভালোবাসা ছিল না, সংসার পেতেছি। তার ওপর প্রতিনিয়ত আরওপ করেছি মহিমকে, এই অপরাধ কি রেজাউলের বালক-প্রীতির চেয়ে কম কিছু?

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

আর এখন? এখন মহিম, রেজাউল—সবাই এক বিশাল ছায়াময় শক্তির গহ্বরে অপসৃয়মাণ। আর এই যে আমি গর্ভে একজনের ভার নিয়ে তাঁর তলায় নিজেকে লোটাতে চাইছি, সেটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? নিজেকে নিয়ে আমি কোথায় দাঁড়াব? সবকিছু মিথ্যে করে দিয়ে এই বয়সে মার সেই প্রেমিক কেন এখন আমার কাছে মহান সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে? কেন আমি একা চলতে পারি না? জীবনের এই জটজটিলতা আমাকে আর কোন অতলে নিয়ে ডোবাবে?

সারসার বিস্কুটের বয়াম, সেভেনআপ, পেপসি, মিরিন্ডা, চকোলেট, নারকেলের তক্তি, প্লাস্টিকের ফুল, হরলিকস, কেক, পেস্ট্রি, পুতুল, হটপ্যাটিস—একই ঘরে একসঙ্গে বিচিত্র গানের সমাহার যেন, ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি... এবং হট্টগোল, হরেক স্বাদের গন্ধ। কেমন ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে যাই। একসময় সালাহদিনের সহজতাই স্বস্তিকর লাগে, যুদ্ধপ্রসঙ্গ পালটে আমার দিকে ফিরে বলে, 'কবিতা লেখা শুরু করেছি। শুনবে?' সত্যজিৎ চেঁচিয়ে ওঠে, 'মেয়ে দেখলেই শালার কাব্য চাগিয়ে ওঠে। মেয়েদের মন গলানোর কী সহজ পথ!'

সালাহদিন কেমন থিতিয়ে যায়, 'তুই কিন্তু নীনাকে স্রেফ একটা মেয়েই বানিয়ে ফেললি। অথচ কতবার আড্ডার সময় তোরাই তাকে সহবন্ধু হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিস।'

এবার রঞ্জু চ্যাঁচায়, 'ওতো মেয়েই। তুই কি বলতে চাইছিস ও পুরুষ? এক সাথে এক ঘরে থেকেই দেখ না, কার পেটে বাচ্চা আসে!'

অসহ্য! আমি সেই ভয়াবহতা থেকে ছিটকে বেরোই। এই কি এদের চিন্তার উচ্চতা? চারপাশ ছায়া করে দূরে একটা আলোকোজ্জ্বল জানালা জেগে থাকে। যত এগোই, ততই ছায়া। মাথায় সার-সার পাথর, স্নায়ু-শিরশির-করা জলের শব্দ এবং শ্বাস-রুদ্ধ করা কীসের যেন মরাটে গন্ধ! হাঁসফাঁস করে এইসব থেকে নিজেকে ছাড়াই। এবং হঠাৎ-উড়ে-আসা বাতাসের প্রবল একটা ঝাপট আমাকে কবজা করে রাস্তায় হেঁচড়ে নিয়ে ফেলে।

বাইরে আলোকিত ফুটপাত। লম্বা করে নিশ্বাস টানি। শীতের বিশুদ্ধ বাতাস। কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডানা-ঝটপট কাক। বিস্তৃত সড়ক ধরে যন্ত্রদানব দৌড়ুচ্ছে। কার্ডিগান ফুঁড়ে-ঢোকা বাতাস বিবশ রোমকূপকে জাগিয়ে তুলে কেবলই সুড়সুড়ি দেয়।

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সত্যজিৎ। সোডিয়াম বাতির আলোতে তামাটে মানুষ। পাশাপাশি হাঁটি। সত্যজিৎ বলে, 'তোকে আমরা অতটা সেনসেটিভ মনে করি না, রঞ্জুর ইয়ার্কিটা'—।

'প্লিজ, ও প্রসঙ্গ থাক।' আমি থামিয়ে দিই। তারপর নিঃশব্দ পথ চলা। ও আসায় আমার অস্থিরতা অনেক কমে গেছে। নিজেকে আমি ততক্ষণে সামলে নিয়েছি। একসময় গল্পচ্ছলেই বলি, 'সত্যজিৎ তোর কাছ থেকে কারও বিশেষ একটা ব্যাপারে সমাধান চাইব। কিন্তু তুই বেশি প্রশ্ন করবি না, এই শর্তে।'

সত্যজিৎ কিছু বলে না। হাঁটছে নিঃশব্দে।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলি, 'ধর অবিবাহিত একটা মেয়ে, তার পেটে হঠাৎ সন্তান এল। কিন্তু যার ভ্রূণ, সে তখন দূরে, মেয়েটা তখন কী করবে?'

'দূরে মানে?' সত্যজিতের প্রশ্ন, 'প্রতারণা করে পালিয়েছে?'

'ধর, সহজ অর্থে তা-ই।'

'বাচ্চাটা কত মাসের?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘ধর, আড়াই।’

‘তা হলে অপারেশন করিয়ে ফেলবে’, সত্যজিতের সহজ উত্তর। ‘বিংশ শতাব্দীর মেয়ে হয়ে রামগাধার মতো প্রশ্ন করো।’

শীত লাগছে। তামাটে ফুটপাতের অলস পথ ধরে আমরা এগোই। চারপাশে হলুদাভ কুয়াশার ধোঁয়াটে আস্তরণ। কোত্থেকে হু হু বাতাস আসে।

‘সেই মেয়েটি কি তুই?’

‘তুই কিন্তু প্রশ্ন করছিস!’

‘আমি কোনো শর্তে যাইনি।’

‘আমি কি অবিবাহিতা?’

‘অন্যের কাসুন্দি ঘাঁটছিস? সে যে-ই হোক, এখানে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ, এটাই আমার একমাত্র সমাধান।’

কথা আর ডালপালা খুঁজে পায় না। মনে নিশ্চিতই সন্দেহ নিয়ে চলে যায় সত্যজিৎ। বুঝতে পারি চলে যাবার ভঙ্গি থেকে।

আমার সামনে শীতের সুদিঘল রাত। এবং মৃত্যুর মতো জেগে থাকার কষ্ট। বুক ধড়ফড় করে। চারপাশে মাছের আঁশটে পচা গন্ধ। কখনো বদ্ধ জলাশয়ের মতো অচৈতন্য পড়ে থাকি। কখনো বিশাল একটা ছায়া আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। দীর্ঘ মোমবাতি জ্বেলে আমাকে বাইবেল থেকে কবিতা পাঠ করে শোনায়। আমি নতজানু হই। এইভাবে আমার বিষাদ-ছাওয়া রাতগুলো পেরোতে থাকে।

পরদিন ক্ষয়িষ্ণু গলি ধরে, নর্দমার দুঃসহ দুর্গন্ধের অত্যাচার কোনোমতে এড়িয়ে ওমরের বাসায় যাই। তাদের বাড়িটা যেন আরও প্রাচীন, আরও ভঙ্গুর। পুরো বাড়িটা শুধু মুতের গন্ধ। ওর মার পরনের শাড়িটা ছেঁড়াঝুলো ত্যানারও অধিক। আমাকে দেখে বিব্রত মহিলাটি ভেতরে ঢুকে যায়। লুঙ্গিতে গিঁট লাগাতে লাগাতে উদোম গা ওমর বাইরের ঘরে আসে। আগাপাস্তালা চিন্তা না করেই চলে এসেছি। বেশ অস্বস্তি বোধ করি। কিন্তু আহত হই ওমরের আচরণে। আমার এই অপ্রত্যাশিত আগমনের খবর যেন সে জানত, এমন ভঙ্গিতে হাসতে থাকে, ‘এসেছেন তাহলে!’

‘আমার কি আসার কথা ছিল?’

‘কোনোদিন আসবেন না, তাই ভেবেছিলাম।’

‘আপনি একটু শার্ট প্যান্ট পরে আসুন তো, বাইরে বেরোব।’ চৌকির পায়াগুলো এমন নড়বড়ে যে, ভারী শরীরের কেউ বসলে নির্ঘাত পড়ে গিয়ে হাড়হাড্ডি চুরচুর হয়ে যাবে। কিন্তু তার ছোটো ভাইটি কোথায়? পাঁশুটে পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে তার বোন। ওমর কিছু না বলে ভেতরে যায়। এই ফাঁকে আমি তার বোনটাকে ডাকি। ক্ষীণকায়, দেখে মনে হয়, লোলচর্মসার বৃদ্ধা। এ ঘরে কোনোদিনই বাতাস কিংবা এক চিলতে আলো ঢুকেছে বলে মনে হয় না। মেয়েটার চোখজোড়া কী চরম নির্বিকার! এবার আমার চোখ গিয়ে ঠেকে ওদের ঘরের বাঁশের সিলিংয়ের পুরোটা জুড়ে লম্বা হয়ে ঝুলে থাকা ঝুলকালিতে। একটা মরা তেলাপোকা হল্লা করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একঝাঁক লাল পিঁপড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ভীত-সন্ত্রস্ত মেয়েটি এগিয়ে আসে। দু-চোখে এমন সরলতা, স্পষ্ট মনে হয়, একজন কামুক কিশোরও যদি তাকে শোবার কথা বলে, তার না করার ক্ষমতা থাকবে না।

'আপনার ছোটোভাইটা কোথায়?' প্রশ্ন করি।

'ওকে আমার এক কাকা পাবনা নিয়ে গেছে' বলে মেয়েটি অস্বস্তির সাথে তার খাটো ওড়না ধরে টানতে থাকে। কী বিপত্তি, একদিকে জোরে টান দিলে, অন্যদিক উদোম হয়ে যায়।

পাবনায় কাউকে নিয়ে যাবার মতো এদের তাহলে একজন কাকাও আছে। কিন্তু এত গন্ধ, এ-বাড়িতে টেকাই মুশকিল। ওমর এলে বেরিয়ে পড়ি।

বাইরে বেরিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করি, 'আপনার বোনকে কে অ্যাবরশন করিয়েছে?'

'আমার মা।'

'আপনিও তাই চাইছিলেন?'

'দেখুন, ছেলেটার কোনো পাত্তা ছিল না। এছাড়া আর কী করার ছিল?'

শুক্রবারের উদ্ভাসিত সকাল। রোদ-ভাজা শহরের ওপর দপদপ পা ফেলে হাঁটি এবং নির্জনে কোথাও গিয়ে বসে বলার চাইতে, কী হয়, চারপাশের এই ঘিঞ্জি ভিড়ভাট্টার ভেতরেই আমি বলে ফেলি আমার সেই মর্মান্তিক-গোপন কথাটা—'শুনুন, আমার গর্ভে একটা সন্তান এসেছে।' ওমর চকিতে আমার মুখের দিকে প্রখর চোখে তাকায়। আমি বলে চলি, 'মাস দুয়েক আগে স্বামীর সাথে... বুঝতেই পারছেন... আর তা থেকেই... কিন্তু এখন আমি কী করব, কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না।'

ওমরের মুখে ছায়া পড়ে। শীতের খরসান রোদে মুহ্যমান বিশাল রাজধানী। এবং চারদিকে বিচিত্র সব শব্দতরঙ্গ। মাথা নিচু করে আমরা পাশের একটা ছোটো চায়ের স্টলে ঢুকে যাই। কোনার একটা মামুলি টেবিলের দু-পাশে দুজন বসি। ব্যাগ রেখে তার দিকে তাকাই।

'আপনি কি স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চাইছেন না?'

'আমার সেরকমই ইচ্ছে।'

মাঝখানে কালো টেবিল। এবং চারপাশে চটুল আড্ডা। শীতের মৃদু আমেজে চায়ের উষ্ণ ঘ্রাণ। এবং পিরিচকাপের তাল-কাটা টুংটাং। ওমর বলে, 'কী বলব বলুন, তবে আমার একটাই পরামর্শ, আপনি বিয়ে করে ফেলুন। আমাদের সমাজ বড়ো ভয়াবহ। নইলে আপনাকে চরম খেসারত দিতে হবে।'

'বাচ্চাটাকে নষ্ট করে ফেলার পরামর্শ দিচ্ছেন না কেন?'

'বড়ো নাজুক প্রসঙ্গ', ওমর বলে, 'এসব আমি বিশেষ বুঝি না। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি কেমন, সেটা বলে বোঝাতে পারব না। আপনার অনাগত সন্তানের প্রতিও আমার মমতা... না, না আমি তার মৃত্যুর কথা ভাবতে পারি না। এ সন্তানের বাবা হওয়াটাও ভাগ্যের ব্যাপার।'

'কিন্তু প্রথম প্রশ্ন হল, জেনে-শুনে এই দায়িত্ব নিতে যাবে কে?' আমি বলি, 'তারপর যে দায়িত্ব নেবে সে-তো তার পিতা হবে না, সুতরাং ভাগ্যবান হওয়ার প্রশ্ন সেক্ষেত্রে কি আর আসছে?'

ডালপুরি, চা এসে যায়। আহ্, ধোঁয়া, পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। ওমরকে আজই প্রথম খুব স্থির মনে হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘জেনেশুনে কেউ দায়িত্ব না নিলে, না জেনে নেবে’, ওমর সহজ স্বরে বলে, ‘আপনি নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে প্রতারণার প্রশ্ন তুলবেন? আমি এসব বিশেষ বুঝি না। সম্ভবত একটা বস্তির মতো জঘন্য পরিবেশে বেড়ে উঠেছি বলে আমার পাপপুণ্য, প্রতারণা—এসব ব্যাপারে মগজ খুব ভোঁতা। আমি জটিলতা না করে কোনো বড়ো কাজ, সেটা যদি সামাজিকভাবে চিহ্নিত পাপের ভেতর দিয়েও হাসিল করতে হয়, তাতে কোনো অন্যায় দেখি না। আর জন্ম যে-কেউ দিতে পারে, কুকুর-বেড়ালও দেয়, প্রতিপালনই পিতার আসল কাজ, সাদা মাথায় আমি এইটেই বুঝি। তাছাড়া পাপ যে ঠিক কোনটা এতদিনেও আমি সেটা বুঝতে পারিনি।’ ওমর এরপর হেসে ফেলে, ‘আপনাকে একটা গল্প বলি। গল্পটা বিখ্যাত কারও লেখা হবে। আপনি হয়তো তার নাম জানবেন। আমার অতসব মনে থাকে না। অবশ্য আমাদের এখনকার প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সঙ্গে গল্পটার মূল থিমের কোনো সাদৃশ্য নেই। গল্পটা মনে ভীষণ দাগ কেটেছিল বলেই বলছি—এক প্রেমিকা তার প্রেমিককে বলল, ‘‘তুমি যে আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসো, তার প্রমাণ কী? তুমি যদি আমাকে সাতদিনের মধ্যে একটি লাল গোলাপ এনে দিতে পারো, তবেই আমি বুঝব তোমার ভালোবাসা নিখাদ, শ্রেষ্ঠতম।’’ তো প্রেমিক ছুটল লাল গোলাপের খোঁজে। সেই মরশুমে সে দেশে একদমই লাল গোলাপ ফুটত না। একদিন, দু-দিন, তিনদিন প্রেমিক পাগলের মতো সমস্ত শহর চষে বেড়াল। নিদ্রাহীন উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় সাতদিনের মাথায় সে একটা গাছের নীচে বসে কাঁদতে লাগল। তখন সেই গাছের মাথায় বসে গান গাইছিল একটা নাইটিঙ্গেল পাখি। প্রেমিকের কান্না দেখে তার বুক ফেটে গেল। সে গোলাপ গাছকে করুণ মিনতি জানাল, ‘‘তুমি কি একজন প্রেমিকের অসহায় কান্না শুনতে পাচ্ছ না? তার জন্য অন্তত একটি ফুলের জন্ম দাও।’’ গোলাপ গাছ বলল, ‘‘ফুলের জন্ম না হয় দিলাম কিন্তু লাল রঙ আমি কোথায় পাব?’’ ‘সে লাল রঙ আমি দেব’, বলল নাইটিঙ্গেল পাখি।

‘নাইটিঙ্গেল পাখি গোলাপ গাছের কাঁটায় বিঁধিয়ে দিল নিজের বুক। ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত সেই কাঁটার বুক বেয়ে গোলাপ গাছে সঞ্চারিত হতে লাগল। নাইটিঙ্গেলের শরীরের রক্তে রক্তে ভোর রাতে ফুটে উঠল টকটকে লাল গোলাপ। খুব সকালে নাইটিঙ্গেল মারা গেল।

প্রেমিকা বলল, ‘‘এটা একটা গোলাপ হল?’’ গল্পটা শেষ করেই ওমর হা-হা হাসতে থাকে। আপনার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে, ‘পৃথিবীতে তবে ভালোবাসা বলে কিছু নেই? প্রথম কিন্তু আমারও তা-ই মনে হয়েছিল।’

এমন গল্প বলে কেউ হাসে? অথচ আমার কেমন কান্না পাচ্ছে। আমি আমার সর্বস্ব নিয়ে যদি সেই স্থির মানুষের সামনে নতজানু হই? যদি বলি, এই যে আমার বেদনা, গ্লানি, আনন্দ। তুলে নিন আমাকে। যদি তিনি আমার মার মতো আমাকেও ছুঁড়ে দেন নর্দমায়, আর বলেন, এটা একটা নীনা হল?

ওমর বিড়ি ধরায়, এবং চিৎকার করে, ‘বিড়ি কেন খাই? পয়লা নম্বর তৃপ্তি পাই।’ কী-যে হিজিবিজি খান, অন্তত একটা ব্রান্ডে স্থির হন... ওমর, ভালোবাসা তবে এই? তেহারির ঘ্রাণ।’ চা এবং বিড়ির ধোঁয়া আমাদের চারপাশে কুয়াশা তৈরি করে। ওমর আবারও হাসে, ‘আপনি সেই প্রেমিকার তাচ্ছিল্যই দেখলেন? ভালোবাসা যদি এ-ই হবে, তবে নাইটিঙ্গেল পাখি রক্ত দিল কেন?’

আমি তার হাত চেপে ধরি, ‘এরকম ব্যাখ্যা আমাকে শোনাচ্ছেন কেন?’ ওমর কেমন থিতিয়ে যায়, ‘আমি মূর্খ গবেট মানুষ, আমার আবার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ! সেই পাখির রক্তপাতের কাছে কত তুচ্ছ আপনার এসব জটিলতা। চোখ মেলুন নীনা, দেখুন, বুঝতে চেষ্টা করুন নিজেকেও। আপনারা আলোর মধ্যে বড়ো হয়েছেন। নিজেকে চিন্তা-চেতনায় বড়ো করে তুলতে পেরেছেন। আমি গু-মুতের মধ্যে বেড়ে-ওঠা মানুষ। আমি আপনাকে কী বলব? তবে এটুকু বলতে পারি, যা আগেই বলেছি, যদি একান্তই নিজের সঙ্গে না পারেন, তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কাউকে বিয়ে করে ফেলুন। নয়তো ফিরে যান স্বামীর কাছে। এখন বুঝছেন না, কিছুদিনের মধ্যেই চড়া দাম দিয়ে আপনাকে বুঝতে হবে আপনার স্বাধীনতা কত বিপন্ন। আমার উদ্বেগ তখন চরমে। কোনোমতে বলি, 'আমাকে জীবন যে কোনো এক ধারে নিয়ে ফেলুক, তবুও তার কাছে আর ফেরা যায় না।'

ওমর কেমন কেঁপে ওঠে, 'তবে অন্য কাউকে, আপনার যাকে ইচ্ছে হয়!'

চায়ে চুমুক দিচ্ছে ওমর। ধোঁয়াটে আলোর আস্তরণ ভেদ করে তার দিকে চেয়ে থাকি। এমন খেলাচ্ছলে সে কি নিজেই জানে সে কী বলছে?

আমার চারপাশে আশ্চর্য নরম ঢেউ। সে ঢেউ ছাপিয়ে টি স্টলে হট্টগোল। উষ্ণ কাপে ঠোঁট চেপে ধরি। বুকের মধ্যে বিচিত্র তোলপাড়। উসকো জঙ্গুলে চুলের ওমর মুহূর্তেই সব ঝেড়েঝুড়ে ফেলে নিজের স্বকীয়তায় ফিরে আসে, 'কী সব ভারী ভারী কথা হল। মাথা থেকে ফেড়ে ফেলুনতো সব। চলুন, আজকে একটু ঘুরে বেড়াই। টিউশানি অবশ্য আছে একটা, গোল্লায় যাক। ব্যাগে টাকা আছে তো?'

তলানি শুষে কাপটা রেখে দিই। বুক জুড়ে পুঞ্জীভূত সাদা। আমি তেমনই ধোঁয়াটে চোখে ওমরের মুখোমুখি, 'কিন্তু হুট করে বিয়েটা করব কাকে? গলির মোড়ে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে?'

কেমন নিভে আসে ওমর। বিহ্বল চোখে আমার দিকে তাকায়। এবং স্বভাব বিরুদ্ধ সংযত স্বরে বলে, 'দয়া করে এরকম কোনো প্রশ্ন আমাকে করবেন না। আমি আমার স্পর্ধার সীমা লঙ্ঘন করতে চাই না। সেটা আমার জন্যে বেশি চাওয়া হবে।'

কী করব আমি? ঘরে ফিরে অসহ্য যন্ত্রণায় তড়পাতে থাকি। আমি কি জানি না যে-সংকটে আমি পড়েছি, তার পরিণতি কী? চারদিক থেকে একটা লম্বা সাঁড়াশি আমার গলা চেপে ধরবে, শ্বাস রুদ্ধ করতে চাইবে। আমার অস্তিত্বকে ছিঁড়েখুড়ে শূন্যে দাঁড় করাবে, ওখান থেকে আমি কোন পথ ধরে নেমে আসব? আকৃতিতে রূপান্তরিত হতে থাকা শিশুটিকে খুন করব? কিন্তু পেটের ওপর হাত রাখার পর কী বিচিত্র মায়া, নরম ঢেউ আমাকে গভীর মোহাবিষ্ট করে রাখে।

আমি আসলে কী চাইছি? আমার সমস্ত অস্তিত্ব কোথায় গিয়ে লুটিয়ে পড়তে চাইছে? আমি কি জানি না ওমরের ইচ্ছে? ওই নর্দমায় বেড়ে ওঠা ওমর কোথায় কতটা বড়ো হয়ে উঠেছে তা কি আমি টের পাচ্ছি না? কিন্তু এতদিন ধরে আমার স্বপ্নের বিস্তারের মধ্যে যে বিশাল হয়ে উঠেছে, সমস্ত অস্তিত্ব আজ তার ছায়ায় দাঁড়াতে চাইছে, ঠিক এই জায়গায় এসে বুঝছি সেই মানুষ ছাড়া আমার সামনে আর কোনো সত্য নেই। কিন্তু এই অবস্থায় তার সামনে দাঁড়ালে তিনি কী বলবেন? উত্তেজনায়, উৎকণ্ঠায় নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। গলা দিয়ে পাকিয়ে উঠছে বমির বেগ। শিরা শিথিল করে সমস্ত শরীর কাঁপছে। চারপাশে বড়ো মায়াবী, প্রকৃতি আঁকড়ে-ধরা রোদ। ওমরের সাথে ঘুরতে ইচ্ছে হয়নি। আজকাল কোথাও স্থির হতে পারছি না। মুখ চেপে উবু হয়ে বিছানায় বসে থাকি। এর মধ্যে শানু এসে আমাকে আরও অতলে নিক্ষেপ করে বলে, 'সামনের মাসটায় শুধু আমরা এ বাড়িতে থাকব, তার পরের মাসে অন্য কোথাও চলে যাব।'

ঝাপসা চোখে তার দিকে তাকাই।

তার মুখে আনন্দ, 'এর চাইতে বেশি ভাড়ার আরও ভালো বাসায় যাচ্ছি। তোমার কামালভাইয়ের ব্যাবসা ভালোর দিকে। ইচ্ছে করলে তুমিও আমাদের সাথে থাকতে পারো। এতে অবশ্য তোমার খরচ কিছুটা বাড়বে।' 'ওয়াক'—বমি ঢেলে দিই মেঝেতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

আমাকে দ্রুত চেপে ধরে শানু, 'ক-দিন ধরে আমার সন্দেহ হচ্ছে। তোমার কী হয়েছে, সত্যি করে বলোতো নীনা?'

ভেতর থেকে কী যেন ধাক্কা দিচ্ছে। আবারও তেতো জল গলা উপচে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চারপাশ আঁধার হয়ে আসছে। বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। সব ফাঁপা, শূন্য। শানু ক্রমাগত ঝাঁকুনি দেয়, 'নীনা চেপে রেখ না। আমাকে পর ভেব না, বলো কী হয়েছে?'

'কিছু না।' বলে নিস্তেজ পড়ে থাকি বিছানায়।

দু-দিন ধরে টিউশনিতে যাচ্ছি না। কোনোরকমে অফিসটা সারছি। টিউশানি থেকে পাঁচশো টাকা রেজাউল নিয়ে নেওয়ায় এ-মাসে আমার হাত রীতিমতো শূন্য। তারপরও শান্তি একটাই, অফিসের অবস্থা শান্ত। আগামী মাস থেকে আমার কিছু বেতন বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বস আমাকে তেমনই আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু এসব আনন্দ উপভোগ করার মতো মন আমার নেই। মগজের কোষে কোষে নীলমাছির হল্লা। কী শিথিল নিভন্ত দিন! এক বন্ধের দিন বিকেলে, টিউশানি করতে বেরিয়ে পড়ি। চারপাশে তখনও উজ্জ্বল রোদ। সেই আলোর পথ আমাকে এনে দাঁড় করায় একটা বিশাল গেটের সামনে। সেদিন সিনথিকে দেখেছি ঝিমুচ্ছে। আমার সন্দেহ হয়, সম্ভবত সে ড্রাগে আসক্ত হয়ে পড়ছে। এ বাসায় এলে আমার আরেক যন্ত্রণা। লাগামহীন একটা ঘোড়ার পেছনে অনর্থক ছুটে চলা।

লন অতিক্রম করব, হিঃ হিঃ হাসি শুনে বাঁয়ে মুখ ঘোরাই। বিশাল লনের ওপর সাদা কুকুরটার সাথে খেলছে সিনথি।

দাঁড়িয়ে যাই। চারপাশে উঁচু পাঁচিল। কেয়ারি করা বাগানের মাঝখানে অদ্ভুত দৃশ্য। এই মেয়ে কোনো পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হতে পারে? উজ্জ্বল রোদ পড়েছে তার মুখের ওপর। এই যে অপাপ ফর্সা মুখের অপরূপ কিশোরী, প্রাণখোলা হাসির তোড়ে ভেসে তার সাদা ঝাঁকড়া কুকুরটার সাথে খেলায় মেতেছে, এর চেয়ে সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও আছে?

মুগ্ধ চোখে দাঁড়িয়ে থাকি। সিনথি বল ছুঁড়ে দিচ্ছে, আর তার ঠোঁটের ঘায়ে সেটা ফিরিয়ে দিচ্ছে কুকুরটা এবং সেই বল লুফে নেওয়ার সময় ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ছে সিনথি। তার ঘর্মাক্ত মুখে ছড়িয়ে পড়ছে তার খাটো করে চুল ছাঁটা। ফের সে বলটি দূরে ছুঁড়ে দিল, দৌড়ে চলেছে কুকুরটা। জায়গা মতো গিয়ে মুখে বল নিয়ে ফের ছুটে আসছে। অকারণেই সিনথি হিঃ হিঃ হেসে গড়িয়ে পড়ছে।

এবার সিনথি শার্টের পকেটে বল পুরে কুকুরটাকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেয়। আমি ধীরে সবুজ ঘাসের কার্পেট মাড়িয়ে এগিয়ে যাই। কিন্তু সেদিকে মেয়েটির ভ্রূক্ষেপ নেই। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুকুরটির ওপর। তারপর তাকে চেপে ধরে উচ্চগ্রামে হাসতে থাকে। সেই বিশাল খোলা প্রান্তর জুড়ে সিনথির অবিশ্রান্ত হিঃ হিঃ শব্দ ধ্বনিত হতে থাকে।

কিন্তু একী! সিনথির মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠছে কেন? কুকুরটাকে নিজের গা-ঘেঁষে শুইয়ে দিয়ে সিনথি তার ফর্সা আঙুল অস্থির চালিয়ে যাচ্ছে নিজের সর্বাঙ্গ জুড়ে। কী অদ্ভুত জড়াজড়ি। সিনথির চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। তার হাসির মধ্যে বিচিত্র মাদকতা। কুকুরটাকে উলটেপালটে উদ্ভ্রান্তের মতো চুমু খাচ্ছে, কখনও প্রচণ্ড শক্তিকে নিজের প্রায়-উন্মুক্ত বুকের ওপরে চেপে ধরছে।

মুহূর্তে পৃথিবীটা টলে ওঠে। আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছি না। বিকৃত গলায় প্রায় চিৎকার করে উঠি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘সিনথি!’ কিন্তু তার কানে আমার সেই ডাক পৌঁছোয় না। ঘৃণায়, বিবমিষায় আমার মাথা ধরে যায়।

ছুটতে ছুটতে সেই রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসি।

পরদিন অফিসে গেলে উদ্ভাসিত সুলতানা এগিয়ে আসে, ‘তোমার প্রমোশন হচ্ছে শুনলাম?’

‘আরে না, বস সামান্য বেতন বাড়াবার ইঙ্গিত দিয়েছেন মাত্র, এখনো কনফার্ম কিছু নয়।’

‘সে-তো সবারই বাড়ছে’, সুলতানা বলে। ‘আমাদের হাজারটা দাবির ফুটোফাটা এক আঙুলের চাপে বন্ধ করে দিচ্ছে।’

সবারই বাড়ছে জানতাম না, এখন জেনে ভালোই লাগছে। এ নিয়ে তাহলে বাড়তি কোনো খোঁচা সহ্য করতে হবে না। মেহজাবিন আর বসকে যে ভুল আমি বুঝেছিলাম, এখন দেখছি সেটাও অবান্তর। সম্ভবত সে সময় তারা সত্যিই সমস্যায় পড়েছিল। যাকগে, এখন মাথায় হাজার সংকট। শানু চলে যাচ্ছে। আপাতত বিশাল আবাসিক সমস্যা আমার সামনে। গতরাতে তাকে সব বলে দিয়েছি। সে ইচ্ছেমতো আমাকে গালিগালাজ করেছে, আতঙ্কিত, ভীত হয়েছে। শেষে নিজের একটি সন্তান হচ্ছে না বলে কান্নাকাটি করেছে। আমাকে ভীষণ পীড়াপীড়ি করেছে, বলেছে, নষ্ট করে ফেলো। আমার পাপ, ইসলামি আইনে এর ভয়াবহ শাস্তি, তীব্র সামাজিক সংকট, কোনো কিছুই তুলে ধরতে বাদ রাখেনি। আমার জন্য যেটা সবচেয়ে কষ্টকর, আমার প্রতি তার যে শ্রদ্ধা, সেটা শূন্যে নেমে এসেছে। কেমন ঘৃণার চোখে সেদিন তাকাচ্ছিল এবং উলটোপালটা বকবক করছিল!

বাড়ি থেকে এসেছে মার সংক্ষিপ্ত চিঠি। চিঠির প্রত্যেক লাইনেই তাদের প্রতি আমার উদাসীনতার আক্ষেপে ভরা। নাহ, বেতন পেয়ে কিছু না পাঠালে চলছে না। কিন্তু সংকট বেড়েছে অন্য দিকেও। সম্ভবত ঝুঁকির ভয়েই শানু তাদের সাথে নতুন বাসায় আমাদের একত্রে থাকার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে। ফাইলপত্রের মধ্যে মাথা নুয়ে আসে। হৃৎপিণ্ড কর্ষণ করে সামনে এগিয়ে আসে বিস্তৃত সবুজ লন। ফুলের মতো সেই কিশোরী। একটি নিষ্পাপ কুকুর। কী দুর্বিষহ যাতনার্ত সময় গেছে তখন! এরপর নিজের সমস্ত কীর্তি শানুকে বলে দেওয়ার পর ওর অবিশ্রান্ত ভীতিকর সংলাপ এবং রাতে বিছানায় যাওয়ার পর কুশ্রী সব ছবির পর ছবি। কুশ্রীতা কোথায় ছিল? কিশোরীর মধ্যে? কিন্তু দোষী নির্ধারিত হওয়ার মতো বয়স কোথায় তার? তবে দৃশ্যটা আমার জন্য যথেষ্ট পীড়াদায়ক ছিল। টিউশানিটা আর করব না বলে সিদ্ধান্ত নিই। এও না হয় একটা সমাধান হল। কিন্তু যতই দিন পেরোচ্ছে ততই আমার জীবন ঝুঁকিময় হয়ে উঠছে, এর কী হবে? আমি কীভাবে দাঁড়াব আমার প্রতিবেশীদের সামনে? চিন্তায় শিরা-উপশিরা সব বিষাক্ত হয়ে ওঠে। আমার কাপড়ে হাজার ফুটো, সেফটিপিন দিয়ে কত জায়গা আটকাব?

‘অফিস টাইম সকালে আধঘন্টা আগে বাড়িয়ে দিয়েছে’, শ্লেষমাখা ঠোঁটে হাসে সুলতানা। ‘এখন জাস্ট আটটায় হাজির হতে হবে, বুঝলে, এইসব হল গিয়ে চাল। ফুটোফাটা বাড়িয়ে অন্যদিকে পুষিয়ে নেবে।’ এসবের জবাবে কী বলা যায়?

গতরাতে মাকে দেওয়া ইরফান চাচার সোনালি ফটোফ্রেমটা বের করেছিলাম। আমার কম্পিত হাত ওটার পুরো অস্তিত্ব ছুঁয়ে দেখছিল। সোনায় মোড়ানো বালিকার মতো নিষ্পাপ মুখ... আমি খুঁটে খুঁটে দেখেছি সেই মুখ... সেই ছবির নারী আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, দেখে দেখে বুকে বিষ জমেছে, তা-ও তাকিয়ে থেকেছি। কিছুতেই সেই নারী আর আজকের বৃদ্ধাকে এক করতে পারিনি। রাত বেড়েছে। এবং আমার ওপর আরও গভীর ছায়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ফেলেছে সেই পুরুষ, তাঁর যৌবনকাল, তার প্রৌঢ়ত্ব, দিনের পর দিন আমাকে তাঁর স্থির করে তোলা। আসলে কি স্থির হয়েছি? স্থিরতার অন্তর্নিহিত জলে অবগাহন মানে কি আরও গভীর প্রবল স্রোতে তোলপাড় হওয়া নয়?

মাথাটা ধরে আছে সকাল থেকেই। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে দুপুর থাকতেই বেরিয়ে পড়ি। অনেকটা পথ বাসের চাপে ভাবলেশহীন দাঁড়িয়ে থাকা। তারপর রিকশার পথ। আজ ইরফান চাচার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথম দিনের মতো উত্তেজনা। কী দুর্মর সংশয় আর অস্বস্তি! আজ তর্জনীর নীচে অগ্নিকুণ্ড। আজ আমার জীবনের চরম পরীক্ষা। বলাই বাহুল্য এসব ভাবনার তোড়ে আমার ভেতরে দ্রুত কম্পন বাড়ছিল। দরজায় নক করি।

ভদ্রলোকের বাইরে কোনো কাজ নেই। বাসা ভাড়ার টাকাই তাঁর প্রধান উপার্জন, ফলে সারাদিন প্রায় বাসাতেই থাকেন। আগে নাকি তবুও সন্ধ্যার পর বাইরে যেতেন, অনেক রাত অবদি আড্ডা দিয়ে কাটাতেন, এখন তা-ও কমেছে। আমাকে দেখে তাঁর মুখে সেই চিরকালীন উদ্ভাসন, 'আরে নীনা তরফদার যে! আসুন... আসুন!'

জড়তা কাটিয়ে আমিও সহজ হই... সারাদিন কী করে যে কাটান! ক্লান্ত লাগে না?'

'বুড়ো বয়সে থির বসে কাটানোর জন্যই তো মানুষ সারা জীবন দৌড়ায়', তিনি হাসতে হাসতে বলেন। ভাবি, প্রত্যেকের নিজের বাঁচার পক্ষে ঠোঁটের ডগায় যুক্তি তৈরিই থাকে।

'খুব অসময়ে এসে গেলাম?'

'অফিসে যাওনি আজ?'

'ছুটি নিয়ে চলে এসেছি, বড্ড বাজে লাগছিল।'

'ভালোই করেছ', তিনি বলেন, 'আজকে আমারও খুব খারাপ লাগছে।' তারপর অনেকক্ষণ নিঃশব্দতা। একসময় সোফায় জাঁকিয়ে বসি। দুপুর পেরোচ্ছে, তবুও তাঁর গায়ে পুলওভার, গলায় মাফলার। মুখখানা বেশ অমসৃণ, কালো হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন করি, 'শরীর খারাপ?'

'হ্যাঁ, বেশ জ্বর বোধ হচ্ছে। তাছাড়া ছেলেটার চিঠি এসেছে বাইরে থেকে, পেটে টিউমার হয়েছে, অপারেশন হবে। সেই থেকে বেশ অস্থির লাগছে।'

এতক্ষণে আমার হুঁশ হয়। ভদ্রলোকের তো একটা ছেলেও আছে। যদিও পিতা হিসেবে এর আগে তিনি কোনোদিনই আমার সামনে উপস্থিত হননি। কী নাজুক প্রসঙ্গ! কেমন থিতিয়ে আসি। তবুও তাঁকে সান্ত্বনা দিই... এটা একটা নর্মাল অপারেশন। উন্নত বিশ্বে এসবতো রীতিমতো ডালভাত, আপনি নিজেও জানেন সেটা।'

'কিন্তু দূর থেকে সবই বেশি লাগে নীনা', তিনি বলেন, 'আমি শুধু তার জন্মই দিয়েছি। কাছে থাকেনি বলে আমি নিজেও কতদিন তার অস্তিত্বকে ভুলে থেকেছি কিন্তু যত বয়স বাড়ছে ততই এমন কিছু ব্যাপার আমাকে ভীত, চঞ্চল করে তুলেছে, যা আগে আমাকে করত না। কেন জানি মনে হয়, আমার মৃত্যু হবে একা একটা অন্ধকার ঘরে। তৃষ্ণায় গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ একফোঁটা পানি এনে দেবে না। কী হয়, ঘরে বসে বসে ছেলেটার ছবি বের করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। প্রবল একটা মায়া বুক উপচে ওঠে। এতদিন এসব কোথায় ছিল?'

উত্তরে কী বলব? আমার ভেতরটা ভেঙে আসছে। ঝিম ধরে থাকি। তারপর আচমকা উঠে দাঁড়াই, 'আজ চলি। আসলে আমার নিজেরও কোথাও ভালো লাগছে না।'

'সে কী!' তিনি এই প্রথম তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ভঙ্গিতে আমাকে বাধা দেন, 'অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এলে, এক্ষুনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

উঠবে? নীনা, এত খেয়ালি মেয়ে তুমি! নিজের অস্থিরতাকে তুমি একটু বেশিই প্রশ্রয় দাও।'

'প্লিজ, আমি অন্যদিন আসব', দরজার কাছে যাই। 'আপনি অন্যভাবে নেবেন না। আমার ভালো লাগছে না।'

'আমি কারও স্বতঃস্ফূর্ততার বিরুদ্ধে যাব না', তিনি বলেন, 'তবে তোমার আচরণে বেশ আহত হলাম, এবং একথা অকপটে বলতে আমার সংকোচ হচ্ছে না।' তার কথায় কী হয়, দরজা থেকে ঘুরে এসে সোফায় মুখ ঢেকে বসে থাকি। তিনি অদ্ভুত স্নেহে আমার মাথায় হাত রাখেন, 'তুমি সম্ভবত কিছু বলতে এসেছিলে, বলে সহজ হয়ে যাও। কেন সব সময় আশা করো, তুমি যে পরিবেশের কল্পনা করো, সেখানে ঠিক তাই পাবে? কিছু ব্যাপার নিজের মতো করে তৈরি করে নিতে হয়।'

'আমি আসলে অদ্ভুত একটা সংকটের মধ্যে পড়েছি', প্রায় ফিসফিস করে বলি। আসলে কথাটা কীভাবে যে বলব, বিক্ষিপ্ত বিহ্বল চোখে তাঁর দিকে তাকাই। তিনি শ্রোতা হিসেবে প্রতিদিনের মতোই নির্জন। নিজের আসনে গিয়ে বসেছেন। সোফার পাশে বসে নরম আঙুলে ফুলদানিতে রাখা প্লাস্টিকের ফুলের ধুলো মুছি। ঘরে প্রতিদিনের ঘোর কুয়াশা। বলি, 'এর মধ্যে আমার একরাতে ভীষণ জ্বর, বাসায় কেউ ছিল না।' আমি যে ঠিক কী ভাষায় আপনাকে বুঝিয়ে বলি, এই যে খেই হারাতে শুরু করেছি, আশ্চর্য! আপনার চোখ এত নির্লিপ্ত কেন? বলতে বলতে ফের নিজেকে শক্ত করি, 'মানে সেদিন কী হল, নিঃসঙ্গতায়, যন্ত্রণায় ছটফট করছিলাম। সন্ধ্যা পেরিয়ে যাওয়ার পর রেজাউল এসেছিল।'

কেমন ভেজা ভ্যাপসা গন্ধ, জানালা ফুঁড়ে আসা এক চিলতে আলোর উজ্জ্বল চকমকি টেবিলের গায়ে, হাত রাখি সেই আলোময় উষ্ণতার মৃদু তাপে।

'এবং সেদিন একটা নাজুক ঘটনার পর আমার ভেতরে আমি একটা জন্ম টের পাচ্ছি'... বলে গভীর প্রত্যয় নিয়ে তাঁর দিকে তাকাই... আমি এখন কী করব?'

আমার কথা শেষ হতেই তিনি অনড় একটা কাঠের মূর্তিতে রূপান্তরিত হন। নিজের নির্দিষ্ট আসনে মগ্ন বসে থাকেন। চেহারায় কোনো ঢেউ নেই, আশ্বস্ত হওয়ার মতো নির্বিকারত্বও নেই। ভেতর থেকে ট্রে ভর্তি চা-নাস্তা আসে। সে সব রেখে বুয়া নিঃশব্দে ভেতরে চলে যায়। আমার বলার পালা শেষ হতেই কেমন নির্ভার মনে হয় নিজেকে। এর পরের পুরো অধ্যায় তাঁর নিজের। আমি অন্য কিছু স্পর্শ না করে কেবল গরম কাপটা দু-হাতে ঠেসে ধরি। ঠোঁটের কাছে নিয়ে চরম অস্থিরতায় চুমুক দিতে থাকি।

'দেখো নীনা', সন্তর্পণে নিজের কাপটা হাতে তুলে নিতে নিতে তিনি তাঁর কথা শুরু করেন, 'বিষয়টার সূত্রপাত সম্পর্কে আমি কোনো প্রশ্ন তুলব না, কেননা, আমি তার পরিবেশ, তোমার অবস্থান... এসবের কিছুই জানি না। কিন্তু স্বীকার করছি, ঠিক এ-ধরনের কোনো পরিস্থিতির জন্য আমি মোটেই তৈরি ছিলাম না, ফলে বেশ নার্ভাস বোধ করছি এবং অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে আমি তো জানতাম তুমি রেজাউলকে এই একটা ব্যাপারেই সহ্য করতে পারতে না।'

'আমিও আপনাকে কিছু বোঝাতে পারব না'... আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বলি, 'তবে সেই পরিস্থিতিতে ওরকমটা ছাড়া আর কিছুই ঘটতে পারত না', বলতে বলতে, কেমন ঝিমিয়ে আসি। অবশ্য হাতের কাপটা ট্রের ওপর রাখি।

তিনি সোফার ওপর আধশোয়া ভঙ্গিতে। আমার ভেতরাত্মায় জলের শব্দ। ঠোঁট শুকিয়ে আসছে। পুরো অস্তিত্ব জুড়ে মৃদু কম্পন। গভীর উত্তেজনায় তাঁর দিকে চেয়ে আছি। তার সিদ্ধান্তের ওপরই আমার স্বর্গ-নরক স্থির হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

যাবে, কেন যেন আমার ভেতরে তেমনই এক বদ্ধ প্রস্তুতি।

'তুমি সেই জাদুকরের গল্পটা জানো?'

'দোহাই, আমাকে আর কোনো গল্প শোনাবেন না', আমি বাধা দিই।

'সহজ হও', বলে তিনি আচমকা নরম হয়ে ওঠেন। 'শোনো, আমি বিশ্বাস করি, যে কোনো রকমের দৃঢ়তা মানুষকে অনেক জটিলতা মুক্ত হতে সাহায্য করে। দুর্বলতা থেকে যার উৎপত্তি, তাকে দুর্বলতার ভেতর দিয়ে বেড়ে উঠতে দেওয়ার চেয়ে দৃঢ়তার সাথে নিজের মধ্যে সহজ সত্যটাকে স্বাভাবিক করে তোলাই উচিত। আমি কি তোমাকে কিছু বোঝাতে পারছি?'

'না।'

'আমার শরীর কীভাবে বেড়ে উঠেছে, কিংবা এই পৃথিবী কীভাবে চলছে, সে সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের লক্ষ লক্ষ বছর চলে যাবে', তিনি বলতে থাকেন, 'আমাদের প্রাণের এই যে স্পন্দন, প্রাণ বিলুপ্ত হলেই চোখের সামনে একটা পৃথিবীর মৃত্যু। এ ব্যাপারেও সামান্যতম অভিজ্ঞতা লাভ করতেও কোটি জীবন পার হয়ে যাবে, কিন্তু একটা ভ্রূণ, অথবা একটা আত্মাকে তুমি মুহূর্তেই ধ্বংস করে দিতে পার কেবল সেই অস্ত্রের আঘাতে, আর সে হল তোমার একান্ত নিজস্ব সিদ্ধান্ত। তোমার ক্রোধ নিয়ে আমি যেমন তোমার কোনো শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব না, তেমনি তোমার ভালোবাসার টানে কাউকে আমি জড়িয়ে ধরতেও পারব না। সিদ্ধান্তটা নিতে হবে তোমাকেই।'

আমার আঙুলের চাপে চিপস গুঁড়ো হয়ে যায়। প্লেট থেকে একটা করে চিপস তুলি, আর গুঁড়ো করি। কেমন জ্বরজ্বর বোধ হচ্ছে। তিনি সর্দির জন্য বারবার সন্তর্পনে রুমাল ব্যবহার করছেন। তারপরও তাঁর নিজেকে আমার প্রতি মনোযোগী রাখার চেষ্টা আমাকে উদ্যমী করে তুলতে থাকে।

ইচ্ছে হয় তাঁর পায়ের কাছটায় হাঁটু মুড়ে গিয়ে বসি। দু-হাত ওপরে তুলে প্রার্থনা জানাই, আপনি নেমে আসুন। এবং এরকম একটা আকাঙ্ক্ষার পর আমার বুকে পুঞ্জীভূত গাঢ় ছায়া। হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি পায়। কথা বলতে পারি না।

'সুধীন দত্তের উটপাখি কাবিতাটি পড়েছ?' বলতে থাকেন তিনি, 'তার কয়েকটা লাইন এরকম—কোথায় পালাবে? ধু ধু করে মরুভূমি,/উদাসীন বালু ঢাকবে না পদরেখা... আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে/আমরা দুজন সমান অংশীদার,/অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,/আমাদের পরে দেনা শোধবার ভার...।' হঠাৎ একটা ঝড় শুরু হয় মনে। প্রায় চিৎকার করে উঠি, 'আমাকে কেন শোনাচ্ছেন এসব? কোন পথ দিয়ে এগোব, শেষে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব, আমি এর কোনোই কিনার করতে পারছি না। তাছাড়া কার দেনা, কীভাবে শোধ করব, তার আমি কী জানি?'

'আগে কোন পথে এগুবে, সেটা বের করো। এবং তারপর সেই পথই তোমাকে তোমার শেষ গন্তব্যে নিয়ে যাবে।'

'আপনি হেঁয়ালি করছেন'... আমি আবারও প্রায় চিৎকার করে উঠি। 'আমি এখন কী অবস্থায় আছি আপনি উপলব্ধি করতে পারছেন না? ভান করে আপনি দায়িত্ব এড়াতে চাইছেন?'

'তা-কী কখনো নিয়েছি আমি?' ভীষণ সহনশীল তার গলার স্বর। 'নীনা, কেন নিজেকে ছোটো করো? তোমার দায়িত্ব নেওয়া যায়? নিজেকে অন্যের ওপর যে এলিয়ে দেয়, তার ব্যাপারেই শুধু দায়িত্ব নেওয়ার প্রশ্ন। তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

নিজেই তোমার জন্য যথেষ্ট। আমি কোনোদিন তোমাকে এলিয়ে পড়তে দেখিনি। তোমাকে তেমন করে ভাবিও না।'

'আমিও মানুষ, আমারও ক্লান্তি আছে'... বলে, কেমন নিজের মধ্যে সেঁধিয়ে যাই। অবসন্ন মাথা সোফায় বিছিয়ে দিই।

'নীনা, পৃথিবীর সবচেয়ে জটিলতম, বিস্ময়কর গ্রন্থ হল মানুষ। সে নিজেও জানে না তার পক্ষে কী করা সম্ভব। ঠিক এই মুহূর্তে তোমার সবচেয়ে বেশি পরিহার করতে হবে ক্লান্তিকে। আমি বলতে চাইছি, যে অবস্থার মধ্যে তুমি পড়ে আছ, আমাদের সামাজিক অবস্থা তুমি জানো, আমাদের ধর্মীয় সংস্কার, আমাদের প্রতিবেশ, সবাই তোমাকে নগ্নভাবে বিদ্ধ করবে। তুমি কি তাদের সেই ছুরির মুখে নিজেকে এলিয়ে দেবে?'

'আমি তবে কী করব?'

'যুদ্ধ করবে', এবার তাঁর উচ্চারণ স্পষ্ট এবং দৃঢ়, 'যার জন্ম হয়েছে, তাকে নষ্ট করে ফেলা খুব সহজ। লালন করাটাই বড়ো ব্যাপার। তোমার ভেতরে সন্তানটি বড়ো হবে। তুমি তাকে জন্ম দেবে। এবং তাকে কেন্দ্র করে যত রকমের সামাজিক যুদ্ধ আসবে, তার সবগুলোকে দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করতে হবে এবং তোমাকেই, আমি তোমাকে ঠিক সেই জায়গাটাতেই দেখতে চাই।'

'সে অনেক কঠিন'... বলতে বলতে গভীর অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকি।

'আমি যে নীনাকে চিনি', তিনি স্বরে প্রত্যয় ঢেলে বলেন, 'সে এই কঠিন পথটাই অতিক্রম করবে। সভ্য বিশ্বে যেটা কোনো সমস্যাই নয়, বরং আনন্দের সাথে গ্রহণ করছে, কেন এখানে সেটা ঘৃণার যোগ্য হবে? তাকে আমরা প্রশ্রয়ই-বা দেব কেন? আমি চাই যুদ্ধটা তোমাকে দিয়েই প্রথম শুরু হোক।'

'আমার চোখের সামনে অস্বচ্ছ ছায়া। যে ভাবে ক্রমাগত ভাঙন চলছে ভেতরে, নিজেকে সবার সামনে ধোপদুরস্ত রাখাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

'তুমি ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছ আবারও?' যেন জটিল একটা বিষয়কে সহজ করার জন্যই ঘরের হাওয়াকে ঘোরাতে চাইছেন তিনি। আমি নতমুখে বলি, 'না।'

'নীনা, আমি একটি বুড়ো বৃক্ষ। শেকড়ে উঁই ধরেছে', গম্ভীর বিষণ্ণ তাঁর স্বর, 'পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দেই যার ডাল ভেঙে যায়।'

চারপাশে তখন ছায়া নেমে এসেছে। কেমন বিহ্বল চোখে তাকাই দেয়ালের ফ্যাকাসে সাদা আস্তরের দিকে। দেয়ালের বাজপাখিটি স্থির, আমার মুখোমুখি।

আমি সোফা থেকে উঠে তাঁর কাছে যাই। কী প্রাজ্ঞ, মায়াময় মুখ। আমি তাঁর হাত চেপে ধরি। মেঝেতে বসে তাঁর হাত মুখের কাছ টেনে নেই। ভেতরে ফুলে উঠছে কান্না। চোখদুটো জ্বলছে। তিনি আমার চুলে নিঃশব্দে হাত বোলান। 'নীনা', অসম্ভব নিরাশ অথচ ধীর কণ্ঠে উচ্চারণ করেন তিনি, 'একটা জীবন পার করে দিলাম যা খুঁজতে খুঁজতে, আমি তার সন্ধান পেয়েছি। একটা বয়স ছিল, যখন তাকে পেলে তার মালিকানার আশায় তাকে ঘরবন্দি করতাম হয়তো। এখন দূর থেকে দেখেই শান্তি। পেয়েছি, এটা ভেবেই শান্তি।'

'আমি যদি সমুদ্রের ঢেউ হয়ে যাই?' অন্ধকার গহ্বর থেকে উঠে এসে প্রশ্ন করি। আচমকা, কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই। বড়ো মোলায়েম তাঁর হাসি, 'তাই হোয়ো' বলার জন্যও সন্ন্যাসীর বয়সটা দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

বয়সের একটা দুর্বিনীত সাহস থাকে, উপেক্ষা কিংবা গ্রহণ করার। নীনা, এলিয়ে পোড়ো না। নিজেকে চেনার, আবিষ্কার করার এটাই সব থেকে উর্বর সময়। একদম একা হয়ে যাও। পৃথিবীকে সঙ্গে রাখো, তবে কখনোই মাথার ওপরে নয়।'

'কিন্তু পৃথিবীকে সঙ্গে রেখে এককভাবে বাঁচা সম্ভব? নিষ্ঠুর একাকিত্ব আমাকে প্রতিদিন অসহ্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে না?' ইরফান চাচার কোমল হাত তখনও আমার মাথায়। তাঁর ম্রিয়মাণ কণ্ঠ সমস্ত ঘরে স্পন্দন তোলে। 'তুমি কি কোনোদিনই একাধিক হতে পেরেছ? একজন পূজারী, তার নিপুণ হাত গড়ে তুলল মূর্তিটা— প্রতিমা। সকাল, দুপুর ও রাতের অবিশ্রান্ত কষ্টের ভেতর দিয়ে যেদিন তার মূর্তি, মোহনীয় ভঙ্গিমায় দাঁড়াল, তার চারপাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তখন সেই আলোয় উদ্ভাসিত পূজারি চিৎকার করে উঠল, এইতো আমার নির্মাণ। এই সেই সুন্দর, যার ভেতর দিয়ে আমি আমার জীবন পার করে দেব। কিন্তু সেই মূর্তির মুখোমুখি তখন কোন মানুষ? ভঙ্গুর ক্ষয়িষ্ণু এক পূজারি। যে তার সব ঢেলে নিঃস্ব হয়ে গেছে। পূজারি তার চোখ দিয়ে দেখবে সুন্দরকে। সে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাবে। কিন্তু সেই নিঃশেষিত ক্ষয়িষ্ণু বৃদ্ধকে সেই মোহনীয় মূর্তি তার স্পর্শ দেবে কেন? পূজারি শুধু স্পর্শ করবে তার তৈরি মাটিকে, পাথরকে। রং দিয়ে ঠেসে রাখা নারকেলের ছোবড়াকে।'

ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে আসে। আমি দাঁড়াই।

তিনি কথা বলায় তখনও অক্লান্ত, 'তোমার বয়সটা ফিরে পেলে, তোমার মতো সুযোগ পেলে নিশ্চিতভাবে আমি যুদ্ধটা করতাম। সংসার নিরানব্বইটা লোকে করে। এবং নিরানব্বইটা লোক সামাজিক শিশুর জন্ম দেয়। এর মধ্যে কোনো অভিনবত্ব নেই।'

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি ধীর অথচ ঋজু পদক্ষেপে এগিয়ে আসেন। অন্ধকার দরজায় অনড় ভঙ্গিতে এসে দাঁড়ান। তারপর প্রতিদিনের মতো আমার সন্ধ্যার পৃথিবীতে নেমে আসা। সোডিয়াম বাতির তামাটে আলোয়, ঘনঘোর স্তূপীকৃত কুয়াশায় আমার প্রতিদিনকার হেঁটে চলা।

ঘরে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ি। দীর্ঘদিন পর অনেক রাত অবদি টানা কান্নার স্রোতের মধ্যে কাটিয়ে একসময় থিতু হয়ে যেতে থাকি। মনে হয়, পৃথিবীটা শূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু কিছুতেই সেই শূন্যতার স্থির উৎস খুঁজে পাই না। শুধু টের পাই, বিশাল পৃথিবীতে আমি একদম একলা হয়ে গেছি। বিশাল ছাতার মতো আমাকে ছায়া-দেওয়া গাছটা সমূলে সরে গেছে। এখন সমস্ত চরাচর জুড়ে ধু ধু নিঃসঙ্গতা। দরজায় শব্দ হয়। সম্ভবত আমার জেগে থাকার শব্দ পেয়ে কিংবা বাতি জ্বলছে দেখে শানু বেরিয়ে এসেছে। আমি বিছানায় উঠে বসি। সে কাছে এসে নিঃশব্দে বসে, জানতে চায় আমি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমি, 'কিছু না', বলে দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে থাকি।

সে বলে, 'তুমি কুকাম ঘটাতে যেমন ওস্তাদ, জেদটাও তোমার ষোলোআনা। ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। এখনও সময় আছে, তাড়াতাড়ি ওটাকে ঝেড়ে ফেলো।'

বিরক্তিতে ওর কপালের ভাঁজ স্ফীত হয়ে উঠছে। আমি তখনও নিশ্চুপ। সে বলে, 'তোমার কামালভাই একজন পিরকে চেনে। তুমি কাল আমাদের সাথে চলো। তার কাছে গিয়ে মাথা কুটে আল্লাহর কাছে মাফ চাও।'

'তা হলেই আমার পেট থেকে বাচ্চাটা শূন্যে উড়ে যাবে, না?' শ্লেষ-মেশানো স্বরে বলি।

'কথার ছিরি দ্যাখো।' শানু খেপে ওঠে, 'প্রায়শ্চিত্ত বলে তো একটা জিনিস আছে। আমি স্বপ্নেও তোমাকে এতটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

চরিত্রহীন ভাবিনি। তোমার কামালভাই তো রীতিমতো ভয় পাচ্ছে। শেষে সে না ফেঁসে যায়। তুমি বড় রিস্কি মেয়ে।'

'তুমি পিরের কাছে তার জন্যই দোয়া চাওগে', আমি বলি, 'তার জন্য একজন মহিলার মৃত্যু হয়েছে।'

আমার কথা আর মাটিতে পড়ার সুযোগ পায় না। শুরু হয়ে যায় শানুর সাঁড়াশি আক্রমণ। যাবতীয় অশ্লীল গালিসহ আমার ওপর সে প্রায় আছড়ে পড়ে। এবং এক সময় লুঙ্গি গোটাতে গোটাতে কামালভাইও বেরিয়ে আসে। শানুকে টানতে টানতে সে আমাকে স্পষ্ট জানায়, 'আগামী মাসেই আপনি পথ দেখবেন, এই আমার শেষ কথা।' তারপর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। শানুর অবিশ্রান্ত অস্পষ্ট গজগজ কানে আসছে। বালিশ আঁকড়ে মড়ার মতো পড়ে থাকি। ভীষণ চক্কর খাচ্ছে মাথা। আবার চারপাশে ধোঁয়া, যুদ্ধটা তবে এখান থেকেই শুরু হল? আমার সামনে পর্যায়ক্রমে হাজার হাজার রুদ্রমূর্তি এসে দাঁড়ায়। মার ফ্যাকাসে ভীত মুখ, আরেফিনের বিস্মিত চোখ, মন্টু, রানু... তারপর দ্রুত বদলাতে থাকা চারপাশের পৃথিবী। ভয়ে, উৎকণ্ঠায় কাঁপতে কাঁপতে বাবার চোখের সামনে পড়ি। মৃত্যুর আগে খোলা দরজায় কী যেন দেখাচ্ছিলেন। কী হিম ধরানো ভীত সেই চোখ, সেই এক মুহূর্তের চাউনি আমাকে চিনিয়েছিল, মৃত্যু কী জিনিস! নাহ্! বাঁচতে হবে। রাত জাগতে জাগতে কবে আমি পাগল হয়ে যাব। বাতি নিবিয়ে বিছানা আঁকড়ে ধরি। প্রাণপণে চোখ বুজি। সীমাহীন অন্ধকারের পথ ধরে সাজানো একটা প্রতিমা জেগে ওঠে এবং একজন ক্ষয়িষ্ণু নিঃস্ব বৃদ্ধ পূজারি এগিয়ে আসে। ভেতর থেকে ঠেলে বমি আসছে। মাথার দু-পাশের রগে অসহ্য ব্যথা। ধড়ফড় করে উঠে বসি। নিজেকে এত নিঃস্ব মনে হচ্ছে! কেমন মৃত্তিকাহীন, আকাশহীন। আমি কোথায় দাঁড়াব? আসলে কি সত্যিই আমি চেয়েছি কোনো বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াতে? আমার সাথে প্রতারণা করেছে কেউ? আমি কি নিজেই জানি কী বাণী শোনার আশায় সেই দরজায় ছুটে গিয়েছিলাম?

পৃথিবীর সব ঠিক আছে, সবাই ঠিক আছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত কেবল আমার সার্বিকতা কেন এতটা বিসদৃশময়? পেটের বাঁ পাশ আবারও মোচড় দিয়ে ওঠে। বিছানায় গড়াগড়ি খাই। এক সময় থিতু হয়ে আসি এবং হাড়-মাংস আলগা হতেই যেন মার কান্না শুনতে পাই। বাবা যখন প্যারালাইজড, তখন কাটা কনডমের মুখ, পাইপের মাথা এবং প্রস্রাবের রাস্তার সথে চিলিমচি পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া থাকত। যাতে শুয়েই বাবা জলত্যাগ করতে পারেন। বাবা তখন অবোধ শিশুরও অধম। তাকে নগ্ন করে সবার সামনেই বলতে গেলে তার ধোয়া-মোছার কাজ করতেন মা। কিন্তু কী এক গোয়ার্তুমিতে বাবা তাঁর সুস্থ পা-টা দিয়ে সবকিছু উলটেপালটে দিতেন। ফলে সমস্ত ঘর বিচ্ছিরি গন্ধে সয়লাব হয়ে যেত। ভালোমন্দ খেতে না পারার কষ্ট, ছোটোদেরকে দিয়ে বাইরে থেকে যা-তা কিনিয়ে এনে খাওয়ার পরিণতিতে অবশ্যম্ভাবী ডায়রিয়া, এবং এসব কিছুর মুখে মার মিহি ক্রন্দন প্রতিদিনই আমাদের অস্তিত্ব তোলপাড় করত। কিন্তু বিস্ময়ের সাথে বাবার ক্রমাগত গজগজ এবং ক্রুদ্ধতার আর এক রূপ একদিন আবিষ্কার করি, তিনি ওই অবস্থাতেও মাকে কামনা করতেন এবং তার শারীরিক উন্মাদনা এতই প্রবল ছিল, তিনি মার চূড়ান্ত ক্ষোভ এবং অনীহার প্রতিবাদেই যেন পাইপ, কনডম সব ছুঁড়ে ফেলে লুঙ্গির তলায় হাত চালিয়ে প্রায় প্রকাশ্যেই হস্তমৈথুন করতেন। এবং সেসব মুহূর্তে যেমন প্রগাঢ় কান্নায় মা সমস্ত পরিবেশ নিথর করে তুলতেন... আজ রাতে হুবহু সেই কান্নার শব্দ শুনি। আজকের এই বিসঙ্গত রাত, চামড়ার তলায় বাচ্চা, ফুসমন্তরে সব উড়িয়ে দেওয়া যায় না? তার চেয়ে ওই যে মহিম ওর সাথে কথা বলি? যে তার বন্ধুর বিশাল রাজপ্রাসাদে আমাকে প্রথম চুম্বনে আপ্লুত করে বলেছিল, 'তুমি প্রকৃতি। এই যে তোমার চুল, এইসব ঘাস। এই যে চামড়া, মাংস, কপালের টিপ... এইসব মাটি রোদ... আমি চুম্বন করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

চাইছি... এ তোমার ঠোঁটে নয়, মন্দিরের পবিত্র সিঁড়িতে।'

ভাবতে ভাবতে হাঁসফাঁস করি। তার অদম্য স্পর্শ বিস্তারের প্রাবল্যে সোফার ওপর আমার কানের দুল খসে পড়েছিল। তারপর ক্রমাগত হাতড়াও, সোফায়, সমস্ত ঘরে, কোথায় দুল? সেই কি ছিল তবে পতনের সূত্রপাত?

ঘুমিয়ে পড়ি এবং স্বপ্নে দেখি জন্মের পর পরই আমি শিশুটিকে গলা টিপে হত্যা করেছি। মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে আতঙ্কে পেটের ওপর হাত রাখি। মেথরপট্টির সহস্র শুয়োর চন্দনার কান্নার দেয়াল উপচে রেললাইনের দিকে ছুটে যায়। শিশু হত্যার ভয়াবহতা আমাকে স্তব্ধ করে রাখে। 'স্বপ্নে তুমি তোমার বন্ধু অতীশকে খুন করেছিলে বলে জাগ্রত অবস্থায়ও বহুদিন কেন বিমর্ষ ছিলে? আমার প্রশ্ন এই যে, স্বপ্নেও তুমি কেন হত্যাকারী'—এই কথাগুলো কোথায় পড়েছি?

ছেঁড়া মশারি ফুঁড়ে মশা ঢুকেছে। কারখানার ভোঁ ভোঁ সাইরেন যেন। বস্তি থেকে ভেসে আসা কান্না ক্রমশ ম্রিয়মাণ। মহিম আমাকে রমণী করেছিল, কিন্তু সেই সৃজনের গভীরতায় এত ফাঁক কী করে ছিল যে, দ্রুত সেই জায়গায় স্থাপিত হয়েছিল রানুর অস্তিত্ব? সে আমাকে ভালোবাসেনি, তার গভীরতায় আমার স্থান ছিল না বলেই কি আমার ভেতর থেকে তার ছায়া মৃত অশরীরী হয়ে গেছে? এ কথা আমি আগেও ভেবেছি, আদৌ কি সেই ছায়া সরে গেছে, মরে গেছে? একজন কিশোরী, যে সবেমাত্র ভালোবাসার পাঠ গ্রহণ করেছে, তীব্র কষ্টে সে অবিশ্রান্ত কান্নায় রাতের পুরো জোৎস্না ভিজিয়ে দিত। যত রূঢ় বাস্তবতাই পরবর্তী জীবনে তাকে অধিকার করুক না কেন, সেসব স্মৃতিমেদুর ছবি কি সহজে মুছে যাওয়ার? ইরফান চাচা কি তবে মহিমেরই পরিণত রূপ? মানুষ কি সারাজীবনই এরকম দুঃখবাদী যে, এর ছায়া ওর মধ্যে হাতড়ে বেড়ায়? আমি তো আমার সমস্ত অস্তিত্ব বিছিয়ে রেখেছিলাম মহিমের জন্য। সে তো ইচ্ছেমতো আমাকে ফেলে আছড়ে খেলতে পারত, কিন্তু আমার হাতটিও সে এত যত্নে নিজের হাতে তুলে নিত, যেন একটি শিশুর হাত, অসাবধান হলেই মচকে যাওয়ার সম্ভাবনা। আমি তার প্রেমের মধ্যে ছিলাম না। তবে কি স্নেহের মধ্যে? আমাকে ছাপিয়ে রানুই কি তবে প্রেমময়? হা আল্লাহ্, কেন এখন সেই মানুষটা এমন কড়া নাড়ছে? কেন তার আঁকা যাবতীয় ছবি আমার চারপাশে উড়ছে, ঝাপসা হচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে?

রিকশায় করে একদিন টানা পথ তার সাথে গিয়েছিলাম। কী ভীষণ নিমজ্জিত ছিল সে নিজের মধ্যে। পেছনে বিস্তৃত হাসপাতাল, এগিয়ে যাচ্ছি। জানতে চাইলাম 'কী হয়েছে?' সে এমনভাবে তাকিয়েছিল, সেই চোখে সব ছাপিয়ে আশ্চর্য এক স্নেহ এবং আমি যেন ক্ষুদে এক বালিকা, কী ভাবে কী বললে কতটুকু কম কষ্ট পাব, তার ভেতর যেন তারই দ্বন্দ্ব। একসময় সে নিজের অক্ষমতার কথা জানায়। জানায়, এই অক্ষমতার উৎস কোথায়, সে নিজেই তা জানে না। আমার দেহ শূন্যে উঠিয়ে ধপাস করে ফেলে দেয় কেউ। সেই প্রথম আবিষ্কার করি তার অস্তিত্বের কোথাও এই বালিকার ছায়া নেই। সেই কম্পিত চুম্বন, অবারিত রিকশার পথ ধরে চলা, ছবি আঁকাআঁকি নিয়ে ছেলেমানুষি উচ্ছ্বাস... পুরোটাই আমার একার স্বপ্ন। সব ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে, পরিণত হয়ে উঠেছে রানু। তারপর পেরিয়ে যায় অনেক সময়। 'নহন্যতে' বইয়ে চোখ ডুবিয়ে ক্রমাগত কেঁদে চলা। আমার অস্তিত্ব থেকে একজন মির্চাকে হারিয়ে কেবলই অস্ফুট উচ্চারণ... মির্চ-মির্চা...। ওইরকম একটা গ্লানিময়, স্বপ্নময় কষ্ট থেকে কীভাবে রেজাউল আমাকে ছিঁড়ে তুলেছিল? তুমি কি মির্চা হতে চাও? মহিমকে প্রশ্ন করি। মহিম শূন্যের মধ্যে পাক খায়, 'চাই, চাই।'

তবে আমার সন্তানকে কোলে তুলে নাও। তুমি এর প্রেমিক বাবা হও। আমার পেট ফুঁড়ে শিশুটিকে টেনে বের করি। ইস্, কী ভয়াবহ রক্ত! হকচকিয়ে চারপাশে তাকাই। জানালা গলিয়ে পালিয়েছে মহিম। হিঃ হিঃ হাসতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

হাসতে গভীর গাড্ডার মধ্যে হাবুডুবু খাই। অসহায় অবিশ্রান্ত হাত-পা ছুঁড়ি। চারপাশঘেরা মশারিকে মনে হচ্ছে মাটির দেয়াল। ওপরেও মাটি। আমি শায়িত সেই কবরের মধ্যে। হকচকিয়ে ওপর দিকে মশারি উঠিয়ে দিই। কোত্থেকে নোনা ইলিশের গন্ধ আসছে। মাগো! উঠে বসি। নাকের কাছে বালিশ চেপে বসে থাকি। শীত বাড়ছে। দাঁতেদাঁতে ঠোকর লাগে। দেয়ালে বসে জ্বলজ্বল চেয়ে থাকা বাজপাখিটা আচমকা এগিয়ে আসে। আমি মেঝেতে দাঁড়াই। বুকটা এমন জ্বলে যাচ্ছে কেন? তেতো জলে জিভ ভিজে ওঠে। মাথা টলছে। অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকায় ছায়ার আবরণটা হালকা হয়ে এসেছে। চেয়ার টেনে বসি। টেবিলে মাথা রাখি। মা, মাগো... বুক বিদীর্ণ করে দীর্ঘদিন পর অস্ফুটে উচ্চারণ করি। সেই ক্ষীণাঙ্গী বৃদ্ধার একটু স্নেহার্দ্র হাত যদি আমার মাথায় থাকত। কেমন কাঙালের মতো সেই হাতের দিকে চেয়ে থাকি। ভেতরে সহস্র তোলপাড়... আমি কী চাইতে গিয়েছিলাম ইরফান চাচার কাছে? আমার জীবনে, তাঁর প্রভাবের সত্যিকার রূপ কী? কিছুতেই এর তল খুঁজে পাই না।

কোত্থেকে আসে এসব আজব বিচ্ছিরি ঘ্রাণ? গা ঘুলিয়ে নাক কুঞ্চিত হয়ে আসে। উঠে দাঁড়াই। সন্তর্পণে বাইরের দরজা খুলি। শীতার্ত হাওয়া, নিশ্বাস টানি। বারান্দায় এসে দাঁড়াই। পাতলা অন্ধকার ভেদ করে চোখে পড়ে বারান্দার এক পাশে বেড়ে ওঠা ফলসা পাতা শিশিরে ভিজে উঠেছে। গায়ে ভালো করে চাদর জড়াই। সামনে অন্ধকার নির্জন বস্তি, বস্তির ঘুপচি ঘরগুলো, লণ্ঠনের মৃদু আলো, আবর্জনার স্তূপ, এবং কাল্লুর মার মৃতদেহ। শিরশির করে ওঠে শরীর। আমি কেন একবারও মহিলার লাশটা দেখতে যাইনি? কেন সব জটিলতা থেকে আমি পালাতে চেয়ে তার মধ্যে আরও বেশি করে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাই?

অথচ একসময় বস্তির কাদার পথ ভেঙে, ইটের ওপর থরোথরো পা ফেলে তেলচিটচিটে মেঝেতে বেছানো বিছানায় গিয়ে বসিনি? কী অস্বাস্থ্যকর ছিল সেই পরিবেশ! পলিথিন দিয়ে বেড়ার সিলিং আটকে রাখা হতদরিদ্র একটা ঘুপচি ঘর। সেখানে গেলেই শীর্ণ দেহের ম্লান সেই মহিলা কুণ্ঠিত হয়ে উঠত, তার চরম দারিদ্র্য, জবুথবু শতচ্ছিন্ন শাড়ি, মলমূত্র তার কাছে যেন প্রকট হয়ে উঠত। পিঁড়ি টেনে বসে ছেলেকে টেনে নিলে এমন চোখে তাকাত, আমি যেন ত্রাণকর্তা অথবা মহামানব কেউ।

সেই মহামানব তার মৃতদেহকে ভয় পেয়েছিল?

কেন সিলিং ফ্যানে দড়িতে ঝুলে ছোটো চাচা সুইসাইড করেছিল? কী বিচিত্র কায়দায় লাশটি ঝুলছে! ধুৎ!

সকালে অনেক দেরিতে ঘুম ভাঙে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠি। লেপ ছুঁড়ে ফেলে লাফিয়ে বিছানা থেকে নামি। মাথাটা জমে আছে। শীতের দিনে সকালে অফিস করাটা কী যে কষ্টকর! টানা সারাদিন ঘুমাতে পারতাম? এত অবসন্ন বোধ হচ্ছে! এক হাতে ব্রাশ করি, অন্য হাতে মুখে জলের ঝাপটা দিই। রাতের ঠান্ডা ভাত আছে। একটা ডিম ভেজে নেব। নিজেকে তৈরি করে রান্নাঘরে গিয়ে দেখি, দুটো চুলোই আটকে রেখেছে শানু। অথচ আমি ওঠার আগেই তার রান্না শেষ, চিরদিনই তাই হয়ে এসেছে। বাটিতে ডিম ফাটিয়ে আমি বলি, ‘ডেকচিটা নামাও।’

‘ডেকচিতে ভাত ফুটছে।’

‘ও চুলাতে কী?’

‘ভাজি।’

‘দ্যাখো, তুমি গায়ে পড়ে লাগতে এসো না। একটা চুলা আমার পাওনা। আমার সময় নেই। একটু ফ্রি করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

দাও।'

'চুলা তুমি একটা কিনে নিয়ো', সে বলে। 'এটা আমার কেনা।'

'তাহলে কিন্তু আমিও একটা ডাবল কিনে নিয়ে আসব', আমি বলি, 'তোমারটা সরাতে হবে।'

'তাই কিনো', বলে সে নির্বিকার সবজি নাড়তে থাকে। আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে ভাতের ডেকচি সরিয়ে কড়াই চাপাই। তেল ঢালার ঠিক আগেভাগে সে জোরে আমাকে ধাক্কা দিয়ে কড়াইটা উলটে দেয়। আর যায় কোথা! আমার মাথায় দাবাগ্নি। তাকে ধাক্কা দিয়ে সোজা মাটিতে ফেলে দিই। তার বাজখাই চিৎকার শুনে কামালভাই বেরোনোর আগেই হনহন হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।

অনেকটা পথ হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতায় কাটে। একসময় আমার সংবিৎ ফিরে আসে। শানু এখন নিশ্চিতই সমস্ত পাড়া মাথায় করে আমার কুকীর্তি জাহির করবে। কথাটা ভেবে আমার পা-জোড়া শ্লথ হয়ে আসে। ভাবি, জাহান্নামে যাক অফিস। ফিরে গিয়ে যাহোক একটা আপস করি। ঝিম ধরে দাঁড়িয়ে থাকি কতক্ষণ। পরক্ষণেই মাথায় বিদ্যুৎ খেলে যায়। কাল্লুর মার মৃত্যুর পর সে আমার সামনে রীতিমতো ছুঁয়ে দেওয়া কেন্নো হয়ে আছে। ফলে সে আমার ব্যক্তিগত কিছু নিয়ে আমাকে ঘাঁটাতে সাহস করবে না। অত বোকা সে নয়। নিজের ভেতরে দুর্বলতা থাকলে গলা আর কতটা উঁচুতে চড়াবে?

বাসে উঠি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলছে। তবুও কোথায় একটা খচখচ অস্বস্তি, শানু যদি মেঝেয় পড়ে গিয়ে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে থাকে, তাহলে তো আমার এখন থেকেই পালিয়ে বেড়ানোর পালার শুরু।

অফিসে বনরুটি, মিষ্টি গিলে অস্থিরতার মধ্যে মুখ থুবড়ে থাকি। কোনো কাজেই শান্তভাবে মন বসাতে পারি না। ধোঁয়ায় আপ্লুত চায়ে ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়েছি, হাসতে হাসতে বড়ুয়া বাবু আসেন, 'আচ্ছা, আপনার এখানে প্রায়ই একটা হনুমানের মতো লোক আসে দেখি, মালটা আসলে কে?'

ওমরের কথা বলছেন বুঝতে পারি। অস্বস্তি নিয়ে একটা মিথ্যে কথা ঝেড়ে দিই, 'একসময় আমরা এক পাড়ায় থাকতাম। পারিবারিকভাবে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ।'

'চিড়িয়া বটে একখানা', বড়ুয়াবাবু চেয়ার টেনে বসেন, 'মনে হয় রোজ কয়লার খনি থেকে উঠে বসে।'

'লোকটা ওইরকমই' বলে চুপ হয়ে থাকি।

'কী ব্যাপার? বস আর আপনাকে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছেন না দেখছি', বড়ুয়াবাবু অন্য পথে হাঁটেন। 'আগে তো হরহামেশাই কাজের জন্য ডাকতেন।'

'কাজ নেই, তাই হয়তো ডাকেন না।'

যাকে নিয়ে এই মাত্র কথা হচ্ছিল, সেই হনুমানটা হঠাৎ এসে হাজির হয়। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে। বড়ুয়াবাবু হে হে করতে করতে উঠে যান। ওমর চেয়ার টেনে বসে, 'একটা খবর দিতে এলাম।'

'জাহান্নামে যাক আপনার খবর', আমি খেপে উঠি, 'আপনি বেরিয়ে যান।'

'সে কী! আমি আবার কী করলাম?'

'এটা একটা ভদ্রলোকের অফিস, এই রকম নোংরা পোশাক নিয়ে বস্তিতে চলাফেরা করা যায়, কোনো ভদ্রপাড়ায় নয়।' সে চুপ হয়ে যায়। তারপর ঠান্ডা গলায় বলে, 'সেটা তো ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে বলা যায়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

তার জবাব শুনে আমি আরও তিনগুণ তেতে উঠি। 'আপনি কি শিশু? আমি আপনার গার্জিয়ান? ঠান্ডা মাথায় বুঝিয়ে বলব? বেরিয়ে যান বলছি। কোনোদিন আমার অফিসে আর আসবেন না।' সারাদিন ধরে মাথায় অসহ্য দহন। চোখে আগুন নিয়ে চেয়ে থাকি ওমরের দিকে। দু-একজন সহকর্মী ঘাড় ঘুরিয়ে আমার উত্তেজিত অবস্থা দেখতে থাকে। ওমর নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায়। এবং অত্যন্ত গোবেচারার ভঙ্গিতে অফিস থেকে বেরিয়ে যায়।

স্থির হয়ে বসার পর আমার অনুপাত শুরু হয়। কাজটা ভয়ানক বাজে হয়ে গেল। উপলব্ধি করার পর শুরু হয় নতুন যন্ত্রণা। নিজের এইসব অস্থিরতার জন্য নিজের ওপরই ভয়ানক ক্রোধ জন্মায়। এসব করে কি আমি নিজেকে পৃথিবীতে আরও বেশি একাকিত্বে, আরও বেশি শূন্যে নামিয়ে ফেলছি না?

অফিস শেষে নিজেকে টেনে, সিঁড়ি হেঁচড়ে নীচে নেমে আসি। কোন নির্লিপ্ত আর স্থির হতে পারছি না? এভাবে আমি উঁচু পাচিল টপকাব? অফিসের সিঁড়িতে দাঁড়াতেই সামনে বিশাল জনারণ্য। এবং তার মধ্যেই সিঁড়ির একপাশে জবুথুবু ওমর দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাই। কী ভয়ানক স্বস্তি! উদ্ভাসিত মুখে তার দিকে তাকাই। তাতেই যেন সে বর্তে যায়। দ্রুত সামনে এগিয়ে আসে, 'ইস, যা ভয় পেয়েছিলাম! তবুও যাইনি, মানুষের রাগ আর কতক্ষণ থাকে।' তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে।

রিকশায় উঠি। হুহু ঠান্ডা বাতাস প্রতিরোধ করে রিকশা এগোয়। আমি প্রশ্ন করি, 'কী খবর নিয়ে এসেছিলেন?'

ওমর লাফিয়ে ওঠে, 'খবর হল দুটো। আমার ছোটো বোনটা একটা সেলাইয়ের দোকানে কাজ পেয়েছে এবং আমি একটা গার্মেন্টসে, কথা পাকাপাকি প্রায়। আগামী মাসে জয়েন করব। সুপারভাইজারের পোস্ট। দু-ভাইবোনের চাকরির মধ্যে অদ্ভুত মিল। শালার সেলাই দিয়ে পৃথিবীর সব কুকীর্তির দরজা বন্ধ করে দেব।'

আমি উৎসাহ প্রকাশ করি, 'বাহ! সত্যি ভালো খবর। এটা কি সেই গার্মেন্টস, ওই যে আপনার ধনী বন্ধুর, যে আপনাকে কাজ দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ', প্রায় চিৎকার করে ওঠে ওমর। 'ব্যাবসায় গচ্চা খেয়ে আমি তো তার পায়ে গিয়ে পড়লাম, একটা কিছু করো, নইলে মৃত্যু ছাড়া আমার পথ নেই।'

কেমন থিতিয়ে আসে। এই লোক আসলে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে চলার কোনো কায়দা-কানুন জানে না। নইলে পা যদি ধরেই থাকে, আমার কাছে এসব চেপে গেলে কী হয়? রিকশা একটা গলির পথ ধরে চলছে। ওমর বলে, 'আমি সামনেই নেমে যাব। আপনার যেতে কোনো অসুবিধা হবে নাতো?' আমি তার কথা এড়িয়ে নিজের মধ্যে ডুবন্ত এবং হঠাৎই বলি, 'আপনি আমার জন্য একটা বাসা দেখুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সস্তায় এক রুমের একটা বাসা।'

'যেখানে আছেন'—ওমর ইতস্তত করে।

'আমি যেখানে আছি, সেখানকার পরিবেশটা দুঃসহ হয়ে উঠেছে', গলায় আন্তরিকতা ফুটিয়ে বলি, 'আমার কোনো কিছুই তারা আর সহজভাবে নিতে পারছে না।'

ওমরের মুখে ছায়া। থমকে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে থাকে, আমি লক্ষ্য করি। তার এই স্থির ভঙ্গিটাই ভয়ানক সুন্দর। থমকে থাকা অবস্থা থেকে সে যেন বাস্তবে ফিরে আসে এবং প্রশ্ন করে, 'একা থাকবেন?'

আমি হেসে ফেলি, 'আগে তো একা উঠি।'

সিনথিদের বিশাল বাড়ির সামনে একসময় নিজেকে আবিষ্কার করি। নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই কখন পালটেছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

আমি কি তা জানি? পরে ভেতরে ভেতরে ঘটে যাওয়া সব ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে কিলবিলে তোলপাড়ের শুরু হয়েছিল। অবশ্য এসব কিছুর সঙ্গে আমার টিউশানি ছেড়ে দেওয়ার কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাইনি। তাছাড়া আমার ভর করে আছে এখনও ইরফান চাচার ঋণের বোঝা। কী একটা ছাইপাশ চাকরি করছে আরেফিন। তবুও তার ওপর বাড়ির দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ক-মাস ধরে মোটামুটি নিশ্চিন্তে আছি বলা যায়। আর নিজের জীবনেই বা আর কাঁহাতক আলু, পটল, চচ্চরি সহ্য হয়? ঘরের বিছানা-তোশক ছিঁড়তে ছিঁড়তে তলায় ঠেকেছে। কতদিন কোনো কিছু কিনি না! এর মধ্যে টিউশানি ছেড়ে দেওয়ার মতো শৌখিনতা আমাকে মানাবে কেন? লন অতিক্রম করার সময় ভেতরে হই-হট্টগোলের শব্দ শুনতে পাই এবং সেই সাথে অদ্ভুত মিউজিকের একটা তরঙ্গ। বারান্দায় সাদা অর্কিড ফুল ডালসহ ওপর দিকে উঠে গেছে। সেখানে দাঁড়িয়েই খোলা জানালা দিয়ে স্পষ্ট দেখি, ভেতরে কোনো উৎসব চলছে। গ্লাস-বোতলের লাগাতার টুংটাং। এবং পৃথিবীর তাবৎ সুন্দর পুরুষ-রমণী সেখানে এক হয়েছে। কেউ কোনায় দাঁড়িয়ে গল্প করছে, কেউ ছন্দে ছন্দে পা ফেলে জোড় বেঁধে নাচছে। কী ঝলমলে আভিজাত্য! ঘোর লাগে। মেয়েদের অদ্ভুত ছাঁটে চুল কাটা, বিচিত্র পোশাক, যতটুকু দেখা যাচ্ছে...এ আর এক পৃথিবী। কিম্ভুতকিমাকার আকৃতির একটা লোকও বিশাল বপু দুলিয়ে নাচছে...হাতে গ্লাস। বারান্দায় চার-খানসামাদের ছোটাছুটি। আমাকে দেখে একজন দাঁড়িয়ে যায়। আমি ঠোঁটে আঙুল চেপে...চুউপ...বলায় সে হনহন করে নিজের কাজে ছুটে যায়। আমার এখান থেকে উৎসবের মাত্র একাংশ দেখা যাচ্ছে। কী হাসি! কষ্ট করে হলেও অল্প সময়ের জন্য হলেও এমন করে হাসতে পারলে পরমায়ু পাওয়া যায়। সবাই হাসছে। সেই অদ্ভুত তরঙ্গ আমাকে বিহ্বল করে তোলে। কী অপূর্ব ঘ্রাণ! ওই যে বয়স্ক মহিলাগুলো, আঁটোসাঁটো পোশাকের বদ্ধতা দিয়ে বার্ধক্য ঢাকছে, চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করে ভুলে যেতে চাইছে সব, নিজের চেহারা-সুরতের কথা ভুলে কিম্ভুতআকৃতির লোকটা যে নাচছে, ক-জন পারে সেটা? যা হোক, এতক্ষণে আমার নিজের দিকে খেয়াল হয়। যে শাড়ি পরে এসেছি, চেহারায় যে কেরানিমার্কা ক্লান্তি, এই বাড়ির কেউ দেখে ফেললে, তার মতো দুর্ঘটনা আর কিছুই হবে না। আর এই অবয়বে পার্টি পর্যন্ত যদি পৌঁছুতে হয়...ধরণী দ্বিধা হও...ফিরে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছি, সিনথির মার অট্টহাসি শুনে চমকে তাকাই। জানালা দিয়ে এখন তাঁকে দেখা যাচ্ছে। পরনে সাদা কামিজ, গোলাপি ধুতি এবং সম্ভবত পার্লার থেকে চুল কার্ল করে এনেছেন—মোটা শরীরে বিচিত্র লাগছে তাকে। একজন ভদ্রলোকের সাথে কথা বলতে বলতে তার এই অট্টহাসি চারদিক কোরাসময় করে তুলছে।

লন ধরে বেরিয়ে আসি। কুয়াশায় ঢাকা রাত, কিছুটা নির্জন পথ। দীর্ঘদিন চলাফেরা করায় রাতের ভয় কিছুটা কমে এসেছে আমার। কিন্তু তারপরও নির্জনতা দেখলেই তা ছেঁকে ধরে। রোঁয়া ওঠা একটা মাদি কুকুর কেঁউ কেঁউ করে হেঁটে যাচ্ছে। এখন দ্রুত হেঁটে আমি রাজপথ ধরতে চাই। আচমকা পেছন থেকে কার যেন গলা। বুক ধড়ফড় করে ওঠে। কাউবয় টাইপের দু-জন ছেলে, কানে দুল, নেশাগ্রস্ত গলায় আমাকে প্রশ্ন করে, 'আপনি সিনথির টিচার?'

'হ্যাঁ,' আমি ভয়ে ভয়ে বলি।

'আপনার কাছে একশো টাকা হবে?' টেনে একজন জানতে চায়। 'দেখুন হাজার হোক আপনি সিনথির টিচার, আপনার কাছ থেকে আমরা ছিনতাই করছি না। খুব প্রয়োজনে পড়ে চাইছি।'

রাস্তা জনশূন্য। যা-ও দু-একজন যাচ্ছে, ঘাড় খাড়া করে যেন এই দৃশ্য দেখছে না। বুকে হিম ভয় নিয়েও জানতে চাই, 'কেন? নেশা করবেন?' গালকাটা আর জংলি টাইপের চুল যে ছেলেটার, সে অনর্গল হাঃ হাঃ হেসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

টাকাটা নিয়ে বলে, 'সিনথির ব্যাপারে আপনি কিছু সাহায্য করতে পারবেন?' আমি চারপাশে তাকাচ্ছি। কিছু দূরেই জনারণ্য। আলোময় রাজপথ।

'কী ব্যাপারে'? এতক্ষণে আমার শরীর থেকে রক্ত উড়তে শুরু করেছে।

'শালিকে একটু প্যাঁদানি দেব।' একজন বলে, 'আপনি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন?' জড়িয়ে জড়িয়ে তারা আবার একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ঘটায়।

'কী ধরনের সাহায্য?' আমার অস্ফুট গলা কেঁপে ওঠে।

ছেলেদুটো টলছে, স্পষ্ট দেখতে পাই। পুরো রাস্তার শূন্যতা আমার বুকের মধ্যেও। এবং একজন আচমকা ছুরির মতো কিছু শব্দ ছুড়ে দেয়, 'এই জায়গাটা নিরাপদ নয়, আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন।'

আমার দু-পা মাটির সাথে ঠেসে যাচ্ছে। আতঙ্কে বিবমিষায় শরীরে জমাট বেঁধে গেছে ঘাম। এবং এরই মধ্যে কোথা থেকে পেছনে জুটে গেছে আরও একজন যুবক। আমার স্থিরতা দেখে ভদ্রতার মুখোশ খুলে দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে একজন, 'কী ব্যাপার, কানে বাতাস যায় না?'

নিজেকে উপড়ে তুলি। এবং কংক্রিটের পথ ধরে হাঁটি। হঠাৎ আমাদের মফসসল শহরের একটা ঘটনা মনে পড়ে মুহূর্তেই। রাত বারোটার সিনেমা দেখে ফিরছিল এক দম্পতি। ছুরির মুখে স্বামীটি টুঁ শব্দ করেনি। একদল ছেলে তার স্ত্রীকে টেনে স্কুলের মাঠে নিয়ে ফেলে। ছোটো শহরে বেশ তোলপাড় হয়েছিল এই ঘটনা নিয়ে। হাসপাতালে মেয়েটিকে বিচিত্র কৌতূহল থেকে আমিও দেখতে গিয়েছিলাম। বিছানায় চোখ বুজে ছটফট আর কেবলই চিৎকার করছিল সে, 'সরে যাও, ওপর থেকে সরে যাও...উফ্ দমবন্ধ হয়ে আসছে, সরে যাও।'

আমার শিরদাঁড়া ফুটো করে পেরেক ঢোকায় কেউ। জংলি ছেলেদের অনুসরণ করতে গিয়ে এক ফাঁকে গোঙানির মতো শব্দ করে উঠি, 'আমাকে ছেড়ে দিন।'

'ডরান ক্যান?' মুখে দাগকাটা ছেলেটা তার আসল ভাষায় ফিরে যায়, 'আপনারে স্রেফ একটা কামের জিনিস বুঝায়া দিমু।' রাস্তা থেকে একটু দূরে একটা আধাআধি তৈরি পাঁচিলের সামনে তারা দাঁড়ায়। এবং সেই পাঁচিলের হিম-ধরানো চেহারা দেখে আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। ফ্যালফ্যাল তাকাই এবং হুমড়ি খেয়ে পড়ি একজনের পায়ের ওপর, আমাকে ছেড়ে দিন। টলতে টলতে ছেলেটা আমাকে টেনে তুলতে গিয়ে বুকের মাঝ বরাবর সজোরে কনুই দিয়ে গুঁতো দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দুটো যুবক এগিয়ে এসে আমার কম্পিত দেহ হাত দিয়ে চেপে স্পর্শ করে বলে, 'ডরান ক্যান? আসেন, আমরা আপনের কোনো ক্ষতি করব না।'

তারা এগোয়। নিজেকে ছাড়িয়ে তাদের পেছন পেছন মৃতপ্রায় আমার পা দুটো চলছে। রাতের ঘোর নির্জনতায় ছেলে তিনটের খাড়া অবয়ব পাক খায়। এবং একজন ঢুকে যায় সেই পাঁচিলের মধ্যে।

থরথর করে কাঁপছিলাম। এতদিনের সীমাহীন ভয়। বাস্তবিকই আমি আজ তার মুখোমুখি! হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে খিঁচিয়ে ওঠে কানে দুল পরা ছেলেটা, 'সম্মান করতাছি গায়ে লাগে না? একেবারে হান্দায়া দিমু, আয়'...এবং এমন বীভৎস চিৎকারে আমার যখন যথার্থই প্রাণপাখি উড়ে যাওয়ার উপক্রম, নির্জন রাস্তার গলি ধরে হঠাৎ একটা গাড়ির সার্চ লাইটের আলো। ছেলেদুটো দৌড়ে ভেতরে চলে যায়। এবং উলটো দিকে আমিও প্রাণান্তকর দৌড় দিই।

আলো জ্বালিয়েই গাড়িটা চলে যায়। এইমাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনা হুবহু কোনো সিনেমার ঘটনার মতোই। একটা তির্যক আলো আমাকে টেনে তুলেছে সেই গহ্বর থেকে। আমি যে সেই বিশাল পথটা কোন বায়ুযানে চড়ে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

কতটুকু শূন্যে পা উঠিয়ে পেরিয়ে এসেছি, নিজেই বলতে পারব না। ঘামঝরা নির্ভার শরীর, কম্পিত বুক নিয়ে প্রথমেই আলোকোজ্জ্বল রাজপথের ওপর দাঁড়িয়ে নিশ্বাস টানি। হঠাৎ পেছনে শব্দ! হাঁসফাঁস করে পেছনে তাকাই। একটা লোক দৌড়ের ভঙ্গিতে পথ হাঁটছে। চারপাশ কেমন আঁধার হয়ে আসছে। আমি কি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছি? এবার আমারই সারা শরীর এক পৈশাচিক ঘোরে টলছে। ছায়া হয়ে আসছে সব। এক সময় চরম বিভ্রান্তিকর অবস্থায় টলতে টলতে নিজের দরজায় দাঁড়াই।

সারাদিন পর আমি এ কোথায় দাঁড়িয়েছি? মগজ তোলপাড় করছে সিনথিদের বাসার কুৎসিত মিউজিকের শব্দ। এখন এসব বিষয়ের পর আমার জন্য কী শান্তি অপেক্ষা করছে? চোখ উপচে জল আসে। সহসা নক করতে পারি না।

দরজা খুলে দেয় কামালভাই। যথারীতি সে আমার সাথে কোনো কথা বলে না। ভাবতেই শরীর রি রি করে ওঠে, এতদিন এইসব অশিক্ষিত অভদ্রদের সাথে বাস করেছি! সে ভেতরে যাওয়ার পর ব্যাগ রেখে আমি বাথরুমে। কাঁচাবাজারের দুর্গন্ধের ভিড় ঠেলে গতকাল রূপচাঁদা মাছ কিনেছিলাম। রাতে ভেজে রেখেছিলাম। সকালে গরম করার সুযোগ পাইনি। শীতের দিন বলে এখনো পচেনি। কিন্তু কেমন একটু গন্ধ ধরে গেছে। কড়া করে ভেজে ভাতের সাথে মাখাই। মন্দ লাগছে না।

আমি কাজ সেরে যখন বিছানায়, তখন রান্নাঘরে শানুর শব্দ পাই। বাতি জ্বালিয়ে দু-দিনের বাসি পেপার মুখে ধরে রাখি। বড়ো বড়ো হরফের হেডিং জানান দেয়, কুয়েত দখলকারী সাদ্দাম হোসেন কঠিন বিপর্যয়ের মুখোমুখি। ঘরে ফেরার অল্পক্ষণের মধ্যেই যুবকদের আক্রমণের রেশ অনেকটাই কাটিয়ে উঠি। কাগজটা ভাঁজ করে রেখে বাতি নিভিয়ে দিই। পেটের ওপর হাত রাখি। নতুন করে বুক খালি হয়ে আসে। প্রাণটির অস্তিত্ব টের পাওয়ার মতো বয়স এখনও হয়নি। স্থির হয়ে আছে। তবুও ছুঁয়ে ছুঁয়ে পরখ করি। কী অদ্ভুত রোমাঞ্চ! দেখি বিশাল এক গ্রামের পথ ধরে আমি হাঁটছি। চারপাশে হুহু হাওয়া। অবারিত ধান খেত। একটা বড়ো ইটখোলার সামনে দাঁড়িয়ে দেখি, খাড়া ওপর দিকে উঠে গেছে অশ্বত্থ গাছ। তার নীচে ধ্যানমগ্ন একজন পিরের মতো কেউ। কম্পিত পায়ে কাছে এগিয়ে যাই, তার বজ্রকণ্ঠ বাতাস বিদীর্ণ করে, 'তুই আল্লাহর কাছে মাফ চা'। ঘোর অন্ধকার ফুঁড়ে আমি খাড়া হই...'কীসের জন্য?'

'হারামজাদি...বেশরিয়তি...চিৎকার করে ওঠে সে, পাপ স্বীকার না করলে দোজখবাসী হবি তুই...তোর কপালে...।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। শীত লাগছে। কম্বল গায়ে টেনে অনড় দীর্ঘ সময় পড়ে থাকি। এক সময় সেই সংকীর্ণতার হলুদ ছায়া ছিঁড়ে উঠে আসি ওপরে। একটা অবারিত গ্রামে আমি পৌঁছেছিলাম। কিন্তু আমার স্বপ্নে হঠাৎ গ্রাম কেন? আমার শৈশব, কৈশোরের সাথে গ্রামের সম্পর্ক খুব ক্ষীণ। আমার জন্মের আগেই আমার দাদা-নানারা মারা যান। আমি জন্মের পর আমার স্মৃতির মধ্যে গ্রাম বলতে একটি কুপির লম্বা শিখা, বাইরে হুহু বৃষ্টিপাত এবং সাদা ঘোমটায় আবৃত আমার সৎদাদির মুখ ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারি না।

সেই কোন জন্মে একবার গ্রামে গিয়েছিলাম। পিরের মহাজাগতিক কণ্ঠস্বর আমার বুক বিদীর্ণ করে। ছটফট করি। কিন্তু এই সব বিষম যন্ত্রণা ছাপিয়ে আমাকে এক চিলতে বাতাস ছুঁয়ে যায়, স্বপ্নে আমি প্রতিবাদী হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম 'কেন মাফ চাইব?'

এরপর যতই দিন যেতে থাকে, আমার জীবন সংকটের পর সংকটে হয়ে উঠতে থাকে বিষনীল। শিশুটি আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ভেতর বেড়ে উঠছে। কী ভয়ানক একটা ভয় সারাক্ষণ আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে থাকে। কিছুতেই আমি কোনো স্থিরতায় পৌঁছুতে পারি না। ক-দিন আগে সিনথির টিউশানি ছেড়ে দিয়েছি। মেয়েটার জন্য অসম্ভব মায়া হয়। কী ধারালো পথ ধরে হাঁটছে! সে-কি এসবের কিছু বোঝে? কিন্তু ওদের ওখানে যাওয়া ছেড়ে দিলেও, ছায়ার মতো একটা ভয় আমাকে অনুক্ষণ অনসরণ করতে থাকে। ওই ছেলেগুলোর সাথে যদি আবার দেখা হয়! পুলিশ কি আমাকে সাহায্য করবে? আরেফিন বলেছিল, ভার্সিটিতে বন্দুক যুদ্ধ শুরু হলে পুলিশরা নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে মজা দেখে।

একদিন সত্যজিৎদের আড্ডায় গিয়েও সেই ভাবনার প্রতিফলন দেখি। 'প্রত্যেক সরকারই ভোট কারচুপি করে ক্ষমতায় আসে, আমাদের দেশে আসবে গণতন্ত্র...ভুয়া সব'...সত্যজিৎ টেবিল ফাটায়। শাহতাবের যুক্তি অন্যরকম, 'তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? দিনের পর দিন চলতে থাকা অরাজকতাকে প্রশ্রয় দেব? প্রতিবাদ করব না?'

'প্রতিবাদ করো...মায়ের জোয়ান ছেলে হয়েছ...গুলি খাওয়ার পর তোমার লাশ পর্যন্ত বাবা-মা পাবে না।'

'কিন্তু নিজেরাই যে দিনের পর দিন লাশ হয়ে বেঁচে থাকছি, এর কি সুরাহা করবে? তার চেয়ে প্রতিবাদ করে মৃত্যু ভালো। খেয়াল করছিস সত্যজিৎ, কোটি কোটি টাকার ঋণের তলায় চাপা পড়ে বিশ্ববাজারে আমাদের দেশের অবস্থাটা? আমরা কি বেঁচে আছি? শেয়াল-কুকুরও এর চেয়ে ভালো বাঁচে!'

'যে সরকারই আসবে...একই রকম হবে তার চরিত্র। ফায়দা লোটার সেই একই রকম ধান্দা। একটা পার্টি দেখা, এই সরকারকে হটিয়ে যাকে বসানোর মতো মনে হবে তোর? কারও কোনো চরিত্র আছে?' এবং এই সব তর্ক চলতেই থাকে। আমি নীরব শ্রোতা হয়ে যাই। অনুভব করি, রাজনীতিকে ঠিকমতো জেনেই তবে তাকে ঘৃণা বা গ্রহণ করা উচিত। আমি কিছু না জেনেই এসব সম্পর্কে চরম নির্বিকার।

ইরফান চাচার ওখানে যাই না। বুকের মধ্যে সারাক্ষণ বল্লম গেঁথে থাকে। অফিসের টেবিলে বসে কেবলই বমি-বমি ভাব। ভয়ে চারপাশে তাকাই। পত্রিকা মেলে ধরি...বুশের মার্কিন সৈন্য হাজার হাজার ইরাকি নাগরিকের দেহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। সুলতানা ফাইলের ভেতর নিমগ্ন। একটু কাঁচা আম খাওয়া যেত?

'নৃশংস' শিরোনামে তিনবছরের শিশুকে ধর্ষণ করে কোনো যুবক। অফিস আজ শান্ত। বড়ুয়াবাবু অতি গভীরভাবে কলম পিষছেন। বমির বেগ বাড়ছে। সন্তর্পণে হাত রাখি পেটে। রক্তস্রোতের ভেতর বরফকুচিগুলো হাঁটতে শুরু করে। মসজিদের সামনে দাঁড়ানো প্রেসিডেন্ট। বিশাল ছবি। ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের সাথে জুম্মার নামাজ আদায় করছেন। ছিনতাইকারীর হাতে প্রাণ দিলেন একজন মহিলা। ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয় কমছে না।

'অবশেষে সাদ্দাম নিঃশর্তে কুয়েত ছাড়তে রাজি হয়েছে'।

'বুশের রাজকীয় উত্থান, বিনিময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচুর অর্থ লাভ'।

'বিশ্ববাসী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল'।

এর মধ্যেই আমার সন্তানের জন্মকে ঘিরে হাজার শব্দের হুল্লোড়। শিরোনাম: 'একজন রমণী দাবি করছেন তিনিই সন্তানটির পিতা।'

বমির বেগ বাড়ছে। মাথা নুয়ে আসতে চাইছে টেবিলের সাথে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘স্রেফ একটা বালব্ চুরি করতে গিয়ে একজন যুবকের তড়িতাহত হয়ে মৃত্যু’। বড়ুয়াবাবু হেঁটে আসেন, ‘একশোটা টাকা লোন হবে?’

‘পঞ্চাশ টাকা হবে।’

‘তা-ই দিন। বাচ্চাটা ক-দিন ধরে মিষ্টি খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে।’ গা গুলোচ্ছে। মুখ নামিয়ে আনি। টাকা নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে চলে যান বড়ুয়াবাবু।

‘আরিচায় বাস খাদে পড়ে পঞ্চাশ জনের মৃত্যু’। এবং বিভিন্ন দলের বিবৃতি, ‘গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলন যে-কোনো মূল্যে অব্যাহত রাখতে হবে’। ওমর এবং শাহতাবের একই উক্তি...‘আমরা কি বেঁচে আছি?’ এই সব অনুভূতির পর যখন কাগজ ভাঁজ করে রাখি, তখন অন্য ভয়, আরেফিন যদি গুলিবিদ্ধ হয়ে মরে? এই ভাবনার সূত্র ছিঁড়েখুঁড়ে চারপাশে ভূতের মতো চক্কর খায় উশকো চুলের কিছু বিদঘুটে মুখ। শাণিত আলোয় তারা ছুরি ঝলসায়। আমাকে পাঁচিলের দিকে টেনে নিয়ে চলে একদল যুবক।

পরদিন অফিসের চেয়ারে বসতেই ঘাই দিয়ে ওঠে নদীর হুহু হাওয়া, গোলাপি নবাব বাড়ি। আমার চোখে জল এসে যায়। আমার এত ঘুম পাচ্ছে কেন? কী মনে হতে সুলতানার টেবিলের দিকে যাই। চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসি। সে প্রশ্ন করে, ‘তোমাকে অমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন?’ উত্তর দিয়ে হঠাৎই বলি, আচ্ছা, এম আর সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে?’ বলেই টের পাই কী চরম বোকামিটা করেছি। সে অবাক চোখে তাকায়, ‘কেন?’

প্রায় তখনই নিজেকে সামলে নিই, ‘না, মানে আমি যাদের সাথে সাবলেট থাকি, সেই বাড়ির মহিলা করাতে চাইছে। আমার কাছে পথঘাট জানতে চাইছিল।’

‘কত মাসের?’ সে জানতে চায়।

‘এই তো, আড়াই তিন।’ বলতে বলতে ভেতরে ঘেমে উঠি।

‘তাহলে খুব একটা অপরিণত না। বিশেষ করে তিন হলে’, সুলতানা বলে, ‘তা, নষ্ট করতে চাইছে কেন?’

‘দুটো বাচ্চা হয়ে গেছে’...বলতে বলতে ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি কি আগে কখনও শানুর বন্ধ্যাত্বের কথা বলেছি?

কিন্তু সুলতানার মুখ স্বাভাবিক, ‘ক্লিনিকে এসব তো হরহামেশাই হচ্ছে। হাসপাতালে গিয়েও করতে পারে। ব্যাপারটা খুব সহজ। একটা সরু নল ভেতরে ঢুকিয়ে, নলটাকে পাকিয়ে ভেতরটা স্প্রে করে সাফ করে আনে।’

‘নলটা কি বাচ্চার শরীর ছিদ্র করে ঢোকে?’ অস্ফুটে প্রশ্ন করি।

সুলতানা দ্বিগুণ বিস্ময়ে তাকায় আমার দিকে, ‘সেকী! সন্তান বলছ কাকে? সবে ও ফুটছে। আড়াই-তিন বললে না?’

কী সব উশকোখুশকো ভার নিয়ে রাস্তায় নামি। অনেকটা পথ দারুণ উৎকণ্ঠায় পার করে দিয়ে নিজের কাছেই জানতে চাই, আমি আসলে কী চাইছি? নিজের ভেতরের বিষ বাইরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছি কেন? হাতের ডাইনে হঠাৎ একটা ক্লিনিকের সাইনবোর্ড। তাতে লাল অক্ষরে নীচে লেখা ‘এখানে এম আর করানো হয়’। তড়িঘড়ি রিকশা থামাই। খুঁটিনাটি সব জানার আশায় কী এক ঘোরে রিকশাকে দাঁড়াতে বলে সিড়িঁতে পা রাখি। টনটন করছে মাথা। সুলতানার বিদ্রূপ মাখা চোখ শূন্যে ঝুলতে থাকে। ওপরে উঠতে গিয়েই একটা বিশাল শলাকা, সরুপথে ঢুকে আমার সন্তানের শরীর বিদ্ধ করে এবং সেই সরু নলের সুতীক্ষ্ণ ফণা স্রোতসহ পাকিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

পাকিয়ে আমার সন্তানকে আলুভর্তা ভানায়, ডাল বানায়, সেই ক্ষীণতম প্রাণের স্পন্দন বীভৎস খিঁচুনিসহ স্থির হয়ে যায়।

নিজেকে নিয়ে ফিরে আসি। অদ্ভুত কাল্পনিক বিভ্রমে ইরফান চাচার মুখোমুখি নীনাকে হাঁটুমুড়ে বসাই। তাঁর সেই ভারী কোমল হাত কান্নায় কান্নায় ভিজিয়ে দিই। রিকশা ছোটে টানা রাস্তা ধরে। পুরো অফিসের ফাইলপত্র আমার মাথায় ঠেসে দিচ্ছে কেউ। সেই স্তূপের নীচে চাপা পড়ে আমাকে আর দেখা যাচ্ছে না। আহা, যদি এমন করে লুকোতে পারতাম? এসব কথা যখন ভাবছি হঠাৎ বোধ হয়, একটা ছায়া আমার পিছু নিয়েছে। অফিস থেকে বেরোতেই সন্ধ্যা। চারপাশে বাতি জ্বলে উঠেছে। সেই আলোর ওপর অর্ধবৃত্তাকার আধমরা চাঁদ। অফিসের আধখোলা জানালা দিয়ে কেউ ছুড়ে দিচ্ছে আমাকে। টনটনে মাথাব্যথা নিয়ে গতকাল শেষরাত অবদি ঘুমোইনি। তন্দ্রা এলেই দুঃস্বপ্ন। কখনও সেই স্বপ্নে আমার পেটের মধ্যে মৃত সন্তানের আর এক রূপান্তর। চামড়ার তলায় জীবন্ত এই অনুভূতিতে রোমাঞ্চ। কখনও সে টলমল হেঁটে ধপাস পড়ে যাচ্ছে কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার বাড়ন্ত আকৃতির দরুণ পৃথিবীর সামনে আমি সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে ধরা পড়ে যাচ্ছি। এক রাতে স্বপ্নে স্পষ্ট দেখেছি, মাটিতে গলা পর্যন্ত পুঁতে পাঞ্জাবি পরা কিছু লোক আমার মাথায় পাথর ছুঁড়ে মারছে। তারপর থেকে মাথা ধরে থাকে সারাক্ষণ। চামড়া টান করে দেওয়া বিশ্রী স্বপ্ন নিঃসঙ্গ মুহূর্তে আমাকে বড়ো দুর্বল করে তোলে।

অফিস থেকে বেরোতেই ব্যথাটা যেন সরে দাঁড়ায়। রিকশা, গাড়ি, মানুষ সব ছাপিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাব। ফের মাথায় চাপ। 'নবাবের শরীর হয়েছে তোমার' নিজেকে বকতে বকতেই বাধ্য হয়ে রিকশা নিই। তাছাড়া নিজেও বুঝতে পারছি, শরীরের এইরকম নাজুক মুহূর্তে বাসে কুস্তাকুস্তি করে ওঠা রিস্কি ব্যাপার। কিন্তু বেশ ক-দিন ধরে আমাকে সেই ঝুঁকির পথ ধরেই হাঁটতে হচ্ছে। এবং তারপরই যেন টের পাই কানে দুল পড়া হুবহু সেই ছেলেটি যেন আমার পিছু নিয়েছে। বুক ঠান্ডা হয়ে আসে।

অনেকটা পথ গায়ে থর-কাঁপুনি নিয়ে বসে থাকি। কিছুক্ষণ পর আর ছেলেটাকে দেখি না। হাঁপ ছেড়ে টের পাই ভার্সিটির সামনের বিস্তৃত পথে এসে পড়েছি। ওদিকে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে, রিকশা তাই ঘুরে এসেছে। আমি টেনে বাতাস নিয়ে ওপর দিকে তাকাই। কী অপূর্ব পুরোনো রোদ্দুরের বিন্যাস। আর বিস্তৃত কড়ইয়ের কালো পাতাগুলো কী অভিনব মায়ায় ধবল আকাশটাকে চিতা-হরিণীর মতো করে রেখেছে। রিকশা বাঁয়ে মোড় নিলে ফের ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে পড়ি। সেই ছেলেটাকে পেছনের রিকশায় দেখা যাচ্ছে। সিগ্রেট টানছে সে। ভালো করে লক্ষ করি, না, এ অন্য ছেলে। অনেকক্ষণ পর ভিন্ন পথে চলে যায় সেই রিকশা। শরীর থেকে ঘাম ছেড়ে গেলেও বাসায় এসে আমি অনেকক্ষণ ধরে স্থির হতে পারি না।

এই রকম কোথাও কোনো ছায়া দেখলেই চমকে উঠি। রাতে দুঃস্বপ্ন বাড়তে থাকে। একদিন ইচ্ছে হয় শানুর দরজায় ধাক্কা দিই। তাকে জড়িয়ে ধরে থিতু হই। কিন্তু তার আচরণ এখন সবরকমের ভব্যতার বাইরে চলে গেছে। রান্নাঘরে তার কোনো জিনিসে স্পর্শ লাগলে সে সঙ্গে সঙ্গে ধুতে শুরু করে দেয়। ফলে আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। এই রকম পরিস্থিতিতে কাঁচা বাজার করা, বাড়িতে টাকা পাঠানোর অসহ্য কষ্ট, বিছানার চাদর, নিজের জন্য একটা তাঁতের শাড়ি কিনতে না পারার অক্ষমতা আমাকে প্রায় পাগল করে তোলে। কত আর ঝেড়ে ফেলা যায়?

সব কিছু ছাপিয়ে উঠে পায়ের পাতা থেকে মগজ পর্যন্ত হিম হিম বইতে থাকে অন্য এক যন্ত্রণা, আমি একে না-কোনো ভাষা, না-কোনো কোনো বেদনা—কিচ্ছুতে রূপ দিতে পারি না। টেলিফোন করার অভ্যেস আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

একদম নেই। কয়েনবক্সে লাইন ধরা সবচেয়ে অসহনীয়, তাই ব্যাপারটা পারতপক্ষে পরিহার করে চলি। কিন্তু একদিন কী এক ঘোরে ছুটে যাই সেদিকেই। ইরফান চাচা কখন কবে যে নাম্বারটা দিয়েছিলেন, মনেই ছিল না। মতিঝিলের টেলিফোন বুথে গিয়ে দাঁড়াই। উত্তেজনায় চোখে জল এসে যায়। সিকি ফেলে নাম্বার ঘোরাই। এক সময় অপর প্রান্ত থেকে একজন মহিলার কণ্ঠ শুনতে পাই। কিন্তু লাইন চাওয়ার পর দীর্ঘ এক নীরবতা। লাইনে দাঁড়ানো পেছনের লোকজন টেলিফোন বুথে গিয়ে উশখুশ করছে তখন। ঠিক এসময় সেই অনির্বচনীয় বিশাল কণ্ঠ...'হ্যালো।'

'হ্যালো হ্যালো'...ওপাশে উদ্বিগ্ন কণ্ঠ। নিঃশব্দ কান পেতে তাঁর ভারী গলা শুনি। কাঁপতে কাঁপতে লাইন কেটে দিই। বিশাল সড়ক ধরে হেঁটে আসি। বাসায় এসে বিছানায় মুখ থুবড়ে থাকি। শানুর সাথে কথা বন্ধ। বাসার পরিবেশটা দুঃসহ হয়ে উঠেছে। বমি, ঝিম ধরা এসব কমে এসেছে। এখন কী এক ভার, কলজে ছিঁড়ে ফেলে লোহার আংটা। আমাকে নীচ দিকে চেপে রাখে কোনো অলৌকিক বিকট দৈত্য। এর মধ্যে জটিল মস্তিষ্ক ক্রিয়া, আমি কোনো লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারি না।

একদিন এইসব বিক্ষিপ্ততার ভেতরেই ওমরের মুখোমুখি হই, 'আপনি কি আমার বাচ্চার দায়িত্ব নেবেন?' এই শব্দতরঙ্গ তাকে স্পষ্টতই চমকে দেয়। সে বিহ্বল চোখে আমার দিকে তাকায়। কথা হচ্ছিল একটি চায়ের স্টলে বসে। কাপ থেকে পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। ওমর বলে, 'আপনি বাচ্চাটার পিতৃত্ব-সংকটে পড়েছেন তো? আমার কি সেই শক্তি আছে?'

কেমন ঝিমিয়ে আসি। আবারও চারপাশে ধোঁয়া এবং জটিল মানসিক পীড়ন। চারপাশে কী কুটিল গোল গোল চোখ, আচ্ছা, ছেলেগুলো যদি আমাকে টেনে সেই পাঁচিলের দিকে নিয়ে যেত?

ওমর বলে, 'আপনি আমার কাছে করুণা চাইছেন কেন? আমি জানি, আমি খুবই নগণ্য একজন, আপনাকে চাওয়ার দুঃসাহস আমার কোনোকালেই হয়নি। আপনি যদি সমাজকেই ভয় পেয়ে থাকেন, তবে আমি রাজি এর পিতৃত্বের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। সন্তানের ব্যবস্থা না হয় হল, আপনি তখন কোথায় থাকবেন?'

'আপনারা সবাই এত কথা জানেন,' কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠি। 'কথায় কথায় চারপাশে দেয়ালই উঠছে শুধু। আমি কোনো পথ পাচ্ছি না।'

ধোঁয়ার আস্তরে ওমরের মুখে ছায়া। আমার কাপটা বয় টেনে নেওয়ার সময় আমি আর এক কাপ চা চাই, কেমন গলা শুকিয়ে আসছে।

'আমার মান-অপমান বোধ খুব কম,'...ওমরের গলা এই প্রথম ভিজে আসে। 'চিরকাল সবার মুখে তা-ই শুনে এসেছি। টাকার জন্য জীবনে নিজেকে কত জায়গায় কতভাবে বিকিয়েছি। মানুষের লাথি-ধাক্কা খেতে খেতে কেমন ভোঁতা হয়ে গেছি। কোনো কিছুতেই আর গা করি না। কিন্তু দেখুন, আপনি কী একটা কথা বললেন, তাতেই আমি কেমন বড়ো বেশি অপমানিত হয়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত আপনিও আমাকে ব্যবহার করতে চাইছেন? দেখুন, কেমন কান্না এসে যাচ্ছে।'

সেই চায়ের স্টলের ভিড়ের মধ্যেও আমি টেবিলে রাখা তার হাত চেপে ধরি। 'বিশ্বাস করুন, এটাও ঠিক না। আমাকে ভুল বুঝবেন না, একে একে সবাই চলে গেছে। ওমর, একজন মানুষ নেই যার পাশে দাঁড়িয়ে আমি বাঁচতে পারি। আমি কি জানি, আমি আদৌ আপনাকে ভালোবাসি কী না? কী করে আপনি ভাবছেন, এই যে স্থিরতা, আমি একদম ঠিক ঠিক তাই নিয়ে আপনার পাশে নিজেকে দাঁড় করাব? আমাকে একটু একটু করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

সেটা বুঝতে হবে। সামনে পুরো জীবনটাইতো পড়ে আছে।'

কাপ আসে। চায়ে ফের চুমুক দিই। ওমর সহসাই নিজেকে ঝেড়ে ফেলে, 'আপনার সব কথার ভেতর ধরার অত ক্ষমতা নেই। আমি আমার পক্ষ থেকে এটুকুই বলতে পারি, আপনি চাইলেও আমি আপনাকে সহজে ছাড়ছি না। এ জন্য আপনি আমাকে ব্যক্তিত্বহীন, ছ্যাঁচড় যা খুশি ভাবতে পারেন। আপনাকে সেদিন নাইটিঙ্গেল পাখির গল্প বলেছিলাম না? নীনা, আমি রক্ত দিতে পারি, কেননা আমার সেটা ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু নিজেকে বদলাতে পারি না।'

এ কথার পর কী বলা যায়? আরও বেশি করে হিম বরফে রূপান্তরিত হওয়া ছাড়া কীই-বা আমার হওয়ার আছে? কিন্তু তারপর আমার জন্য আরও তীব্র শীতলতা অপেক্ষা করছিল। রুমাল দিয়ে ঠোঁটের কোনা মুছছি, ওমর তার স্বাভাবিক স্বভাবে হেসে বলে, 'আপনাকে আমার জীবনের একটা ট্র্যাজিক ঘটনা বলি। এটা বলে বেড়ানোর মতো কোনো কাহিনি নয়। যারা আমার পরিচিত তারা সেটা নিজের চোখে দেখেছে, তারা ছাড়া এই আপনাকেই প্রথম বলছি। এরপর আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে আরও বেশি ঘৃণা করতে পারেন।'

স্টলের ভেতর হঠাৎ উঁচু গ্রামে রেডিও বাজতে শুরু করে। সিনেমার বিজ্ঞাপন উচ্চকণ্ঠ চালায় তার কথা শোনার জন্য আমাকে আরেকটু ঝুঁকতে হয়।

'আমার এক বন্ধু ছিল,' ওমর বলে চলে, 'আপনাকে আগেই বলেছি, আমার জীবনে কোনো বন্ধু নেই, আমি কারও সাথে তেমন গভীরভাবে আর মিশতে পারি না। দুজনই ক্লাস এইটে পড়তাম। জানেন তো খুব গরিব আমরা, তখনও তাই ছিলাম। আমাদের দুজনের ঘুরে বেড়ানো, স্কুল ফাঁকি দেওয়া—সব কিছুতে মিল থাকলেও তার একটা বাড়তি গুণ আমাকে খুব হীনমন্যতায় ভোগাত। চমৎকার ছবি আঁকত সে। একবার হল কী, একটা ভয়াবহ ছবি আঁকার মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে ফেলল সে। সারাদিন দরজা আটকে থাকে। ডাকলেও সাড়া দেয় না। যদিও হঠাৎ বেরোয়, কেমন উদ্ভ্রান্ত, উশকুখুশকু ভাব। প্রতিদিন ফিরে আসি। এভাবে বেশ কয়েক মাস কেটে যায়। আমি কেমন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ি। তো একদিন তার ছবি আঁকা শেষ হল। দুজন মিলে বেশ দু-চার পয়সা করে চাঁদা তুলে ছবিটাকে ফ্রেমে বাঁধালাম। শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল, তা দেখেতো আমি থ। আপনাকে আমি ভাষায় বোঝাতে পারব না, কাচের ফ্রেমে বন্দি এক অন্য পৃথিবী। সে বলল, এই ছবি দিয়ে তার জীবনটাই বদলে যাবে, সে অনেক বিখ্যাত হবে, ধনী হবে। জানেনই তো আমি ছিলাম চূড়ান্ত গরিব। সব দেখে আমার মনটাই ভেঙে গেল। আমি পড়ে রইব আঁস্তাকুড়ে। সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাবে সাত-মহলের চুড়োয়? দুজনের জীবনই যাবে পালটে? ঘরে তখন নিত্যদিন কুকুর কামড়াকামড়ি অভাব, একদিন কী হল ছবিটা আমি চুরি করে ফেলি।'

রেডিয়োতে বিজ্ঞাপনের শব্দ কমে এখন খবর হচ্ছে। ঠান্ডা হাত কানের চামড়ায় ঠেসে বসে থাকি।

'বিশ্বাস করুন, কোনো ঈর্ষা থেকে নয়,' ওমর বলতে থাকে, 'আমি নিজেও জানি না কেন তখন ও কাজটা করেছিলাম। সেটা বেচতে গিয়ে আমার স্বপ্নভঙ্গ হয়। কিন্তু তখন আমার ফেরার কোনো পথ ছিল না। একেবারে জলের দামে সেটা বেচে দিয়ে ঘরে এসে ভূতের মতো বসে থাকি।' ওমর থামে। আমি তখনও চেয়ে আছি। পাশের টেবিলে আড্ডার চূড়ান্ত উত্তেজনার মুহূর্তে একজন টেবিলে জোরে ঘুষি বসায়, ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করে মুখে ধর্ম নিরপেক্ষতার বুলি কপচানো? রাবিশ! এবং রেডিওতে আমার স্নায়ু শীতল করা গান —'আয় রে...মেঘ আয় রে...।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

‘সে রাতেই আমার বন্ধুটি আত্মহত্যা করে,’ ওমর আবার শুরু করে, ‘এ খবর শুনে আমি কষ্টে, গ্লানিতে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। নাওয়া-খাওয়া ভুলে পুরো একমাস তার কবরের পাশে বসে ছিলাম। মাথা ঠুকতাম মাটির সাথে। সবার কত ঠাট্টা, অপমান, পরিহাস। তারপরও আজ এত বছর কেটে গেছে। মাসের সাতাশ তারিখে, যে তারিখে সে মারা গেছে, আমি সারারাত তার কবরের পাশে বসে থাকি। কতজন এটাকে পাগলামি বলেছে। এসব অর্থহীন বলে বুঝিয়ে সবাই কত টেনেছে, ওখানে আর না যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমার মন বুঝলে তো’—বলতে বলতে ওমরের চোখ ফের ভিজে ওঠে। পরক্ষণেই মাথা নেড়ে বলতে থাকে, ‘আমি একটা লোভী কুত্তার বাচ্চা। এই করে করে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। জানেন, যে কোনো জিনিসের জন্য জীবন বাজি রাখতে পারি। কিন্তু আমার এই কুৎসিত জীবনের কতটুকুই-বা মূল্য আছে। কিন্তু ভয় লাগে, ধরুন চুরি করলাম আপনাকে, জীবন বিকিয়ে দিয়ে আপনাকে জয় করলাম, কিন্তু আপনাকে ছাড়া, সব আছে, তার ভেতর কেবল আপনি নেই।’

কাপের ওপর আমার হাতের ছাপ বসে গেছে। কেমন বোবার মতো অনড় বসে থাকি। চারপাশ কুয়াশা হয়ে আসে। ওমর আবারও আগের প্রসঙ্গে আবর্তিত, ‘জানেন, আমার বন্ধুর নাম ছিল অপু। আমি পুরো পথের পাঁচালি ঘেঁটে ফেললেও কি সেই অপুকে খুঁজে পাব? কী সব কথা যে আজ আপনাকে বলছি।’

‘আমিও কিন্তু ছবি আঁকি’...ঠান্ডা গলায় শুরু করি। ‘এক সময় ছবি আঁকার জন্য কী করিনি? জানেন আমার ছোটো ভাইটা একদিন একজোড়া সোনার দুল...।’

‘থাক, নাইবা বললেন সেসব,’ ওমর বাধা দেয়। ‘ছবি আঁকা নিয়ে আমি উলটোপালটা কোনো কিছু একদম সহ্য করতে পারি না। আপনি আঁকেন জেনে কেন যেন আমার নিজেকে নিয়ে ভয়ই বাড়ে শুধু। আপনি লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই, এ নিয়ে কখনো আমি আগ্রহ প্রকাশ করিনি?’

‘আমি কি তাহলে আঁকা ছেড়ে দেব?’ তাকে পরীক্ষা করতেই যেন হঠাৎ আমার এই প্রশ্ন।

‘সে-কী! তা কেন হবে?’ সে মহাবিব্রত। ‘শুধু ওই নেশাটার সাথে আমার মতো অকল্যাণকে না জড়ালেই হল। মোটা মাথার একটা গবেট আমি। ওইসব সূক্ষ্ম শিল্পটিল্পর আমি কী বুঝি? দেখেছেন, আমিও আজ চান্স পেয়ে আপনাদের মতো কথা বলতে শুরু করেছি। একটু সুযোগ দিয়েছেন কী অমনি মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে রাজা-বাদশা বনে গেছে। এই জন্যই লোকে বলে বানরকে...।’

‘থামুন’—বলে ধমক দিয়েই আমি অনেকক্ষণ ঝিম ধরে বসে থাকি। কি তীব্র অবশতা, নড়তে পারছি না। কিন্তু ওমরের চরিত্রে কোনো শিথিলতা নেই, নিজেকে ঝেড়েঝুড়ে পরমুহূর্তে সহজ স্বরে বলে, ‘আপনাকেতো আসল কথাই বলা হয়নি। দেখুন, কী সব প্রসঙ্গ এসে গেল। একটা বাসা পাওয়া গেছে। শহর থেকে একটু দূরে, তবে বাসের সুবিধা ভালো। ম্যালা ঝক্কি গেল দিদি! ট্যাপের পানির আরাম পাবেন না, টিউবওয়েল। তাই এক হাজারে রাজি হয়েছে।’

অবশ শরীর টেনে বাইরে বেরিয়ে আসি। ফুটপাত ধরে দুজন হাঁটি। মধ্যরাতের বিশাল নির্জনতায় বাবার মৃত্যু হয়েছিল। বিস্তৃত জনারণ্যের দিকে চেয়ে আমি বাবার মুখ খুঁজি। ঝাপসা সব। ওমর একটা ঝুলঝুলে জ্যাকেট গায়ে ঝুলিয়েছে। গলায় মাফলার। গালে তার যথারীতি পুনরায় গজানো দাড়ি। পায়ের চেয়ে একটু ছোটোই হবে চপ্পল। গোড়ালি বেরিয়ে পড়েছে। ওকে এই অবস্থায় দেখে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। বরং আচমকা ফিটফাট, চৌকশ হয়ে গেলেই ওকে বেখাপ্পা লাগবে। হঠাৎ পকেটে হাত রেখে সে শীতে কুঞ্চিত নাকে ভাঁজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com

ফেলে বলে, 'তাহলে বাসাটা কালই আপনি দেখতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ,' আমি বলি। 'ভোরে আমার বাসায় চলে আসবেন। কুয়াশায় ভিজতে ভিজতে দুজন যাব।'

এরপর রিকশায় ঘুপচি গলি, নর্দমা, স্তূপীকৃত ময়লা, পচা ডাব, মাস্তান গোছের ছেলের বিড়ি ফোঁকা, গলির মাঝখানে রক্তমাখা ন্যাপকিন, দুটো কুকুরের দীর্ঘস্থায়ী সঙ্গম দৃশ্য দেখা শেষে আমার বাসার সামনে ওমর আমাকে নামিয়ে দেয়। একজন অপুর আত্মহত্যা, শরীরের সমস্ত রক্ত নিঃশেষে দান করে রক্ত গোলাপ-ফোটানো নিথর নাইটিঙ্গেল এবং আর একজনের দুর্বিষহ গ্লানির ওপর পা রেখে ঘরে আসি।

সারাটা রাত প্রচণ্ড অস্থিরতায় আর ঘুম আসে না। সেই চিরকালীন যাবতীয় দ্বন্দ্ব যা আমাকে শুষে পান করে একবার শূন্যে ওঠায়, ফের দ্বিধাবিভক্ত পৃথিবীর অতলে নিক্ষেপ করে, এইসব অনুভূতির পীড়নে ছটফট করি। গলায় শ্বাস চেপে বসলে উঠে বসি বিছানায়। বালিশ ফুঁড়ে তুলো বের হয়ে বিছানা একাকার হয়ে যায়। কেমন হাঁসফাঁস লাগে। মেঝে দিয়ে একটা ছুঁচো দৌড়ে যায়। গলায় জল ঢালি। তারপর মুমূর্ষু আঙুলে বাতি জ্বালিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা ইজেলটা খাড়া করাই। ন্যাকড়া দিয়ে তকতকে পরিষ্কার করি। বড়ো অবসন্ন লাগে। দরজা খুলে বাইরে বেরোই। দমকা অন্ধকারে আবৃত চরাচর। এক সময় দেখি, দূরের একটা আলোর স্তম্ভ থেকে এক চিলতে আলো এসে বারান্দায় পড়েছে। কী তির্যক সেই আলোর বিস্তার। যেখানে পড়েছে, বড়ো উজ্জ্বল হয়ে, চারপাশের অন্ধকারকে তরল করে দিয়ে। কুয়াশা ঝরছে এবং এইভাবে প্রকৃতি ক্রমশ ধবল হয়ে উঠছে। ঠান্ডা হাওয়া। আমি ক্রমশ কেমন শান্ত হয়ে আসি। টেনে শরীরে চাদর জড়াই এবং অদ্ভুত চোখে, যেন এই প্রথম দেখছি, এইভাবে মাথা খাড়া রেখে চেয়ে থাকি, সেইদিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও www.amarboi.com